আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী

বার্নার্ড জ্যাফি

অনুবাদ

অধীর কুমার রাহা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী

বিশেষার্থবাচক বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী ও ঐতিহাসিক ঘটনাসূচক যে সব শব্দ, বাক্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রন্থ শেষের নির্ঘণ্টে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থপাঠের পূর্বে এগুলির উপর পাঠকগণ একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন।

সূচীপত্র

স্বীকৃতি

কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাহায্য লাভ করায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সহজসাধ্য হয়েছে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এটিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগের এবং ওয়াশিংটনের কংগ্রেস লাইব্রেরীর সাহায্য পাওয়ায় আমেরিকার পথিকৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের মূল লেখা পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৪১ সালের শরৎকালে সানমেরিনোর (ক্যালিফোর্নিয়া) হেনরি-ই হানটিংটন লাইব্রেরী আমাকে তাদের "রীডার" শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তার ফলে আমেরিকার বিজ্ঞানের প্রথম যুগের মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও চিত্র সংগ্রহ পরীক্ষা করতে পেরেছি। ফিলাডেলফিয়া একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্স, আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভারসিটি উইমেন, বেল টেলিফোন লেবরেটরীজ, ক্রোমাটিক টেলিভিশন ল্যাবরেটরিজ, ওয়াশিংটনের কর্নেগী ইনস্‌টিটিউশন, ক্যানাডা সরকারের খনি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ, মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরী, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব কলারর্ড পিপল, ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউশন, ইউনাইটেড স্টেটস্‌ হাইড্রোগ্রাফিক অফিস, ইউনাইটেড স্টেটস্‌ নেভাল একাডেমী, ইউনাইটেড স্টেটস্‌ পাবলিক হেলথ সার্ভিস্‌, প্রিন্সটনের পামার ফিজিক্যাল লেবরেটরী, ইয়েলের পীবডি মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি,—এরা সকলেই আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য, মানচিত্র ও ফটোগ্রাফ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বহু গুণী ব্যক্তি সুপরামর্শ দিয়ে এবং প্রভূত পরিমাণে তাদের মূল্যবান সময় দান করে আমাকে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পরিকল্পনা ও সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ। এদের মধ্যে রয়েছেন, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক এরিক, টি. বেল; ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ র‍্যালফ জি. ভ্যান নেম; ডার্টমাউথ কলেজের অধ্যাপক রেমণ্ড ডব্লিউ. বারট; ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এম. এম. রোডস্‌; কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এইচ. এল. এভারেট; স্যানমেরিনো

(কালিফোর্নিয়ার) মিসেস এডুইন হাবল ; ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজির লাইব্রেরী সমূহের ডাইরেক্টর রজার স্টানটন ; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডঃ এডুইন বি. উইলসন ; 'জার্নাল অব কেমিক্যাল এডুকেশনে'র ডঃ নরিস রেক্‌স্ট্র ; ডেথ ভ্যালির বনরক্ষী উইলার্ড ই. শ্যান্টো ; ওয়েলস্‌লি কলেজের ক্যাথারিন এস. ব্রেহম ; সাউথ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডঃ জে. রিঅন ম্যাসকিস্‌ক ; ট্রান্সিলভানিয়া কলেজের গ্রন্থগারিক মিসেস চার্লস এফ. নর্টন ; ড্যানিয়েলস্‌ভিলের (জর্জিয়া) পোস্টমাস্টার মিঃ জে. এ. বেকার ; জেফারসনের (জর্জিয়া) মেয়র সি. ই. হার্ডি ; নিউ হারমনির (ইণ্ডিয়ানা) ওয়ার্কিংমেনস্‌ ইনসটিটিউটের গ্রন্থগারিক লুই এম. হাসব্যাণ্ড হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এইচ. ওয়েসলি ; ওয়াইওমিং-এর সিনেটর জোসেফ সি. ও'মোহানি ; আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক্‌ ওয়ার্কস-এর ডেরিস কাটেল ; মাইকেলসন পরিবার ; হ্যারল্ড ওয়ার্ড এবং এই গ্রন্থে উল্লিখিত অসংখ্য সমসাময়িক বিজ্ঞানী। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হার্বার্ট এম. ইভানস্‌, বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত যে চমৎকার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি আমায় ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন, তাও আমার এই গ্রন্থ রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

সবশেষে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব মিস গ্যালিনা টেরকে। অতিশয় যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। এই নিয়ে তিনি তিনবার আমার হয়ে এই কাজ করলেন।

বার্নার্ড জ্যাফি

ভূমিকা

• বিজ্ঞানের ইতিহাস সমিতির মুখপত্র আইসিস (Isis) পত্রিকার সম্পাদক, ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ সাটন বলতেন, 'বিজ্ঞানের ইতিহাসই সভ্যতার ইতিহাসের মূলসূত্র হওয়া উচিত।' আজ খুব কম লোকই তাঁর কথা অস্বীকার করবেন। এই গ্রন্থেও আমি নথিপত্র ঘেটে চেষ্টা করেছি আমেরিকায় যে ধরনের বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছিল ও তার দ্বারা যে সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যকার সম্ভাব্য যোগসূত্রটি পরীক্ষা করতে।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় টমাস হ্যারিয়টের আগমন থেকেই বিজ্ঞানীদের এই জীবনকাহিনী শুরু করা হয়েছে। আমেরিকায় প্রথম আসবার পরই প্রকাশিত হয় তাঁর 'এ ব্রিফ অ্যাণ্ড ট্রু রিপোর্ট অব দি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অব ভার্জিনিয়া' (A Brief and True Report of the New Found land of Virginia) নামে গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থেই প্রথম ইংরাজী ভাষায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত ভূখণ্ডের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মার্কিনীদের বিজ্ঞান সেবার এই দীর্ঘ সাড়ে তিনশত বৎসরের ইতিহাস লিখতে বসে তাই আমার সামনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, অসংখ্য বিজ্ঞানসেবীদের মাঝ থেকে কি করে স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবনী বেছে নেওয়া যায়। যাদের কেন্দ্র করে মাকিনী বিজ্ঞান সাধনার কাহিনী সব চেয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করা যাবে।

কয়েকশত বিজ্ঞানীদের মাঝ থেকে তাই কুড়িজনকে বেছে নেবার কাজটা বড় সহজ নয়। কাজেই আমাকে নির্বাচনের কয়েকটি মূলসূত্র স্থির করে নিতে হয়েছিল। প্রথম ও প্রধান সূত্র হল পথিকৃৎ গবেষণাকারীরূপে কোনও বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্বের গুরুত্ব। অন্য সব বিষয় বাতিল করে এই ধরনের বিজ্ঞানীদের প্রাধান্য দেবার কারণ এই যে, কোনও নতুন বিষয়ে পথপ্রদর্শকের কাজটাই সব চেয়ে কঠিন।

মূলসূত্রের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল: (১) সমকালীন সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে, অন্ততঃ তৎকালীন যে সব রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনে বিজ্ঞানী অংশ গ্রহণ করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা। (২) বিজ্ঞানীর বিশেষ গবেষণা-ক্ষেত্র—যাতে যথাসম্ভব বেশী

সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। (৩) যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন বা ফলিত বিজ্ঞান অপেক্ষা মৌলিক গবেষণা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া। সর্ব শেষ অধ্যায়গুলিতে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে সব ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকরূপে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তার আলোচনা করা হয়েছে।

বইখানির প্রথম খসড়া সম্পূর্ণ হবার আগে কতকগুলি মজার ব্যাপার ধরা পড়তে লাগল। যেমন, কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল বিশুদ্ধ ও তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অপেক্ষা ফলিত বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নতুন হাতিয়ার নির্মাণেও এবং প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি সাধনে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম বৎসরেই জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৯০ সালের ১০ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট রেজেস্ট্রী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তার পর থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত মার্কিন নাগরিকগণ প্রায় ৩২০০০ পেটেণ্ট রেজেস্ট্রী করেন। এ ব্যাপার লক্ষ্য করে এব্রাহাম লিঙ্কন যে মন্তব্য করেছিলেন, "পেটেণ্ট ব্যবস্থা প্রতিভার অগ্নিতে স্বার্থের ইন্ধন জুগিয়েছে" তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পরবর্তী ত্রিশ বছরে আমেরিকাবাসীরা আরও সাড়ে চার লক্ষ পেটেণ্ট রেজেস্ট্রী করেন। এর মধ্যে ১৮৭৩ সালে মার্ক টোয়েনের আবিষ্কৃত কাটিং সংগ্রহের একটি খাতাও ছিল। এই অভিনব সংগ্রহ খাতাটিতে ছিল শুধু মাত্র আঠা-লাগানো কতকগুলি পাতা। সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত কাটিং এতে আপনা আপনি জোড়া যেত। মার্কটোয়েনের একজন জীবনীকার বলেন, এই খাতায় এমন একটি কথাও ছিল না, কোনও সমালোচক যার কোনও নিন্দা বা প্রশংসা করতে পারেন। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আরও পনেরো লক্ষ পেটেণ্ট মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তী দুই দশকে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও দশ লক্ষ। বস্তুতঃ পেটেণ্ট গ্রহণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। গ্রেট ব্রিটেন বা ফ্রান্সের দুগুণ এবং জার্মেনীর চারগুণ পেটেণ্ট মঞ্জুরীকৃত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৩৬ সালে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট অফিসের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ১০০ বৎসরে রেজেষ্ট্রীকৃত পেটেণ্ট সমূহের একটি প্রদর্শনী খোলা

হয়েছিল। এ থেকে একটি কমিটি দেশের বারোটি সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বাছাই করে নিম্নলিখিত ভাবে কালানুক্রমিক তালিকাভুক্ত করেন :

কটন জিন (তুলাবীজ ছাড়ানোর যন্ত্র)	১৭৯৩ সালে	মাসাচুসিটস্-এর	এলি হুইটনি	কর্তৃক	আবিষ্কৃত
বাষ্পীয় পোত	১৮০৯ সালে	পেনসিলভানিয়ার	রবার্ট ফুলটন	„	„
		এবং কনেটিকাটের	জন ফিচ্	„	„
রীপার (ফসল কাটাই যন্ত্র)	১৮৩৪ সালে	ভার্জিনিয়ার	সাইরাস ম্যাককরমিক	„	„
টেলিগ্রাফ	১৮৩৭ সালে	মাসাচুসিটস্-এর	সামুয়েল মোর্স	„	„
রবার ভলকানিজেসন (তাপ প্রয়োগে রবারে গন্ধক মিশিয়ে শক্ত করা)	১৮৩৯ সালে	কনেটিকাটের	চার্লস গুডইয়ার	„	„
সেলাইকল	১৮৪৬ সালে	মাসাচুসিটস্-এর	ইলিয়াস হাউ	„	„
এয়ার ব্রেক	১৮৭২ সালে	নিউ ইয়র্কের	জর্জ ওয়েস্টিংহাউস	„	„
টেলিফোন	১৮৭৬ সালে		আলেকজাণ্ডার জি. বেল (জন্ম স্কটল্যাণ্ডে)	„	„
বিজলী বাতি	১৮৮০ সালে	ওহাওর	টমাস এডিসন	„	„
লিনোটাইপ মেশিন	১৮৮৪ সালে		ওট্টমার মার্গেন্থালের (জন্ম জার্মানীতে)	„	„
ব্যবহারোপযোগী এলুমিনিয়াম	১৮৮৪ সালে	ওহাওর	চার্লস এম. হল	„	„
বিমান	১৯০৩ সালে	ইণ্ডিয়ানার	উইলবার রাইট	„	„
		ওহাওর	অরবিল রাইট	„	„

আরও পাঁচটি জিনিস এই তালিকাভুক্ত হতে পারে :

প্রথম কার্যকরী টাইপ রাইটার	১৮৮৬ সালে	পেনসিলভানিয়ার	ক্রিস্টোফার এল সোলস্	„	„
ফোনোগ্রাফ	১৮৭৭ সালে		টমাস এ এডিসন	„	„
রেডিও টিউব (তিন ইলেকট্রোড-যুক্ত)	১৯০৬ সালে	আইওয়ার	লি ডি ফরেস্ট	„	„

ব্যাকেলাইট ১৯০৯ সালে লিও এইচ. ব্যাকেল্যাণ্ড কর্তৃক আবিষ্কৃত
(জন্ম বেলজিয়ামে)

অয়েল ক্র্যাকিং
(ঘন পেট্রোল থেকে হালকা
পেট্রোল তৈরি করা) ১৯১৩ সালে ওহাওর উইলিয়াম বার্টন " "

এর অনেকগুলি আবিষ্কারই বিদেশে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সূত্র সমূহের উন্নতি সাধন, বিবর্ধন ও প্রয়োগের ফলাফল। যেমন বাষ্পীয়পোত। বাষ্প-চালিত এঞ্জিন জলযান চালনার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হওয়াতেই প্রথম কার্যকরী বাষ্পীয় পোত নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিজলী বাতি এবং বিমানের মত কতকগুলি আবিষ্কার সম্পূর্ণ বা বহুলাংশে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রয়োগ করেই সম্ভব হয়েছিল। আবার তুলাবীজ বাছাই যন্ত্র, ফসল কাটার যন্ত্র ও সেলাই কল প্রভৃতি নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল নিছক যান্ত্রিক উদ্ভাবনী ক্ষমতার বলে। মোটর চালনার অন্তর্দাহী এঞ্জিন নিয়োগ, আমাদের শ্রমশিল্পে বিভিন্ন ধরনের ধাতু ইস্পাত ও অন্যান্য মিশ্র ধাতুর ব্যবহারের বিপুল প্রসার; রকেটের নতুন জ্বালানী আবিষ্কারে আমাদের অভাবনীয় সাফল্য, আধুনিক কালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কৃত্রিম রবার, সুতা, রং, কীটঘ্ন ঔষধ, ভেষজ, ভিটামিন হর্মোন প্রভৃতি আবিষ্কারে আমাদের বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর অবদান,—এ সবই এ দেশের বিজ্ঞানসাধকদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অসংখ্য ব্যবহারিক প্রয়োগের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

কেন এ দেশে এমনি ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল? এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও আর্থিক বনিয়াদ গঠনে যে সব সামাজিক শক্তি কাজ করেছিল তার মাঝে। ইউরোপ থেকে যখন মানুষ এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ দেশে বাস করতে আসে, তখন তাদের সংখ্যা ছিল অল্প। এ দেশে আসবার পর থেকেই এই সংখ্যাল্প মানুষকে এই বিশাল ভূখণ্ডকে ইউরোপের সুসভ্য মানুষের বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য অবিরাম প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছে, অতিক্রম করতে হয়েছে এদেশের বিরাট সু-উচ্চ পর্বতমালা, দুরন্ত নদী, শষ্পহীন প্রান্তর, প্রতপ্ত মরুভূমি। এইসব প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে তাদের ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে দেশের সর্বত্র। এই কাজের জন্য চলাচল ও

যোগাযোগের নতুন ও দ্রুততর ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং শ্রম লাঘবকারী যন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এই প্রয়োজন দেশের মানুষের নিকট এক চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছিল। মার্কিনী মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও কারিগরী দক্ষতা এই চ্যালেঞ্জের সামনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এ দেশে শিল্পবাণিজ্যের অভূতপূর্ব সুযোগ ও ধনসম্পদ আহরণের বিপুল সম্ভাবনায় যেন চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল এই কর্মচঞ্চল লোকগুলির। এদের মাঝ থেকে আমেরিকায় দেখা দিতে লাগল এক শ্রেণীর ধনকুবের। ব্যবসা ও শিল্পে অগাধ ধন সম্পদ অর্জন করে এরা নিজ নিজ ব্যবসা বা শিল্প ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন এক একজন সম্রাট। বড় বড় রেল কোম্পানি, পেট্রোলখনি, কয়লাখনি, ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য শ্রমশিল্পের একচেটিয়া মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এই সব ধনকুবের শিল্প সম্রাটরা। বিজ্ঞানের সুফল প্রয়োগ করে বিপুল ধনসম্পদ আহরণ করবার এবং এই নতুন দেশকে শিল্প-সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলেন। সকল ক্ষেত্রেই তখন বিজ্ঞানের মূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সেবা ও কার্যকারিতার দ্বারা বিচার করা হত। তাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেবার বা সে বিষয়ে চিন্তা করবার অবসর ছিল খুবই কম। বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই দেশের সম্পদ আহরণের দুর্বার চেষ্টার মাঝে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুশীলনের দিকটি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল তখন।

তবু আমাদের এই প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠবার সময়ের মধ্যেই আমেরিকা তত্ত্বীয় ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছিল। এর কারণ হয়ত এই যে প্রতিভাধর তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের আবির্ভাবের জন্য কোনও বিশেষ উর্বর মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিত সমাজের মধ্য থেকে এদের জন্ম অবশ্যম্ভাবী এবং সমাজের উপর তাদের মনীষার প্রভাব পড়তেও বাধ্য। ভুললে চলবে না যে সম্পূর্ণ অভাবিত স্থান থেকে সাংস্কৃতিক পটভূমিবিহীন ভাবে, কোনও শিক্ষা বা উৎসাহ না পেয়েও বহু বিখ্যাত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। দিনমজুরের ছেলে জোসেফ হেনরি, প্রসারণশীল মার্কিন সীমান্ত প্রদেশে নতুন চাষ-আবাদ ফেঁদে আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী গরীব চাষীর ছেলে ম্যাথু মারি, ক্যালিফোর্নিয়ায় জামা-কাপড়ের দোকান চালান ইহুদীর ছেলে মাইকেলসন, অষ্ট্রিয়া হতে আগত, নিউইউয়র্কের ব্রুকলিনে এক মুদিখানা মালিকের ছেলে ইসিডোর রবি—এদের জীবনী ও কর্মসাধনা স্মরণ করলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

একথা সাধারণতঃ প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা তাঁদের সামাজিক পরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন এবং সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝে নির্বিকার চিত্তে বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন। মার্কিন বিজ্ঞানের ইতিহাস কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীদের জাগতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে এমনি পরম নির্লিপ্ততার অপবাদ সমর্থন করে না।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এতই সুবিদিত যে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যই ফ্রাঙ্কলিন তৎকালীন সমাজে প্রধানতম নাগরিকরূপে গণ্য হয়েছিলেন। বেঞ্জামিন টমসন আপন মানবতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন ইউরোপের দুর্গত মানুষের সেবায়। ইউরোপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পেতে শরণার্থীরূপে এদেশে এসেছিলেন বিজ্ঞানী কুপার। বহুদিন তিনি এই নতুন প্রজাতন্ত্রে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এদেশের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রিট্রেনহাউস দাসপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে ফরাসী বিপ্লবের লক্ষ্য সমর্থন করেছিলেন। টমাস সে তৎকালীন প্রচলিত অবাস্তব সমাজবাদে বিশ্বাস করতেন। তাই উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে রবার্ট ওয়েন প্রবর্তিত নতুন সমন্বয় আন্দোলনে (New Harmony Venture) যোগ দিয়েছিলেন।

বিচিত্র প্রতিভাধর এবং খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বিজ্ঞানী রাফিনেস্‌ক। কর্মব্যস্ত জীবনের বহু বছর তিনি কাটিয়েছিলেন সামাজিক উন্নতি সাধনের নানাবিধ পরিকল্পনা রচনায়। নিজস্ব মতাদর্শ অনুযায়ী কর্মপন্থা অনুসরণ করে তিনি দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। স্বল্পবিত্তদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন তার অন্তর্গত। এই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানটি খানিকটা সাফল্যও অর্জন করেছিল। এখান থেকে দরিদ্র ব্যক্তিগণ অল্পসুদে এবং স্বল্প মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রেখে টাকা ধার নিতে পারত। হেনরি যোসেফ তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ শিল্পে প্রয়োগ করে অর্থোপার্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সামান্য বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত স্মিথ-সোনিয়ান ইন্‌স্টিটিউটের ডাইরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। নিজের আবিষ্কার-গুলি অর্থের বিনিময়ে শিল্পপতিদের ব্যবহার করতে দিলে তিনি বিপুল অর্থের মালিক হতে পারতেন। বিজ্ঞানী সাইমন নিউকম্ব অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ

করেন, আর্থনীতি বিষয়ে লেখনী চালনা করেন। তিনিই প্রথম নির্ভুল ভাবে অর্থ প্রসারবাদ (Quantity theory of money) প্রচার করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

মার্কিন বিজ্ঞানী সমাজসচেতন। অকস্মাৎ পারমাণবিক ও মহাশূন্য যাত্রার যুগ আবির্ভূত হওয়ায় তাঁদের এই সমাজসচেতনতা আরও বেড়ে গেছে। তাঁদের এ সমাজসচেতনতার কারণ ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন নয়। মার্কিন বিজ্ঞান বহুলাংশে এমন সব বিজ্ঞানীর সাধনফল যারা ইউরোপে থাকতে সেখানকার অধিবাসীদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক মতবাদ-অসহিষ্ণুতার জন্য অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। শরণার্থীরূপে আমেরিকায় এসে তাঁরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ করেছিলেন। আর একদল বিজ্ঞানী ছিলেন ইউরোপের নির্যাতিত নরনারীর সন্তানসন্ততি। এই নতুন দেশে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বাধীনতার নির্মল বায়ুতে মুক্ত জীবন যাপন করতে। এদের মধ্যে খুব কম লোকই ছিলেন ধনী। অনেকেই ছিলেন আত্মশিক্ষিত বুদ্ধিমান। গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে চালিত দেশের স্বাধীন মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন।

বিগত ষাট বছরে এদেশে বিজ্ঞানে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংখ্যা বেড়েছে এবং তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর একটি কারণ হল আমেরিকার একদা-প্রসারণশীল সীমান্তের অবলুপ্তি। তার ফলে অস্থির চঞ্চল দুঃসাহসী কল্পনাবিলাসী মার্কিনী মানুষ তার এই উদ্যম ও কর্মশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজেছিল সীমাহীন নতুন জগতের রাজ্যে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ইদানীং কালে নতুন ব্যবসা প্রবর্তনকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহ মেধাবী গণিতজ্ঞদের চাকরি দিয়ে তাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিয়োগ করেন না। সব মেধাবী বিজ্ঞানীরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ-সিদ্ধির বদলে, এখন তাদের গাণিতিক ও তথ্য নির্ণয়ের দক্ষতা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-সংগঠন সমূহের বীক্ষণাগারে গবেষণার কাজে লাগাচ্ছেন।

এ ছাড়া জনস্ হপকিনস্, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইন্‌স্টিটিউট ফর অ্যাডভানস্‌ড স্টাডিজ প্রভৃতি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হওয়ায় বহু ছাত্রের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষালাভ ও গবেষণার সুযোগ হয়েছে। না হলে এসব সুযোগলাভের জন্য এরা হয়ত বিদেশে যেতে বাধ্য হতেন। পার্ট টাইম শিক্ষা দানের নতুন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকদের রুটিন-মাফিক নিয়মিত অধ্যাপনার দায় হতে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা এখন মৌলিক গবেষণায় একটু বেশী সময় দিতে পারেন। নিয়মিত অধ্যাপনার গুরু-ভার থেকে এবং নিত্য ক্লাস নেবার একঘেয়ে খাটুনি থেকে মুক্ত হতে পারলে অধ্যাপকগণ আরও প্রশান্ত চিত্তে দীর্ঘ সময় দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োগ করতে পারবেন।

মার্কিন বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল সাম্প্রতিক কালে ওয়াশিংটনের কর্নেগী ইন্‌স্টিটিউট, নিউইয়র্কের কর্নেগী কর্পোরেশন, রকফেলার ফাউণ্ডেশন, কমনওয়েলথ ফাণ্ড, গুগেনহাইম মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশন, ডব্লিউ কে কেলগ ফাউণ্ডেশন, স্লোয়ান ফাউণ্ডেশন ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনগুলির মত বিদ্যোৎসাহ ও গবেষণা কার্যে বৃত্তিদান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রভূত অর্থসঙ্গতি-সম্পন্ন কতকগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্ম। রকফেলার ইন্‌স্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চের মত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ সাহায্য পেয়েছে এমনি বেসরকারী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯০৪ সালে নিউইয়র্কে এই গবেষণাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। সাইমন ফ্লেকস্‌নার ছিলেন এর ডিরেক্টর। পালোমার পর্বতের উপর মানমন্দিরে স্থাপিত দুইশত ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছিল এমনি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকুল্যে। লোকহিতৈষণা কার্যে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ-সাহায্যের অসংখ্য সুফলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ দুটি যন্ত্র।

অনেকটা এই সব কারণেই পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানীরা এসে জড়ো হয়েছেন আমাদের দেশের গবেষক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবার জন্য। এখানে স্বাধীন ও শান্ত পরিবেশে মিলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাব, দক্ষতা ও জ্ঞানের আদান প্রদান করে, পরস্পরের জ্ঞান ও দক্ষতা একত্রিত করে সকলে উপকৃত হচ্ছেন। পীত জ্বর (yellow fever—এক ধরনের সংক্রামক জ্বর। এতে পাণ্ডুরতা ও রক্তস্রাব ঘটে) নির্মূলকরণ সম্পর্কিত গবেষণা চালাতে উত্তর জাপানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে রকফেলার ইন্‌স্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চে আসেন হিদেও নোগুচি, এই পীত জ্বর প্রতিষেধক টিকা

আবিষ্কারের গবেষণা করতেই আবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এখানে আসেন ম্যাকস্ থেইলার। এই টিকা আবিষ্কার করেই ১৯৫১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চালাতে ইন্স্টিটিউট ফর অ্যাডভানসড্ স্টাডিতে আসেন দুজন তরুণ চীনা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। এখানে তাঁদের গবেষণার ফলে প্যারিটি নিত্যতা সূত্র (Principle of Parity) বাতিল হয়ে যায়। এবং ১৯৫৭ সালে এরা দুজন একত্রে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের শক্তিশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বৃহদাকার, বিস্তৃত ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সজ্জিত গবেষণাগার স্থাপন। এগুলির মধ্যে প্রথম বড় রকমের ফলপ্রসূ গবেষণাগারটি স্থাপন করেন ১৯০২ সালে নিউইয়র্কের সেনেক্টাডিতে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি। এর পর ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানি, ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, গাল্ফ্ অয়েল কোম্পানি এবং ই আই দ্যু-পণ্ট দ্য নেমরস্ অ্যাণ্ড কোম্পানি নিজেদের গবেষণাগার স্থাপন করেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণাগার স্থাপনের সর্বাধিক প্রেরণা দেখা দেয় ১৯১৬ সাল হতে। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে ঘটনাবলীর মাঝে নাটকীয়ভাবে অতি দ্রুত আমরা উপলব্ধি করলাম যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম রসায়ন ও রঞ্জন দ্রব্য প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যে আমরা ইউরোপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অকস্মাৎ তড়িৎবেগে বীক্ষণাগার স্থাপনের হিড়িক পড়ায়, ১৯২০ সাল নাগাদ আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণাগারে ৬০০০ বিজ্ঞানী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কুড়ি বছর পর এ সংখ্যা দাঁড়ায় ছত্রিশ হাজারে। কোটি কোটি ডলার অর্থ ব্যয় হয়েছিল এই সব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যে।

আমেরিকার এই নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা সমৃদ্ধ হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটে। বস্তুত এমনি দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগার থেকেই পাঁচজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ও জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর আরভিং ল্যাং মুইর ও বেল টেলিফোন লেবরেটরীজের ক্লিনটন জে ডেভিসন। জন বার্ডিন, ওয়াল্টার এইচ ব্র্যাটেন, উইলিয়াম শক্লে। প্রথম দুজন বিজ্ঞানী বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

গবেষণার জন্য, বাকী তিনজন ট্রানজিস্টর উন্নয়নের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মার্কিন বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের কাজে লিপ্ত রয়েছে আরও চল্লিশটিরও অধিক গবেষণা পরিচালন সংস্থা ও কেন্দ্রের কতকগুলি, যেমন নেভাল অবজারভেটারী (নৌবিভাগীয় মানমন্দির), কোস্ট অ্যাণ্ড জিওডেটিক সার্ভে (উপকুল ও ভূপৃষ্ঠ জরীপকারী সংস্থা), জিওলজিক্যাল সার্ভে (ভূতাত্ত্বিক জরীপ সংস্থা) ও কৃষিবিভাগ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব মাইনস্ (জাতীয় খনি বিভাগ), ব্যুরো অব স্টাণ্ডার্ড (মান বিভাগ), ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব হেলথ (জাতীয় স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান) পাবলিক হেলথ সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সংস্থার বিজ্ঞানীরা পেলাগ্রা, পীতজ্বর, টাইফয়েড, আমাশা, রক্তামাশয়, রকি পর্বত অঞ্চলের স্পটেড ফিভার, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এদের প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডের এফ জি ব্রিকওয়েডের ডয়টোরিয়াম আবিষ্কারের কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা আমেরিকা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হত। বিদেশ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণীর ও উচ্চতর গবেষণার জন্য বহু ছাত্র সেখানে এসে জড়ো হত। সেই ছাত্রধারার গতিপরিবর্তন হল এবার। ইউরোপের বদলে বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আসতে লাগল আমাদের গবেষণাগারগুলিতে। আমরা তখন ব্যাপক ভাবে গবেষণার কাজ চালাচ্ছি। আমাদের গবেষণার মানও ইউরোপের গবেষণাগারগুলির মতই সুউচ্চ পর্যায়ের। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজিতে স্টার্টইভাণ্ট ও তাঁর এক দল সহকারীর (মৌলিক চিন্তাশক্তিতে এরা পৃথিবীর যে কোনও দেশের মনীষীদের সমকক্ষ) সাহায্যে টমাস হাণ্ট মর্গান বংশগতি সম্পর্কে এক মতবাদ প্রচার করলেন। মর্গানের জিন (gene) সম্পর্কিত মতবাদ তাপগতিবিজ্ঞানে জে. উইলার্ড গিবসের মতবাদের মতই অতি গুরুত্বপূর্ণ। অভিব্যক্তি ও বংশগতির রহস্য সমাধানের কাজে বিজ্ঞানকে অনেকখানি সাহায্য করেছে মর্গানের এই জিনতত্ত্ব।

পাসাডেনাতে গবেষণা চালাচ্ছিলেন রিচার্ড সি. টোলম্যান নামে আর একজন তীক্ষ্ণ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে এডুইন হাবল ও অন্যান্য পর্যবেক্ষকগণ ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সব তথ্য নির্ণয় করছিলেন তিনি সেগুলির বিশ্লেষণ করে চলেছিলেন। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি যে নূতন সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করলেন তা এমনই যুক্তিপূর্ণ যে স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর স্থির বিশ্বের ধারণা পরিত্যাগ করে টোলম্যান প্রচারিত 'চলমান বিশ্বের' মতবাদ গ্রহণ করলেন। হাবল জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেছিলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আহরিত তথ্যের অধিকাংশই শুধু তাঁরই গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ নয়। গভীর অন্তদৃষ্টির সাহায্যে তিনি জগতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর প্রসারণশীল বিশ্বের মতবাদ। হাবল ছিলের ইউরোপের সেরা তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের সমান প্রতিভাধর। তাঁর প্রসারণশীল বিশ্বের মতবাদ মানুষের মনকে এক স্বপ্নাতীত ঊর্ধ্বলোকে টেনে তুলল।

বার্কলিতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অচিন্তিতপূর্ব একটি যন্ত্রের সাহায্যে আর্নেস্ট ও. লরেন্স নামে একজন তরুণ গবেষক পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় মেতেছিলেন। তার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত এক জগতের দ্বার খুলে গেল। পরমাণুর এই অভিনব জগত এখন বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত আহ্বান জানাচ্ছে তার অপার রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য। লরেন্স এই পরমাণু রাজ্যের রহস্যভেদ করতে যে সাইক্লোট্রন বা পরমাণুচুর্ণকারী যন্ত্র নির্মাণ করলেন, তা এমনই কার্যকরী হয়েছিল যে আমেরিকার কুড়িটিরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সাহায্য নিয়ে এই যন্ত্র নির্মাণ করে নিয়েছিল। এদের দেখাদেখি পরে ইউরোপ ও এশিয়ার গবেষণাগারগুলিতেও সাইক্লোট্রন যন্ত্র স্থাপিত হয়।

১৯৩৫ সালে রকফেলার ইন্স্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চে প্রাণরসায়নী ওয়েনডেল এম. স্টানলি কেলাসিত প্রোটিন আবিষ্কার করেন: স্ট্যানলির জন্ম ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে। তাঁর আবিষ্কৃত এই জিনিসটিতে রোগ-উৎপাদক সকল ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। ট্যোবাকো মোজেইকে আক্রান্ত পাতা থেকেই তিনি এই বিশুদ্ধ রাসায়নিক কেলাসিত প্রোটিনটি পৃথক করলেন। ট্যোবাকো মোজেইক এক ধরনের ভাইরাস-সৃষ্ট গাছের রোগ। স্ট্যানলি আবিষ্কৃত কেলাস সুস্থ গাছে এই ট্যোবাকো মোজেইক রোগ উৎপাদন করতে

পারত। জীবন্ত না হলেও স্ট্যানলির এই কেলাস জীবন্ত কোষে প্রাপ্ত কতকগুলি কম্পাউণ্ড (যৌগিক) থেকে আপনদেহে রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করতে পারত। তাঁর এই আবিষ্কারে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও ভেষজ বিজ্ঞানের সীমান্ত যেন ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেল। এই অভাবনীয় আবিষ্কারে বিশ্ববাসী চমকিত হয়ে উঠল ও মানুষের মাঝে ভাইরাস-সৃষ্ট রোগ জয়ের আশা নতুন করে দেখা দিল।

বিপুল প্রয়োগকৌশল ও অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিউইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে হ্যারল্ড সি. ইউরে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এক নতুন পরীক্ষাক্ষেত্রের সন্ধান দিলেন। হাইড্রোজেনের দুটি ভারি আইসোটোপের মধ্যে একটি আবিষ্কার করেন তিনি এবং বেশ খানিকটা পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন আইসোটোপ পৃথক করেন। এই আইসোটোপগুলি এবং এগুলির দ্বারা নতুন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শারীরবৃত্তীয় সমস্যাগুলি নিয়ে নতুন ভাবে গবেষণা শুরু হল।

রবার্ট এ. মিলিকানের প্রেরণাধীনে রহস্যময় মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে কার্ল অ্যাণ্ডারসন মৌলগঠনকারী পরমাণুর একটি নতুন অংশ পজিট্রন আবিষ্কার করলেন। মেসন নামে অদ্ভুত পরমাণু কণিকাটিও আকস্মিক ভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। তীক্ষ্ণধী তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী ও দুঃসাহসী পরীক্ষাকারীর অসাধারণ সংমিশ্রণ ছিলেন লিনাস পলিং। প্যাসাডেনায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্ল অ্যাণ্ডারসনের গবেষণাগারের সামনে অন্য একটি গৃহে তিনি রাসায়নিক আচরণের ব্যাখ্যায় কোয়াণ্টাম বিদ্যা প্রয়োগ করলেন। কেলাসের গঠনের কতকগুলি সমস্যার এবং আণবিক সুস্থিতির ব্যাখ্যা করলেন। তারপর দুঃসাহসী অভিযাত্রীর মত প্রোটিনের রাসায়নিক গঠনরূপী অজ্ঞাত মহাদেশ আবিষ্কারের ও আণবিক ভেষজের প্রকৃতি নির্ধারণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দুটি নতুন গবেষণার ক্ষেত্রেই এই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

১৯১০ সালে রাশিয়ান ইউক্রেনের কীয়েভ শহর থেকে এসেছিলেন বাইশ বছরের তরুণ বিজ্ঞানী সেলম্যান এ. ওয়াকসম্যান। নিউ ব্রানসউন্টকের (নিউ জার্সি) রুট জার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বছর তিনি জীবাণু জীববিদ্যায় গবেষণা করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি স্টেপটোমাইসিন্ নামে নতুন

একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। মূত্রাশয়ের পীড়া ও মানুষের অন্যান্য ব্যাধিতে ঔষধটি চমকপ্রদ ফল দেয়। তারপর তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ নতুন রাসায়নিক পদার্থের সন্ধানে ইন্‌স্টিটিউট অব মাইক্রোবায়োলজিতে সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা চালান। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁর আবিষ্কৃত স্টেপটোমাইসিন বিক্রয়লব্ধ রয়ালটি থেকে নির্মিত হয়েছিল।

ভূগর্ভের কেন্দ্রস্থলে যে বিপুল চাপ দেখা যায়, অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করে তার অধীনে কেলাসের গঠন এবং অন্যান্য ধরনের প্রচণ্ড চাপের প্রভাব নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দার্শনিক পদার্থবিদ পার্সি ডব্লিউ. ব্রীজম্যান। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আবার তরুণ রবার্ট বি. উডওয়ার্ড জটিল জৈব অণুর গঠন রহস্য উদঘাটনের চেষ্টায় গবেষণা চালাচ্ছিলেন এবং সর্বপ্রথম কৃত্রিম কর্টিসোন, স্ট্রিচনিন, কুইনিন, প্রশমক রেসারপিন উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি গবেষণাগারে পঁচিশ বছর চেষ্টার পর জর্জ ওয়াল্‌ড দৃষ্টিশক্তির পশ্চাদ্‌বর্তী রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রহস্যোদ্ঘাটন করে চলেছিলেন।

খাদ্য হিসাবে শর্করা ও শ্বেতসার গ্রহণ করলে দেহাভ্যন্তরে কি ভাবে তার পরিবর্তন ঘটে সে সম্বন্ধে সেণ্ট লুই-এ ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি স্কুল অব মেডিসিনে গবেষণা চালাচ্ছিলেন এক তরুণ গবেষক দম্পতি। ১৯২২ সালে ডাঃ কার্ল এফ. কোরি ও তাঁর পত্নী ডঃ মিসেস গার্টি টি কোরি চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রাগ শহর থেকে এদেশে এসেছিলেন। ছয় বছর পর তাঁরা আমেরিকার নাগরিকরূপে গণ্য হন। এরা ইনসুলিনের সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলি সমস্যার সমাধান করে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ প্রমেহ রোগীর মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করতে সক্ষম হন।

তারপর বহু বর্ষ ধরে বহু গবেষকের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের শেষে ঘোষণা করা হল একটি চমকপ্রদ খবর: মারাত্মক শিশু পক্ষাঘাত রোগের কার্যকরী প্রতিষেধক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। ভেষজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই অতি বিস্ময়কর কাজটি সম্পাদন করেছিলেন জোনাস ই. সল্‌ক। তিনি তাঁর গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থের কিয়দংশ পেয়েছিলেন 'ন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিজ' নামক প্রতিষ্ঠান থেকে।

আমেরিকান বিজ্ঞান আজও প্রাণবন্ত, কল্পনাময়ী, এবং অবিশ্বাস্যরূপে সৃজনশীলতার সম্ভাবনাপূর্ণ। দেশের সর্বত্র বিজ্ঞান নিয়ে নতুন করে দেখা

দিয়েছে অসীম আগ্রহ। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা নিঃশব্দে বিজ্ঞানের বহু কঠিন সমরাঙ্গনে ও নিঃসঙ্গ ঘাটিতে যুদ্ধ করে চলেছেন যেন। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অনুশীলন ও পরিপোষণ চলছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও শিল্প গবেষণাগারগুলিতেই নয়, আরও বহুস্থানে। বহু অভাবিত ক্ষেত্রে। নানাসূত্র থেকে একত্র করে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের এই কাহিনী লিখতে গিয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য আমাকে সারা দেশে ঘুরতে হয়েছিল। আলাপ করতে হয়েছিল বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে। তখন লক্ষ্য করেছিলাম একালের বিজ্ঞানীদের নামে আমাদের সেই আদি যুগের প্রকৃতি, বিজ্ঞানীদের নিঃস্বার্থ, আত্মভোলা বিজ্ঞানসেবার ধারা এখনও অক্ষুন্ন আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের অভিযানে লুই ও ক্লার্ক একদা যে পথ ধরে চলেছিলেন, এই বিজ্ঞানীজীবনী কাহিনী লেখার তথ্য সংগ্রহের জন্য, তার কিছু পথ ধরে আমাকেও চলতে হয়েছিল। বার্টরাম ও রাফিনেস্কের পুরানো পথ ধরেও চলতে হয়েছে আমায়। দেখেছি, পুরানো ধাঁচের প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের সমতুল্য বিজ্ঞান সাধক রয়েছেন এখনও আমাদের মাঝে। বর্ণাঢ্য ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল মনুমেণ্টের গর্ভে, এমনি মানুষদের একজনের সাক্ষাৎ পেলাম। যিনি এখনও 'জীবন্ত জিনিস ভালবাসেন"। এই ডেথ ভ্যালিতেই একশত বৎসর আগে জন সি. ফ্রেমণ্ট কতকগুলি অভিনব গাছগাছালির সন্ধান পেয়েছিলেন।

সুউচ্চ পিনামিণ্টস্ ও ফিউনারেল রেনজের মাঝে সুন্দর উপত্যকাটিতে সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এম. ফ্রেঞ্চ গিলম্যানের। একশ বছরেরও আগে ইনি ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যানিং অঞ্চলের আশেপাশে গাছপালার নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসে মরুভূমির চারা গাছের তত্ত্বাবধানকারীর চাকরি নিয়ে তিনি এই উপত্যকায় আসেন। আজ তাঁর নাম ডেথভ্যালির উদ্ভিদ ও পক্ষিবিজ্ঞানের সমার্থক। আমাদের দেশের প্রথমদিকের অনেক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর মত গিলম্যান লেখা-পড়া জানতেন না। লাতিনে সামান্যতম দখলও ছিল না। তবু তিনি নিষ্ঠাবান সংগ্রাহকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। গিলমানিয়া লিউটেওলা, ও অন্যান্য কতকগুলি ফুলের নাম তাঁর নামানুসারে রাখা। গিলম্যান ও তাঁর কর্মতৎপর সঙ্গীরাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর উত্তেজনাময় অভিযানের অচ্ছেদ্য অংশ।

॥ ১ ॥

টমাস হ্যারিয়ট

১৫৬০-১৬২১

আমেরিকায় বিজ্ঞানের বীজ বপন

"এই লোকগুলির গায়ে হরিণের চামড়ার ঢিলে জামা, কোমরে জড়ানো অমনি হরিণের চামড়া, শরীরের অন্যান্য অংশ নগ্ন। ইংল্যাণ্ডের মানুষ যেমন দেখতে, তেমন নয়। তাদের সঙ্গে পার্থক্য অনেক। এরা কোনও ধারাল যন্ত্রপাতি, লোহা বা ইস্পাতের অস্ত্র ব্যবহার করে না। ছোট ছোট খুঁটি দিয়ে গোলাকারে এরা ঘর তৈরী করে। ঘরের চুঁড়াটা শক্ত করে বাঁধা।...... এদের খুব বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের মত এদের ধারাল যন্ত্রপাতি না থাকলেও, আমাদের মত এরা বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উন্নত না হলেও, যে সব জিনিসপত্র ওরা তৈরী করে তাতে ওদের বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের জিনিসপত্র যা কিছু ওরা দেখেছে, যেমন গণিতবিদ্যার যন্ত্রপাতি, জাহাজের কম্পাস, আতসবাজি, বন্দুক, হুক, আমাদের লেখাপড়া ও তার সাজসরঞ্জাম, পুঁথিপত্র ও কালি-কলম-কাগজ, ঘড়ি—সব কিছুই ওদের কছে এত অদ্ভুত ও দুর্জ্ঞেয় ঠেকেছে যে ওরা ভেবেছে এসব ভগবানের তৈরি, মানুষের নয়। (এমনি ধারণার ফলেই ওরা আমাদের ঈশ্বর ও ধর্মের কথা মন দিয়ে শুনেছে)"।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (তখন অবশ্য দেশটির এ নাম হয়নি) বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকে প্রথম যে সব কথা লেখা হয়েছিল, এগুলি তাঁরই কিছু অংশ। হ্যারিয়টের 'এ ব্রিফ অ্যাণ্ড টু রিপোর্ট অব দি নিউ-ফাউণ্ড ল্যাণ্ড অব ভার্জিনিয়া' নামে গ্রন্থখানিতে এমনি ভাবে উত্তর ক্যারোলাইনার রোয়ানেক দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। এই দ্বীপেই ১৮৮৫ সালে ইংরাজ অভিযাত্রীদল এসে অবতরণ

করেছিল। রানী এলিজাবেথের নিকট হতে রাজকীয় সনদ প্রাপ্ত হয়ে স্যার ওয়াল্টার র্যালে এই অভিযাত্রীদের উত্তর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, 'নতুন দেশ আবিষ্কারের। নতুন দেশ অন্বেষণের, কোনও খ্রীষ্টান বাস করে না যে দেশে, কোনও খ্রীষ্টান রাজার অধিকারভুক্ত নয় যে সব দেশ, আটল্যান্টিক সাগরের ওপারের সেই মূর্তিপূজক, বর্বর মানুষ অধ্যুষিত অজানা ভূ-ভাগের খবর সংগ্রহ।'

নতুন দেশের বর্বর পৌত্তলিকগুলিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের আত্মার পারলৌকিক সদ্গতির ব্যবস্থা করাই শুধু র্যালের লক্ষ্য ছিল না। নতুন আবিষ্কৃত এই দেশটি ছিল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এ কথা তখন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে এই আবিষ্কৃত দেশটি ইংল্যাণ্ডকে বাল্টিক উপকূলের দেশগুলি থেকে অতি উচ্চ মূল্যে পটাশ (রাসায়নিক ক্ষার) ও জাহাজ তৈরির কাঠ কেনার দায় থেকে অব্যাহতি দেবে, রং মশলা ও শোরা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির সরবরাহের জন্য সুদূর প্রাচ্যের উপর একান্ত নির্ভরতা থেকে মুক্তি দেবে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তখন এই সব পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

আটলান্টিকের ওপারের অসভ্যদের এই দেশগুলি ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের অধীনে আনবার মতলব আঁটছিলেন র্যালে। খুঁজছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি এই নতুন দেশে সযত্ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের কাজ চালাতে পারবেন। এ কাজ করবার জন্য চাই একজন অগাধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ও তারুণ্যের উৎসাহদীপ্ত একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। হাতের কাছে এমনি একজনকে পাওয়া গেল। নাম তাঁর টমাস হ্যারিয়ট। কুড়ি বছর বয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করে পাঁচ বছর ধরে তিনি র্যালের গণিত-শিক্ষকের কাজ করছিলেন। র্যালে এই কৃতী ছাত্রটিকে তাঁর গৃহে স্থান দিয়েছিলেন। মোটা বেতনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেই সঙ্গে। ইংরাজ অভিজাত সম্প্রদায় ও পার্লামেন্ট সদস্যগণও দেখলেন তরুণ হ্যারিয়ট প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত, মুখ বুজে নিজের কর্তব্যকাজ করে যান, সঙ্গী হিসাবেও তাঁকে মন্দ লাগে না। কারণ ক্ষুরধার বুদ্ধি আর রসজ্ঞান আছে ওঁর। শিক্ষক হিসাবে তিনি সুদক্ষ ও ধৈর্যশীল। এ কাজের যোগ্য ব্যক্তিই হ্যারিয়ট।

১৫৮৫ সালের ৯ই এপ্রিল প্লীমেথ বন্দর থেকে সাতখানি জাহাজ ছাড়ল। র্যালের নামে এই বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন স্যার রিচার্ড গ্রেনভিল।

তাঁর এই অভিযাত্রী বাহিনীতে ছিল একশত সাত জন লোক। হ্যারিয়টও তাদের অন্যতম। নতুন দেশের বিবিধ পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করা, অভিযানের ইতিহাস লেখা, ভৌগোলিকের কাজ করা, নতুন দেশের খনিজ সম্পদ, বৃক্ষলতা, পশুপ্রাণীর বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করা ও সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে আনার ভার পড়েছিল হ্যারিয়টের উপর। ক্রিস্টোফার কলম্বাস যে পথ ধরে চলেছিলেন সেই পথে পাল তোলা জাহাজ নিয়ে চললেন গ্রেনভিল। বায়ু প্রবাহের টানে অ্যাডমিরাল গ্রেনভিলের নৌবহর প্রথমে গিয়ে পৌঁছাল স্যাণ্টো ডেমিনিগোর দিকে, পরে পামলিকো সাউণ্ডের (উপহ্রদের) উত্তরে, রোয়ানোক দ্বীপে। পামলিকো সাউণ্ড ও অ্যালবার মার্লি সাউণ্ডের মধ্যবর্তী জলভাগে অবস্থিত এই রোয়ানোক দ্বীপ।

এখানে দুর্গ নির্মাণ করলেন অভিযাত্রীদল। ম্যানটিও ও. ওয়ানচেজ নামে দুই ব্যক্তিকে গাইড (পথপ্রদর্শক) ও দোভাষীরূপে পেয়েছিলে হ্যারিয়ট। এদের সাহায্যে তিনি এ অঞ্চলের মানচিত্র তৈরির কাজে লেগে গেলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে টুকে নিতে লাগলেন চারদিকে যখন যা দেখতে পেলেন তার সব কিছুই।

এই সময় পৃথিবীর নানা অজানা দেশে অভিযান চালাচ্ছিল ইউরোপের নানা দেশের নৌবাহিনী, বয়ে আনছিল বিচিত্র সব গাছপালা, পশুপাখীর অদ্ভুত সব তথ্য ও নমুনা। জীবন্ত প্রাণী সম্বন্ধে মানুষের মাঝে এ সময় নতুন ভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীববিদ্যা চর্চায় নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। অ্যারিস্টটলের লেখা মোটা মোটা পুরানো যে সব বইগুলিতে এতদিন অব্যবহারে ধুলো জমছিল, সে গুলি ঝেড়ে মুছে নবোদ্যমে পঠনপাঠন ও চর্চা চলছিল এবং অ্যারিস্টটলের শিক্ষার আলোকে অজানা দেশগুলি থেকে সংগৃহীত নতুন তথ্যগুলির বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা পুনপ্রবর্তিত হল। বিত্তবান শৌখিন উদ্ভিদ ও পশুপ্রাণীর নমুনা সংগ্রাহকদের সোনার কাঠির ছোয়ায় গজিয়ে উঠতে লাগল বটানিক্যাল গার্ডেন ও পশুশালা। বন্ধু-বান্ধবদের আনন্দ দেবার জন্য এরা সাগ্রহে বিচিত্র সব উদ্ভিদ ও পশুপ্রাণীর নমুনা খুঁজে বেড়াতেন। বহু বিচিত্র বর্ণের অদ্ভুত পশুপাখী ও ফুল এইভাবে ইউরোপে

২

আসছিল। নবাবিষ্কৃত পশুপ্রাণীর এই ক্রমবর্ধমান তালিকা ও কাহিনীতে যুক্ত হল হ্যারিয়টের সংগৃহীত পশুপক্ষী এবং উদ্ভিদের নমুনা ও বিবরণ।

ইউরোপের বিজ্ঞানীরাই শুধু আমেরিকা ভূখণ্ডের এই বনসম্পদ ও পশু-প্রাণী সম্বন্ধে আগ্রহ দেখালেন না। ইংল্যাণ্ডের বণিক সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছিলেন, রোয়ানক দ্বীপের ফার গাছ থেকে তৈরি করা যাবে জাহাজের শক্ত মজবুত মাস্তল, অ্যাশ গাছ থেকে তৈরি হতে পারবে পিপের বেড়, সীডার গাছের কাঠ দিয়ে বানানো চলবে চমৎকার আসবাবপত্র, পাইন গাছ থেকে পাওয়া যাবে পীচ, আলকাতরা, রজন, ও তার্পিন তেল। ওয়াড গাছ থেকে তৈরী করা যাবে নীল, মাডের গাছের শিকড় থেকে হবে লাল রং। সুমাক গাছ থেকে এক ধরনের কালো রং ; এদেশের অনেক গাছপালা থেকে নিষ্কষিত করা যাবে সুমিষ্ট নির্যাস ও অন্যান্য কবিরাজী ঔষধ। উইনটার-গ্রীন এমনি একটি গাছ। এর রোগ আরোগ্য ক্ষমতার কথা রেড ইণ্ডিয়ানরা জানত। হ্যারিয়ট লিখেছিলেন 'এসব পণ্য সম্পদের ব্যবসা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মুনাফা করা যাবে।' প্রধানতঃ এই কারণেই র‍্যালে এই নতুন দেশে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

হ্যারিয়টের আনা দুটি বস্তু সম্পর্কে পরম উৎসাহ দেখাতে লাগলেন র‍্যালে। প্রথম বস্তুটি হল ভুট্টা। স্পেন দেশের অভিযাত্রীরা আগেই ভুট্টা গাছ দেখেছিল। এগুলি প্রথমে জন্মাত পেরুতে। সেখান থেকে উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ভুট্টার চাষের প্রচলন হয়। রেড ইণ্ডিয়ানরা তরমুজ, মটর, কোয়াস, কুমড়া, চাল কুমড়া, এবং লিমাবীণ (এক জাতের মটরশুঁটি)ও চাষ করত। এগুলি ভুট্টার সঙ্গে মিশিয়ে তারা তাদের সৌ-কোয়াকোয়াটাস তৈরি করত।

দ্বিতীয় যে পণ্যটি স্যার ওয়ালটার র‍্যালেকে উৎসাহিত করে তুলেছিল সে, জিনিসটা এক ধরনের ওষধি গাছ। আলাদা ভাবে এর চাষ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে উপপ্‌ওক (Uppowoc)। এর পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে মাটির তৈরি পাইপের মধ্য দিয়ে টেনে এর ধোঁয়া টেনে নিত তারা পেটে ও মাথায়। সেখান থেকে এই ধোঁয়া শরীরের বাড়তি তাপ ও বদ রস বের করে দিত। রোয়ানক দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এই ওষধি গাছের পাতার ধোঁয়া খেয়ে হ্যারিয়ট লিখে ছিলেন, "অনেক বিরল ও অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা—যা বর্ণনা করতে লাগবে মস্ত বড় এক খণ্ড বই।" হ্যারিয়টের

বৈজ্ঞানিক বিবরণী সাধারণতঃ নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য হলেও কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই বিচিত্র ওষধি বৃক্ষ সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

ধুমপানের সপক্ষে প্রথম বড় দরের প্রচার কর্তার কাজ করেন হ্যারিয়ট। কি ভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের মত ধুমপান করতে হয় হ্যারিয়ট তাঁর মুরুব্বি ওয়ালটার র‍্যালেকে তা দেখিয়ে দেবার পর তিনি তামাক সেবনের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে ইংলণ্ডের রাজ সভার অভিজাত মহলে পাইপে ধুমপানের ফ্যাসান চালু হয়ে গেল। তামাকের ব্যবহার প্রসার কল্পে আধুনিক কোনও সিগারেট ব্যবসায়ী এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারতেন কি না সন্দেহ। ধুমপানের অভ্যাস এত প্রসার লাভ করল যে তামাক বিনিময়ের মাধ্যমরূপ ব্যবহৃত হতে লাগল: শোনা যেত পঞ্চাশ পাউণ্ড আমেরিকান তামাকের বদলে তখন চলন সই গোছের সুন্দরী স্ত্রী সংগ্রহ করা যেত।

কিছু রেড ইণ্ডিয়ান হ্যারিয়টের বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর প্রার্থনা সভায় এসে গান গাইত। ভক্তিভরে বাইবেল চুম্বন করত, বিশেষ করে খরার সময় যখন ফসলের ক্ষেত শুকিয়ে যেত। রেড ইণ্ডিয়ান দলপতি পেমিসাপানের কিন্তু শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকটির মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিল। সে স্থির করেছিল কিছুতেই সে তার দেশবাসীর জমি হাত ছাড়া হতে দেবে না। পেমিসাপান তার লোকজনকে পরামর্শ দিল কেউ যেন হ্যারিয়টের খেলো গহনা, টিনের থালা, বা তামার কেটলির বদলে তাঁর কাছে চামড়া বা খাবার দাবার না বেচে। নদীতে মাছ ধরবার জন্য হ্যারিয়টের লোকজন যে খাঁচা পেতেছিল, রাত্রে সে তা চুরি করল, তাদের বাসের ঘরগুলি পুড়িয়ে দিল; তারপর মতলব আঁটতে লাগল হ্যারিয়টকে খুন করবার।

রেড ইণ্ডিয়ান দলপতির এমনি শত্রুতাচরণের ফলে শীঘ্রই র‍্যালফ লেন দেখতে পেলেন তার কলোনীতে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। র‍্যালফ লেনকে এই কলোনীর দেখা শোনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন হ্যারিয়ট। তিনি তার লোকজনদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আশে পাশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বললেন। নিজেদের চেষ্টায় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে বেচে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এই ছোট ছোট দলগুলোকে; আর সেই সঙ্গে সবাই লক্ষ্য রাখবে ইংরাজ অভিযাত্রীদের কোনও জাহাজ চোখে পড়ে কি না।

রেড ইণ্ডিয়ান দলপতি শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের দেশ থেকে হটিয়ে দেবার জন্য লড়াই বাধালেন, এবং স্যার ফ্রানসিস ড্রেক ইংরাজদের এই কলোনীটা দেখতে পাবার কয়েকদিন আগে সেই লড়াইএ দলপতি মারা গেল। স্যার ফ্রানসিস ড্রেক তখন নিজে সাণ্টো ডামনিঙ্গো ও স্টে অগাস্টাইন থেকে কিছু সোনারূপা লুট করে ফিরছিলেন সে পথে। কলোনীর ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, হতাশ অধিবাসীরা তখনই ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া স্থির করলেন।

১৫৮৬ সালের ১৯শে জুন, চার জন বাদে (এই চারজন সে বছর মারা গিয়েছিল) প্রথম উপনিবেশের সব অধিবাসীই ইংলণ্ডে রওনা হলেন। এরা জানতেন না যে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত স্যার রিচার্ড গ্রেনভিল চৌদ্দ দিন পর এখানে ফিরে আসবেন। সঙ্গে আনবেন প্রচুর রসদ ও কলোনীতে বসবাস-কারী লোকজন। এই লোক জনের অল্প কিছু সংখ্যক লোক দখল বজায় রাখতে রয়ে গেল এই রোয়ানোক দ্বীপে। এদের যে শেষ পর্যন্ত কি গতি হল, সে কথা কেউ আর জানতে পারেনি। এই হারানো উপনিবেশের রহস্য আজও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। এখন শুধু এই টুকু জানা যায় যে এই দলে ছিলেন ভার্জিনিয়া ডেয়ায়ের মা ও বাপ। এই নারীই আমেরিকায় ইংরাজ দম্পতির প্রথম সন্তান। তার মা ছিলেন ভার্জিনিয়ার গভর্ণর জন হোয়াইটের মেয়ে।

ইংলণ্ডে ফিরে এসে নতুন দেশ সম্বন্ধে হ্যারিয়ট র‍্যালের কাছে এক চমক-প্রদ বিবরণী দাখিল করলেন। পরের বছর চিজাপেক উপসাগরের আশেপাশে উপনিবেশ স্থাপনের আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন র‍্যালে। তারপর ১৫৮৮ সালের ২০শে জুলাই স্পেনের দুর্ভেদ্য নৌবহর ইংলণ্ড আক্রমণ করল। ইংলণ্ড এই আক্রমণ প্রতিহত করল। তিপ্পান্নখান বাদে স্পেনীয় নৌবহরের সব জাহাজই ধ্বংস হল। এর অল্প কিছুকাল পরই, সামান্য কিছু খাজনা আর আমেরিকার খনি থেকে আহরিত সোনার এক পঞ্চমাংশের বিনিময়ে র‍্যালে তাঁর আমেরিকার জমিদারীর ভূমি স্বত্ব একটা ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দিলেন। হ্যারিয়ট আর আমেরিকায় ফিরে যাননি।

ইতি মধ্যে ইউরোপে নতুন নতুন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে চলেছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিভিন্ন অনাবিষ্কৃত অজানা রাজ্য উন্মুক্ত করছে।

হ্যারিয়টও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ডুবে গেলেন। ১৬০৭ সালে তিনি একটি ধূমকেতু সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ চালাতে লাগলেন, এবং তাঁর পর্যবেক্ষণ ফলাফল

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলারের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। পরে এই ধূমকেতুটি হ্যালির ধূমকেতু নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপরিচিত হয়। দু বছর পর তিনি একটা দূরবীন বা দূরদর্শন নালিকা ব্যবহার করছিলেন। এই যন্ত্রটি তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কারের আগের বছরই যে তিনজন ওলন্দাজ জাকারিয়াস জানসেন, জেমস্ মেটিয়াস এবং হানস লিপারসে নিজেরা আলাদা আলাদা ভাবে এই দূরবীন আবিষ্কার করে বসেছিলেন, তা তিনি তখন জানতেন না। বন্ধু বান্ধবদের জন্য এমনি আরও কতকগুলি দূরদর্শন নল তিনি তৈরী করিয়েছিলেন এবং এর সাহায্যে সৌর কলঙ্কও পরীক্ষা করেছিলেন। এই সৌর কলঙ্কগুলি গ্যালিলিওর কৌতূহল উদ্রেক করেছিল। হ্যারিয়ট ছিলেন তাঁর সমসাময়িক ইংরাজ জ্যোতির্বিদদের মধ্যে প্রধান। গ্রীষ্ম মণ্ডলে পৃথিবী প্রখর সূর্যতেজে সম্পূর্ণ দগ্ধ এবং মানুষের বাসের অযোগ্য, অ্যারিসটটলের এই ভ্রান্ত ধারণার তিনি বিরোধিতা করেন। কেপলার ও গ্যালিলিও উভয়ের সঙ্গেই হ্যারিয়ট নিয়মিত পত্রালাপ চালাতেন।

আলোক, বর্ণ, তেলের দ্বারা আলোকের প্রতিসরণ, বস্তুর ভার কেন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণা ছাড়াও হ্যারিয়ট বীজগণিত নিয়েও গবেষণা চালিয়েছিলেন। এই গবেষণা পর্যালোচনা করে গণিত শাস্ত্রের বহু ঐতিহাসিক তাঁকে উৎপাদকের দ্বারা দ্বিঘাত সমীকরণ কষার পদ্ধতি উদ্ভাবক বলে স্বীকার করে থাকেন। Artis Analyticae Praxis গ্রন্থে তিনি গণিতের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে আধুনিক রীতির প্রবর্তন করেন, তাই পরবর্তীকালে গণিতের পাঠ্যপুস্তক রচনার আদর্শরূপে গৃহীত হয়। আধুনিক গণিতে ব্যবহৃত কতকগুলি প্রতীকের প্রবর্তনও করেন হ্যারিয়ট। গুণনের চিহ্নরূপে বিন্দু এবং অসমতা জ্ঞাপক "$>$" অপেক্ষা বড় এবং "$<$" অপেক্ষা ছোট" এই চিহ্নগুলি প্রথম ব্যবহার করেন তিনি। দু'শ বছর পরে এমনি আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্নগুলির উদ্ভাবন করেছিলেন সুইডেনের বার্জেলিয়াস।

হ্যারিয়ট ছিলেন চিরকুমার। গণিত ও বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি তারই মাঝে সময় করে কারাগারে র‍্যালে ও হেনরি পার্শির (আর্ল অব নর্দামবার্ল্যাণ্ডের) সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর এই ভূতপূর্ব পৃষ্ঠপোষকদ্বয়, তখন রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ে হৃতগৌরব হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। ফাঁসীর আগের রাতে র‍্যালে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা "অন দি স্ক্যাফোল্ড-এর' (On the Scaffold—ফাঁসীর মঞ্চে) "স্মরণিকা"

অংশটুকু মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, হ্যারিয়ট তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন।

র‍্যালের শোচনীয় মৃত্যু হ্যারিয়টকে চরম অভিভূত করেছিল। তিনি তখন পীড়িত, রুগ্ন। বন্ধু বিয়োগের শোক ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত সাধনার মাঝে ডুবে গিয়ে। র‍্যালের ফাঁসির এক মাস পরই দেখা গেল হ্যারিয়ট মান মন্দিরে ১৬১৮ সালের বিখ্যাত ধূমকেতুটি পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত। লণ্ডনের নিকটবর্তী নিয়নে আর্ল অব নরদামবারল্যাণ্ড তাঁর (হ্যারিয়টের) জন্য এই মান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এর তিন বছর পর হ্যারিয়টের মৃত্যু হয়। ১৬২১ সালের ২রা জুলাই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই বাবদ খরচ হয়েছিল মাত্র ছয় শিলিং আট পেন্স। হ্যারিয়টের সামান্য যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তা তিনি গ্রামের গরীব দুঃখীদের দান করে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা এ থেকে পেয়েছিল চার পাউণ্ড অর্থ। হ্যারিয়ট ঠোঁটের ক্যানসারে মারা যান। শোনা যায়, পিতল নির্মিত গণিতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার কালে নিরন্তর দাঁত দিয়ে সেগুলি কামড়ে ধরে রাখার জন্যই তাঁর এই রোগ দেখা দিয়েছিল।

আমেরিকায় ইংরাজদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলার নানাবিধ চেষ্টায় র‍্যালে প্রায় ৪০০০০ ডলারেরও বেশী খরচ করে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে একাজে সফল হতে হলে একাধিক ব্যক্তিকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমেরিকার বিপুল ধন সম্পদ আহরণের জন্য অনতিবিলম্বে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠতে লাগল। ১৬০৬ সালে এমনি দুটি কোম্পানি সংগঠিত হয়েছিল। জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে এদের মূলধন সংগৃহীত হয়। আমেরিকায় খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করে এই কোম্পানিগুলি প্রচুর লাভ করে মোটা লভ্যাংশ প্রদান করতে সক্ষম হবে, এই আশায় ইংল্যাণ্ডের বণিকশ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় ও গির্জার যাজকবর্গ যেমন এগুলির শেয়ার ক্রয় করেছিলেন তেমনি কিনে ছিলেন কসাই, রুটিওয়ালা ও দর্জি শ্রেণীর গরীব লোকেরাও। শেয়ার বিক্রয়ে ঝানু দালালগণ সর্ববিধ উপায়ে লণ্ডন কোম্পানির জন্য মূলধন ও ঔপনিবেশিক সংগ্রহ করেছিল। দরকার হলে তারা এর জন্য গির্জার মঞ্চ থেকে প্রচার কার্য চালাতেও কসুর করেনি। এই লণ্ডন কোম্পানিই ১৬০৭ সালের ১৩ই মে উত্তর আমেরিকার জেমস টাউনে (ভার্জিনিয়া), ইংরাজদের প্রথম স্থায়ী

উপনিবেশ স্থাপন করে। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারী কোম্পানিগুলির ব্যবসা প্রসার কল্পে যারা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ১৬০৮ সালে জেমস টাউন উপনিবেশের সর্বাধ্যক্ষ জন স্মিথ। ভার্জিনিয়ার গাছপালাও জীবজন্তুর বিবরণী লিপিবদ্ধ করে ইনি একখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নে লণ্ডন কোম্পানি একাই ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছিল। কিন্তু জমি ও ব্যবসায়ে যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা সফল হল না। ১৬২৯ সালে লণ্ডন কোম্পানি পরিচালিত উপনিবেশে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যমে পরিচালিত স্বাধীন ব্যবসা চালু হল।

ধন সম্পদ লাভের আশা ছাড়াও ক্রমে ইংল্যাণ্ডের মানুষ অন্য কারণেও আমেরিকায় আসতে লাগল। প্লীমাথ, মাসাচুসেট্‌স-এ মে ফ্লাওয়ার জাহাজ থেকে নাবল পিলগ্রীমস্ ফাদারদের একটি দল। পিউরিট্যান সম্প্রদায়ভুক্ত এই যাজকবৃন্দ নিজেদের স্বতন্ত্র মতানুযায়ী ধর্মচর্চার স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথমে গিয়েছিল হল্যাণ্ডে। সেখানেও সে ধর্মীয় স্বাধীনতা না মেলায় তাঁরা এসেছিলেন আমেরিকায়। ১৬২৮ সালে মাসাচুসেট্‌স বে কোম্পানি আমেরিকায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পিউরিট্যান সম্প্রদায়ভুক্ত ও নিজেদের আথিক অবস্থার উন্নতিকামী একদল লোক নিয়ে এই উপনিবেশটি গঠিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকবিরোধী আইন-কানুনের দ্বারা যে সব ক্যাথলিক নিগৃহীত হচ্ছিল, তাঁরা লর্ড বাল্টিমোরের নেতৃত্বে গঠিত মেরীল্যাণ্ড উপনিবেশে আশ্রয় পেল। মাসাচুসেটস্-এর ধর্মশাসিত গণরাজ্য হতে বিখ্যাত উদারপন্থী ধর্ম প্রচারক রজার উইলিয়ামস্ নির্বাসিত হবার পর গড়ে উঠল রোড আইল্যাণ্ডের উপনিবেশ। এই ধর্ম শাসিত রাজ্যের নিষ্ঠুর বিধি নিষেধের হাত এড়াতেই আবার কনেকটিকাটের অরণ্য ভূমিতে টমাস হুকারের নেতৃত্বে একদল লোক নিঃশব্দে স্থাপন করল একটি স্বায়ত্ত শাসনশীল উপনিবেশ। এরা এখানে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিল। এইটিই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম লিখিত সংবিধান।

এদেশে উপনিবেশ স্থাপনকারী এই সব আগন্তুক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শরণার্থী, নতুন দেশে ভৃত্যরূপে কাজ করবার চুক্তিতে আবদ্ধ ইংল্যাণ্ডের বেকার—এদের অনেকে সাত বছর পর্যন্ত ভৃত্যরূপে কাজ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে এ দেশে আসত—ইউরোপের নিঃস্ব, রিক্ত, অসন্তুষ্ট মানুষ, দুঃসাহসী

অ্যাডভেঞ্চার পিয়াসী তরুণ, দেনাদার, এমন কি ফৌজদারী মামলার আসামী—এমনি সব দুর্ধর্ষ, দুর্মদ নরনারীর মাঝ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানসেবীরা। আমেরিকার বিখ্যাত অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি নির্মাতা আলভান ক্লার্কের পূর্বপুরুষ পিলগ্রিম ফাদারদের অন্যতম টমাস ক্লার্ক ছিলেন মে ফ্লাওয়ার জাহাজের একজন মেট। প্রচলিত ধর্ম মতে অবিশ্বাসী জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন নর্দাম্পটন শায়ার পরিত্যাগ করে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে চলে আসেন বস্টনে। ইনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা। টমাস হ্যালি নামে একজন ইংরাজ কৃষক শেষ সম্বল বিক্রি করে ১৬৪০ সালে এসেছিলেন মাসাচুসেট্সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সৌর বিশেষজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দূরবীণ নির্মাতা জর্জ এলিরী হ্যালি এই দরিদ্র ইংরাজ কৃষকের উত্তর পুরুষ।

প্রথমাগত বসবাসকারী ও তাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্য থেকে দেখা দিয়েছিল আমেরিকার আদি প্রকৃতি বিজ্ঞানীর দলও। এরা এই নতুন মহাদেশের বিভিন্ন গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ার আবিষ্কার ও তাদের বিবরণী লিপিবদ্ধ করার ও শ্রেণী বিভাগের কাজ করে গেছেন। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন অতি সরল অশিক্ষিত মানুষ, প্রকৃতিকে তাঁরা গভীর ভালবাসতেন। কেউ কেউ বিরাট চাষ আবাদের মালিক, অবসর সময়ে বৃক্ষলতা পশু প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতেন। এছাড়া কেউ কেউ আবার ছিলেন, চিকিৎসক, যাজক, আইনজীবি ও কলেজে পড়া মানুষ, ইউরোপের সংস্কৃতির ধারকরূপে এরা বিজ্ঞানে ইউরোপ ও আমেরিকার যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আদি বৃক্ষলতা সংগ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুপরিচিত হলেন কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত জন বার্ট্রাম। ইনি বাল্যকালে ছিলেন ক্ষেত মজুর। গাছপালা চিনবার সহজাত দক্ষতা ছিল এর। পিটার কলিনসন নামে লণ্ডনের (ইংল্যাণ্ড) কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ীর সুনজরে পড়ে যান বার্ট্রাম। এই ব্যবসায়ীটি তাঁর একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ান। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এই ইংরাজ ব্যবসায়ীকে অবাধে সর্বপ্রকার গাছগাছালির নমুনা সরবরাহ করেছেন। তার বদলে তিনি কলিনসনের কাছ থেকে শুধু অর্থ সাহায্যই পাননি, পেয়েছিলেন, নিজের বাগিচায় পরীক্ষা কার্য চালাতে বীজ, মূল, চারাগাছ, গাছের কলম। নতুন নতুন গাছগাছালি সংগ্রহের অভিযানে সাহায্য করতে লর্ড পেট্রিও তাকে একটা ভাতা দিয়েছিলেন। লর্ড পেট্রির গর্ব ছিল ইংল্যাণ্ডের সেরা সংগ্রহশালা ও হট

হাউসগুলির (উষ্ণীকৃত উদ্যান) মালিক তিনি। বার্ট্রাম তাঁর ইংরাজ পৃষ্ঠপোষকদের যত বিভিন্ন বৃক্ষলতা পশুপ্রাণী ইত্যাদির নমুনা পাঠান, তারা ততই আরও চাইতে থাকেন। এদের চাই বিভিন্ন ধরনের পাখি, ও তাদের ডিম, কচ্ছপ, পোকামাকড়, সাপ, ঝিনুক, কন্দ, এমন কি জীবাশ্ম (ফসিল)। বার্ট্রামের মনে ছিল প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য আরও ভাল ভাবে জানবার জ্বলন্ত বাসনা। এই উদ্দেশ্য এবং উদ্ভিদতথ্য সম্বন্ধে নতুন গ্রন্থ রচনার কাজে তাঁর বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাবার জন্য তিনি শুধু নিজের দেশ পেনসিলভ্যানিয়ার সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে ঘুরে বেড়াননি, ঘুরেছিলেন মেরিল্যাণ্ড ও ব্লু রীজ পর্বত অঞ্চলেও।

স্কুইল্‌কিল নদীর পশ্চিম পাড়ে কিংসএসিং নামক স্থানে (জায়গাটা এখন ফিলাডেলফিয়া শহরের অন্তর্গত) পাঁচ একর ভূমিতে বার্ট্রাম বটানিকাল গার্ডেন স্থাপন করলেন। আমেরিকায় এইটিই প্রথম বটানিকাল গার্ডেন। এখানে তিনি বহু বৃক্ষলতা রোপণ করেছিলেন। এখান থেকে বহু গাছগাছালির নমুনা পাঠাতেন ইউরোপের সেরা উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের কাছে। এই বাগানে আসতেন জর্জ ওয়াশিংটন ও আমেরিকার অন্যান্য শৌখিন উদ্যানপালকগণ। তারা এখান থেকে শুধু বীজ আর কলমই সংগ্রহ করতেন না, নিয়ে যেতেন উদ্ভিদ বিদ্যায় আটলান্টিকের এপারের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তির পরামর্শ। কারণ লিনেয়াসই বার্ট্রামকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বলে আখ্যাত করেছিলেন।

বার্ট্রামের পুত্র উইলিয়াম তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে সে পিতার সঙ্গে ক্যাটস্‌স্কিলস্‌ পর্যটন করে। বাপের মত সেও বন জঙ্গলের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েছিল। তখনকার দিনে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধিকাংশ বই ছিল লাতিন ভাষায় লেখা লক্ষ্য করে খুব বেশী বয়সে লাতিন ভাষা শিখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়েছিল জন বার্ট্রামকে। উদ্ভিদ-তত্ত্বের লাতিন ভাষায় লিখিত এই ইউরোপীয় গ্রন্থগুলি যাতে উইলিয়ামস পড়তে পারে তারজন্য অল্প বয়সেই তাকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন জন বার্ট্রাম, যাতে সে শিশুকাল থেকেই লাতিন ও গ্রীক ভাষা শিখবার সুযোগ পায়। বাপের চেয়েও ঢের বেশী বনে জঙ্গলে ঘুরেছিলেন উইলিয়ামস। 'ট্রাভেলস' নামক তাঁর রচিত গ্রন্থখানি শুধু আমেরিকায় প্রচণ্ড সাড়া জাগায়নি, তার চেয়েও বেশী আলোড়ন তুলেছিল ইউরোপে। সেখানে ফরাসী ও জার্মান ভাষায় বইখানির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারী উদ্ভিদ ও জীব বিজ্ঞানী এবং সংগ্রাহকদের কার্যকলাপের মাঝেই আদি ঔপনিবেশিক নরনারীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জ্যোতিষ্কলোকের রহস্যও এদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। মাসাচুসেটস্ বে অঞ্চলের স্বৈরাচারী প্রথম গভর্নরের জেষ্ঠ্যপুত্র জন উইনথ্রোপ (জুনিয়ার) তিন ফুট দীর্ঘ রিফ্রাক্টর দূরবীনের সাহায্যে আকাশের গ্রহনক্ষত্র পরীক্ষা করেন এবং লণ্ডনের রয়ল সোসায়িটীর নিকট লিখিত একটি পত্রে বৃহস্পতির যে পঞ্চম একটি উপগ্রহ আছে একথা জানান। আড়াই শো বছর পর আরও উন্নততর দূরবীন নির্মাণ সম্ভব হলে শেষে ১৯১৬ সালে এই উপগ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন এডওয়ার্ড ডি বার্নার্ড নামে আর একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

পৃথিবী নয়, সূর্যই গ্রহজগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করছে, মহান জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের আবিষ্কৃত এই তত্ত্ব ইউরোপের অনেক দেশেই তখনও স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু এই নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য আমেরিকায় সহজেই গৃহীত হয়েছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কোপারনিকাসের এই নতুন তত্ত্ব শেখান হত। এমন কি পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মপ্রবক্তা কটন মাথেরও বস্টনে তাঁর গির্জার মঞ্চ থেকে উপাসকমণ্ডলীর নিকট এই মতবাদ প্রচার করতেন। ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এই কটন মাথের ছিলেন অতিশয় গোঁড়া এবং এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি ডাইনী বলে বহু নিরপরাধ স্ত্রীলোককেও পুড়িয়ে মেরেছিলেন। সমকালীন বহু ধর্মযাজকের মত কটন মাথেরও নবাবিষ্কৃত অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁর অপার সৃষ্টি রহস্য প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করতেন। গির্জার বক্তৃতা মঞ্চ থেকে মাথের এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্বন্ধেও একটি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। মাথের সে যুগের বিজ্ঞান-উৎসাহী মানুষের একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এরা যেমন ভূয়ো বিজ্ঞান আর কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন, তেমনি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল বশতঃ শিশুর মত সরল বিশ্বাসে অবাধে বিচিত্রতম 'প্রাকৃতিক সত্য'ও মেনে নিতেন। কটন মাথের অতি উৎসাহের সঙ্গে বসন্তের প্রতিষেধক টিকাদানের প্রস্তাব সমর্থন করতেন। রয়েল সোসায়িটীর কার্যবিবরণী পড়ে তিনি এই প্রতিষেধক টিকার কথা জানতে পেরেছিলেন। বস্টনের অনেক চিকিৎসক এই টিকাদানের বিরোধিতা করেন। টিকার সমর্থক মাথেরের পাঠাগারে জলন্ত বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু

মাথের তাঁর বিশ্বাসে অটুট রইলেন। ১৭২১ সালে বসন্তরোগ ঘোর মহামারীরূপে দেখা দিলে জাবডিয়েল বয়েলস্টোন নামে স্ব-শিক্ষিত জনৈক চিকিৎসক আপনপুত্র, একটি বালক ও দুজন নিগ্রো ভৃত্যকে বসন্তের টিকা দিয়েছিলেন। টিকা বিরোধীদের রোষবহ্নি থেকে এই চিকিৎসকটিকে রক্ষা করবার জন্য কটন মাথের তখন তাঁর বাড়ীর চারদিকে পাহারা বসানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রথমদিকে সাধারণভাবে আমেরিকান বিজ্ঞান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ ভাবে ছিল সত্য। আমেরিকায় তখন ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষার কোনও স্কুল কলেজ ছিল না। অধিকাংশ চিকিৎসককেই প্রধান চিকিৎসকের অধীনে শিক্ষানবিসী করে ডাক্তারী বিদ্যা আরম্ভ করতে হত। চিকিৎসা বিদ্যার উপাধি গ্রহণের জন্য খুব কম লোকই যেত ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যালয়-গুলিতে। ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষার অঙ্গরূপে কদাচিৎ শবব্যবচ্ছেদ করা হত। অণুপ্রাণিত কলেজ শিক্ষকের দল অ্যারিস্টটলের অবৈজ্ঞানিক শারীরস্থানিক তত্ত্ব অনুযায়ী ছাত্রদের শারীরস্থান বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

আমেরিকার প্রথম পেটেন্ট ওষুধ 'টাসকারোরা রাইস' ১৭১১ সালে প্রস্তুত হয়। যক্ষা রোগের দাওয়াই হিসাবে এই পেটেন্ট ওষুধটি বিক্রি করা হত। এর পর থেকে এমনি ধরনের পেটেন্ট ওষুধে দেশ ছেয়ে যেতে থাকে। এখনও এদেশে তার জের মেটেনি। চিকিৎসক ও তাদের শিক্ষানবিসবর্গ নিজেদের 'আবিষ্কৃত' নানা বিচিত্র ভেষজ ও মৃতসঞ্জীবনী বিক্রয় করতেন। সাদৃশ্যমূলক ভেষজের দ্বারা রোগ চিকিৎসায় মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনুযায়ী দেহের রোগগ্রস্থ বা যন্ত্রণাপীড়িত অংশের অনুরূপ উপাদানে তৈরি অর্থহীন, অকেজো ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হত। এমনি ব্যবস্থাপত্রগুলি একটির বিধান ছিল এই ধরনের: সর্ব প্রকার পালা জ্বরে, জ্বর আসবার আগে রোগীর নখ কেটে, কাটা নখের টুকরোগুলি একটি ন্যাকড়ার পুটুলিতে বেঁধে, পুটুলিটা জলের টবে রাখা একটি পাঁকাল মাছের গলায় বেঁধে দাও। পাঁকাল মাছটা মরে গেলে রোগী সেরে উঠবে।

জীবাণু দ্বারা যে রোগ সংক্রামিত হতে পারে একথা তখন কেউ ভাবতে পারত না। শরীরের পুষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান তখনও

মানুষের অজ্ঞাত। শরীর ও তার কার্যপ্রণালী মানুষের কাছে সম্পূর্ণ রহস্যজনক। এ অবস্থায় দেশের মৃত্যুহার যে ভয়াবহ হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্যের বিষয় হল চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এমনি বিপুল অজ্ঞতা সত্বেও বহুলোক বেঁচে থাকত। ১৬২৪ সালের আগে লণ্ডন কোম্পানি আমেরিকায় বসবাসের জন্য ১৪০০০ লোক পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে ১৩০০০ লোকই পথে ও সমুদ্রবক্ষে রোগ পীড়িত হয়ে বা বিরূপ আবহাওয়ার দৌরাত্ম্যে মারা যায়। ১৭১১ সালে একবার যখন ৩০৮৬ জন যাত্রীকে আমেরিকায় পাঠান হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে ৮৫৯ জন পথে মারা যায়। পাল তোলা জাহাজে বিশাল আটলান্টিক সমুদ্র পার হওয়া ছিল অতিশয় মারাত্মক ব্যাপার। খুব কম লোকই এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রযাত্রার ধকল সামলাতে পারত। এসময় জাহাজে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পাগল হয়ে তখন যাত্রীদলকে ইঁদুর মেরে খেতেও দেখা গেছে। কোন কোনও ক্ষেত্রে ক্ষুধিত যাত্রীর দল নরমাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। আবার নতুন দেশে পৌঁছেও স্বস্তি নেই। সেইখানেও বেঁচে থাকার ভরসা খুবই কম। কটন মাথেরের ষোলটি সন্তানের মধ্যে ন'টিই শৈশবে মারা যায়।

পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা ও পঠনপাঠনের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল এ সময়ও। কনেটিকাটের গভর্নর জন উইনথ্রোপ (জুনিয়ার) পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা কার্য চালানোর যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন এবং রসায়ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। এই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে এলেন চার্লস্ মর্টন। আমেরিকার নবাগত বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি প্রচার করলেন, রবার্ট রয়েল, আইজ্যাক নিউটন, উইলিয়াম হার্ভে ও গ্যালিলিও প্রবর্তিত নতুন বিজ্ঞান। মর্টন কমপেনডিয়াম ফিজিকা (Compendium Physicac) নামে একখানি বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে গ্রন্থখানি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হত। এর স্থানে স্থানে ভুল তথ্যে পূর্ণ, তার উপর পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগে এতে নিষ্ঠার সঙ্গে অ্যারিসটটলের রীতি অনুসৃত হয়েছিল। তবু এই বইটি বিজ্ঞানজগতের যে সব বিস্ময়কর আবিষ্কার ইউরোপকে আলোড়িত করে তুলেছিল, তার প্রতি আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমেরিকাবাসীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনের সুবিধার জন্য, কটন মাথের ১৭২১ সালে সমকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার, 'দি ক্রিশ্চিয়ান ফিলজফার, এ কনেকসন অব দি বেস্ট ডিস্‌কভারিজ ইন নেচার উইথ রিলিজিয়াস ইমপ্রুভমেন্টস্' (The Christian Philosopher a collection of the best discoveries in Nature with religious improvements) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম যে জাঁকালো তাতে সন্দেহ নেই। তা হলেও এই গ্রন্থেই আমেরিকায় প্রথম নিউটনের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মাথেরের নিজস্ব কতকগুলি পর্যবেক্ষণের বিষয়ও এতে আলোচিত হয়েছিল। এই সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী অনেক ক্ষেত্রেই মাথেরের নররূপী ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বিকৃত করা হয়েছিল। কারণ মাথের বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর মানুষেরই মত গুণাগুণ ও আকৃতি বিশিষ্ট।

আমেরিকার বিজ্ঞানের এই আদিপর্বেই লণ্ডনের রয়েল সোসায়িটী স্থাপিত হয়। এই সময় ইংল্যাণ্ডে দ্রুত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার লাভ ঘটছিল। নব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভাটির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল কতকগুলি বাস্তব সমস্যার সমাধান করা। শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের ফলে ইংল্যাণ্ডে এক নূতন অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বোক্ত সমস্যাগুলি উদ্ভব হয়েছিল এই নতুন অর্থনীতি থেকে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তখন এই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বার করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যন্ত্রপাতি ও কামান নির্মাণের জন্য তখন তার চাই আরও আরও অধিক পরিমাণে ধাতুর যোগান। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল খনি থেকে ধাতুপিণ্ড উত্তোলনের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবনের। নতুন তৈরি কারখানাগুলির জন্য চাই নতুন শক্তির উৎস। রয়েল সোসায়িটির সভ্যগণ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় বড় যে সব আবিষ্কার করেছিলেন, তার অনেকগুলির মূলেই ছিল এই বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ। বয়েল, হুক, হাইজেনস্, ও ফ্রামস্টীডের অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাই বাস্তব সমস্যার আশু সমাধান প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত।

নিউটনের আবিষ্কারগুলি বিশ্বের চিত্তলোকে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বিখ্যাত সূত্রগুলি সম্বন্ধে একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে এগুলি সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যোগসূত্রহীন প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর কীর্তি। কিন্তু নিউটনের এই যুগান্তরকারী আবিষ্কারগুলির পিছনেও

যে বাস্তব সামাজিক সমস্যা সমাধানের তাগিদ ছিল তা লক্ষ্য করা যায়। তিনি সমকালীন সামাজিক পটভূমির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন দুর্জ্ঞেয় প্রতিভাবান এক নিঃসঙ্গ বিজ্ঞান সাধকমাত্র ছিলেন না। বরং একথা বলা চলে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের ফলেই নিউটন ও তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের গ্রহ নক্ষত্রের গতি প্রকৃতির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল। নিউটনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মহাকর্ষ সূত্র তখনকার দ্রুত পরিবর্তনশীল কালের প্রয়োজন মিটিয়েছিল।

'নতুন আবিষ্কৃত দেশ ভার্জিনিয়া' নামে যে দেশের কথা হ্যারিয়ট তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণ অনাবাদী জমি। এখানে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দানের প্রয়োজন ছিল। ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোস্যায়িটির উদ্যোগে তখন এই উৎসাহ দানের কাজ চলেছিল। এদেশের আদি ঔপনিবেশিকদের মধ্যে রয়েল সোসাইটির কয়েকজন সভ্য ছিলেন। তার মধ্যে নয়জন ছিলেন মাসাচুসেটস্ বে কলোনীর, তিনজন পেনসিলভানিয়ার, তিনজন ভার্জিনিয়ার, অধিবাসী। কানেটিকাট, রোড আইল্যাণ্ড ও ক্যারোলিনার থেকে এক একজন করে সভ্য ছিলেন। এই সভ্যদের সাহায্যে রয়েল সোসায়িটি এদেশে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান করতেন, সমিতির মুখপত্র ট্রানজাকসানস্এ (Transactions) এদেশের বসতিস্থাপনকারী ঔপনিবেশিকদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাদি ছাপতেন, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট এবং বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সরকারকে এদেশে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিতে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করতে প্রভাবিত করতেন। আদিপর্বে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয় মূলতঃ ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞানের অংশরূপে।

ভূট্টা থেকে বীয়ার তৈয়ারী করা চলে কিনা সে বিষয় পরীক্ষাকার্য চালাতে জন উইনথ্রোপ (জুনিয়ার) কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসায়িটি। বিজ্ঞানী উইনথ্রোপ তাঁর পরীক্ষা কার্যের ফলাফল জানিয়েছিলেন সমিতিকে। দশ বছর পর এই রয়াল সোসায়িটিতেই জন ক্লেটন তাঁর পরীক্ষা কার্যের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। কোন ধরনের জমি তামাক চাষের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী তা নির্ধারণ করতেই তিনি এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কার্য চালিয়েছিলেন। ১৭৩৩ সালে সাভানায় জেমস ওগলিথ্রোপ যখন প্রথম জনপদ স্থাপন করেন (জর্জিয়া প্রদেশে ইউরোপাগত অধিবাসীদের এটি প্রথম উপনিবেশ) তখন সেখানে যাতে "উদ্ভিদ ও কৃষি বিজ্ঞানের

উন্নতিকল্পে" দশ একর জমিতে একটি পরীক্ষামূলক বাগিচা প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন।

রোয়ানোক দ্বীপে হ্যারিয়টের আগমনের পর থেকে দেড়শ বছর পর্যন্ত আমেরিকার বিজ্ঞান সাধনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নতুন নতুন বৃক্ষলতা ও পশুপ্রাণী সম্পর্কে ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে এরা সাহায্য করেন। ১৭৩৭ সালে লিনেয়াসের 'জেনারা প্লানটারাম' (Genera Plantarum) প্রকাশিত হবার পর আধুনিককালের সুসম্বদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জন্ম হয়। উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানে লিনেয়াসের প্রবর্তিত দ্বিপদ শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ পদ্ধতি ইংলণ্ডের চেয়েও এদেশে ঢের বেশী আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। হ্যারিয়ট আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন পশুপাখীর বিবরণী ও নমুনা, জন হোয়াইটের আঁকা আটাশটি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর চিত্র ছিয়াশি জাতের পাখী, এবং বহু সংখ্যক নতুন গাছগাছালি। এরপর প্রায় দু'শ বছর পর, ১৭৬৬ সালেও বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ লিনেয়াস সারা পৃথিবীর দু'শ দশটির বেশী স্তন্যপায়ী প্রাণীর বর্ণনা দিতে পারেননি। এর মধ্যে আটাত্তরটি প্রাণীর বর্ণনা আবার তিনি সংগ্রহ করেছিলেন আমেরিকার প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের লেখা থেকে। যে সাতশ' নব্বইটি বিভিন্ন ধরনের পাখী তিনি পঞ্জীভুক্ত করে গেছেন তার অন্তত একটির বর্ণনা আমাদের দেশের আদি প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের লেখা থেকে নেওয়া।

আমেরিকান বিজ্ঞানের প্রথম দেড়শ বছর বহুলাংশে এদেশের আদি প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাহিনী। এই নতুন দেশের বিপুল উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ প্রবলভাবে তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তুলেছিল।

তবু ব্যাপারটা ছিল এর চেয়েও বেশী কিছু। সত্য বটে এ সময় আমেরিকায় কোনও বিখ্যাত তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেননি, পদার্থ বিজ্ঞানের বিখ্যাত কোনও পরীক্ষা কার্য সংঘটিত হয়নি। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সে সময় এই নতুন মহাদেশের প্রত্যন্ত ভাগে সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষ শুধু বসতি স্থাপন করেছিল। নতুন দেশে আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর সংগ্রামে তারা তখন সদা বিব্রত। এ কাজেও আবার পুরানো পৃথিবীর কুসংস্কার ও ভুয়ো বিজ্ঞান এসে বাধা সৃষ্টি করছিল।

এর মাঝেই বিজ্ঞান আমেরিকায় ধীরে ধীরে শিকড় গাড়ছিল। ১৫৮৫ সালে হ্যারিয়ট যে অঞ্চল জরীপ করে এসেছিলেন, তা, যেখানে একদা বিরাট শিল্পবাণিজ্যের পত্তন হবে এমন কয়েক একর অনাবাদী জমিই শুধু ছিল না। এ অঞ্চল একদা এক সমৃদ্ধিশালী দেশের অঙ্গরূপে পরিগণিত হবে, এখানে বিজ্ঞান সাধনা যথাকালে প্রসার লাভ করবে, এবং এখানকার উর্বর মৃত্তিকায় বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সতেজে বর্ধিত ও ক্রমান্বয়ে ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকবে—এমনি এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিল এই ভূখণ্ডের জন্য।

॥২॥

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

(১৭০৬-১৭৯০)

আমেরিকার বিজ্ঞানের প্রথম ফল

হ্যারিয়ট আমেরিকার জীবতত্ত্বের চর্চা শুরু করবার পর থেকে দেড়শ বছর পর্যন্ত তাঁর অনুগামী প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর দল একান্ত নিঃসঙ্গ ভাবে জীবতত্ত্বের চর্চা করে যান। আমেরিকার বাইরে বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে ছিল লণ্ডনের রয়েল সোসায়িটি ও ইউরোপের কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ। আমাদের দেশের আদি প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের অনেকে প্রথম প্রথম একত্র মিলিত হয়ে পরস্পরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতেন। তাতে তাঁদের গবেষণাকার্য ও সেই সম্পর্কিত নবাবিষ্কৃত তথ্যের আদানপ্রদান ঘটত। অনেক সময় তাঁরা কয়েকজনে মিলে একত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চালাতেন। ১৬৩৬ সালে হার্ভার্ড কলেজ, ১৬৯৩ সালে উইলিয়াম ও মেরি কলেজ এবং তার কয়েক বছর পর ইয়েল কলেজ স্থাপিত হবার পর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারের আরও সুসংহত প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ততর হল। তবুও আমাদের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের আরও ঘন ঘন একত্র মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও তত্ত্বের আদান-প্রদান করবার আরও ভাল ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

শীঘ্রই এই প্রয়োজন মেটাবার পথ হল। উনিশ মাস ইংলণ্ডে কাটিয়ে তখন সদ্য দেশে ফিরে এসেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। সেই বয়সেই দেখা করেছেন রয়েল সোসায়িটির কয়েক-জন সভ্যের সঙ্গে। ১৭২৭ সালে (এই বছরই নিউটন মারা যান) ফ্রাঙ্কলিন তাঁর পরিচিত অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের একত্রিত করে জাণ্টো নামে একটি ক্লাব গড়লেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা

ও ভাবের আদানপ্রদানের দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ক্লাবের সভ্যগণ সরাইখানা, নিজেদের বাড়ী বা মাঠে-ময়দানে মিলিত হতেন। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে সভ্যগণ এক এক জন এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। সকলে তা নিয়ে আলোচনা করতেন, চিন্তা করতেন।

শুরুতে ক্লাবে ছিল মাত্র এগারো জন সভ্য। ছোট্ট এই ক্লাব হতে কালক্রমে এক মহতী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সভ্যদের জাতি ও ধর্ম-বিদ্বেষ যাতে ক্লাবের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য ভাবী সভ্যদের এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হত যে ধর্ম বা পেশা নির্বিশেষে তাঁরা সব মানুষকেই সমান ভালবেসে থাকেন, বিতর্কমূলক কোনও মতবাদ পোষণের জন্য কারো যাতে কোন ক্ষতি না হয় বা সুনাম বা সম্পত্তি নাশ না ঘটে সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন। সর্বশেষে তাঁদের ঘোষণা করতে হত যে তাঁরা সত্যের খাতিরেই সত্যকে ভালবাসেন, নিরপেক্ষ ভাবে তাঁরা সত্যানুসন্ধান, সত্যগ্রহণ, ও সত্য প্রচারের চেষ্টা করবেন। ক্লাবের সভ্য হবার এই চারটি যোগ্যতা অতি সুসভ্য নীতিসম্মত, বিচক্ষণ ও আধুনিক মনোভাবপূর্ণ। এগুলি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে।

জাণ্টোর সভ্যগণ ক্লাবঘরে নিজের নিজের বইপত্র এনে রাখতেন। অন্য সভ্যগণও এই সব বইপত্র ব্যবহার করতে পারতেন। ক্লাবঘরের জন্য আরও নানান ধরনের বই কেনার জন্য ফ্রাঙ্কলিন চাঁদা তুলতেন। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে লণ্ডন থেকে বই আনাতেন। এই ভাবে ক্লাবে স্থায়ী একটি পাঠাগার স্থাপিত হল। এখান থেকে সভ্যগণ প্রয়োজন মত বইপত্র ধার নিয়ে পড়তে পারতেন। এইটিই 'উত্তর আমেরিকার প্রথম সাধারণ পাঠাগারের জনক'।

জাণ্টো প্রতিষ্ঠার চার বছর আগে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বস্টন হতে পালিয়ে আসেন অপেক্ষাকৃত উদার ও সংস্কারমুক্ত ফিলাডেলফিয়া শহরে। বস্টন শহরের অধিবাসীদের গোঁড়ামির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তাঁকে শহর ছাড়তে হয়েছিল। বস্টনে তাঁর সৎভাই জেমস্, 'নিউ ইংল্যাণ্ড কুরাণ্ট' (New England Courant) নামে একখানা সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন। এইটি আমেরিকার প্রথম উগ্র বিরুদ্ধবাদী সংবাদপত্র। জেমস তাঁর এই পত্রিকায় প্রবল-প্রতাপ কটন মাথের ও কেলভিন-পন্থীদের বিরুদ্ধে জেহাদ

ঘোষণা করেছিলেন। তখন কেলভিন-পন্থীদের সংখ্যা কমে এলেও তখনকার দিনে এ ছিল খুবই দুঃসাহসের কাজ। এই জেহাদ থেকে কাগজে মাথের ও জেমসের হেল ফায়ার ক্লাবের তরুণ সভ্যদের মধ্যে প্রচণ্ড মসীযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তার শেষ পরিণতি দাঁড়িয়েছিল জেমসের কারাদণ্ড। জেমসের বদলে তখন ফ্রাঙ্কলিন কাগজে সম্পাদনার ভার নিলেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর।

জাণ্টো প্রতিষ্ঠার পরের বছর ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়াতে ছাপাখানার ব্যবসা খোলেন। শীঘ্রই 'ইউনিভারসলি ইনস্ট্রাকটর ইন অল আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস্ : অ্যাণ্ড পেনসিলভানিয়া গেজেট' নামে কাগজখানা তিনি কিনে নেন। এটির নতুন নাম রাখলেন 'দি পেনসিলভানিয়া গেজেট'। এটি 'দি সাটারডে ইভিনিং পোস্ট' নামে এখনও চলছে।

মুদ্রণ ব্যবসায়ের সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিন একটা দোকান চালাতেন। এখানে দেবোরা রিড কড মাছ থেকে লটারী টিকিট সব কিছুই বিক্রি করতেন; দেবোরা রিডকে ১৭৩০ সালে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ছাপাখানা ও দোকান চালান ছাড়াও আরও অনেক রকমের ব্যবসা চালাতেন ফ্রাঙ্কলিন। 'পুওর রিচার্ডস অ্যালম্যানাক' নামে একখানা পঞ্জিকা সংকলন করে তিনি প্রকাশ করতেন। বইখানার হাজার হাজার কপি বিক্রি হত। কয়েকটি কাগজকলের জন্য টন টন ছেঁড়া ন্যাকড়াও কিনতেন তিনি। উপনিবেশের সর্বত্র এমনি কয়েকটি কাগজকল স্থাপনে সাহায্য করছিলেন তিনি। পেনসিলভানিয়ার গভর্নর কীথের কাছ থেকে নোট ছাপবার একটি সরকারী কণ্ট্রাক্টও পেয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। নিউ ইয়র্ক সিটি, চার্লসটন এবং কিংসটনে (জ্যামাইকা) নিজের ছাপাখানার শাখা খুলেছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকা উপনিবেশের ফ্রীম্যাসনদের গ্রাণ্ড মাস্টার নির্বাচিত হন। চার বছর পর তিনি পেনসিলভানিয়া অ্যাসেম্বলীর (বিধান সভা) ক্লার্ক নির্বাচিত হন। এর কিছুকাল পর ফিলাডেলফিয়ার পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত হন। এই পদ লাভ করায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালানোয় তাঁর অনেকখানি সুবিধা হয়েছিল।

সর্ববিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা, চমৎকার সাধারণ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং লোকের কাছ থেকে কাজ গোছানোর অসাধারণ ক্ষমতার বলে ফ্রাঙ্কলিন উপনিবেশের সর্বত্র মূল্যবান ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এমনি অতিশয় সক্রিয়ভাবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালানোর সময় পেতেন তিনি খুবই কম। তবু এই সব কাজকারবারে জড়িয়ে থেকেও এসময় তিনি জাণ্টোর সভায় আগুন সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, এবং একটি স্টোভ আবিষ্কার করেছিলেন। এই স্টোভটি ফ্রাঙ্কলিনের প্রথম আবিষ্কার। মিতব্যয়িতার প্রতি ফ্রাঙ্কলিনের ছিল প্রখর দৃষ্টি। অপচয় তিনি ঘৃণা করতেন। এই স্টোভটি আবিষ্কারের পিছনে প্রেরণা ছিল যেমন উপনিবেশবাসীদের প্রয়োজন, তেমনি তাঁর এই মিতব্যয়িতা প্রীতি ও অপচয় রোধের বাসনা। সে সময় ঘর গরম রাখার জন্য ঘরের অগ্নিকুণ্ডে (ফায়ার প্লেসে) কাঠ পুড়িয়ে যে আগুন জ্বালান হত, তাতে বেশীর ভাগ তাপই ঘরের মধ্যে আসতে পারত না, চিমনি দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ত। জার্মানী ও হল্যাণ্ড থেকে আগত কিছু সংখ্যক অধিবাসী সেখান থেকে নতুন এক ধরনের স্টোভ (উনান) সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এতে তাপ চিমনির বাইরে ছড়িয়ে পড়ত না বটে, কিন্তু ঘরের বদ্ধ বাতাস ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকত। ফ্রাঙ্কলিনের স্টোভটি ছিল ঢালাই লোহার তৈরি ; এটি অগ্নিকুণ্ডের (ফায়ার প্লেসের) মাঝে বসানো হত। অবাধ বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল।

এই স্টোভ আবিষ্কারের একবছর পর, ১৭৪৩ সালে ফ্রাঙ্কলিন নানা ধরনের কাজের মাঝেও সময় করে তাঁর পুরানো ক্লাব জাণ্টোকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলার ভার নেন। ক্লাবটা ইতিমধ্যে বেশ খানিকট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে চলেছিল। পুনর্গঠিত হবার পর ক্লাবটির নাম হল দি আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটি। টমাস হপকিন্‌স হলেন এর প্রেসিডেণ্ট, ফ্রাঙ্কলিন সম্পাদক। সমিতিতে আদি সদস্যদের কয়েকজনও ছিলেন : পেনসিলভানিয়া সুপ্রীম কোর্টের সহযোগী বিচারপতি কোলম্যান ; রৌপ্যকার ফিলিপ সিঙ্গ, ভূগোলবিদ উইলিয়াম পারসনস্, এবং কাচের মিস্ত্রি এবং স্বয়ংশিক্ষিত গণিতবিদ্ টমাস গডফ্রে।

সোসায়িটির ছয়জন নতুন সদস্যদের একজন ছিলেন ডাঃ টমাস্ বণ্ড। এই চিকিৎসকপ্রবর ও ফ্রাঙ্কলিন—এরা দুজনে একত্রে মিলে ১৭৫১ সালে পেনসিলভানিয়া হাসপাতাল স্থাপন করেন। এটি উন্মাদদের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত আমেরিকার প্রথম হাসপাতাল। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে

ছিলেন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ জন বার্ট্রাম, বিজ্ঞানী পিনিয়াস বণ্ড; মেকানিক (যন্ত্রী) সামুয়েল রোড্স; নিউ জার্সির প্রধান বিচারপতি রবার্ট মরিস; পিটার জেঙ্গারের বিখ্যাত বিচারে তার পক্ষাবলম্বনকারী জেমস আলেক-জাণ্ডার এবং পরবর্তী কালে আরও অনেকে সদস্যরূপে সমিতিতে যোগদান করেন।

বিজ্ঞানের একটা অতি কঠিন ও মৌলিক প্রশ্নের উত্তর তখন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না বিজ্ঞানীরা। তড়িৎ জিনিসটা ঠিক কি বস্তু? প্রশ্নটা বহু পুরাতন। যেদিন মিলটাসের থালেস লক্ষ্য করেছিলেন যে একখণ্ড অ্যাম্বার ঘসলে তা শুকনো পাতা বা খড়ের টুকরোর মত হালকা জিনিস আকর্ষণ করতে পারে সেই দিন থেকেই বহু জিজ্ঞাসু মন এই প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। অন্যান্য অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন ঘর্ষণের সাহায্যে অন্যভাবেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলে। পশুলোমের সাহায্যে গালা ঘষলে, রেশমবস্ত্র দিয়ে কাচ ঘষলে ঐ জিনিসগুলিও হালকা বস্তু আকর্ষণ করে। তা দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, কাচের সঙ্গে যুক্ত তড়িতের এবং গালার সঙ্গে যুক্ত তড়িতের কোনও সম্পর্ক আছে কি না?

এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে গিয়ে কতকগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পশুলোম ঘষা একটি গালার দণ্ড রেশমের সুতোয় ঝুলানো ছোট সোলার বলের নিকট আনা হল। আশ্চর্য! ঠেলা খেয়ে বলটি অমনি দূরে সরে গেল, অর্থাৎ সেটি বিকর্ষিত হল। তারপর সিল্কে ঘষা একটা কাচদণ্ড বলটির কাছে আনা হল। বলটি কাচ দণ্ডটির দিকে আকর্ষিত হল। এই ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করে পরীক্ষাকারীদের মনে হল তড়িৎ সম্ভবতঃ দুই ধরনের। প্যারিসের ত্যু ফে এদের নাম দিলেন যথাক্রমে কাচিক (vitreous) ও লাক্ষিক (resinous) তড়িৎ। একে বলা হত বিদ্যুতের দুই-তরল তত্ত্ব।

ইতিমধ্যে কাচের বড় ঘর্ষণযন্ত্র নির্মিত হল। এগুলির সাহায্যে মোটা মোটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা যেত, এবং বিভিন্ন বস্তুতে তড়িৎ সঞ্চারিত করা যেত। বন্ধুবান্ধবদের প্রমোদদানের চমৎকার খেলনা হিসাবে অনেকে এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ভ্রাম্যমাণ সখের বিজ্ঞানীরা স্থির-বিদ্যুতের এই তাজ্জব কাণ্ডকারখানা দেখাতে নানা ধরনের আজব কল বানিয়ে সারা ইউরোপে ফেরি করে বেচতে লাগলেন। এই আজব কলের ভেল্কিবাজি দেখে ইউরোপের লোকে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেত! একটা নতুন যন্ত্র এই সময়

এই সব ভেল্কিওয়ালাদের খুব কাজে লেগেছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনেও এটি সাহায্য করেছিল আরও বেশী। যন্ত্রটা প্রায় একই সঙ্গে ১৭৪৫ সালে আবিষ্কার করেছিলেন ই. ফন ক্লীস্ট নামে পমেরানিয়ার একজন পাদ্রী সাহেব এবং লীডেনের পিটার ভ্যান মুস্‌চেনব্রুক। এই নতুন যন্ত্রটি এখন লীডেন জার নামে খ্যাত। ১৭৪৬ সালের প্রথম দিকে নবাবিষ্কৃত এই যন্ত্রটি স্থির-বিদ্যুৎ সম্পর্কিত পরীক্ষা কার্যে ব্যবহৃত হতে থাকে।

কাচের নল সিল্কের দ্বারা ঘষলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সেই বিদ্যুৎ লীডেন জারে জমা করে রাখা হত। জারে জমানো এই ভূরি পরিমাণ বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসবার সময় বড় বড় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করত। মানুষের সংস্পর্শে এলে মানুষ প্রচণ্ড শক খেয়ে লাফিয়ে উঠত। এই জমানো বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে ছোট মুরগী পুড়িয়ে মারা হত, মাংসের ফালি ঝলসানো হত, কোহলে আগুন ধরানো হত, আগুনের শিখা নিভিয়ে দেওয়া হত, ছোট নদীর অপর তীরে বিদ্যুতের শক সঞ্চারিত করা হত, এবং অন্ধকারে অপার্থিব আলোক সৃষ্টি করা হত। এই সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। তখন পর্যন্ত আমেরিকার অধিবাসীদের আমোদপ্রমোদের একমাত্র উৎস ছিল মেলা, চায়ের আসর, ঘোড়দৌড় ও মাঝে মাঝে এক-আধটি পীপ শো। বিদ্যুতের ভেল্‌কি দেখানো বাজিকরেরা এখানেও ঐ সব ভেল্কিবাজি দেখাতে লাগল এবং তাদের ঐসব মজাদার কল এখানে অসংখ্য আমদানী হতে লাগল।

ব্যবসা উপলক্ষে ফ্রাঙ্কলিনের প্রায়ই বস্টনে যেতে হত। একবার এমনি বস্টনে চলেছেন ফ্রাঙ্কলিন। পথে দেখতে পেলেন এক জায়গায় ডাঃ এ. স্পেনসার নামে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎযন্ত্রের ভেল্কি দেখাচ্ছেন। লোকটি সত্ত স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। ফ্রাঙ্কলিন থামলেন। দেখতে লাগলেন লোকটির কাণ্ডকারখানা। তাঁর কৌতূহল শুধু লোকটির বিদ্যুৎকলের আজব ফিকির নিয়ে নয়। তার চেয়েও বেশী কিছু। কারণ লোকটির ঐ মজাদার বিদ্যুৎ ভেল্কিকলে ছিল এমন কতকগুলি ব্যাপার, ফ্রাঙ্কলিনের মনে হল, যেগুলির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। তিনি শুনেছিলেন শহরের গরীবদের বিনামূল্যে দেখিয়ে আনন্দ দেবার জন্য রোড আইল্যাণ্ডস্থিত এক ঘড়ির নির্মাতা একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র বস্টনে এনেছেন। লোকটির নাম উইলিয়ম ক্লাগেট। বস্টন থেকে বাড়ী ফেরবার পথে ফ্রাঙ্কলিন নিউপোর্টে নেমে ক্লাগেটের সঙ্গে দেখা করে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

ফ্রাঙ্কলিনের বয়স তখন চল্লিশ। এখন তিনি যথেষ্ট ধনী। কিছু কিছু ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এখন আত্মনিয়োগ করতে পারেন। পিটার কলিন্‌সনকে লিখলেন তাঁকে এমনি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পাঠাতে। এই পিটার কলিন্‌সন ছিলেন লণ্ডনের একজন মিল মালিক। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী জন বার্ট্রামের বিজ্ঞান চর্চায় ইনিই সহায়তা করতেন। ফ্রাঙ্কলিনের সাধারণ পাঠাগারের জন্য লণ্ডন থেকে বইপত্র কিনে পাঠাতেনও ইনিই। পরবর্তী বই-এর চালানের সঙ্গে কলিন্‌সন পাঠালেন একটি তড়িৎ নল। রেশম খণ্ডের সাহায্যে ঘষে এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হত। নলটি পাঠিয়ে কলিন্‌সন লিখেছিলেন, "আপনার হাতের সমান মোটা তিনফুট লম্বা একটা নল।"

নিছক একজন সখের বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন। তিনিই এখন কতকগুলি রোমাঞ্চকর আবিষ্কার করতে লাগলেন। সেই বছরই ১১ই জুলাই তারিখে তিনি কলিন্‌সনকে লিখেছিলেন যে বিদ্যুতের ব্যাপারে তিনি কতকগুলি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, "যেগুলি আমার কাছে নতুন মনে হয়। প্রথম হল ছুঁচালো বস্তুর বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ টেনে নেওয়া ও উদ্গার করার ক্ষমতা।" তিনি ও টমাস হপকিনস্ দুজনে মিলে সুকৌশলে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করায় তড়িৎ সম্পর্কিত এই তথ্যটি ধরা পড়েছিল। একখণ্ড কর্ক লম্বা একটা রেশমী সুতোয় বেঁধে ফ্রাঙ্কলিন তাঁর ঘরের ছাদ থেকে সেটি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর কর্কটিকে তিন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি ধাতুগোলকের কাছে এনেছিলেন। ধাতুগোলকটি ছিল ঘর্ষ-তড়িৎ সঞ্চারিত। একটি অপরিবাহী বস্তুর উপর এটি রাখা ছিল। বিদ্যুতায়িত ধাতু গোলকের কাছাকাছি আসতেই কর্কটি ছিটকে দূরে সরে গেল। এমনটিই আশা করেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। এরপর তিনি একটি ধাতব ছুঁচ ধাতুগোলকটির খুব কাছাকাছি আনলেন, কিন্তু ছুঁচটিকে ধাতুগোলকটিকে স্পর্শ করতে দিলেন না। এবার দেখা গেল কর্কটি ধাতুগোলকটির দিকে এগিয়ে আসছে। এবার একটা ভোঁতামুখ ছুঁচ দিয়ে এই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখা গেল, ধাতুগোলক থেকে বিদ্যুৎ টেনে আনবার জন্য ছুঁচটিকে ধাতুগোলকের আরও কাছে আনতে হয়। না হলে ভোঁতামুখ ছুঁচটি ধাতুগোলক থেকে বিদ্যুৎ আহরণ করতে পারে না, কর্কটিও ধাতুগোলকের দিকে আসতে পারে না। ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষার ফলাফল লিখলেন, 'চুঁচের মুখ যত কম ছুঁচালো হবে

তার বিদ্যুৎ আহরণ ও বিচ্ছুরণ ক্ষমতা লক্ষ্য করতে সেটিকে গোলকের তত বেশী কাছে আনতে হবে।'

ফ্রাঙ্কলিনের পরবর্তী পরীক্ষা ও তার ব্যাখ্যা রবার্ট এ. মিলিকানের মতে "তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব মৌলিক গবেষণা।" রেশমী কাপড়ের টুকরো দিয়ে কাঁচ ঘষলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ কি ঘর্ষণ কালে তখনই সৃষ্টি হয়, না রেশমী বস্ত্রের বিদ্যুৎ কাচে সঞ্চারিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। তিনি জানতেন মোম বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না। পুরু একখানি মোমের ফলকের উপর দাঁড়িয়ে খুব জোরে জোরে একটা কাচের নল ঘষলেন। এই ভাবে তাঁর দেহে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল তা তিনি মাটির সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি বস্তু স্পর্শ করে দেহ থেকে বার করে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর দুই বন্ধুকে দুটি মোমের ফলকের উপর দাঁড় করালেন। একজন কাচের নল ঘষে তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেন। অন্য বন্ধুটি সেই নল থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করলেন নিজ দেহে। এই ভাবে দুই বন্ধুই দেহে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করলেন এবং অতি হালকা বস্তু আকর্ষণে সক্ষম হলেন। দেখা গেল, তৃতীয় এক ব্যক্তি মাটিতে দাঁড়িয়ে এদের কাউকে আঙ্গুলের গাঁট দিয়ে ছুঁলেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে শক খান। তার উপর, এই বিদ্যুৎবাহী মানুষ দুটি মোমের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যখন পরস্পরকে স্পর্শ করে, তখনও তারা এক অতি জোরালো শক খায় এবং উভয়ের দেহের সমস্ত সঞ্চিত বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হয়।

ফ্রাঙ্কলিন এবার নিঃসন্দেহ হলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন তিনি। ঘর্ষণ কালে তড়িৎ তখন তখনই উৎপন্ন হয় না। সঞ্চারিত হয় এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে। ফ্রাঙ্কলিনের মতে সব বস্তুতেই তড়িৎ বিদ্যমান। তখন তড়িৎকে বলা হত এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ। সাধারণতঃ সব বস্তুতেই এই পদার্থ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থান করে। তাতে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও নির্দিষ্ট বস্তুতে তড়িতের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। রেশম খণ্ড দিয়ে যখন কাচ ঘষা হয় তখন কাচে এই তরল পদার্থের পরিমাণের হের-ফের ঘটে। কাচ স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই তরল পদার্থ লাভ করে তড়িৎ-ধর্মী হয়ে ওঠে। হাত বা রেশম খণ্ড দিয়ে কাচ ঘষার ফলে সেগুলি এই সূক্ষ্ম তরল পদার্থের খানিকটা হারিয়ে তড়িতান্বিত হয়ে ওঠে। এই তড়িতান্বিত কাচ মাটিতে ছোঁয়ালে

মাটি ঐ বাড়তি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ তৎক্ষণাৎ শুষে নেয়। কাচে তড়িৎ-ধর্ম সঞ্চারকারী সূক্ষ্ম তরল পদার্থের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। ফলে, তাতে আর তখন তড়িতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

যে সব পরীক্ষার কথা বলা হল, সেগুলি হাতে-কলমে করেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। ১৭৪৭ সালের শরৎকালের আগেই পদার্থের তড়িতান্বিত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে এসে পেঁছাতে পেরেছিলেন। পরে এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন (অংশতঃ): তড়িৎ ঘর্ষণের দ্বারা সৃষ্টি হয় না, সংগৃহীত হয় মাত্র। বস্তুতঃ এই তড়িৎ হল এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম কণিকাবৎ মৌলিক পদার্থ। সব বস্তুতেই এই পদার্থ মিশে আছে। কাজেই আমরা কতকগুলি নতুন শব্দ পাচ্ছি। আমাদের বলতে হবে খ ধনাত্মক ভাবে (পজিটিভ) তড়িতায়িত, ক ঋণাত্মক (নেগেটিভ) ভাবে। কিংবা অন্যভাবে বলা চলে, খ তড়িৎ-যুক্ত, ক তড়িৎ-বিযুক্ত। ফ্রাঙ্কলিন তড়িৎ সম্পর্কে এই পজিটিভ (ধনাত্মক) ও নেগেটিভ (ঋণাত্মক) এই আধুনিক শব্দগুলি প্রয়োগ করেন। তড়িৎ যে এক ধরনের তরল পদার্থ, ফ্রাঙ্কলিনের এই মতবাদ নির্ভুল ছিল না। কারণ তাঁর ধারণা ছিল কোনও বস্তুতে তড়িৎরূপী এই তরল পদার্থের মাত্রাধিক্য ঘটলে বস্তুটি ধনাত্মক ভাবে (+) তড়িতাহিত হয়। স্বাভাবিক মাত্রার ঘাটতি হলে হয় ঋণাত্মক ভাবে (−) তড়িতাহিত। আবার এই তড়িতরূপী তরল পদার্থ যখন কোনও বস্তুতে সঠিক মাত্রায় বিরাজ করে তখন বস্তুটি হয় নিস্তড়িৎ।

তড়িতের প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও কিন্তু এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে তিনি যে বৈজ্ঞানিক শব্দমালা সৃষ্টি করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোনও বিজ্ঞানীর চেয়ে তা ঢের বেশী আধুনিক। ফ্রাঙ্কলিনের মৌলিক চিন্তাশক্তি ছিল এত গভীর ও পরিচ্ছন্ন যে তড়িৎ-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি, জড়পদার্থ যে তড়িৎ কণিকার সমন্বয়ে সৃষ্টি, আধুনিক কালের এই বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রায় কাছাকাছি এসে পৌছেছিলেন। তড়িৎ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষার প্রায় দেড় শত বৎসর পর ব্যাপকতর পরীক্ষার ফলে এখন বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়েছে যে জড়পদার্থ ইলেকট্রন (ঋণ তড়িৎ কণিকা) ও প্রোটন (ধন তড়িৎ কণিকা) সমন্বয়ে গঠিত। ফ্রাঙ্কলিন যদি অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা নাও করতেন তা হলে তড়িৎ সম্বন্ধে তাঁর এই একটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের

জন্যই তিনি বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে স্বীকৃতিলাভ করবেন।

ফ্রাঙ্কলিনের নিকট তত্ত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান ছিল সমান অর্থপূর্ণ। কারণ প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণের কাজে উভয়ই মানুষের নিকট সমান অত্যাবশ্যকীয়। ইতিমধ্যে তিনি নিজে ব্যবসা দেখাশোনার কাজ ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান সাধনা ও রাজনীতি চর্চায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। তখন ব্যবসায়ে তাঁর যে আয় হত তা থেকে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যেত। ফ্রাঙ্কলিন নিজেই তাঁর ছাপাখানার ব্যবসাটি দেখাশোনা করতেন। ১৭৪৮ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর, এ কাজের ভার তিনি ডেভিড হল নামে তাঁর একজন অংশীদারের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তড়িৎ সম্বন্ধে আরও গভীরতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। এবার তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হল ঘর্ষণ উৎপন্ন তড়িৎ ও ধনসম্পত্তি এবং প্রাণনাশকারী আকাশের বজ্র-বিদ্যুতের সম্ভাব্য সম্পর্ক।

একাধিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এ দুটি ব্যাপারের মধ্যকার সাদৃশ্য অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। ঘর্ষণযন্ত্রে উৎপন্ন তড়িতের স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে স্যার আইজ্যাক নিউটন আকাশের বিদ্যুৎ ঝিলিকের তুলনা করেছিলেন। ফ্রান্সের রাজ-পরিবারের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক আবে জাঁ নোলেও এই সাদৃশ্যের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জার্মানীর উইঙ্কলার আরও একটু এগিয়ে বলেছিলেন: ঘর্ষণযন্ত্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ এবং আকাশের বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য শুধু তীব্রতায়। কেউ কিন্তু তাঁদের এই সব ধারণার সপক্ষে হাতেকলমে কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি।

১৭৪৯ সালের ৭ই নবেম্বরের একটি চিঠিতে ফ্রাঙ্কলিন ঘর্ষ-তড়িৎ ও বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যকার সাদৃশ্যগুলি লিপিবদ্ধ করলেন। ছুঁচালো মুখ শলাকায় যে ঘর্ষ-তড়িৎ আকর্ষিত হয় তা তিনি পরীক্ষার সাহায্যে প্রদর্শন করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখলেন, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলেও আমরা এখনও সঠিক বলতে পারি না। আকাশের বজ্র-বিদ্যুতেরও এই আকর্ষণী শক্তি আছে কিনা—প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য প্রয়োজন ছিল পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ সংগ্রহের। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কৌশলপূর্ণ পরীক্ষা উদ্ভাবন করলেন এবং তদনুযায়ী পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হলেন। এইটিই তাঁর সর্বাধিক সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।

ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষাটি ছিল এমনি : বর্ষাবাদলের দিনে খুব উঁচুতে একটা ঘুড়ি উড়িয়ে দেবেন তিনি, যাতে ঘুড়িটা গিয়ে মেঘের মাঝে পৌছায়। বিদ্যুৎ-ভরা মেঘের স্পর্শ লেগে ঘুড়ির সুতো বেয়ে বিদ্যুৎ-ধারা নেবে আসবে। তখন তিনি তার গুণাগুণ পরীক্ষা করবেন। আড়াআড়ি ভাবে দুটো কাঠ একত্র বেঁধে তার উপর একখণ্ড সিল্ক টান টান করে সেটে তিনি একখানা ঘুড়ি তৈরি করলেন। ঘুড়ির একটা কাঠির গায়ে ছুঁচালো মুখ একটা ধাতু-তার বেঁধে দিলেন। তারটির আর এক প্রান্ত বাঁধা রইল ঘুড়ি উড়াবার শনের দড়ির সঙ্গে। দড়িটার শেষ প্রান্তে রেশমের সুতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা ধাতু-নির্মিত চাবি।

একুশ বছরের ছেলে উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গিয়ে একটা চালার নিচে অপেক্ষা করতে লাগলেন ফ্রাঙ্কলিন। আকাশ মেঘ-মলিন হয়ে ওঠে, এক সময় জলভরা মেঘ থেকে ধারা বর্ষণের পূর্বলক্ষণ দেখা দেয়। ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়িটা আকাশে উড়িয়ে দেন। ঘুড়িটা মেঘের মাঝে গিয়ে পৌছালে সহসা লক্ষ্য করলেন হাতে-ধরা শনের দড়িটার ঝুল ও শেষ প্রান্তের আঁশগুলি টান টান হয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে। যেন আঁশগুলি পরস্পরকে বিকর্ষিত করছে। তাড়াতাড়ি আঙ্গুলের গিঁটটা ধাতু-নির্মিত চাবিটার কাছে নিয়ে এলেন। জোরালো একটা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে একটা শকও খেলেন ফ্রাঙ্কলিন। ঘর্ষ-তড়িৎ আর আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ যে একই পদার্থ, তার প্রমাণ সত্যই এখন তার হাতে হাতে মিলে গেছে! সন্দেহ নেই যে, মেঘের বিদ্যুৎও ছুঁচালো ধাতু শলাকার দ্বারা আকর্ষিত হয়।

মেঘের বিদ্যুতের এই প্রকৃতি আরও ভালভাবে জানবার জন্য তিনি একটি কৌশল উদ্ভাবন করলেন। দণ্ডটির পাদদেশে একটা তার বাঁধা হল। আমার ঘরের দরজার বিপরীত দিকের সিঁড়িতে তারটি দুভাগে ভাগ করা হল। তাদের দু প্রান্তে বাধা হল দুটি ঘণ্টা। ঘণ্টা দুটির মাঝে রেশমের সুতো দিয়ে ঝোলান হল ছোট্ট একটি পিতলের গোলক। বিদ্যুৎ-বাহী মেঘের বিদ্যুৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রবেশ করে সেগুলি বিদ্যুতাহিত করে তুললে ঘণ্টাদুটি পিতলের গোলকটিকে আকর্ষণ করবে। তাতে ঘণ্টা বেজে উঠবে। ঘণ্টার শব্দ হলেই ফ্রাঙ্কলিন বুঝতে পারবেন যে পরীক্ষার ফলাফল দেখবার সময় হয়েছে। এমনি বিদ্যুতের ঘণ্টার সাহায্যে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রাঙ্কলিন দেখতে-

পেলেন যে অধিকাংশ মেঘই ঋণাত্মক ভাবে বিদ্যুতাহিত। তবে মাঝে মাঝে ধনাত্মক বিদ্যুতাহিত মেঘও দেখা যায়।

মেঘমালার বিদ্যুৎ ও ঘর্ষ-তড়িতের ঝিলিকের অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও মিল আছে কি না তা নির্ধারণ করবার সময় এল এবার। এই পরীক্ষায় ফ্রাঙ্কলিন লীডেন জার ব্যবহার করেছিলেন। এই যন্ত্রটি তিনি খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলেন যে কাচের বোতলের ভিতরের ও বাহিরের পাতে থাকে দুই বিভিন্ন ধরনের তড়িৎ আধান। তারই ফলে যন্ত্রটি কাজ করে। কোনও তড়িৎ পরিবাহকের সাহায্যে ভিতরের ও বাহিরের পাত যুক্ত হলে, তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। তার ফলে জারটি থেকে সমস্ত তড়িৎ অন্তর্হিত হয়। মেঘবাহী বিদ্যুতের সাহায্যে লীডেন জার বিদ্যুতাহিত করার চেষ্টা করে তিনি সফল হলেন। দেখতে পেলেন যে কাচের নল ঘষে পাওয়া তড়িতের সাহায্যে এই জারে যে সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার সবই উৎপন্ন করা চলে মেঘ থেকে আহরিত বিদ্যুতের সাহায্যেও। অতএব, তিনি লিখলেন, "মেঘের বিদ্যুৎ আর ঘর্ষণ-সৃষ্ট তড়িৎ যে একই তা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হল।"

মেঘের বিদ্যুতের প্রকৃতি নির্ণয়ের এই সব পরীক্ষা যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক ছিল ফ্রাঙ্কলিন তখন তা বুঝতে পারেননি। তিনি জানতেন যে শুকনা জিনিসের চেয়ে ভিজা জিনিসের বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ষমতা বেশী। কিন্তু একথা তখন বুঝতে পারেননি যে ঘুড়ির শণের দড়ি যদি খুব বেশী ভিজে যেত তা হলে সেই দড়ি বেয়ে নাবা মেঘের বিদ্যুতের স্পর্শে তাঁর বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে মারা যাবার সম্ভাবনা ছিল।

বৈদ্যুতিক তত্ত্ব ও সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগে ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন সদাই তৎপর। নিজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি অবিলম্বে বাস্তব জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানোর পথ দেখতে পেলেন তিনি। গৃহস্থের বাড়িঘর, শস্যগোলা, সরকারী বাড়ি, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ—এসব কেন বজ্রপাতে দগ্ধ ও ধ্বংস হবার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না তার আবিষ্কৃত এই বিদ্যুৎ-ধর্মের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ?

ছুঁচালো মুখ ধাতুশলাকার বিদ্যুৎ আকর্ষণ ও নিঃসরণ ক্ষমতা আবিষ্কার করতে যখন ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তখনই মানুষের ধনসম্পত্তি ও প্রাণ রক্ষা করতে বজ্রবারক দণ্ডের পরিকল্পনা তার মাথায় আসে। নিজের

বাড়িতেই এমনি একটা বজ্রবারক দণ্ড তৈরী করতে লেগে গেলেন। ছুঁচের মত সরু মুখ খাড়া একটা ধাতুদণ্ড নিজের বাড়ীর ছাদে বসালেন। দণ্ডটিতে যাতে মরচে না ধরে তার জন্য গিল্টি করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে সেটিকে বাড়ী থেকে বিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। খাড়া ধাতুদণ্ডের সঙ্গে একটি তার বেঁধে সেটির শেষ প্রান্ত ভিজে মাটিতে পুতে দিলেন। বজ্র ভূপাতিত হবার সময় খোঁজে সবচেয়ে সেরা পরিবাহক মাধ্যম। কাজেই তার বিদ্যুৎ-ধারা ধাতুদণ্ড ও তার বেয়ে মাটিতে নেবে আসবে। বাড়ীখানা তাতে বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার হাত থেকে রেহাই পাবে।

তারপর এই বজ্রবারক দণ্ডের আরও উন্নতি সাধনের কথা তাঁর মনে এল। ধাতুদণ্ডটির গায়ে কিছুদূর অন্তর অন্তর ছুঁচালো মুখ ছোট ছোট ধাতুশলাকা এঁটে দিলেন। এই বজ্রবারক দণ্ড শুধু মারাত্মক ধ্বংসলীলা সৃষ্টিকারী বজ্রাগ্নি-বিদ্যুৎই মাটিতে টেনে নাবাবে না, ছোট ছোট ছুঁচালো মুখ ধাতুশলাকাগুলি বায়ুমণ্ডলের বা মেঘের স্থির-বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে শুষে নিতে থাকবে। এতে বায়ুমণ্ডলে বা মেঘে স্থির-বিদ্যুতের পরিমাণ বেড়ে তা ধ্বংসাত্মক বজ্ররূপে দেখা দেবার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে না।

অনেক দিন থেকেই ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন আধুনিক মানুষ। বিদ্যুতের প্রকৃতি ও বজ্রবারক দণ্ড—এ দুটি আবিষ্কার তিনি ঝানু প্রকাশকের মত তাঁর বর্ষপঞ্জীর কাটতি বাড়ানোর কাজে লাগান। কারণ তাঁর এই বর্ষপঞ্জীতেই তিনি এ দুটি বিষয়ের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বাহ্যত এই কারণেই তিনি তাঁর বর্ষপঞ্জী প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ চার মাস অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর এই আবিষ্কারগুলির ফলাফল প্রকাশ করতে। না হলে ১৭৫২ সালের জুন মাসে বজ্রবিদ্যুতের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যেদিন তিনি আকাশে তার সেই বিশ্ববিখ্যাত ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন, তার পর থেকে সেই বছরেরই ১৯শে অক্টোবর, যেদিন পেনসিলভানিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞাপনের দ্বারা তিনি তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন—এই দীর্ঘ সময় তাঁর এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকার কারণ ব্যাখ্যা করা মুস্কিল। পেনসিলভানিয়া গেজেটের এই বিজ্ঞাপনে তাঁর পুয়োর রিচার্ড ইমপ্রুভড্-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বর্ষপঞ্জীতেই (পুয়োর রিচার্ড ইমপ্রুভড্, ১৭৫৩) সর্বপ্রথম তাঁর বজ্রবারক দণ্ড সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিবরণী প্রকাশিত হয়। ছত্রিশ পৃষ্ঠার এই

বর্ষপঞ্জীর শেষের দিকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল "বাসগৃহাদি বজ্রপাতের হাত হতে কি ভাবে রক্ষা করা যায়" নামে ১৮ লাইনের নিবন্ধটি।

এই পরীক্ষা ফলাফল গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই ফ্রাঙ্কলিন তাঁর এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে দেরী করেননি। তিনি কি নিয়ে পরীক্ষা করছেন তা তাঁর বন্ধু ও পরিচিত মহল সব সময়ই জানতেন। নিজের মতবাদ যে নির্ভুল ও কার্যকরী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হতে পারার আগে তাঁর গবেষণার ফলাফল ও আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ততার জন্য তিনি এসব তথ্য গোপন করে যাননি। ছুঁচালো মুখ ধাতুশলাকার উপর বিদ্যুতের প্রভাব সম্পর্কিত তার পরীক্ষার বিষয়ে পরে তিনি লিখেছিলেন। এগুলি সম্বন্ধে তার কিছুটা সন্দেহ থাকলেও তিনি এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন এইজন্য যে, "একটি খারাপ সমাধান পড়েও তার ত্রুটি ধরা পড়ে অনেক সময়। প্রতিভাবান পাঠকের মনে একটি ভাল সমাধানের উদয় হতে পারে।"

উপনিবেশবাসীরা বিপুল সংখ্যায় ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত এই বজ্রবারক দণ্ড নিজেদের গৃহশীর্ষে স্থাপন করতে লাগলেন। এর জন্য কোনও পেটেন্ট খরচ দেবার প্রয়োজন হত না। যে কোন গৃহস্থই কোন বিশেষজ্ঞ না ডেকে বা মূল্যবান যন্ত্রপাতির খরচ বহন না করে নিজের বাড়ীতে এই বজ্রবারক দণ্ড স্থাপন করে ফেলতে পারতেন।

এই বজ্রবারক দণ্ডের খবর ইংলণ্ডে গিয়েও পৌছাল। ১৭৫২ সালের ১৯শে অক্টোবর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর এই বজ্রবারক দণ্ডের কথা এক চিঠিতে লিখে পাঠালেন কলিন্‌সনকে। তিনি ছিলেন রয়েল সোসায়িটির একজন সভ্য। সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত নন এমন একজন লোকের পক্ষে এই ছিল সমিতিতে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রেরণের একমাত্র পথ।

এই চিঠিখানি ১৭৫২ সালের ২১শে ডিসেম্বর রয়েল সোসায়িটির সভ্যদের সভায় পড়া হল। শেষ পর্যন্ত সভ্যগণ ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত বিদ্যুৎতত্ত্বের যথার্থতায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন। দুবছর আগে ফ্রাঙ্কলিন যখন বজ্রবিদ্যুৎ ও ঘর্ষ-তড়িতের সাদৃশ্য প্রমাণ করতে তাঁর পরীক্ষার কথা প্রবন্ধাকারে লিখে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁরা হেসেছিলেন। প্রবন্ধটি সমিতির মুখপাত্র 'ট্রানজাকসনস' ছাপতে অস্বীকার করেছিলেন। এবার তাঁরা অতিদ্রুত এই আমেরিকাবাসী বিজ্ঞানীর প্রতি তাদের অতীত প্রায়শ্চিত্ত করলেন

তাঁর এই নতুন গবেষণামূলক প্রবন্ধটি তাঁরা অবিলম্বে সমিতির মুখপত্রে ছাপলেন। তাঁকে রয়েল সোসায়িটির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হল। তাঁর জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর অনুমতি চাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হল না।

অনতিবিলম্বে উপনিবেশবাসীদের দেখাদেখি ইংলণ্ডবাসীরাও গৃহশীর্ষে বজ্রবারক দণ্ড স্থাপন করতে লাগলেন। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ টেনে নেবার পক্ষে গোলমুখ শলাকার চেয়ে ছুঁচালো মুখ শলাকার উপযোগিতা যে অধিকতর, এবিষয়ে ইংলণ্ডের অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। রয়েল সোসায়িটির হলঘরে, রাজসভায় এবং সরাইখানায় এ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। শেষে ১৭৭২ সালে ইংরাজ সরকার প্রশ্নটির মীমাংসার অনুরোধ জানান। পারফ্লিটে একটি নতুন সরকারী বারুদ ঘর তৈরি হচ্ছিল। বাস্তু-বিদগণ জানতে চাইলেন, বজ্রপাতের হাত থেকে বারুদ-ভাণ্ডার রক্ষা করতে সবচেয়ে উপযোগী হবে কোন ধরনের বজ্রবারক দণ্ড। এবিষয় অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হল। ফ্রাঙ্কলিনসহ কমিটির চারজন সদস্য ছুঁচালো মুখ দণ্ডের সপক্ষে অতি জোরালো ভাবে মত প্রকাশ করলেন। সমিতির পঞ্চম সদস্য বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পী বেঞ্জামিন উইলসন গরিষ্ঠ মতের বিরোধিতা করে গোল মুখ বা থোবড়া মুখ শলাকার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। ব্যাপারটিকে জে. জে. টমসন বলেছিলেন ছুঁচালো, ও চ্যাপ্টার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ এবার রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রসারিত হল।

বেঞ্জামিন উইলসন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তার উপর তিনি ফরাসী এবং নিজের আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের উগ্র স্বভাবের জন্য বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর চোখে ফ্রাঙ্কলিন একজন বিদ্রোহী। ইংলণ্ডেশ্বরও এই "ছুঁচালো-চ্যাপ্টার" বিতর্কে যোগ দিলেন। তিনি রয়েল সোসায়িটির সভাপতি স্যার জন প্রিংগলকে গোপনে বললেন, গোলমাথা বজ্রবারক দণ্ড সমর্থন করতে। প্রিংগল সবিনয়ে জানালেন, সম্রাটকে খুশী করতে পারলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "প্রকৃতির নিয়ম ও কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা তাঁর নেই।" শোনা যায় এই উদ্ধত উত্তর শুনে ইংলণ্ডেশ্বর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি স্যার জনকে বলেন, 'আপনার পদত্যাগ করাই উচিত।' প্রিংগল পদত্যাগ করেছিলেন। সম্রাট তৃতীয় জর্জ দমলেন না। নিজের মত চালু করতে যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

এই অবাধ্য অনিচ্ছুক বিজ্ঞানীদের তা সমঝে দেবার জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ কিউ প্যালেসের উপর থেকে ছুঁচালো মুখ বজ্রবারক দণ্ড অপসারিত করে তার জায়গায় থোবড়া মুখ দণ্ড স্থাপন করলেন। ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডেশ্বরকে চটাতে পারেন না। আবার বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাপারে কোনরূপ আপস করতেও তিনি প্রস্তুত নন। অতএব ইংলণ্ডের রাজনীতিতে এই বিবাদ-বিসম্বাদ চলার সময়ে তিনি নিঃশব্দে নেপথ্যে সরে গেলেন।

ছয় বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণায় কতকগুলি বিখ্যাত অবদান রেখে যান। পরবর্তীকালে অবশ্য এবিষয়ে আর নতুন কোনও কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি, বা এমনি ধরনের কোন বিরাট বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। তবু তাঁর বাস্তবদর্শী ব্যবহারিক ও দার্শনিক মন এবং মৌলিক চিন্তাশক্তি নানান প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর রহস্যোদ্ঘাটন প্রয়াসে সদা ব্যাপৃত থাকত। তড়িৎ বিজ্ঞানে তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলি প্রচারিত হবার এক বছর যেতে না যেতেই তিনি আর একটি নতুন যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এটি হল আমেরিকার ভেষজ বিজ্ঞানে পরিচিত প্রথম সহজ নম্য ক্যাথিটার নল। এই বছরই তিনি কাঠ, রেশম, রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতুদ্রব্য ও চীনামাটির তৈজসপত্রের আপেক্ষিক তাপ পরিবহণ ক্ষমতা নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণার তিনিই পথিকৃৎ। এই গবেষণার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কাঠের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুবই কম, কাজেই রূপার চা পাত্রের (টি পটের) কাঠের হাতল থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এরপর অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে ফ্রাঙ্কলিন সপুত্র যান ইংলণ্ডে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক জন হ্যাডলের সঙ্গে দেখা করতে। এখানে তাঁরা তরল পদার্থের বাষ্পীভবনকালীন তাপক্ষয়ের বিষয়টি নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা চালালেন। পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করতে করতে বাষ্পীভবন ও তাপক্ষয়ের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্কের এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে করতে ফ্রাঙ্কলিন অবাক হয়ে ভেবেছিলেন 'নিগ্রোদের দেহ থেকে শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশী স্বেদ নির্গত হয় বলেই কি তারা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশী রৌদ্রতাপ সহ্য করতে সক্ষম হয়?' তাঁর ধারণা হয়েছিল ঘাম শুকিয়ে যাবার সময় দেহের তাপমাত্রা কমে আসে। এই ধারণা সত্য কিনা নির্ধারণ করতে তিনি নিজের দেহের উপর পর্যন্ত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিনের বয়স যখন তিপ্পান্ন বছর তখন তিনি রিচার্ড পাকারিজের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শুনতে পান। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান রিচার্ড পাকারিজ। এই ইংরাজ ভদ্রলোক বিভিন্ন আকারের জলপূর্ণ কাচপাত্রে গঠিত একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। জলসিক্ত অঙ্গুলি দিয়ে বিভিন্ন পরিমাণ জলপূর্ণ কাচের গ্লাসের প্রান্ত ছুঁয়ে মধুর সুরলহরী সৃষ্টির পদ্ধতি একশ বছর ধরে ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের জানা ছিল। এই পুরাতন পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত রিচার্ড পাকারিজ আবিষ্কৃত নূতন বাদ্যযন্ত্রটির কার্য-কারিতার প্রদর্শনী ফ্রাঙ্কলিন রয়েল সোসায়িটির একটি সভায় দেখতে পেয়েছিলেন। দেখে তিনি ভাবলেন, এর চেয়ে আরও উন্নত, এবং ঘনসন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি বাদ্যযন্ত্র তিনি নির্মাণ করতে পারবেন, তাতে আরও বিভিন্ন ধরনের সুর সৃষ্টি করা চলবে। কতকগুলি কাচের গোলক তৈরি করিয়ে সেগুলির কেন্দ্রস্থলের ফুটোর সাহায্যে একটা লোহার টাকুর গায়ে বসালেন। টাকুটা ঘোরালে তার গায়ে সাঁটা কাচের গোলকগুলিও ঘুরতে থাকে। এ সময় আঙুল দিয়ে এই ঘুরন্ত গোলকগুলি বাজিয়ে পরিপূর্ণ তিন পর্যায়ের সুর অষ্টক রচনা করতে পেয়েছিলেন তিনি। ফ্রাঙ্কলিন এই বাদ্যযন্ত্রটির নাম দিয়েছিলেন "আর্মনিকা", এবং অতি দক্ষতার সঙ্গে এটি তিনি বাজাতে শিখেছিলেন।

জলের উপরিভাগের উপর তেলের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। এজন্য ছড়ির ফাঁপা খোলের মধ্যে তেল পুরে তিনি বেড়াতে বের হতেন। বাষট্টি বছর বয়সে তিনি সীসকের বিষক্রিয়ার মারাত্মক ফল সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। লেড কম্পাউণ্ডের (সীসক যৌগিক) বিষাক্ত প্রকৃতি থেকেই যে এই বিষক্রিয়ার ফল দেখা দেয়, গবেষণার ফলে এই তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। গভীর নদীনালা অপেক্ষা অগভীর নদীনালায় নৌকা কেন অধিকতর শ্লথগতিতে চলে, এ বিষয়ে পরীক্ষাকার্য ও গবেষণার ভার নিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। এই বছরই, তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল স্যার জনপ্রিংগলের কাছে পেশ করেন। জলযান চলাচল সম্পর্কে হাইড্রোডাইনামিকসের (জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ সংক্রান্ত শক্তি বিজ্ঞান) কতকগুলি সূত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এই সূত্রগুলির পরীক্ষা করতে একটি মডেল নৌকা ও মডেল খাল তৈরি করেছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন নিভৃতবাসী পেশাদার বিজ্ঞানী বা গবেষক ছিলেন না।

অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই তিনি করে গেছেন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সময়ই। প্রগাঢ় বুদ্ধিমান, কর্মতৎপর, মার্জিতরুচি, নির্ভীক, মনুষ্যচরিত্রের সুতীক্ষ্ণ বিচারক ফ্রাঙ্কলিন সমকালের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার অর্জনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৪৮ সালে তিনি ফিলাডেলফিয়ার সিটি কাউন্সিলের (পৌর প্রতিষ্ঠানের) সদস্য নির্বাচিত হন। দুবছর পর সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন পেনসিলভানিয়া বিধান সভার সদস্য। এই পদে তিনি পর পর চার বছর পুনর্নির্বাচিত হন। ১৭৫৭ সালে পেনসিলভানিয়া বিধান পরিষদ তাঁকে পেনসিলভানিয়ার স্বত্বাধিকারী পেন পরিবার ও ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে রাজ-কর সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসা প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে পাঠালে শুরু হল তাঁর কূটনৈতিক জীবনের। এই অধ্যায় চলেছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

ফ্রাঙ্কলিনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাই শুধু আমেরিকাকে সমৃদ্ধই করেনি, তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার প্রচণ্ড প্রভাব উপনিবেশবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনাও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। আটলান্টিকের এপারে এই নতুন পৃথিবীতে যে সব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তরঙ্গ উঠত, তার প্রায় সবগুলিরই মধ্যমণি ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধানে তাঁর অদম্য কৌতূহল ও উৎসাহ অন্যকে উদ্বুদ্ধ করত। বহু লোককে তিনি বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির ইতিহাসে দেখা যায়, এই সমিতির কর্ণধাররূপে, প্রকৃতি রাজ্যের সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনাকল্পে তিনি সভাসমিতি, সফর, প্রকল্প, পত্রালাপ এবং আর্থিক সাহায্যের দ্বারা উপনিবেশের বহু প্রতিভাদীপ্ত বিজ্ঞানী মনীষা একত্র করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন চারবার লণ্ডনের রয়েল সোসায়িটির কর্ম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই রয়েল সোসায়িটির সাহায্যে তিনি ইউরোপের বিজ্ঞান সাধনা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বহু আমেরিকান বিজ্ঞানীকে রয়েল সোসায়িটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে নেবার জন্য সুপারিশ করে তিনি তাদের ঐ সমিতির সভ্যপদ সংগ্রহের সুবিধা করে দেন এবং আমেরিকায় ধীরে ধীরে যে বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ঘটছে সে বিষয়ের প্রতি ইউরোপবাসীদের সচেতন করে তোলেন। তারই চেষ্টায়, লিনেয়াস, লাভাসিয়ার, বাফন এবং ব্যাঙ্কস সহ ইউরোপের বিজ্ঞান জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নাম আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির পর্যায় তালিকা-ভুক্ত

হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে জল তোলা চলে কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা চালানোর জন্য তিনি ক্রিস্টোফার কোল্‌সকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। জারেড এলিয়ট কৃষি বিজ্ঞানের পরীক্ষায়, রিটেন-হাউস জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায়, কোলডেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় ফ্রাঙ্কলিনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। জন বার্ট্রামকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায় রোয়া প্রথম চীনদেশীয় রেউচিনি লতা, স্কচ ক্যাবেজ (স্কটল্যাণ্ডের বাঁধাকপি), এবং কোলরাবির (এক ধরনের বাঁধা কপি, শালগমাকৃতি কন্দমূলযুক্ত) বীজ।

তড়িৎ সম্পর্কে ফ্রাঙ্কলিনের গবেষণালব্ধ আবিষ্কারগুলি ব্যতীত ১৭২৭ সালে তাঁর জাণ্টো প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৭৯০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে আমেরিকায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর কোনও মৌলিক আবিষ্কার ঘটে নি। তবু এই সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বেড়ে চলেছিল, বিজ্ঞানীরা আরও দুরূহ জটিল ও বৃহত্তর সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা নিজেদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিলেন।

যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, উইলিয়াম রিটিংগুইসেনের বংশধর জ্যোতির্বিদ ডেভিড রিটেনহাউস পদার্থ বিজ্ঞানেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। এই উইলিয়াম রিটিংগুইসেনই ১৬৯০ সালে উত্তর আমেরিকার প্রথম কাগজকল স্থাপন করেন। ১৭৮১ সালে রিটেনহাউস চুম্বক সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ আধুনিক কালের বিচারেও এখনও সত্য। তিনি একটি ধাতুনির্মিত তাপযন্ত্র ও বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। সৌর জগতের একটি যান্ত্রিক মডেলও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। হাতল ঘোরালে এই যান্ত্রিক মডেলের গ্রহগুলি নির্ভুল বৃত্তপথে সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলত। ১৭৮৬ সালে আলোক রশ্মি অপবর্তনের (diffraction) একটি যন্ত্র (গ্রেটিং) তিনি নির্মাণ করেছিলেন এবং অপবর্তনের ব্যাপারটা নিউটনের আলোক প্রকৃতিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনোফার আলোক রশ্মির অপবর্তন সম্পর্কিত গবেষণার ত্রিশ বছর আগেই রিটেনহাউস এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। সাধারণতঃ ঐ জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রনোফারই আলোক অপবর্তনের এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্যান্য চিন্তাশীল ছাত্রেরা আলোক, তাপের প্রকৃতির মৌলিক সমস্যাবলী এবং নভোচারী গ্রহনক্ষত্রপুঞ্জের গঠন-প্রকৃতি গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বন্ধু, চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ক্যাডওয়াল্লাডার কোলডেন, আলোক ও বর্ণ, এবং বস্তুর গতি ও অভিকর্ষের কারণ সম্বন্ধে দুটি গবেষণামূলক নিবন্ধ লেখেন [(1) Light and colors, an Inquiry into the Principles of Vital Motion, (2) Explication of the first causes of Motion in Matter, and of the cause of Gravitation]। এই শেষোক্ত নিবন্ধে তিনি যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছিলেন, অনুরূপ মতবাদ প্রায় একশ বছর আগে প্রচার করে গিয়েছিলেন জ্যাকব বারনৌলি। ইউরোপে নিউটনের শিষ্যবর্গ কোলডেনের এই নিবন্ধ পরম আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, তারা "আমাদের আমেরিকানদের" কাছ থেকে আরও জানতে চায়।

১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কংগ্রেস ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ফ্রাঙ্কলিনকে ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন। নয় বছর ফ্রান্সে ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি এ দু দেশের মধ্যে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়েও বেশী হৃদ্যতর সম্পর্ক বজায় রাখতে কম সাহায্য করেনি। ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভার আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। এখানে তিনি সুমেরু জ্যোতি সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যটির সঠিক ব্যাখ্যা করেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর মতে আবহমণ্ডলের ঊর্ধ্বলোকে বায়ুর পরিমাণ অতি ক্ষীণ হওয়ায় এখানে আংশিক নির্বাততার অবস্থা দেখা দেয়। এই আংশিক নির্বাত অঞ্চলে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ কণিকা এসে পড়াতেই এমনি বিস্ময়কর জ্যোতিপ্রভা দেখা দেয়।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্টলের কাছে এই বলে অনুযোগ করেছিলেন যে "প্রকৃতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে গবেষণা করবার উপযুক্ত অবসর ও শক্তিসামর্থ্য পাচ্ছেন না।" পরে ১৭৮৫ সালে উন-আশি বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে জন ইনজেনহাউস নামে আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে লেখেন: অবশেষে তিনি এখন "মুক্ত পুরুষ", আবার বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হবার জন্য প্রস্তুত। বিজ্ঞানে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি কখনও দেশসেবা থেকে বিরত হননি। ১৭৮৭ সালে তিনি সংবিধান

পরিষদের (Constitutional Convention) প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই পরিষদের সদস্যরূপেই তিনি দেশসেবার শেষ স্বাক্ষর রেখে যান।

এর তিন বছর পর, চুরাশি বছর বয়সে স্বল্পকালীন রোগভোগের পর ফিলাডেলফিয়াতে মৃত্যু হয় ফ্রাঙ্কলিনের। যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের প্রতিনিধি সভা সরকারী ভাবে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। মৃত্যু সংবাদ ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে পৌছালে শোক প্রকাশ করতে উঠে মিরাবিউ সখেদে বলেন, 'প্রাচীনকাল হলে আকাশের বজ্র ও বিশ্বের উৎপীড়কদের দমনে সক্ষম এই মহান পুরুষের উদ্দেশ্যে পুণ্য যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হত।' উত্তরকাল সত্যই ফ্রাঙ্কলিনের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তা এক ভিন্ন ধরনের যজ্ঞবেদী।

॥ ৩ ॥

টমাস কুপার

(১৭৫৯-১৮৩৯)

নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে বিজ্ঞানের মন্থর গতি

আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করার অল্প কিছুকাল পর দুজন বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক দার্শনিক এদেশে আসেন বসবাস করবার জন্য। তাঁদের একজন হলে অক্সিজেন আবিষ্কারক জোসেফ প্রিস্টলে, আর একজন হলেন টমাস কুপার। আমেরিকার নতুন প্রজাতন্ত্রে তখন যেটুকু বিজ্ঞানচর্চা চলছিল তা এই দুই মনীষীকে কেন্দ্র করে। প্রিস্টলে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। জেফারসনের মতে কুপারকে বিধাতা এমন এক বিরাট পুরুষরূপে সৃষ্টি করা স্থির করেছিলেন 'যাকে পরিচিত বিদগ্ধজন মননশক্তি ও পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় পুরুষ বলে স্বীকার করবেন।'

কুপারের জন্ম হয়েছিল লণ্ডনের বেশ অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্য, আইন, ভেষজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে উনিশ বছর বয়সে তিনি সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত স্বীকৃতি পাঠ করতে অস্বীকার করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। স্নাতকের উপাধি গ্রহণ করা আর তাঁর হয়ে উঠল না। এর কিছুকাল পরই তিনি বিবাহ করলেন। তরুণী স্ত্রী ছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বেশ কিছু ধনসম্পত্তির মালিক। তিন বছর ধরে কুপার ওকালতি করলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁকে দেখা গেল ম্যাঞ্চেস্টারের 'সাহিত্য ও দর্শন সমিতির' সক্রিয় সদস্যরূপে। তিনি এই বৈজ্ঞানিক সংস্থাটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। জন ডালটন এই সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কোয়েকার সম্প্রদায়-ভুক্ত এই স্কুল মাস্টারই পরমাণুবাদ প্রচার করেছিলেন।

অনতিবিলম্বে কুপার রাজনীতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের সাহিত্য ও দর্শন সমিতিতে তিনি বেসরকারী শাসনের ভিত্তি (On Propositions Respecting the Foundation of Civil Government) সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন কুপার, তাই সাধারণ মানুষের বৈষয়িক উন্নতিকল্পে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে গেছেন। তিনি জোরের সঙ্গেই বলতেন, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আসে জনসাধারণের কাছ থেকে।'

ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিকগণ ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। উদারপন্থীদের সঙ্গে মিলে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে কুপার কমন্স সভার প্রভাবশালী সদস্য এডমাণ্ড বার্কের সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়ে বসলেন। বার্ক তাঁর 'ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে চিন্তা' (Reflections on the Revolution in France) নামক গ্রন্থে বিপ্লবের সমর্থনকারীদের তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। কুপারের বয়স তখন মাত্র একত্রিশ বছর। একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করে তিনি বার্কের এই আক্রমণের জবাব দিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে ১৭৮১ সালে রাজদ্রোহী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে তাঁর অননুমোদিত পত্রালাপ ইংল্যাণ্ডের রিভোলুশন সোসায়িটির ফরাসী জাতীয় পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপের চেয়েও অধিক নিন্দনীয়। তিনি আরও জানান যে বার্ক আমেরিকার বিপ্লবীদের সমর্থন করেছিলেন। আমেরিকার বিপ্লবকে বিদ্রোহ নয়, ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কুপার অবশ্য এ সময় ইংল্যাণ্ডে আমেরিকার বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। এই বিরুদ্ধবাদীরা সর্ববিধ সংকটকালে ব্রিটিশরাজকে সমর্থন করতেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বার্কের প্রকাশ্য শত্রুতাচরণে কুপারকে এখন বার্কের বিরোধিতা করতে হল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য 'সমর্থক সমিতি' (sympathy club) গড়ে উঠতে লাগল এবং তারা ফ্রান্সের তথাকথিত সংবিধান সংঘগুলির (constitutional club) সঙ্গে পত্রালাপ চালাতে লাগল। ম্যাঞ্চেস্টারের সাহিত্য ও দর্শন সমিতির সদস্যবৃন্দ কুপার ও তাঁর গুণমুগ্ধ সমর্থক তরুণ জেমস ওয়াটকে (জুনিয়ার) প্যারিসের জ্যাকোবিন ক্লাবে তাদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেছিলেন। এই তরুণ

জেমস ওয়াট প্রথম কার্যকরী বাষ্পীয় এঞ্জিন-নির্মাতা বিখ্যাত জেমস ওয়াটের পুত্র। ১৭৯২ সালে ইনি ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। কুপার ও ওয়াট জেকোবিন ক্লাবে ইউরোপের স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার অস্বীকার করার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে এক আবেগময়ী বক্তৃতা দেন। কুপার গিরোনডিস্টদের পক্ষাবলম্বন করে জ্যাকোবিন দলের উগ্রপন্থী নেতা রবেসপেরীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধান। সময় মত সতর্ক করে দেওয়াতেই তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। না হলে হয়ত গিলোটিনে তাঁর শিরশ্ছেদ ঘটত।

ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে এসে কুপারকে কমন্স সভায় এক তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল। বার্ক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তিনি ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ধ্বংসের জন্য 'কুখ্যাত ফরাসী রাজ-হন্তারকদের' সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কুপারও তৎক্ষণাৎ এমনি পাল্টা অভিযোগ এনে এর জবাব দিলেন। বললেন, বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতা নিছক 'বার্কসুলভ বাগ্‌জাল বিস্তার, প্রমাণশূন্য অভিযোগ ও যুক্তিহীন গালিগালাজ।'

শাসন ব্যবস্থার উৎপত্তি ও শাসকবর্গের কর্তব্যের মৌলিক প্রশ্ন তুলে তিনি উচ্চ কণ্ঠে দাবী করলেন উদার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার। অভিজাত ও বংশপরম্পরায় ক্ষমতাবান সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কুশাসনের নগ্নরূপ তিনি নির্মমভাবে প্রকাশ করলেন। যে পুস্তিকায় তিনি বার্কের অভিমতের এমনি কঠোর সমালোচনা করেন, অতি দ্রুত তার ছয় হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। এটর্নি জেনারেলের হস্তক্ষেপে পুস্তকগুলির একখানি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ বন্ধ হয়। ইংল্যাণ্ডের সরকার কুপারকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মনে করতেন। রয়েল সোসায়িটির সদস্যগণও তাঁকে পরিহার করেন। প্রিস্টলের সুপারিশ সত্ত্বেও রয়েল সোসায়িটি কুপারের সভ্যপদের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন। ইংল্যাণ্ডের শাসকচক্রের প্রতি নিদারুণ বিরক্ত হয়েছিলেন কুপার। ফ্রান্সে উগ্রপন্থী রবেসপেরীর দল বিপ্লবের নামে যে ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন তাও তাঁর ভাল লাগেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়াই স্থির করলেন তাই।

১৭৯৩ সালে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করলেন কুপার। পরিবারের কয়েকজন লোক ও প্রিস্টলের একটি ছেলেকে নিয়ে দশ সপ্তাহ পর পৌছালেন আমেরিকায়। সেখানে এই শিশু-রাষ্ট্রের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

জীবন সম্বন্ধে অতি সযত্ন ও ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালালেন। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডে। কিছুকাল পর প্রকাশিত হল তাঁর 'আমেরিকা সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য' শীর্ষক রিপোর্টটি। এটি তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য যারা সত্য সত্যই আমেরিকায় গিয়ে বসবাস কববার কথা চিন্তা করছেন তাদের সুবিধার জন্য লিখেছিলেন।

অতি সঙ্গতভাবেই কুপার আমেরিকাযাত্রীদের সাত বা আট সপ্তাহ সমুদ্রবক্ষে কাটানোর জন্য তৈরি থাকতে ও জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পানীয় জল পরিস্রুত করার যন্ত্র আছে কিনা তাও দেখে নিতে বলেছিলেন। 'পানীয় জল থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয় তা হলে কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে পরিস্রুত ও শুদ্ধ করে নিতে হবে। যদি জল পরিস্রুত করার ব্যবস্থা জাহাজে না থাকে, তা হলে জলের সঙ্গে ফিটকিরির সলুশান (দ্রাবণ) মিশিয়ে জল পরিষ্কার করে নিতে হবে।' এ সবই বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল পরামর্শ। আমেরিকাযাত্রীদের তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন 'সঙ্গে লেবু, আপেল বা অন্য কোনও ফল নিতে ভুলবেন না, পথে সামুদ্রিক পীড়ায় এগুলি কাজে লাগবে...'

ইংল্যাণ্ড থেকে আগত কোন্ ধরনের বসবাসকামী আমেরিকায় সব চেয়ে বেশী সমাদৃত হবেন, সে সম্বন্ধে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন কুপার। বলেছিলেন 'বংশগত কৌলিন্য ছাড়া যাদের অন্য কোনও গুণ নেই তাঁদের সেখানে না যাওয়াই ভাল। কৃষক ও মিস্ত্রিদেরও সেখানে সম্মানের স্থান আছে। কারণ নতুন এই দেশে তাদের প্রয়োজন খুব বেশী। সেখানে লোকের মাঝে একটা চলতি কথা আছে, 'সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিজেই একজন কারিগর। ব্রহ্মাণ্ডের সেরা মিস্ত্রি। তাঁর সৃষ্টিকর্মের সুপ্রাচীনতার চেয়ে সেই সৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্য, বিস্ময়কর কলাকৌশল ও কল্যাণকারিতার জন্যই মানুষ তাঁকে বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।'

ভবিষ্যৎ আমেরিকাযাত্রীরা আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে চাইতেন। কুপার সে সব তথ্যও সরবরাহ করেছিলেন। এই রিপোর্টে তিনি নতুন দেশের বিভিন্ন অংশের আবহাওয়ার ও জমির উর্বরতা শক্তির পরিমাণ জানিয়েছিলেন। আমেরিকায় বসবাস স্থাপনকামীদের তিনি নিউজার্সি প্রদেশে বসতি স্থাপন করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ আমেরিকার অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা এখানে মশা ও ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বেশী।

তাঁর অনেক বাস্তবধর্মী সুপরামর্শের অন্যতম এটি। যুক্তরাষ্ট্রের জমির দাম এবং জমি নিয়ে ফাটকাবাজির কথাও লিখেছিলেন তিনি। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধেও ইঙ্গিত ছিল তাঁর এই রিপোর্টে।

যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্প স্থাপন সম্পর্কেও বেশ মূল্যবান কথা বলেছিলেন কুপার, 'এখানে জমি খুবই সুলভ। কিন্তু শ্রমিকের মজুরী অত্যধিক। কাজেই যে সব শ্রমশিল্প ইতিপূর্বেই এখানে লাভজনকভাবে চলছে সেই ধরনের শ্রমশিল্প ব্যতীত অন্য কোনও শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিদারী কাজ।...আমার মনে হয় না যে কেউ এখন এখানে রেশমী বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র ও সূতীবস্ত্রের (সম্ভবত মোজা বাদে) কারখানা স্থাপন করলে তা লাভের সঙ্গে চালাতে পারবেন। এখানে এখন চীনামাটির বাসনপত্র তৈরির কারখানা নির্মাণের সময় হয়েছে বলেও মনে হয় না। তবে কাচের, বারুদের, কাগজে রং করবার, ছাপার হরফ তৈরির, ধাতুপিণ্ড থেকে ঢালাই লোহা তৈরির, অপরিশুদ্ধ লৌহ, ঢালাই লৌহ ও লৌহের শিক, লৌহ ঢালাই, লৌহ ছাটাই প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভারি লৌহের কারখানা ও পেরেক তৈরির কারখানা স্থাপন করলে তা যে ভাল ভাবেই চলবে, এবিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

কতকগুলি রাসায়নিক শিল্প ইতিপূর্বেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে কুপার এই সব সুপারিশ করেছিলেন। কাচ শিল্পই ছিল তখন আমেরিকার শ্রমশিল্পগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। জেমস টাউনের নিকটে ১৬২১ সালেই, রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য কাচের পুঁতি তৈরি করতে আমেরিকায় প্রথম কাচের কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথম কাচের বোতল ও কাচের তৈজসপত্র তৈরি হয় ১৬৩৮ সালে। মাসাচুসেট্‌স-এ জানালায় লাগানোর কাচ বহুদিন আমেরিকায় মিলতই না। আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে উঠবার অনেক পরে, ১৭৮৯ সালে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জানালার কাচ তৈরি করবার জন্য এখানে কারখানা স্থাপিত হয়।

এদেশে ইউরোপীয় মানুষের বসতি স্থাপন হবার প্রথম দিকেই এখানে লোহা তৈরি হতে থাকে। ১৬২৮ সালে মাসাচুসেট্‌স-এর লিন-এর নিকট সাউগাসে বিল ও কর্দমাক্ত ভূমিতে প্রাপ্ত কিছু লৌহধাতুপিণ্ড গালিয়ে অপরিশুদ্ধ লৌহ উৎপন্ন করা হয়েছিল। ১৬৪১ সালে লোহার কারখানা তৈরির ঠিকাদারী নিতে পারে এমন একটা কোম্পানি গঠন করবার জন্য ও

কারখানার যন্ত্রপাতি, ব্লাস্ট ফার্নেসে অপরিশুদ্ধ লৌহ এবং পেটা লোহা তৈরির কাজে অভিজ্ঞ শ্রমিক সংগ্রহ করতে জন উইনথ্রোপ (জুনিয়র) ইংল্যাণ্ডে গেলেন। তাঁর লোহার কারখানা স্থাপিত হয়েছিল সাউগাসে। ১৭০০ সাল নাগাদ আমেরিকায় প্রায় বারোটি লোহার কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। এখানে লোহার পাত্র, উনুন ও স্কিলেট (হাতলওয়ালা কড়াই) এবং পেরেক তৈরির শিক নির্মিত হত। ১৭২৫ সালে আমেরিকায় প্রথম ইস্পাত উৎপন্ন হয়। কানেটিকাটের সামুয়েল হিগবি অগ্নিচুল্লীতে লোহার ডাণ্ডা ও কয়লা একত্র মিশিয়ে দীর্ঘ সাত দিন ধরে পুড়িয়ে ইস্পাত উৎপাদন করেছিলেন। ১৭৭৫ সাল নাগাদ আমেরিকার আশিটি ব্লাস্ট ফার্নেসে ৩০,০০০ টন ঢালাই লোহা উৎপন্ন হত। পরিমাণটা সে বছর পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ।

আমেরিকায় জনবসতি গড়ে উঠবার একেবারে প্রথমদিকেই ইট তৈরি হয়েছিল। প্রথম ইটের পাজা পোড়ান হয় ১৬৪৩ সালে সালেমে। এই ইট দিয়েই সে বছর আমেরিকার প্রথম ইটের তৈরি বাড়ী নির্মিত হয়। ১৭৯৩ সাল নাগাদ ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক ও বস্টন প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির অনেক বাড়ীই ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি হতে থাকে।

তখন আমেরিকায় পশুর শিং থেকে সিরিশ আঠা তৈরি হত। সমুদ্রের নোনা জল শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়েছিল এখানে ১৬২৩ সালেই। সপ্তদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তির দশ বছর আগেই পেনসিলভানিয়ার জার্মান টাউনে প্রথম কাগজ কল স্থাপিত হয়। ১৬০৯ সালে লণ্ডন কোম্পানি প্রেরিত আটজন স্পেন ও জার্মান এখানে সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত পটাশ (অপরিশুদ্ধ পটাসিয়াম কার্বনেট) প্রথম উৎপাদন করেন। ১৭৮৮ সাল নাগাদ একমাত্র ম্যাসাচুসেটসেই পটাশ কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই শো।

অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যও অল্পপরিমাণে তৈরি হচ্ছিল। পশুমল নিষ্কাশিত সোরা থেকে বারুদ তৈরি হত। এমনকি অল্প পরিমাণে রঞ্জন দ্রব্যও তৈরি হত। ইউরোপীয়গণ আসবার অনেক আগেই রেড ইণ্ডিয়ানরা গাছের শিকড়, ছাল ও বীজ থেকে উদ্ভিজ্জাত রঞ্জক তৈরি করত। আমেরিকায় আগত ইউরোপীয়েরা এইভাবে উদ্ভিজ্জজাত রং তৈরি করতে শেখে, এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে।

১৬৪৩ সালে উইনথ্রোপ মাসাচুসেট্‌সে রং তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে নীল তৈরির প্রথম পরীক্ষাও করেন তিনি ঐ বছরই।

আমেরিকায় উপনিবেশ পত্তনের একেবারে প্রথম দিকেই রেশমগুটি চাষের চেষ্টা চলে। রেশমগুটি চাষের জন্য হাজার হাজার তুঁত গাছ লাগানো হয়েছিল। এই রেশমগুটি অবশ্য আমেরিকায় আমদানী করা হয়েছিল। কারণ এখানে রেশমগুটি পাওয়া যেত না। ১৭৫৯ সালে দক্ষিণ ক্যারোলাইনা থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড কাঁচা সিল্ক রপ্তানি করা হয়। ১৭৭০ থেকে ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটিতে আলোচনা চলে, ফিলাডেল্‌ফিয়ায় রেশমগুটি থেকে রেশমসূতো উৎপাদনের কারখানা স্থাপনে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য বিধানমণ্ডলীকে অনুরোধ জানান বাঞ্ছনীয় কিনা। রেশমগুটি চাষ আমেরিকায় খুব বেশী দিন চলল না। ধীরে ধীরে লোপ পেল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তা আর চালু করা যায় নি।

আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে খবরাখবর দেওয়া ছাড়াও কুপার সাগ্রহে সেখানকার সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, কিসের লোভে মানুষ ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় আসছে? এর যে প্রথম এবং প্রধান কারণটা আমার মনে আসছে তা হল, এখানে কোনও পরিবারের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্নতা। শ্রমিকের মজুরী এখানে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে বেশী। গরীব মানুষ সেখানে টাকা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে।...এখানকার মত সেখানে ক্ষেত-মজুরদের উপর জমির মালিকদের প্রভুত্ব তত জোরালো নয়। ক্ষেতমজুররা ইচ্ছা করলেই জমানো টাকা দিয়ে চাষের জমি কিনে ক্ষেত-খামারের মালিক হতে পারে।...ইউরোপে যেমন চরম প্রাচুর্য ও অর্থহীন বিলাসব্যসনের সমারোহের পাশাপাশি সর্বদাই চোখে পড়ে পাপ, নোংরামি ও কুৎসিত দারিদ্র্য, আমেরিকায় এমন চক্ষুপীড়াদায়ক শোচনীয় ধনবৈষম্য দেখা যায় না।...এখানে মানুষকে রাজকর দিতে হয় স্বল্পমাত্রায়। ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে বৈরিতা নেই। ধর্ম এখানে এমন একটা বিষয় যা নিয়ে মানুষ মোটেও মাথা ঘামায় না।"

কুপার তাঁর এই রিপোর্টে এমন একটা কথা লিখে গিয়েছিলেন পরবর্তী কালে লিঙ্কনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে তা অমরতা লাভ করেছিল। যৌবনকালে লিঙ্কন হয়ত কুপারের লেখা পড়ে থাকবেন। কুপার আইন-বিষয়ক গ্রন্থও

রচনা করেছিলেন। 'আমেরিকার সরকার হল জনসাধারণের দ্বারা এবং জনসাধারণের মঙ্গলার্থে চালিত সরকার' একথা লিখেছিলেন কুপার। ইংল্যাণ্ড-বাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে রচিত এই তথ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এতে সন্নিবেশিত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। এই গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র পাঁচ বছর আগে এই সংবিধানটি রচিত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক অবদান দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ উদ্ভাবনে সুকৌশলী এবং বিজ্ঞান, কলা, যন্ত্রশিল্প, নৌ-বিদ্যা ও কৃষিকর্মের কাজে তৎপরতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে যান্ত্রিক কৌশল ও কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করে থাকে।"

১৭৯৩ সালের শেষের দিকে কুপার প্রথম যখন এদেশ পরিদর্শনে আসেন, তার আগেই ওয়াশিংটন সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। হ্যামিলটন তখনও তাঁর অর্থসচিব। জেফারসন তাঁর পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন কিন্তু হ্যামিলটনের সঙ্গে মতভেদের জন্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন কারণ রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে তাঁর চেয়ে বেশী সমর্থন লাভ করছিলেন হ্যামিলটন। ইনি (হ্যামিলটন) বিশ্বাস করতেন যে ধনাঢ্য উচ্চ কুলোদ্ভব এবং যোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই দেশ শাসিত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। ধনী বণিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে তিনি চাইতেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। অপর দিকে জেফারসন চাইতেন কৃষিজীবী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে। তিনি সাধারণ লোকের শাসনে বিশ্বাস করতেন। গ্রামের লোক ও শহর থেকে বহু দূরে দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে বসবাসকারী মানুষের খুব শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে ভয় ছিল। তাঁরা মনে করতেন এমনি ধরনের সরকার হয়ত তাদের কিছু কিছু ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করতে পারে। এরা জেফারসনকে সমর্থন করতেন।

কুপার আমেরিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা স্পষ্ট ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। লিখেছিলেন, "আমেরিকানরা প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। তবে তাদের মধ্যে দুটি দল রয়েছে। এদের একদল চাইতেন সরকারের আইন প্রণয়নের এবং আইন অনুযায়ী কার্যনির্বাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে; ফরাসী অপেক্ষা ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এদের ঝোঁক বেশী। এরা চান অর্থ বিনিয়োগ, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের প্রবর্তন ও প্রসার। এই দলে আছেন

প্রায় সমগ্র উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, সিনেটের অধিকাংশ সদস্য, বড় বড় শহরগুলির ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি। এ দলকে বলা হয় ফেডারেলিস্ট দল। ......অন্য দলকে বলা হয় অ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট। এই নামের দ্বারা একথা অবশ্য বোঝাচ্ছে না যে এরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের বিরোধী। এই নাম থেকে শুধু বোঝায় যে এরা ফেডারেলিস্ট দলের বিরোধী পক্ষ। অ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট দলে আছেন দেশের অধিকাংশ অধিবাসী এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের (প্রতিনিধি সভার) অধিকাংশ সদস্য।"

১৭৯৪ সালের প্রথম দিকে কুপার তাঁর চারটি সন্তান ও স্ত্রী সহ যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন। তার আসবার কয়েক সপ্তাহ পরই আসেন তাঁর বন্ধু জোসেফ প্রিস্টলে। দুই বিজ্ঞানী পেনসিলভানিয়ার নর্দামবারল্যাণ্ডে, সাস্‌কেহানা নদীর তীরে একই বাড়ীতে বসবাস করতে শুরু করলেন।

এখানে আসবার এক বছর পর কুপার আমেরিকার নাগরিকরূপে গণ্য হলেন। প্রিস্টলের সঙ্গে তিনি রাসায়নিক পরীক্ষায় মাতলেন এবং সহযোগী আমেরিকান বিজ্ঞানীদের রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মনোযোগ দিলেন।

১৭৯২ সালে বেঞ্জামিন রাস ফিলাডেলফিয়ার কেমিক্যাল সোসায়িটি স্থাপন করেন। এই সময় রসায়নশাস্ত্রে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে বিজ্ঞান জগতে এক জোর আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জনক লাভাসিয়র সর্বপ্রথম দহনের সত্যিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। এতে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ প্লজিস্টন (Theory of Phlogiston) বাতিল হল। তিনি রসায়ন বিজ্ঞানে প্রচলিত নামকরণ পদ্ধতিরও সংস্কারসাধন করেন। কলাম্বিয়া কলেজে রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত থাকা কালে ডঃ সামুয়েল এল. মিচিল তাঁর কলেজে এই নতুন নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আমেরিকায় প্রিস্টলে প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী তখনও প্লজিস্টনবাদ আঁকড়ে ছিলেন। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই লাভাসিয়রের নতুন ব্যাখ্যা সমর্থন করতেন। ডঃ সামুয়েল মিচিল সম্পাদিত মেডিকেল রিপোজিটারী নামে কাগজখানিতে দহন ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই দুই দলের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ চলত।

রসায়ন বিজ্ঞান ছাড়াও বহুমুখী প্রতিভাবান কুপারের আরও অনেক বিষয়ে অনুরাগ ছিল। তিনি ভেষজ বিজ্ঞান চর্চা করতেন। পাড়ার দুঃস্থ পীড়িতদের

বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। কিছুকালের জন্য তিনি 'নর্দামবারল্যাণ্ড রেজিস্টার' সম্পাদনা করেছিলেন। ওকালতিও করেছিলেন এক সময়। অনতিবিলম্বে তিনি নতুন দেশের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। সে সময় হ্যামিলটনের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্ট ও জেফারসনের নেতৃত্বে রিপাবলিক্যানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল। (এই রিপাবলিক্যান দলটি বর্তমান কালের রিপাবলিক্যান পার্টি নয়। বর্তমান রিপাবলিক্যান পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে।) ১৭৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে ফেডারেলিস্ট দল অ্যালিয়েন ও সিডিসান অ্যাক্ট (বিদেশী নাগরিক ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সম্পর্কিত আইন) পাস করেন। অ্যালিয়েন অ্যাক্ট পাস করা হয়েছিল আমেরিকাকে বিদেশী, বিশেষ করে ফরাসী ও আইরিশ 'বিক্ষোভকারীদের' কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য। এরা প্রেসিডেণ্ট জন অ্যাডামস-এর শাসনের তীব্র সমালোচনা করছিল। সিডিসন অ্যাক্ট প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল রিপাবলিক্যানদের দমন করা। তারা ছিল সেকালের চরমপন্থী অতি-বিপ্লবী দল।

রিপাবলিকান দলের যে দশজন সম্পাদক ও মুদ্রাকর এই সিডিসন অ্যাক্টের কবলে পড়ে নিগৃহীত হয়েছিলেন কুপার তাদের অন্যতম। রিডিং উইকলি অ্যাডভারটাইজারে "প্রেসিডেণ্ট জন অ্যাডামস-এর সম্পর্কে মিথ্যা, কুৎসা ও বিদ্বেষপূর্ণ বিষয় লিখে প্রকাশ করার জন্য" তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য জজ সামুয়েল চেজের আদালতে হাজির করা হয়। ইনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের একজন অতি দাম্ভিক ও উদ্ধত প্রকৃতির বিচারক। কুপার নিজের মামলায় ওকালতি করলেন নিজেই। কিন্তু বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। চারশ ডলার জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়েছিল তাঁর। প্রিস্টলে তাঁকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট অ্যাডামস, তাঁর মুক্তির জন্য কিছুই করতে রাজী হলেন না। ছয় মাস জেল খাটবার পর কুপার ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়েও তিনি এই সিডিসন আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। কারণ তাঁর মতে এই আইন আমেরিকার সংবিধান-বিরোধী—সংবিধানের প্রথম ধারায় যে বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, এই আইনে সেই অধিকার বিনষ্ট করা হয়েছে।

১৭৯৬ সালে জেফারসন আমেরিকান ফিলজফিকাল সোসায়িটির তৃতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। আঠারো বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন অন্য সব কিছুর চেয়ে এই নতুন প্রজাতন্ত্রী দেশটির সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিজ্ঞান। হার্ভার্ড কলেজের প্রেসিডেন্ট উইলার্ডকে তিনি লেখেন, "আমেরিকার উদ্ভিদবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমেরিকার মণিকবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় এখনও হাত দেওয়া হয়নি। এদেশের প্রাণী সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জীবনে স্বাধীনতার মহান আশীর্বাদ বয়ে আনতে আমরা আমাদের জীবনের সারাংশ কাটিয়েছি। এবার তারা তাদের জীবনের সারাংশ কাটিয়ে দেখিয়ে দিন যে স্বাধীনতাই বিজ্ঞান ও সদগুণের জনক। যে জাতি যতখানি স্বাধীন সে জাতি এই দুইটি বিষয়ে ততখানি সমৃদ্ধশালী।"

জেফারসন বিজ্ঞানে ঠিক সাধারণ উৎসাহী বা লঘুচিত্ত অনুরাগী ছিলেন না। একজন বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন, "প্রকৃতি চেয়েছিল আমি শান্তভাবে বিজ্ঞানসেবা করি। এমনি বিজ্ঞান চর্চায় আমি পরম আনন্দ পেতাম।" ১৭৮১ সালে তিনি "নোটস্ অন দি স্টেট অব ভার্জিনিয়া" নামে গ্রন্থখানি সংকলন করেন (এটি ১৭৪৪ সালে প্যারিসে প্রথম প্রকাশিত হয়)। এই গ্রন্থে তিনি ভার্জিনিয়া প্রদেশের ভূসংস্থান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পাঁচ বছর পর ১৮০১ সালে জেফারসন গেলেন ওয়াশিংটনে, যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্টরূপে কার্যভার গ্রহণের জন্য। ফেডারেলিস্ট ও রিপাবলিকান, এই দুই রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্য ছিল অতি তিক্ত ও তীব্র। জেফারসনকে সর্বদা কাগজে অশ্লীল ইতর ভাষায় গালিগালাজ করা হত। কিন্তু নির্বাচনে রিপাবলিক্যানদের হাতে ফেডারেলিস্টদের পরাজয় ঘটেছিল সেবার। জেফারসনের প্রতিদ্বন্দ্বী আরন বার, তাঁর সমান সংখ্যক নির্বাচক ভোট পান। কে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবেন, সে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হয়েছিল হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভকে।

জেফারসনের বিজ্ঞানানুরাগকে তার শত্রুগণ তাঁকে অপদস্থ করবার আর একটি পন্থা হিসাবে ব্যবহার করে। তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীগণের তাঁর উদারনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে বেশ ভয় ছিল। তারা অভিযোগ আনলেন, "তিনি মোজেসকে অস্বীকার করেছেন। বাইবেলোক্ত মহা

প্লাবন কাহিনী অবিশ্বাস করেন। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মৌল পার্থক্যের কারণ নিয়ে গবেষণা করেন।" তারা অবজ্ঞাভরে মুখ সিটকে বলেছিলেন, "মনে করুন, নিগ্রো কেন কালো এবং দুর্গন্ধযুক্ত আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর মূত্রাশয় ও গ্লাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করে, তা প্রমাণ করবার জন্য কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত তাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে।" জেফারসন নানা ধরনের জিনিস আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল লাঙ্গলের জন্য মোল্ডবোর্ড—আমেরিকার কৃষিতে সেই প্রথম বিজ্ঞানের প্রয়োগ, একটি মূক ওয়েটার, একটি হাতলযুক্ত আবর্তনকারী চেয়ার, একটি পেডোমিটার (পাদক্ষেপ গণনাযন্ত্র), পাটকাঠি থেকে আছড়ে পাটের আঁশ বের করার যন্ত্র। এই সব আবিষ্কারের কোনটিরই তিনি কোনও পেটেন্ট নেন নি। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর এমনি নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা দেখে পরিহাস করত।

জেফারসন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে, সে সময় নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ড অবরোধ করেন। ব্রিটেন পাল্টা ফ্রান্স অবরোধ করে। আমেরিকা যাতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে না পড়ে তার জন্য আমেরিকার কংগ্রেস ১৮০৭ সালে এমবার্গো অ্যাক্ট পাস করেন। এতে আমেরিকার নৌ-বাণিজ্য ব্যাহত হয়। ফলে ব্যবসায়ে যে মন্দা দেখা দেয় তার জন্য জেফারসনকে দায়ী করা হতে লাগল। জেফারসন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফন হুমবোল্ড ওয়াশিংটনে আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এর সঙ্গে জেফারসন গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পত্রালাপ করেছিলেন। হুমবোল্ড জেফারসনের টেবিলে একখানা খবরের কাগজ দেখতে পান। কাগজখানিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হীন গালিগালাজ করা হয়েছিল। জার্মান বিজ্ঞানী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ ধরনের কুৎসা সহ্য করা হয় কেন? জেফারসন উত্তর দিয়েছিলেন, "ব্যারন, কাগজখানা আপনার পকেটে রেখে দিন। যদি কখনও আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ওঠে, বা আমাদের দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে তবে এই কাগজখানি তাকে দেখাবেন এবং কোথায় এখানা পেয়েছেন, তাও জানিয়ে দেবেন।"

প্রিস্টলে ১৮০৪ সালে মারা যান। মৃত্যুকালে কুপার তার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। রাসায়নিক পরীক্ষা চালানোর জন্য প্রিস্টলে যে বীক্ষণাগার

নির্মাণ করেছিলেন, কুপার বহুবর্ষ তা ব্যবহার করেন। প্রিস্টলে উইল করে তার যন্ত্রপাতি কুপারকে দান করে যান। এর মধ্যে ছিল তাঁর বার্নিং গ্লাসটিও। এরই সাহায্যে ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও কুপার রাজনীতি চর্চায়ও বিশেষ ব্যস্ত থাকতেন। ১৮০৬ সালে তিনি পেনসিলভানিয়া প্রদেশে বিচারকের পদ লাভ করেন। কর্মবহুল পাঁচটি বৎসর তিনি উদার মনোভাব নিয়ে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বিচারকের কর্তব্য সম্পাদন করেন।

উদার মনোভাবের জন্য বহু লোক তাঁর প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী কর্তব্য কাজে গাফিলতির অভিযোগ আনেন এবং তাঁকে বিচারকের পদ হতে অপসারণের জন্য বিধান মণ্ডলীর নিকট দরখাস্ত পেশ করেন। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাজানো। কুপারের সহকর্মী কয়েকজন বিচারক অভিযোগ সম্পর্কিত বিচারের রায়ের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তবুও বিধান মণ্ডলীর আদেশে গভর্নর স্নীডার ১৮১১ সালের ৩রা এপ্রিল তাঁকে বিচারকের পদ হতে অপসারিত করতে বাধ্য হলেন।

দুদিন পরই কুপার বেঞ্জামিন রাসের চেষ্টায় পেনসিলভানিয়ার কার্লসলির ডিকিনসন কলেজের রসায়ন বিজ্ঞান ও মণিকবিদ্যার অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। বেঞ্জামিন রাসই এই কলেজটি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। অধ্যাপক নিযুক্ত হবার দুদিনের মধ্যেই তিনি একটি বক্তৃতায় আমেরিকায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে এক নতুন ও প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার করলেন। তাঁর মতে রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা অন্যান্য সাংস্কৃতিক শিক্ষার সঙ্গে আরও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়া উচিত। ব্যবহারিক মূল্যের জন্য নয়, সাংস্কৃতিক অবদানের জন্যই রসায়ন বিজ্ঞানের একটা সামাজিক মূল্য থাকবে। তিনি আরও বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, কোনও শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের ইতিহাসই সে বিষয়টি শিক্ষার প্রকৃত ভূমিকারূপে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। এখানে অদ্যাপি অমীমাংসিত বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত অনেক অবিষ্কার রয়েছে। কাজেই এগুলি ছাত্রদের জানার যোগ্য বিষয়। রসায়ন বিজ্ঞানের এই ইতিহাস থেকেই সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটেছে। এই ইতিহাসই অতীতের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়ে ভবিষ্যতের ভ্রমপ্রমাদের প্রতি যথোচিত সতর্ক করে দেয়। বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারের দ্বারা যাঁরা মানব জাতির অশেষ উপকার করে গেছেন, তাদের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে এই রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস।"

ডিকিনসন কলেজে কুপার পাঁচ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর রসায়নগারে প্রতি শিক্ষা বছরে প্রত্যেকে দশ ডলার ফি দিয়ে প্রায় আশিটি ছাত্র রসায়ন বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করত। এরা দুধ, মাখন, সাবান, বীয়ার, মদ, চীজ, কাচ, পিতল এবং লোহার রসায়ন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করত। ছাত্রদের মধ্যে ছিল দ্যু পণ্ট দ্য নিমরস্-এর ছেলেরা। ক্লাসে তিনি ছাত্রদের প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের কথা, হিন্দু ও চীনাদের হীনতর ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণে পরিণত করার চেষ্টা থেকে উদ্ভূত কিমিয়া শাস্ত্রের (alchemy) কথা ও সমসাময়িককালের নতুন রসায়নবিজ্ঞানের কথা শোনাতেন। আমেরিকায় লাভাসিয়র সৃষ্ট নতুন রসায়ন শাস্ত্র প্রবর্তনের কাজে তিনি প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেন। আকুমের রচিত সিস্টেম অব থিয়োরেটিক্যাল অ্যাণ্ড প্রাকটিক্যাল কেমেষ্ট্রি (System of Theoretical and Pratical Chemistry) নামে গ্রন্থখানি সংশোধিত করে তিনি হাল আমলের তথ্য সম্বলিত করে তোলেন। তিনি নিজেও রাসায়নিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, কক্সের এম্পোরিয়াম অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস (Emporium of Arts and Sciences) সম্পাদনা ও সংশোধন করেছিলেন। এই বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকীটি ১৮১২ সালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ডিকিনসন কলেজে অধ্যাপনা কালে কুপার ইনস্টিটিউটস অব জাস্টিনিয়ান (Institutes of Justinian) নামে গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করে কলেজে রোমীয় আইন পঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। অনূদিত গ্রন্থখানিতে তিনি যে নিজস্ব টীকা সংযোজনা করেছিলেন তার পরিমাণ প্রায় মূল পুস্তকখানির সমান। কুপার তখন একটুও বদলাননি। তিনি সেই পুরাতন কুপারই রয়ে গেছেন। অকুতোভয়ে নতুন ভাবধারা প্রকাশ করে চলেছেন। নতুন শত্রু সৃষ্টি করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এখানেও অভিযোগ উঠল তিনি তাঁর কতকগুলি ছাত্র নিয়ে রবিবারের বিশ্রাম দিনেও গবেষণাগারে কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত কলেজের অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

ডিকিনসন কলেজের কাজে ইস্তফা দেবার এক বৎসর পর আবার তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ পেলেন। এবার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়ে যখন ইয়েল, হার্ভার্ড, উইলিয়াম অ্যাণ্ড মেরী ও নিউ জার্সির কলেজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে চলেছিল তখন ফ্রাঙ্কলিন চেষ্টা করেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত একটি কলেজ স্থাপন করতে। সেই চেষ্টার ফলেই ১৭৪৯ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। ফ্রাঙ্কলিন চেয়েছিলেন, সাধারণ কলেজগুলিতে ল্যাটিন, গ্রীক ও প্রাচীন সাহিত্য পঠনপাঠনের উপর যে অতিমাত্রায় জোর দেওয়া হয়ে থাকে তার বদলে নতুন এক পাঠ্যক্রম-যুক্ত কলেজ স্থাপন করতে, যেখানে ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার প্রতি জোর দেওয়া হবে। তিনি কারিগরদের জন্য কলেজ স্থাপনের কথাও চিন্তা করেছিলেন এবং অঙ্ক শাস্ত্র, নৌবিদ্যা, হিসাব রক্ষাকার্য, পদার্থ ও জৈববিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে দক্ষ কারিগর ও কৃষি কর্মীদের নৈপুণ্যবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখতেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথ একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না। নতুন কাজের ভার গ্রহণ করতে না করতেই কুপার গিয়ে পড়লেন আর এক বাগ্‌বিতণ্ডার ঝঞ্ঝার মাঝে। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালয়ে (মেডিকেল স্কুলে) রসায়ন বিজ্ঞানের স্থান কোথায়, এই প্রশ্ন নিয়ে তখন চিকিৎসক মহলে আলোচনা চলছিল। ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ চার্লস কল্ডওয়েল মেডিকেল ছাত্রদের রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষণের তীব্র বিরোধিতা করছিলেন। মেডিকেল ছাত্রদের নিকট রসায়ন বিজ্ঞানের গুরুত্ব তিনি উপহাস ভরে উড়িয়ে দেন। তিনি বললেন, "আমায় কি একথা শুনতে হবে যে রসায়ন বিজ্ঞান জীবন্ত প্রাণীর শারীর ক্রিয়ার কোনও প্রকৃতি বা সূত্র ব্যাখ্যায় সাহায্য করে? শারীর বৃত্ত, রোগনিরূপণ বিদ্যা বা রোগচিকিৎসাবিদ্যার উপর কোনও আলোক সম্পাত করে? এসব বিষয়ের আলোচনায় রসায়নবিজ্ঞানে যতটা স্থান পেয়েছে, তাতে চিকিৎসা শাস্ত্রকে শুধু ঘোলাটে করে তোলেনি, ভ্রম-প্রমাদপূর্ণও করে তুলেছে।" একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে এ এক অদ্ভুত উক্তি। তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলেন যে তিন শত বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডবাসী বিজ্ঞানী প্যারাসেলসাস্ রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে ভেষজবিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের পক্ষে রসায়ন শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন।

আবশ্যিক বিষয় হিসাবে এই মেডিকেল স্কুলে বেঞ্জামিন রাস প্রথম রসায়ন বিজ্ঞান পড়ান। এখন এই বিষয় পড়াচ্ছিলেন অক্সিহাইড্রোজেন ব্লোপাইপ আবিষ্কারক বিখ্যাত ডঃ রবার্ট হেয়ার। ১৮০১ সালে তিনি এই ব্লো পাইপ

আবিষ্কার করেন এবং তার জন্য আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স-এর নিকট হতে রামফোর্ড পদক লাভ করেন। ভেষজবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হওয়া সত্বেও চিকিৎসা বিভাগে রসায়ন বিজ্ঞান পড়ানোর কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন হেয়ার। কুপার ভেষজবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি হেয়ারকে বুঝিয়ে রাজী করালেন যে হেয়ার মেডিকেল ছাত্রদের শুধু বিশুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞান পড়াবেন। ভেষজবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান —উভয় বিষয়েই কুপারের জ্ঞান থাকায় তিনি মেডিকেল ছাত্রদের ভেষজবিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় পড়াবেন।

তারপর ডঃ কল্ডওয়েলের বিরোধিতার জবাব দিয়ে তিনি 'অন দি ইম্পরটেনস্ অব কেমিস্ট্রি টু দি মেডিকেল ম্যান' (ভেষজ বিজ্ঞানীদের নিকট রসায়ন বিজ্ঞানের গুরুত্ব) বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি দেখিয়ে দিলেন যে ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষায় রসায়ন বিজ্ঞান কতখানি অত্যাবশ্যকীয়। মেডিকেল ছাত্রদের জন্য তৎকালে প্রচলিত তিন বছরের পাঠক্রমের বদলে তিনি চার বছরের পাঠক্রমের প্রস্তাব করেন এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন যে 'ভেষজবিজ্ঞান সংক্রান্ত রসায়ন বিজ্ঞানের সবে সূত্রপাত হয়েছে।' ভবিষ্যদ্বক্তার মত তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। কারণ তাঁর প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম থেকে আমেরিকার ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষায় এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল।

কুপার আমেরিকার ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির কার্যাবলীতেও খুবই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সমিতিতে তিনি ব্লিচিং (শুভ্রকরণ), প্লাটিনাম ধাতুমিশ্রণ, নিউজার্সির আকরিক লৌহ এবং আর্সেনিক পরীক্ষা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন। ১৮১৮ সালে তিনি টমাস টমসনের চার খণ্ড 'এ সিস্টেম অব কেমিস্ট্রি' সম্পাদনা করেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই পাঠ্য পুস্তকটিতে তিনি অজস্র ব্যাখ্যা সংযোগ করেন এবং জন ডালটনের সাম্প্রতিক প্রচারিত পরমাণুবাদের পূর্ণ ভাষ্যও দেন। এই বছরই তিনি আমেরিকার রসায়নবিজ্ঞানের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক, 'কনভারসেসনস্ ইন কেমিস্ট্রি' নামে গ্রন্থখানি সংশোধন করেন। জেন মার্সেট লিখিত এই পুস্তকখানি বহু তরুণ আমেরিকান বিজ্ঞানীর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুপার সময় করে ভেষজবিজ্ঞান-গত-ব্যবহার শাস্ত্রের একখানা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। গ্রন্থখানি উচ্চ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছিল।

অশোভন ভাবে আত্মজাহির করবার প্রবণতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। আবার এখানেও তাঁর এই ব্যাধি পুনরায় প্রকাশ পেল। কলেজ অব ফিলাডেলফিয়া থেকেও তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রতিবারই চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুপার আর একটি বিদ্যাকেন্দ্রকে সমৃদ্ধ করে তুলতেন। এবার এসে তিনি যোগদান করলেন নব প্রতিষ্ঠিত ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। জেফারসনের শিক্ষা ব্যবস্থার এটি সেরা প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনাকালে কুপারের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। স্থির হয়েছিল এখানে গণিত শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হবে এবং সকল ছাত্রই কার্যকরী বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করবে। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জেফারসন, কলেজের ট্রাষ্টিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কুপারকে কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞান, মণিকবিদ্যা ও আইনের অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়োগের বিরুদ্ধে এমন বিরোধিতা দেখা দিল যে, তার সামনে জেফারসনও অসহায়বোধ করতে লাগলেন। কয়েক মাস কাজ করার পরই, কয়েকজন বন্ধুকে যাতে বিব্রত বোধ না করতে হয় তার জন্য তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করলেন।

১৮১৯ সালে রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য কলেজ অব সাউথ ক্যারোলাইনা তাঁকে আমন্ত্রণ করল। পরে মণিকবিদ্যা ও ভূবিদ্যা বিভাগের ভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়। এক বছরের মধ্যেই তিনি কলেজের প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করেন এবং পরবর্তী তেরো বছর অতি দক্ষতার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের এই বিখ্যাত বিদ্যায়তনটি পরিচালনা করেন। সময়ের নিছক অপব্যয় মনে করে তিনি কলেজে অধিবিদ্যার (metaphysics) পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেন। বক্তৃতা শিক্ষাদানও রদ করেন। 'তরুণদের যদি যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে সাহায্য না করতে পারি তা হলে বৃথাই তাদের শিক্ষা দেওয়া'—এই যুক্তি দ্বারা চালিত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম রাজনীতিশাস্ত্র ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে, কলেজ পাঠক্রম যুগোপযোগী করে তোলেন। ফ্রাঙ্কলিন ও রাসের মত কুপারও বিনাবেতনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন সরকারী ব্যয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেই গণতন্ত্রের নিরাপত্তা-বিধান সম্ভব হবে।

কলেজের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থেকেও কুপার ক্লাসে ছাত্রদের রসায়ন

বিজ্ঞান পড়াতেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষক। লা বোর্দে নামে তাঁর একজন সহকর্মী লিখেছেন, 'দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় পদার্থবিজ্ঞান প্রসারে তিনিই প্রথম বড় রকমের প্রেরণা দান করেন। তিনিই প্রথম এদেশবাসীর নিকট ওয়াট, ক্যাভেন্‌ডিস, ব্ল্যাক, চিলি, ডেভি, লাভাসিয়র, ও প্রিস্টলের নাম সুপরিচিত করে তোলেন। আমেরিকা ও ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি অবাধে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিলেন। অদ্ভুত নৈপুণ্যে যেমন তিনি প্রিস্টলের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন, রবেসপিয়েরের সঙ্গে সুরাপান করেছেন, কিংবা ডিউক অব অরলিনের সঙ্গে কনভেনসনের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেছেন ; তেমনি অবলীলাক্রমে অ্যাসবেসস্টস্‌, সোডা বা ম্যাগনেসিয়াম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।' খাঁটি বিজ্ঞান প্রচারক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই।

সমকালীন সমাজের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত নাগরিকরূপে বিজ্ঞানী কুপার ভালভাবেই জানতেন যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে তাঁকেও কিছু করতে হবে। তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ঝঞ্ঝা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে তিনি বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অঙ্গরাজ্য সমূহের বিশেষ অধিকারের মতবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন। কারণ কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন।

উত্তরাঞ্চলের শ্রমশিল্পের মালিকগণ আমদানীকৃত পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্যের দাবী করতেন। আবার কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা চাইত বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য। কুপার উত্তরাঞ্চলের শিল্পপতিদের দাবীর কার্যকরী বিরোধিতা করেন। সংগ্রামী কুপারের শক্তি উপেক্ষা করবার শক্তি ছিল না কারও। এমন কি রাজ্যসমূহের অধিকার সম্পর্কিত বিতর্কে ডানিয়েল ওয়েবস্টার সিনেটর রবার্ট হাইনেকে (দক্ষিণ ক্যারোলাইনা) যে স্মরণীয় জবাব দিয়েছিলেন তাতে তিনি কুপার ও তার রাজ্যসমূহের বিশেষ অধিকারবাদীদের দলকে ফেডারেল ইউনিয়নের (কেন্দ্রীয় সরকারের) সংহতি-বিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে উদার মনোভাব পোষণ করবার জন্য শেষ পর্যন্ত কুপার কলেজ অব সাউথ ক্যারোলাইনার অধ্যক্ষপদ হতে অপসারিত হলেন। কয়েক বছর ধরে তাঁর মাথার উপর ঝড়ের মেঘ জমছিল। ব্রাউসাইসের 'ইরিটেশন অ্যাণ্ড ইনস্যানিটি' (Irritation and Insanity) নামক গ্রন্থখানি অনুবাদ-

কালে কুপার তার সঙ্গে জড়বাদ সম্বন্ধে নিজের লেখা দুটি প্রবন্ধ জুড়ে দেন। তারপর দি 'সাউদার্ন রিভিউ' (The Southern Review) নামক পত্রিকাটিতে স্যার হামফ্রী ডেভির এলিমেণ্টস্ অব এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট্রি (Elements of Agricultural Chemistry) নামক গ্রন্থখানির সমালোচনা কালে তিনি পুনরায় দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাঁর জড়বাদী মতবাদ প্রকাশ করেন।

অবশেষে ১৮৩৩ সালে 'অন দি কানেকসন বিটুইন জিওলজি অ্যাণ্ড দি পেণ্টাটিউক' (On the Connection between Geology and the Pentateuch) নামে পুস্তকখানি প্রকাশ ক'রে তিনি যেন এক প্রবল জলোচ্ছ্বাসের দ্বার মুক্ত করে দিলেন। এই প্রলয়োচ্ছ্বাস শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রাস করেছিল। বেকওয়েলের 'জিওলজি' (Geology) নামে গ্রন্থখানির আমেরিকান সংস্করণটি তখন তিনি পাঠ্যপুস্তকরূপে ভূবিদ্যার ছাত্রদের পড়াতেন। তখনকার দিনে ভূবিদ্যার এই একখানি পাঠ্যপুস্তকই প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বেঞ্জামিন সিলিম্যান (বড়) গ্রন্থখানিতে তাঁর ব্যাখ্যাযুক্ত বিস্তৃত পরিশিষ্ট সংযোজিত করে দিয়েছিলেন। সিলিম্যান তাতে লিখেছিলেন, 'বাইবেল বর্ণিত নোআর সমকালীন প্রলয়ঙ্কর মহা প্লাবন সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না…। ভূবিদ্যা বাইবেল বর্ণিত এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পূর্ণ সমর্থন করে…।'

সিলিম্যান ছিলেন তখনকার দিনের আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ইনি প্রথমে আইন ব্যবসায় শুরু করেছিলেন, পরে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কলেজ অব ফিলাডেলফিয়ার মেডিকেল স্কুলে পড়াতেন। এখানে হেয়ার, রাস, প্রিস্টলে ও কুপারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রসায়ন-বিজ্ঞান শিক্ষাদানে তাঁর মনোজ্ঞ বক্তৃতাবলী ও তাঁর চমৎকার বীক্ষণাগারের আকর্ষণে বহু ছাত্র ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত। সিলিম্যান 'আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্স' নামে পত্রিকাখানি প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকাখানি আমেরিকার বিজ্ঞানের রত্নখনিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং বহু দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের শক্তিশালী মুখপত্ররূপে কাজ করে।

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে কি ভাবে? ১৭৮৫ ও ১৭৯৫ সালে এ সম্বন্ধে এডিন-বরার জেমস হাটনের প্রচারিত আধুনিক ভূতাত্ত্বিক মতবাদ কুপার পড়ে-ছিলেন। হাটনের এই মতবাদ যে সত্য তাও তিনি বিশ্বাস করতেন। হাটনের মতে পৃথিবী ছিল এক সময় প্রচণ্ড তাপে গলিত বস্তুপিণ্ড। এই

উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড শীতল হলে তা থেকে গ্রানাইট ও অন্যান্য পাথর সৃষ্টি হয়। তারপর, একের পর এক সুতীব্র আলোড়নে পৃথিবীপৃষ্ঠ আলোড়িত ও উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনি সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে চলে পৃথিবীপৃষ্ঠের ভূমিক্ষয়। এই ভূমিক্ষয়ের ফলেই আবার সৃষ্টি হয়েছে নতুন প্রস্তর স্তর।

একজন খাঁটি মানুষরূপে কুপার সিলিম্যানকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁকে লিখলেন কিভাবে তাঁর 'মতবাদ ভূবিদ্ হিসাবে তাঁর খ্যাতি আমার তরুণ ছাত্রদের নিকট নষ্ট হতে চলেছে, কাজেই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি। আমার মতে বাইবেলের পূর্বভাগ বা অন্তভাগ কোনটি থেকেই অভ্রান্তরূপে মণিকবিদ্যা ও ভূবিদ্যার অভ্রান্ত নির্দেশ মেলে না।' সিলিম্যান কুপারের মতবাদকে শ্রদ্ধা করতেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে এমনি অকপট মতবিনিময়ের দ্বারা কোন বিরাট গোলযোগ কিছু দেখা দিত না। কিন্তু ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, বাইবেলোক্ত বিশ্বসৃষ্টি কাহিনী বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে সত্য কিনা এ সম্বন্ধে যখন তাঁকে প্রশ্ন করতেন, তখন কলহপ্রিয় কুপার এ বিষয়ে তার নিজস্ব মতামতই প্রকাশ করে বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব যে ভ্রান্ত তা জানাতে দ্বিধা করতেন না। ফলে কলেজের অধ্যাপকের পদ হতে তাঁকে অপসারিত করার জন্য রাজ্য বিধান মণ্ডলীর নিকট আবেদনপত্র প্রেরিত হল। কুপার দৃপ্ত তেজে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার প্রতিনিধি সভার সামনে অতি চমৎকার ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মদ্রোহিতার সকল অভিযোগ হতে মুক্ত হলেন। তাঁর কলেজের চাকরি বজায় রইল। কিন্তু তাঁকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার আন্দোলন চলতে থাকল। শেষে ১৮৩৪ সালে কলেজের অধ্যাপকের পদে তিনি ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। তখন এই আন্দোলন থামল।

আমেরিকান বিজ্ঞানের প্রাণবন্ত এই পুরুষ সম্বন্ধে আজ কি কথা বলা চলে? কয়েকটি বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। কুপার ছিলেন বিরল ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। এই প্রতিভা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই দেখা দেয়নি। দেখা দিয়েছিল আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রেও। শিক্ষকরূপে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েও বিজ্ঞান বিষয়ে লেখনী ধারণ করে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা অনেকখানি

প্রসারিত করে গেছেন। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী উক্তি ও কার্যকলাপ দ্বারা শিষ্ট সমাজকে চটিয়ে না দিলে তিনি এক সময় ইয়েল বা হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করতে পারতেন। তাতে আরও বৃহত্তর ও প্রভাবশালী মহলে তাঁর শিক্ষা প্রসারিত হবার সুযোগ পেত। বিভিন্ন বিষয়ে ঔৎসুক্য, সমাজ-সচেতনতা, বহুমুখী প্রতিভা ও আধুনিকতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কলিনেরই সমগোত্রীয়। স্নেহময় পিতা ও স্বামী, চমৎকার সঙ্গী, বিশ্বাসে আন্তরিক, নিজস্ব মতাদর্শ অনুযায়ী ধার্মিক, নিজের শ্রদ্ধাভাজনদের সুখদুঃখে দরদী পুরুষ ছিলেন এই কুপার। না হলে কি ধর্মবিশ্বাসে মূলগত মতভেদ সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ দশ বছর যাজক-বিজ্ঞানী প্রিস্টলের সঙ্গে এক বাড়ীতে কাটাতে পারতেন ?

কুপার ছিলেন একজন উগ্রপন্থী, দুঃসাহসী, একগুঁয়ে, প্রায়শঃ কৌশল-বর্জিত এবং মারমুখো সংস্কারক। এই উগ্রচণ্ডী স্বভাবের সঙ্গে মিশেছিল খামখেয়ালীপনা। এইসব ব্যাপার দেখেই ইংরাজ ভূবিজ্ঞানী জি. ডব্লিউ. ফেদারস্টোনহাউ লিখেছিলেন, 'তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন, সে বাড়ীর কর্তা একজন অসাধারণ পুরুষ, তবে তাঁর মাথার কয়েকটি স্ক্রু অতিরিক্ত ঢিলে।'

কুপার একদা জেফারসনকে লিখেছিলেন 'আমার ধর্মবিশ্বাস ঠিক যে কি, তা আমি নিজেই জানি না।' তবু এই ধর্মমতই তাঁর অনেক ঝঞ্ঝাট্ ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুপারের কবরের উপর যে সাদাসিধা প্রস্তর ফলক স্থাপন করা হয়েছিল তাতে শুধু এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করা হয় :

> **সাউথ ক্যারোলাইনা কলেজের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট টমাস কুপার, এম. ডি., এলএল, ডি, মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর সমসাময়িক নাগরিকদের এক অংশের দ্বারা নির্মিত।**

নাগরিকদের বাকী অংশ তাঁকে চিরতরে ভুলে যেতে চেয়েছিল। ব্যস্ত চঞ্চল বিগত শতাব্দীতে এদেশের মানুষ তাঁর কথা ভুলে গেছে। কিন্তু, আমাদের দেশের সংস্কৃতি অগ্রগতির সাধনে তিনি যে বিরাট অংশ-গ্রহণ করেছিলেন, তার জন্যই তিনি স্মরণীয়।

॥ ৪ ॥

কনস্ট্যাণ্টাইন সামুয়েল রাফিনেস্ক

(১৭৮৩-১৮৪০)

আমেরিকার বিজ্ঞান নতুন সীমান্তপারে এগিয়ে চলে

১৮০১ সালে টমাস জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রূপে কার্যভার গ্রহণের আগে থেকেই আমেরিকাবাসীরা বসবাসের উদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যেতে শুরু করেছিল। ছোট ছোট দু একটি অভিযাত্রীদল ইতিমধ্যেই অ্যালিগেনি ও আপেলেসিয়ান পর্বতমালা অতিক্রম করেছিল। ১৭৯২ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হবার উপযোগী বিরাট জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেনটাকি রাজ্যের। এর চার বছর পর টেনেসি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। ১৮০৩ সালে ওহাও প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করল।

এই নতুন রাজ্যগুলির সীমান্তের বাইরে তখন ছিল আরও এক বিরাট অজ্ঞাত মহাদেশ। মিসিসিপি নদী থেকে রকি পর্বতমালার মধ্যবর্তী সব অঞ্চল ছিল স্পেনের অধিকারভুক্ত। ১৮০০ সালে স্পেন গোপনে এই ভূখণ্ড নেপোলিয়নের হাতে তুলে দেয়। ইউরোপে ব্যয়বহুল যুদ্ধের খরচ জোগাতে, অর্থচিন্তায় তখন প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন নেপোলিয়ন। তাই ১৮০৩ সালে লুসিয়ানা নামে এই ভূখণ্ড তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মূল্যে বেচে দেন।

জেফারসনের ইচ্ছা ছিল যে অ্যাপেলেসিয়ান পর্বতমালা ছাড়িয়ে যে বিরাট অপরিজ্ঞাত ভূমিখণ্ড রয়েছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একদিন তিনি সেখানে অভিযান চালাবেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে কার্যভার গ্রহণ করবার পর এবার তিনি এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় একটি অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরণ করবার

পরিকল্পনা রচনা করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে এরূপ অভিযান এই প্রথম। এই অভিযানের নেতৃত্ব করবার জন্য তিনি ক্যাপ্টেন মেরীওয়েদার লুইস ও লেফটেনাণ্ট উইলিয়াম ক্লার্ক নামে দুজন ভার্জিনিয়াবাসী তরুণকে নির্বাচিত করলেন। লুইস ছিলেন জেফারসনের একান্ত-সচিব। এই অধ্যবসায়ী যুবক নিজের দেশের আঞ্চলিক ও ঋতুকালীন উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের পরিচয় ভালভাবেই জানতেন। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও ভূবিদ্যার মূলসূত্রগুলি কিছু কিছু শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি। ক্লার্কের ছিল পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ও রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা। চমৎকার শিকার করতে ও ফাঁদ পেতে পশুপ্রাণী ধরতেও পারতেন তিনি। সুচারু রূপে, সযত্নে আঁকতে পারতেন পাখি, মাছ ও গাছগাছালির নির্ভুল প্রতিকৃতি।

লুইস ও ক্লার্ক ছিলেন বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি। পেশাগত ভাবে শিক্ষিত বিজ্ঞানী অবশ্য তাঁরা ছিলেন না। অভিযানের নেতৃদ্বয়ের এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে জেফারসন তাঁর আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির বন্ধুদের শরণাপন্ন হলেন। ফিলাডেলফিয়াতে লুইসকে এক বছর ধরে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া হল। বিজ্ঞানী হিসাবে লুইস ও ক্লার্কের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে বহু সপ্তাহ কাটালেন জেফারসন নিজে। আমেরিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে অভিযান চলাকালে এদের সেখানকার ভূসংস্থান সংক্রান্ত বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিদিন গ্রহনক্ষত্রের ও আবহমণ্ডলের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেখানে কোন্ গাছে কখন কোন্ ফুল ফোটে, কোন্ ফুল ও গাছের পাতা কখন ঝরে পড়ে তা লক্ষ্য করে লিখে রাখতে হবে। ওখানকার বিভিন্ন ধরনের পাখি, সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ কখন কখন দেখা দেয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে তাদের। এ ছাড়া এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এখানকার গাছপালা, জীবজন্তু এবং খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। অভিযানকালে যে সব রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে অভিযাত্রীদলের দেখা-সাক্ষাৎ হবে তাদের সঙ্গে ওরা আলাপ-আলোচনা করবেন এবং এ অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা, সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, ধর্ম, রোগ, এবং কৃষি ও অন্যান্য উপজীবিকা সম্বন্ধে তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে আনবেন।

১৬ই মে ১৮০৪ সালে সেণ্ট লুই থেকে জলপথে অভিযাত্রীরা যাত্রা শুরু করল। সাড়ে পাঁচ মাস পর অতি কষ্টে তাঁরা গিয়ে পৌছলেন মিসৌরি নদীর বিরাট বাঁকে। নর্থ ডেকোটার বিসমার্কের নিকট মানদান রেড-ইণ্ডিয়ানদের একটি গ্রামে তাঁদের সঙ্গে দেখা হল বর্ণসঙ্কর তৌসেণ্ট চারবনেউ ও সাকাজাউআ নামে তার ষোল বছরের দাস-স্ত্রীর সঙ্গে। সাকাজাউআ তখন অন্তঃসত্ত্বা। বাপের বাড়ীর দেশে ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছা তার। সে সানন্দে রাজী হল লুইস ও ক্লার্কের অভিযাত্রী বাহিনীর পথপ্রদর্শকের কাজ করতে। রকি পর্বতমালার বিটাররুট পাহাড়ের মাঝের গিরিবর্ত্ম দিয়ে কলাম্বিয়া নদীর উৎসমুখে পৌছবার পথের সন্ধান সে জানত। অভিযাত্রীদের পথকষ্ট আরও বাড়ত যদি না পাহাড়পর্বতে পক্ষীসম স্বচ্ছন্দগতি সাকাজাউআ ও তার সদ্যোজাত শিশুপুত্র পম্প শোশোন রেড ইণ্ডিয়ানদের সাহায্য না পেত। এদের নিকট হতেই শিশুকালে সাকাজাউআ অপহৃত হয়েছিল। পরে প্রকাশ হল, এই শোশোন রেড ইণ্ডিয়ানদের দলপতি হল তার বহুদিনের হারানো ভাই। সে অভিযাত্রী দলের নিকট রসদ বিক্রয় করল। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে পৌছনোর পক্ষে পর্যাপ্ত এই রসদ।

বিরাট বিশাল বৃক্ষরাজিপূর্ণ অরণ্যভূমি ও তুষারাবৃত পবতমালা পার হয়ে অভিযাত্রীদল কলাম্বিয়া নদীর বিশাল জলধারা প্রথম দেখতে পেল। সেণ্ট লুইসে ফেরবার আগে তারা এই জলধারা অনুসরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে নদীর মোহানা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সেণ্ট লুইতে দলটি ফিরে আসে ১৮০৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। লুইস ও ক্লার্ক এবং তার সাতশ জন সঙ্গী দুবছর চার মাস অভিযানে কাটিয়েছিলেন। আঠারো মাস তাদের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবু কিন্তু, দলটি ফিরে আসবার তিনমাস পরও খবরের কাগজে ওদের সম্বন্ধে এক ছত্রও খবর বের হয়নি। এ সম্বন্ধে অধিকাংশ কাগজে প্রথম খবর বের হল তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলীতে একটি বিশেষ বার্তায় জেফারসন লুইস ও ক্লার্ক "সাফল্যের সঙ্গে যে সব কাজ করবেন বলে আশা করা গিয়েছিল" তা করতে সক্ষম হওয়ায় তাদের প্রশংসা করলেন।

লুইস্ ও ক্লার্ক উভয়েই পৃথক পৃথক ভাবে অভিযানের দিনলিপি রেখে-ছিলেন। দলের অন্যান্য অনেক সদস্যও এমনি দিনলিপি লিখেছিলেন। এইগুলি এবং সরকারী মুখপত্রে প্রকাশিত বিবরণী থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়।

লুইসকে সম্ভবতঃ খুন করা হয়েছিল কিংবা তিনি হয়ত আত্মহত্যা করেছিলেন। ১৮১৪ সালে, মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, তাঁর লিখিত অভিযানের বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে প্রভূত বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যতীত বিভিন্ন রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল।

লুইস ও ক্লার্ক যখন অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন, তখন ফিলাডেলফিয়া শহরে এসে বসবাস করছিলেন একুশ বছর বয়সের এক যুবক। ইতালী থেকে দু বছর আগে তিনি এদেশে এসেছিলেন। জীবতত্ত্বে ইতিমধ্যেই তিনি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন। টমাস জেফারসনও তাঁকে চিনতেন। নতুন দেশে তিনি যতটা উন্নতি করতে পেরেছিলেন তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন দেশে ফিরে যাবার কথা। এ সম্বন্ধে তিনি পরে লিখেছিলেন, "কিন্তু যখন আমি শুনতে পেলাম যে লুইস ও ক্লার্কের যে অভিযানের প্রস্তুতি চলছে তাতে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ-রূপে আমাকে নেওয়া হতে পারে তখন আমি আমেরিকা ত্যাগে দ্বিধা করতে লাগলাম।" কিন্তু এই পদের জন্য আবেদন না করে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এত দেরী করে ফেললেন যে আর তাঁকে অভিযানে নেওয়া চলল না। ব্যর্থ মনোরথে তিনি যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করা স্থির করলেন। ১৮০৫ সালে নববর্ষের দিনে জাহাজযোগে যাত্রা শুরু করলেন ইতালীর লেগহর্ন শহরের উদ্দেশ্যে। দশ বছর ছিলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে।

লুইস ও ক্লার্কের অভিযানে যোগদান করতে না পেরে রাফিনেস্ক যখন ১৮০৫ সালে ইউরোপে ফিরে যান তখন তাঁর আর আমেরিকায় ফিরে আসবার ইচ্ছা ছিল না। আমেরিকা থেকে আসবার সময় তিনি সঙ্গে করে আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের পাথর, শামুক, গাছগাছালি ও বীজের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন। এগুলি তিনি ইউরোপের বিভিন্ন কলেজ, বাগিচা ও যাদুঘরে বিক্রি করেন। কিছুকাল তিনি সিসিলিতে উইলিয়াম সোয়ায়েনসন নামে একজন ইংরাজ পক্ষিবিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করলেন। এখানে তিনি সিসিলির পালেরমোস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের সচিবরূপে কাজ করতেন, হুইস্কি তৈরি করতেন, এবং ঔষধ ও ওষধিলতা স্কুইলস (squills) বিক্রি করতেন। বাকী সময়টা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে কাটাতেন। সিসিলিতে যে সব ব্যবসা ফেঁদেছিলেন সেখানে তার কোনটাই চলল না। সিসিলি

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করবার আবেদন তিনি করেছিলেন। সে আবেদনও নামঞ্জুর হল। তখন তিনি আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন।

রাফিনেস্কের আমেরিকা প্রত্যাবর্তন খুব শুভ হয়নি। পালেরমো থেকে রওনা হবার নব্বই দিন পর জাহাজ থেকে লং আইল্যাণ্ডের তটভূমি দেখা গেল। ঠিক সেই সময় ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল সমুদ্রবক্ষ। জাহাজখানা লং আইল্যাণ্ড ও ফিসার আইল্যাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় এসে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেল। জাহাজডুবিতে তিনি তাঁর উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্পর্কে সংগৃহীত সমুদয় বস্তু হারালেন। এর মধ্যে ছিল উদ্ভিদতত্ত্ব ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপকরণে পূর্ণ পঞ্চাশটি বাক্স। দশ বছরের চেষ্টায় ইতালীতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। তা ছাড়া ছিল নানা পশুপক্ষী ও উদ্ভিদের চিত্র এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি কোন ক্রমে নিরাপদে পৌছালেন নিউ ইংল্যাণ্ডের কনেকটিকাটের উপকূলে। দীর্ঘ সন্তরণে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সামান্য একটু শক্তি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলেন নিউ ইয়র্ক শহর অভিমুখে—বন্ধু ডঃ সামুয়েল এল. মিচিলের সঙ্গে দেখা করতে। ইতালীতে থাকতে বহু দিন ধরে তিনি এর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। মিচিলের সুপারিশক্রমে রাফিনেস্ক ক্লারমণ্টে, নিউ ইয়র্কের মিঃ লিভিংস্টোন নামে এক ব্যক্তির তিন কন্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। রাফিনেস্কের বয়স তখন বত্রিশ।

এ কাজ রাফিনেস্কের খুব ভাল লাগল না। কারণ এই মেয়ে তিনটিকে পড়ানোর সময় তাঁর সর্বদাই মনে পড়ত নিজের ছেলেমেয়েদের কথা। ১৮০৯ সালে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ঠিক যে সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে রওনা হন, সে সময় ইনি তাঁকে ত্যাগ করে একজন ইতালীয় কৌতুক-অভিনেতার সঙ্গে পালিয়ে যান। গৃহশিক্ষকের জীবন রাফিনেস্কের দুঃসহ ঠেকতে লাগল। মনে হতে লাগল এই নতুন পরিবেশ যেন তাঁকে বন্দী করে ফেলতে চলেছে। এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বনে জঙ্গলে গাছগাছালি ফলফুলের নমুনা সংগ্রহ করে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর প্রবৃত্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তাঁর মাঝে। নিউইয়র্কে ফিরে এসে তিনি মিচিলের সঙ্গে অজ্ঞাত অরণ্যভূমি অঞ্চলে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহের একটি অভিযানে যোগ দিলেন। অভিযাত্রীদলটি নিউজার্সি রাজ্যের মধ্য

দিয়ে উদ্ভিদাদির নমুনা সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে চলবে বলে স্থির হয়েছিল।

আর একবার বাইরের জীবনের স্বাদ পেয়ে তিনি আবার বনভূমি অঞ্চলে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহের কাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন। ফ্লাটবুস, গ্রেভসএণ্ড, জ্যামাইকা, অয়েস্টার বে-তে তিনি তরুলতার অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও সংগ্রহকার্য চালান। অল্প কিছুকাল ব্রুকলিনে (নিউইয়র্ক) বসবাস করেন। হাডসন নদী উপত্যকা আবিষ্কারের অভিযানে তিনি ঐ অঞ্চল পরিক্রমা করেছিলেন। প্রথমে নদীপথে বাষ্পীয় পোতে যান আলবানি পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে যান নায়েগ্রা জলপ্রপাত, লেক জর্জ, সারাটোগার খনিজ প্রস্রবণে ও টিকেনডারোগায় এক হাতে ছাতা ধরে আর এক হাতে নোট বই নিয়ে যখন ঘরে ফিরলেন তখন পাহাড়প্রমাণ তরুলতা, শামুক, ঝিনুক, জীবাশ্ম ও খনিজ পদার্থের নমুনার ভারে তাঁর পিঠ নুয়ে পড়তে চলেছে।

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক অভিযানে বের হওয়ার মাঝেও রাফিনেস্ক মিচিল, কুপার ও জেমস ই. ডিকেকে নিউ ইয়র্কে লাইসিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি (জীবতত্ত্বের মহাবিদ্যালয়) নামে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবার অবকাশ পেয়েছিলেন। ১৮১৮ সালের মে মাসে পায়ে হেঁটে অ্যালিগেনি পর্বত পার হয়ে তিনি কেনটাকিতে হেনডারসনভিলে গেলেন। সারা পথ তরুলতা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে চললেন। এখানে তিনি একজন চিত্রশিল্পীর সাক্ষাৎ পেলেন। লোকটিকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন রীতিমত। ভদ্রলোক জীবিকা নির্বাহের জন্য ছোট্ট একটি মুদিখানার দোকানে কাজ করতেন। অবসর সময় তাঁর কাটত শিকার করে ও পাখির রেখাচিত্র এঁকে। এই ভদ্রলোকের নাম জন জেমস্ অডুবন। ইনি দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের সেরা পক্ষীচিত্রশিল্পী ও সর্বাধিক পরিচিত পক্ষী-বিজ্ঞানীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে চলেছিলেন।

১৭৮৫ সালে নিউ অরলিন্সের কাছে অডুবনের জন্ম হয়। লুসিয়ানা তখনও ফরাসীদের দখলে। তাঁর মা ছিলেন হাইতিবাসী ক্রিওল (ইউরোপীয় ও আমেরিকার আদিবাসীদের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর), বাপ ছিলেন ফরাসী নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল। সান্টো ডোমিনগোতে দেশীয় অধিবাসীদের অভ্যুত্থানে তাঁর মা মারা যান। অডুবন ও তাঁর বাপ ফ্রান্সে পালিয়ে আসেন। সতেরো বছর বয়সে তরুণ অডুবনকে মিল গ্রোভে পাঠান হল পিতার পেনসিলভানিয়ার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে। এখানে এসে তিনি জীবজন্তু

পাখির ছবি আঁকতে লেগে গেলেন, বিবাহ করে বসলেন লুসি বেকওয়েল নামে এক মহিলাকে। ইনি তাঁর বাড়ীর পাশেই বাস করতেন। ১৮০৮সালে আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি পুনরায় কেনটাকিতে ফিরে গেলেন।

১৮১০ সালের ১৯শে মার্চ অডুবনের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি লুই-ভিলের একটি দোকানে ঢুকলেন। এর নাম আলেকজাণ্ডার উইলসন। ইনি ছিলেন স্কটল্যাণ্ড দেশীয় কৃষক—তাঁত বুনতেন, জিনিস ফেরী করতেন। ছিলেন কবি ও রাজনৈতিক শরণার্থী। উইলিয়াম বার্ট্রামের কথামত ও তাঁর সাহায্যে ও উৎসাহে তিনি ১৭৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন আমেরিকার পক্ষী বিজ্ঞান চর্চা করতে। উইলসন অডুবনকে তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আমেরিকান অরনিথলজির' (মার্কিন পক্ষীবিজ্ঞান) প্রথম তুই খণ্ড দেখালেন ও তাকে এই গ্রন্থমালার গ্রাহক হতে অনুরোধ করলেন। অডুবনও অমনি তাঁকে নিজের জলরঙ ও রঙ্গিন পেনসিলে আঁকা কতকগুলি পাখির ছবি দেখালেন। কদিন তুজনে একত্র পাখি শিকার করলেন। তারপর নিজের গ্রন্থমালার জন্য চাঁদা না নিয়েই উইলসন অডুবনের নিকট থেকে বিদায় নিলেন। তিন বছর পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও রক্তামাশয়ে তিনি মারা যান। তার আগে তিনি আমেরিকার পক্ষীবিজ্ঞানকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে যান। আমেরিকার বিজ্ঞানে এক বিপুল গতিবেগ সঞ্চারিত হয় তাতে। পক্ষীবিজ্ঞানে আরও অনেক বিজ্ঞানী অনেক গবেষণা, অনুসন্ধান ও অনুশীলন করে গেছেন। কিন্তু তা হলেও উইলসনকেই ন্যায়সঙ্গত কারণেই আমেরিকার পক্ষীবিজ্ঞানের জনক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

উইলসনের সঙ্গে অডুবনের ঐতিহাসিক সাক্ষাতের আট বছর পর ভবঘুরের মত চেহারা নিয়ে অডুবনের দোকানে ঢুকে রাফিনেস্ক তাঁর হাতে একখানি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। এই পরিচয়পত্র যিনি দিয়েছিলেন তিনি রাফিনেস্ক ও অডুবন উভয়েরই বন্ধু। চিঠি পড়ে অডুবন বহুক্ষণ সশব্দে অট্টহাস্য করলেন। কারণ এই চিঠিতে পত্রবাহকের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছিল "ইনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির 'মৎস্য', জীবতত্ত্বের প্রকাশিত কোন গ্রন্থেই এর বর্ণনা মিলবে না।" পরে অডুবন লিখেছিলেন, 'পরম বিচিত্র পোশাক পরিহিত' পূর্বদেশ থেকে আগত যে পক্ষীটি তাঁর দোকানে এসে বসেছিল তাকে তিনি সযত্নে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন।

অডুবন রাফিনেস্ককে স্বাগত জানালেন। তুজনে গাছপালা, পাখি ও

নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও গল্পগুজব করলেন। রাতে বাড়ী ফিরতে তাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে অডুবন পরে লিখেছিলেন, রাফিনেস্ক তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকতে না ঢুকতেই 'আমি বিরাট চিৎকার ও গোলমালের শব্দ শুনতে পেলাম সেখান থেকে। সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদের অতিথি মহাশয় উলঙ্গ হয়ে হাতে আমার শখের ক্রেমোনা বেহালাটি নিয়ে সারা ঘরময় ছুটোছুটি করে বাদুড় মারবার চেষ্টা করছেন। বাদুড়গুলি খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে ছিল। বাদুড় মারার চেষ্টায় বেহালাটা থেতলে গুড়িয়ে গেছে। আমি অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি। উনি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটোছুটি করে বাদুড় মারার চেষ্টা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ছুটোছুটিতে বেশ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তখন আমায় কাতর অনুনয় করতে লাগলেন একটি বাদুড় ধরে দেবার জন্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এগুলি এক নতুন জাতের বাদুড়।'

নতুন শ্রেণীর পশুপক্ষীর প্রতি রাফিনেস্কের ছিল প্রবল আকর্ষণ। সর্বদা তিনি নতুন ও অপরিচিত জীবন্ত প্রাণী খুঁজে বেড়াতেন। নতুন শ্রেণীর পশু পাখির নাম ঘোষণা করার প্রায় এক উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। তার জন্য অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে, ভ্রান্ত খবরের ভিত্তিতে, কয়েকটি ক্ষেত্রে পরের মুখে শোনা কথার উপর নির্ভর করে, নতুন আবিষ্কৃত পশুপাখীর নাম ঘোষণা করে বসতেন। এই দুর্বলতার ফলে তাঁকে একাধিকবার প্রতারিত হতে হয়েছে। যেমন, অডুবন একবার রাফিনেস্ককে কতকগুলি মাছের ছবি দেখান। এগুলি তিনি নাকি নদীতে দেখতে পেয়েছিলেন। এই মাছগুলিকে নাকি ও অঞ্চলের ইংরাজ ও ফরাসী অধিবাসীরা পোগোস্টোমা ও পিলোডিকটিস্ বলে থাকে। রাফিনেস্ক খবরটা তাঁর নোট বইতে টুকে নেন, এবং তাঁর অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধের একটিতে এই মৎস্যকুলের পরিচয় প্রকাশ করেন। বহু দিন ধরে মৎস্যবিজ্ঞানের ছাত্ররা পোগোস্টোমা ও পিলোডিকটিস্ জাতীয় মাছের কোনও সন্ধান না পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন। এই মাছ দুটি আসলে অডুবনের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত।

রাফিনেস্ক এই সময় অতিশয় দারিদ্রের মাঝে দিন কাটাচ্ছিলেন। দুর্বার চেষ্টা করছিলেন কোনও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষকের কাজ পাবার, যাতে মোটামুটি একটা আয়ের পথ হয়। দারিদ্রের কবল-মুক্ত হয়ে তিনি বৃক্ষলতা অন্বেষণ, অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও জীবতত্ত্বের অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ কার্য চালাতে

পারেন। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিযুক্ত করার জন্য ইতিপূর্বেই তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেছিলেন। কলেজের ট্রাষ্টিরা (অছি) তাঁকে জানালেন যেহেতু তাঁর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই এবং তিনি অদ্ভুত স্বভাবের লোক, অতএব ঐ পদে তাঁকে নিযুক্ত করা চলে না।

শখের বিজ্ঞানী ছিলেন জন ডি. ক্লিফোর্ড। কেনটাকির লেক্‌সিংটনে তাঁর জীবাশ্ম ও প্রাচীন শিল্প সভ্যতার নিদর্শক বস্তুর সংগ্রহশালা ছিল। ট্রান্সিলভানিয়া কলেজের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন তিনি। কেনটাকি রাজ্য ১৭৮০ সালে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করে। জন ডি. ক্লিফোর্ডকে একজন উপকারী ও প্রভাবশীল বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন র‍্যাফিনেস্ক। তাঁর প্রভাববলে ১৮১৯ সালে এই কলেজে র‍্যাফিনেস্ক উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব ও আধুনিক ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। সেই বছরের শরৎ কাল থেকে তিনি কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করে দেন। সাত বছর ছিলেন তিনি এই কলেজে।

কলেজের অধ্যাপক জীবনের এই দিনগুলি র‍্যাফিনেস্কের পক্ষে খুবই ফলবান হয়েছিল। কলেজের সঙ্গে এই তাঁর একমাত্র সম্পর্ক। কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হবার কিছুকাল পরেই তিনি লেকসিংটন থেকে নিজের খরচে ইকথিয়লজিয়া ওহায়িয়েনসিজ (Ichthyologia Ohiensis) নামে নব্বই পৃষ্ঠার একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় ওহাও এবং তার উপনদীসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের বিশ্লেষণাত্মক বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এর অনেকগুলি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন। জীবতত্ত্বে এই অবদানের জন্য জার্মানীর বনের একটি বিজ্ঞান পরিষদ র‍্যাফিনেস্ককে একটি সম্মানার্থক প্রশংসাপত্র দেন।

র‍্যাফিনেস্কের সমসাময়িক কালে সুসম্বদ্ধভাবে নতুন নতুন শ্রেণীর তরুলতা ও পশুপক্ষী অন্বেষণ সংগ্রহ ও নামকরণ চলছিল। যে সব নদীপথে ভ্রমণ করে তার রহস্য সন্ধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সেই সব নদীর তীরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ যে এই সব নদীর বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের অনেক খবর দিতে পারবে, তা বুঝতে পেরে তিনি সাময়িকপত্র ও তাঁর রচিত পুস্তকাদির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যকুলের বিবরণী জানানোর জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করলেন। আমেরিকায় পক্ষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে উইলসন যা

করতে পেরেছিলেন, আমেরিকার মেরুদণ্ডী প্রাণী সম্বন্ধে অন্যান্যরা যে গবেষণা-মূলক কাজ করার চেষ্টা করছিলেন, আমেরিকার মৎস্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুরূপ কাজ তিনি করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন।

কলেজে ছাত্র পড়ানো ছাড়াও অন্য কাজ নিয়ে রাফিনেস্ক খুব ব্যস্ত থাকতেন। ওহাও নদীর মাছের বিবরণী বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পরের বছর তিনি একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানের দল নিয়ে মিয়ামি নদীর মোহনা পর্যন্ত যান। ট্রান্সিলভানিয়া কলেজ তাঁকে এম. এ. ডিগ্রীতে ভূষিত করে সম্মানিত করেন। সেই বছরই রাফিনেস্ক কেনটাকি ইনষ্টিটিউসনের সম্পাদকের পদ লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানটি কেনটাকিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিজ্ঞান পরিষদ। রাজ্য বিধানমণ্ডলীকে দিয়ে আইন পাস করিয়ে একটি সরকারী বটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই চেষ্টা বিফল হলে একটি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি খুলে তিনি এমনি একটি তরুপ্রদর্শন বাটিকা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

ট্রন্সিলভানিয়া কলেজে তিনি পড়াতে লাগলেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রগতির সকল পর্যায়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর। সচেতন ছিলেন এ বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন পরিস্থিতির প্রতি, ভালভাবে খবর রাখতেন সহযোগী আমেরিকান প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের গবেষণামুলক সব কাজে, ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী ; মাঝে মাঝে পরিচয় দিতেন অতি খর স্বভাবের। সব মিলে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ অধ্যাপক। তাঁর একজন ছাত্র শিক্ষক হিসাবে রাফিনেস্কের এই চমৎকার বর্ণনা দিয়ে গেছেন : "পিপীলিকা সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা ছিল বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। বহু ছাত্র এই বক্তৃতা শুনে প্রাণ ভরে হাসত। বিশেষ করে যখন তিনি শোনাতেন যে পিপীলিকাদের মধ্যেও রয়েছে উকিল, ডাক্তার, সেনাপতি, সৈনিক, ওদের মধ্যেও বড় বড় লড়াই হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে ডাক্তার, সেবার জন্য রয়েছে নার্স।"

ছাত্রগণ এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপকটির অধ্যাপনা উপভোগ করলেও কিন্তু তাঁকে নিয়ে কলেজের ট্রাষ্টিগণ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের বন্ধুমহলে তিনি ছিলেন আনন্দদায়ক সঙ্গী। তার বাইরে হটকারী, অসম্বদ্ধ, একগুঁয়ে, এমনকি অন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্যায়ভাবে ঈর্ষাপরায়ণরূপে তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লিনেয়াস কুন নামে কলেজ অব

ফিলাডেলফিয়ার জনৈক অধ্যাপকের নামে একটি ফুলের নামকরণ করলে রাফিনেস্ক প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে কুন একজন অতি নিচুস্তরের বিজ্ঞানী। গাছগাছালির শ্রেণী বিভাগকরণে তিনি লিনেয়াসের কৃত্রিম পদ্ধতির যৌক্তিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। যে সব আমেরিকান বিজ্ঞানীরা তরুলতার নামকরণ পদ্ধতিতে তাঁর (রাফিনেস্কের) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। তাঁর সব চেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল, সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বনের অক্ষমতা। এই দোষই শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে চরম দুর্দশা ডেকে আনল। ১৮২৬ সালে কলেজের প্রেসিডেণ্ট, বস্টনের ডঃ হোরেস হোলি, তাঁকে কলেজের অধ্যাপক পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করলেন।

রাফিনেস্কের বয়স তখন তেতাল্লিশ। আবার তিনি দারিদ্রের সম্মুখীন হলেন। নিজের বইপত্র ও বৈজ্ঞানিক সংগ্রহগুলি ফিলাডেলফিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তরুলতা পরীক্ষা ও সংগ্রহের আরও অভিযান চালাতে পায়ে হেঁটে দেশে চললেন। লেক এরির প্রান্ত ঘেঁষে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। দু দিন কাটিয়েছিলেন নাএগ্রা জলপ্রপাতের কাছে। এই বিশাল জলপ্রপাত তাকে বিস্মিত করেছিল। সে অঞ্চলের ভূতত্ত্ব পরীক্ষা করে, প্রপাত সৃষ্টির মানচিত্র ও রেখাচিত্র এঁকে তিনি আমেরিকার সীমান্ত অতিক্রম করে কানাডায় প্রবেশ করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে কয়েকদিন তাঁর বন্ধু ডঃ আমোজ ইটনের সঙ্গে কাটানোর জন্য তিনি ট্রয় শহরে যাত্রাভঙ্গ করলেন। বন্ধুটি সে শহরের একটি স্কুলে মাস্টারি করতেন। তরুণদের কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ১৮২৪ সালে এ স্কুলটি স্থাপিত হয়। পরে এটি রেনসেলার পলিটেকনিক স্কুল নামে খ্যাত হয়। এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। ফিলাডেলফিয়াতেই রাফিনেস্ক জীবনের শেষভাগ কাটান। ফিলাডেলফিয়াতে ফেরার আগে তিনি জন টোরি নামে আর একজন বন্ধুকে দেখতে যান। ইনি তখন ওয়েস্ট পয়েণ্টে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সামরিক একাডেমির রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করতেন।

ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট অব ফিলাডেলফিয়ার ছোট একটি ক্লাসে কিছুকালের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার অনুমতি পেয়েছিলেন রাফিনেস্ক। ঐ ইনস্টিটিউশনের

হাইস্কুল বিভাগে তিনি অল্প কিছুকালের জন্য ভূগোল ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষকের কাজ জুটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কাজে তাঁর হাতে কিছু টাকা জমেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাঁকে বেকার জীবনের অর্থ সংকটের মধ্যে পড়তে হল। অতিশয় দারিদ্র্যের মাঝে কালাতিপাত করেও তিনি কলের লাঙল, অদাহ্য গৃহ, জলের উপর রেলপথ নির্মাণ ও অনুরূপ আবিষ্কারের পরিকল্পনা ফাঁদতে থাকেন এবং গাছগাছড়ার রস মিশ্রিত করে ক্ষয় রোগের একটি "ঔষধ" প্রস্তুতের চেষ্টা করেছিলেন।

এই সব কাজের মধ্যে অবশ্য তিনি কখনও তাঁর তরুলতা অন্বেষণ পরীক্ষা ও সংগ্রহের কাজ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবহেলা করেননি। ১৮৩০ সালে তিনি কুভিয়ের ও অন্যান্য ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের নিকট ধারাবাহিক ভাবে বহু চিঠি লেখেন এবং এসিয়াবাসী নিগ্রোদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রেরণ করেন। এই প্রবন্ধের জন্য (১৮৩২ সালে) প্যারিসের জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁকে স্বর্ণ পদকে ভূষিত করেন। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হন। এই বছরই কুভিয়ের তাঁকে তার জন্য আমেরিকার বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যের নমুনা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। এতে রাফিনেস্ক যেন অর্থকষ্ট হতে মুক্তি পাবার পথ দেখতে পেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর কিছুকাল পরই কুভিয়ের মারা যান। পরিকল্পনাটিও বানচাল হল। কোন টাকা পেলেন না রাফিনেস্ক।

এরপর তিনি অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। যে সময় জ্যাকসন ও পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা সেকেণ্ড ইউনাইডেট স্টেটস্ ব্যাঙ্কের উপর তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, সে সময় তিনি সেফ ব্যাঙ্কিং ইনক্লুডিং দি প্রিন্সিপলস্ অব ওয়েলথ (Safe Banking, Including the Principles of Wealth) এই নামে তাঁর নিজের ব্যাঙ্কিং পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। লোন কোম্পানী-গুলির বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এগুলিকে বলতেন অত্যধিক সুদ গ্রহণকারী বন্ধকী কারবারীদের তেজারতি ব্যবসা। এরা খাতকদের নিকট হতে বছরে শতকরা ছত্রিশ টাকা হারে সুদ আদায় করত। যে সব ব্যাঙ্ক কোম্পানির শেয়ার নিয়ে ফাটকাবাজি খেলত তিনি সেগুলিরও নিন্দা করতেন। ১৮৩৫ সালে তিনি জনসাধারণকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি সেভিং ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করতে আবেদন জানালেন। তিনি আশ্বাস দিলেন

এই ব্যাঙ্ক উপযুক্ত লভ্যাংশ বিতরণ করবে। এবং এখান থেকে লোকে শতকরা ছয় টাকা সুদে টাকা ধার পাবে। পঞ্চাশজন অংশীদারের নিকট দশ ডলার মূল্যের পাঁচ হাজার শেয়ার বিক্রয় করা হল এবং ১৮৩৫ সালে রাফিনেস্ককে অ্যাকচুয়ারি নিযুক্ত করে এই ব্যাঙ্ক সংগঠিত হল। রাফিনেস্ক জানিয়েছিলেন যে প্রথম বছর কারবার চালানোর পর ব্যাঙ্ক অংশীদারদের শতকরা নয় টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়েছিল, তাঁর পরিকল্পনাটি অন্য ব্যাঙ্কওয়ালাদের কাছে এমনি উত্তম ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত হয়েছিল যে তারাও অংশতঃ এটি গ্রহণ করে, প্রতিযোগিতা রোধ করতে তাঁকে ব্যবসা থেকে হটিয়ে দিলেন।

আবার তরুলতা ও পশুপ্রাণীর নমুনা সংগ্রহের কাজ চালানোর টাকার টানাটানি দেখা দিল তাঁর। কলেজগুলি তাকে কাজে নিতে চায় না। সাধারণের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে কেউ ডাকে না। কোনও বিত্তবান ব্যক্তি তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন না। বন্ধু টোরি চেষ্টা করেছিলেন রাফিনেস্ককে তাঁর বেতনভোগী সহকারীরূপে নিয়োগ করার। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। কিছুকালের জন্য রাফিনেস্ক আশা করেছিলেন যে ম্যাসেচুসেটস্, মেরিল্যাণ্ড ও টেনেসি রাজ্য যে ভূতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক অভিযান শুরু করেছে, তাতে নতুন ভাবে কাজ করবার সুযোগ পাবেন আবার। তিনি লিখেছিলেন, "রাজ্যগুলি এই যে ভূতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক জরীপের কাজ হাতে নিয়েছে তাতে তাঁর বিদ্যাবত্তা কাজে লাগবার বিরাট ক্ষেত্র এখন উন্মুক্ত হচ্ছে।" কিন্তু এখান থেকেও যখন ডাক এল না, তখন তিনি অর্থসমস্যা দূর করার আশায় সাহিত্য চর্চায় ও গ্রন্থ প্রকাশে মন দিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রাফিনেস্ক মোট প্রায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, বৈজ্ঞানিক প্রকরণ রচনা ও প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা-বিশিষ্ট মন জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করত। সব ক্ষেত্রেই খুব গভীরে প্রবেশ করতে না পারলেও একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পর্যাপ্ত ও স্থায়ী অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখন প্রকৃতি বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থা। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা স্বচ্ছন্দে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারতেন। তাতে অন্য বিজ্ঞানীর বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশেরও ভয় ছিল না। তখনকার দিনে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে একাধিক

ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব ছিল। তখনও বিজ্ঞান বর্তমান কালের মত এমনি বিশেষ বিশেষ শাখায় বিভক্ত হওয়ার অবস্থায় এসে পৌছায়নি, যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, এক রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বারোটির অধিক বিশেষ শাখা রয়েছে। যার এক একটি শাখার চর্চায় এক একজন গবেষক সারা জীবন কাটাতে পারেন।

দীর্ঘকাল পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যানসারে ভুগে রাফিনেস্ক ফিলাডেলফিয়ার রেস স্ট্রীটের একটা বাড়ীর ছোট্ট নির্জন চিলে-কোঠায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাড়ীওয়ালা তাঁর কাছে কয়েক মাসের ভাড়া পেত। সে শাসিয়ে ছিল রাফিনেস্কের মৃতদেহ সে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য মেডিকেল ছাত্রদের নিকট বিক্রয় করে বকেয়া ভাড়া উশুল করবে। রাফিনেস্কের কয়েকজন বন্ধু গভীর রাতে দড়িতে বেঁধে তাঁর শবদেহ চুপি চুপি নিচে নামিয়ে নিয়ে আসেন। এই ভাবে তাঁর শবদেহ অতি দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানায় সমাধিস্থ হবার বা মেডিকেল ছাত্রদের নিকট বিক্রীত হবার হাত হতে রক্ষা পায়।

যে তিনজন ব্যক্তির উপর রাফিনেস্কের উইল কার্যকরী করবার ভার পড়েছিল জন টোরি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৮৩৫ সালে রাফিনেস্ক তাঁর এই উইল করে যান। এই উইল পাঠ করে দেখা গেল, তিনি তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নমুনারাজি বিক্রি করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁর কন্যা, ভগ্নী এবং বালিকাদের জন্য একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনে সমান ভাবে বণ্টিত হবে। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর এই সংগৃহীত নমুনারাজির বিক্রয়লব্ধ অর্থে এমনি একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাঁর এই সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় আট গাড়ি। এগুলি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে রঙ্গীন পোস্টার ছাপা হল। প্যারিসের ভৌগোলিক সমিতির প্রদত্ত পদকটি বিক্রয় করে পাওয়া গিয়েছিল ১৬.৫৫ ডলার। কয়েকটি নোট বই ও পাণ্ডুলিপি নীলামে বিক্রয় করে পাওয়া গিয়েছিল ৫ ডলার। অন্যান্য কাগজপত্র ও সংগ্রহ বস্তুগুলি অগ্নি চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর তরুলতার সংগ্রহের খানিকটা অংশ ইউনিভারসিটি অব পেনসিলভানিয়া, নিউ ইয়র্ক বটানিক গার্ডেনস্ ও ফিলাডেলফিয়ার একাডেমী অব ন্যাচারল সায়েন্সেস-এ স্থান পেয়েছিল।

রাফিনেস্কের মৃত্যুর পর একশ বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। বিজ্ঞানীরা তাঁর খামখেয়ালীপনা, কৌশলহীনতা, অসংযত আত্মশ্লাঘা ও মানবিক দুর্বলতা

ভুলে যাবার অবকাশ পেয়েছেন এর মাঝে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে এখন তাঁদের মতামত কি? তরুলতার নমুনা সংগ্রাহক, বৃহৎ হার্বারিয়াম (লতাপাতার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ) সৃষ্টিকারী, বিভিন্ন উদ্ভিদের পার্থক্য অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণকারী, জীবন্ত প্রাণীসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্বদ্ধ প্রণালীবদ্ধকারী—এসবের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সমসাময়িক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের অনেকেই হয়ত এসব বিষয়ে ছিলেন তাঁর সমকক্ষ। কিন্তু রাফিনেস্ক ছিলেন একজন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত থেকে মূল সত্যোপলব্ধির ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন এদের চেয়ে অনেক বড। চল্লিশ বছর ধরে হাজার হাজার তরুলতা ও পশুপক্ষী পরীক্ষা করে তিনি তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মাঝে এক বিরাট রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই রহস্য অধিকতর আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং ভাবাবেগের দিক দিয়ে আরও বেশী স্থৈর্যশীল মানুষ ইংল্যাণ্ডের চার্লস ডারউইনের নিকট বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান অভিব্যক্তিবাদ রূপে ধরা পড়েছিল।

মারা যাবার সাত বছর আগে রাফিনেস্কের বয়স যখন প্রায় ৫, তখন তিনি তাঁর হার্বারিয়াম রাফিনেস্কুয়ানাম (Herbarium [illegible] ianum) নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন যে নতুন বর্গীয় প্রাণী, প্রজাতির কোন[illegible]ী নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তাঁর মতে, 'আসল সত্য হল, দীর্ঘ কাল ধরে প্রাণীদেহের আকৃতি-অবয়ব ও দেহাংশের ক্রমিক রূপান্তর ঘটে প্রজাতি (species) এবং সম্ভবতঃ নতুন বর্গের (genera) প্রাণীর উদ্ভব হয়। সুদূর অতীতে তরুলতা ও পশু-প্রাণীর মাঝে ধীরে ধীরে রূপান্তর ও বংশগতি পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায়। তবে এ পরিবর্তন নিয়মিত বা সুনির্দিষ্ট নয়। প্রতি প্রাণীতে নিরবচ্ছিন্ন বংশগতি পরিবর্তনের এক বিরাট বিশ্বজনীন নিয়মের এক অংশ এই ক্রমিক পরিবর্তন। প্রতি প্রকারের প্রাণীই মূল প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের বিচ্যুতি থেকে উদ্ভূত। এ বিচ্যুতি সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করলেই নতুন প্রজাতি দেখা দেয়··· যে সব আদিম প্রজাতি থেকে বর্তমান কালের প্রাণী ও তরুলতাশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এগুলি নির্ধারণের অনেক পন্থা অবশ্য আছে। যেমন, এই প্রজাতিগুলির ইতিহাস, প্রাপ্তিস্থান ও প্রাচুর্য ইত্যাদি। এই সব নিদর্শন থেকে এই মূল প্রজাতিগুলির সন্ধান মিলতে পারে। মানুষ, বাঁদর, কুকুর, গোলাপ, আপেল, গম···এবং অন্য

প্রায় সর্বপ্রকার গণের (genus) জাতি, বংশ ও প্রকার-ভেদ একটি বা স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি আদিম প্রজাতি থেকে দেখা দিয়েছে। তবু এখানে কয়েকটি প্রজাতির নামের কথা স্বীকার করা যেতে পারে। এরা ইতিহাস ও ভূগোলের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, সময় ও পরিবর্তনের ফলে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু এক ধরনের বংশানুক্রমিক ধারা ও সারণীর সাহায্যে এদের উন্নততর শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে ফেলা যায়।...'

রাফিনেস্কের মত কোনও আমেরিকান বিজ্ঞানীর নিকট এত আগে অভিব্যক্তির পরম সত্যটি ধরা পড়েনি, এই সত্যগ্রহণের জন্য এত আগে কাউকে সংগ্রাম করতে হয়নি। যথার্থ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে প্রকৃত পক্ষে রাফিনেস্কই ছিলেন চার্লস ডারউইনের পূর্বসূরী। অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যদি তাঁকে সর্বদা বিব্রত না হতে হত তা হলে হয়ত তিনি ডারউইনের মতই অনন্যনিষ্ঠ হয়ে বিজ্ঞান সাধনা কবে যেতে পারতেন।

জী[illegible]র শেষ ভাগে রাফিনেস্ক বলেছিলেন যে 'মহাকাল সক[illegible]র প্রতিই সুবিচার [illegible]রে।' তাঁর এই কথাগুলি সত্য হতে চলেছে। কারণ যতই দিন যাচ্ছে, বিজ্ঞ[illegible] হিসাবে তাঁর মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ষাট বছর আগে আমেরিকার [illegible] [illegible]তিহাসকার জি. বি. বুডে তাঁর (রাফিনেস্কের) মানসিক উৎকেন্দ্র[illegible] দেখতে পেয়েছিলেন 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার বাধাবন্ধহীন উৎসাহের প্র[illegible]ক্রিয়া।' চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীবিদ ডেভিড স্টার জর্ডন তাকে 'আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে অসাধারণ ব্যক্তি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অতি সম্প্রতিকালে প্রতিভাবান বিজ্ঞান লেখক ডোনাল্ড কুলরস পিটি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন 'যে সব প্রকৃতি-বিজ্ঞানী আমেরিকা মহাদেশে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সেবা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই স্পষ্টতঃ বলা চলে অতি বিরাট পুরুষ।'

উনিশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশে যে সময় রাফিনেস্ক বিজ্ঞান সেবায় নিযুক্ত সে সময় ইউরোপের বিজ্ঞান জগতে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটছিল। ইংল্যাণ্ডে মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুতে বিস্ময়কর তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করছিলেন। জার্মানীতে উলের (Wohler) প্রথম রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম জৈব পদার্থ (ইউরিয়া) তৈরি করছিলেন, ফ্রান্সে জোসেফ লাপ্লাস তাঁর 'মেসিনিক সিলেস্ট'র (Me´chanique Ce´leste) সাহায্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সমৃদ্ধ করে তুলছিলেন।

আমেরিকাতেও বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। জোসেফ হেনরি বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সামুয়েল গুথরি প্রথম ক্লোরোফর্ম তৈরি করছিলেন, জন আর. ইয়ং ও উইলিয়াম বীমণ্ট পরিপাক ক্রিয়াকালীন রাসায়নিক ক্রিয়া পরীক্ষা করছিলেন। রবার্ট ফুলটন প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্মাণ করছিলেন ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে ব্যাপৃত ছিলেন অন্যান্য আবিষ্কারকেরা। নতুন নতুন বিজ্ঞান সমিতি গড়ে উঠছিল। নতুন নতুন তরুপ্রদর্শ বাটিকা, জীবতত্ত্বের সংগ্রহশালা স্থাপিত হচ্ছিল। নতুন কলেজের সংখ্যা বাড়ছিল। তাতে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছিল। বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা-সভার অনুষ্ঠান হত নিয়মিত। অঙ্গরাজ্যগুলি নিজ নিজ তত্ত্বাবধানে ভূতাত্ত্বিক জরীপের কাজ হাতে নিয়েছিল। অজ্ঞাত পশ্চিমাঞ্চলের রহস্যোদ্ঘাটনে কেন্দ্রীয় সরকার বহু অভিযান প্রেরণ করেছিলেন—এইসব নানা কারণে ক্রমেই অধিক পরিমাণে সাধারণের নিকট বিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ত্ব প্রচারিত হতে থাকে।

বিজ্ঞান বিষয়ে এই ঔৎসুক্য বৃদ্ধি দেখে অনেকে বিস্ময় বোধ করেছেন। অধ্যাপক চার্লস বিয়ার্ড এর একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞান একই সময়ে উদ্ভূত হয়ে পুষ্ট হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে গভীর কোনও কারণ ছিল কিনা গবেষণার দ্বারা তা এখনও ধরা পড়েনি। কিন্তু নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে।' এর কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও টেস্ট টিউবধারী বিজ্ঞানীদের অলস কৌতুহল চরিতার্থ করার কাজে সময়ের অপব্যয়ের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। গণতন্ত্রের দাবী হল, বিজ্ঞানীরা সমাজ-জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসবেন উন্মুক্ত রাজপথে, বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা সমাজকে সমৃদ্ধ করতে। তাঁরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবেন, সমাজের সঙ্কট ত্রাণ করবেন, সমাজের সেবা করবেন। অপর দিকে বিজ্ঞানও গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ প্রদর্শন করতে সাহায্য করেছে। গবেষণার ব্যাপারে আমেরিকায় কোন কিছুই—তা যত তুচ্ছ ও সামান্য হোক না কেন—উপেক্ষিত হয়নি, এই ব্যাপারটাই ছিল এখানে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। আমেরিকার অন্তহীন বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের পথে পবিত্র বলে কোনও বস্তু অব্যাহতি পায়নি। এর সামনে

ব্যক্তির বিশেষ অধিকার বা সুবিধা বলে কোনও কিছু স্থান পায়নি…। পরিশেষে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বিশ্ব জগৎ সম্বন্ধে বৈপ্লবিক ধারণা, সচেতন করেছে এই বিরাট সৃষ্টির মাঝে তার যথাযোগ্য স্থান সম্বন্ধে, ইন্ধন জুগিয়েছে সেই চিন্তাধারার যাতে গির্জা ও রাষ্ট্রের প্রাচীন কুসংস্কারের ধার ভোতা হয়ে ক্রমে ক্রমে যায় মিলিয়ে।'

॥ ৫ ॥

টমাস সে

(১৭৮৭-১৮৩৪)

শিল্প-বিপ্লবের দুর্বার গতির মুখে বিজ্ঞান

ওহাও নদীর ধারে একদল আদর্শবাদী লোক একদা যে পথে চলেছিল আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হয়ত আর কিছু ছিল না। যন্ত্রযুগ এদের সামনে কঠোর শ্রম আর দাসত্বের এক পরম বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেছিল। এরা আশা করছিলেন, এখানে এই ওয়াবাস নদীর তীরে তাঁরা যন্ত্রযুগের এই দুঃস্বপ্ন-মুক্ত এক আদর্শ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবেন। যে যন্ত্রযুগের প্রতি তাঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তার জন্ম দিয়েছিল শিল্প-বিপ্লব। আমেরিকার পূর্বাঞ্চল ইতিমধ্যেই এই শিল্প-সভ্যতার লৌহনিগড়ে বাঁধা পড়তে আরম্ভ করেছিল। এই আদর্শবাদী দলে ছিলেন বহু বিচিত্র সব মানুষ। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার কয়েকজন সেরা বিজ্ঞানীও। রবার্ট ওয়েন-সৃষ্ট আদর্শবাদী ভাবোন্মাদনার তরঙ্গে তাঁরা বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন ইণ্ডিয়ানার নিউ হার্মনী নামক স্থানের নব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের জীবতত্ত্বের পরীক্ষা ও গবেষণা অবাধে চালিয়ে যেতে পারবেন। এঁরা এই মত পোষণ করতেন যে শিল্পায়নের ফলে সমাজে ধনবৈষম্য, কুৎসিত দারিদ্র ও ক্লেশ ভোগ দেখা দেয়। তাই এঁরা চাইছিলেন, নতুন এক আদর্শ সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেবেন যে শিল্পায়নের সাহায্য না নিয়েও মানুষের পক্ষে সাদাসিধাভাবে ও সামাজিক উপযোগিতাসহ বাস করা সম্ভব।

এঁদের নেতা ছিলেন রবার্ট ওয়েন। জন কে, জেমস্ হারগ্রেভস্, রিচার্ড আর্করাইট, সামুয়েল ক্রম্পটন, এডমাণ্ড কার্টরাইট কলের মাকু, সুতো কাটার যন্ত্র, ওয়াটার ফ্রেম, ক্রম্পটন মিউল, এবং লোহা ও কাঠে তৈরি স্বয়ংক্রিয়

সুতোকাটা ও কাপড় বোনা যন্ত্র আবিষ্কার করার পর ইংলণ্ডে যে নতুন শিল্পপতির দল দেখা দিয়েছিল, রবার্ট ওয়েল তাঁদের অন্যতম। আর একজন ইংরাজ, জেমস ওয়াট বাষ্পীয় এঞ্জিন নির্মাণ করে কার্যোপযোগী করে তুলেছিলেন। এই বাষ্পীয় এঞ্জিন দিয়ে কলের তাঁত চালান যেত। শ্রমিকেরা যন্ত্রবিপ্লবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। কোনও ফল হল না তাতে। তাঁতশিল্পের যুগ শেষ হয়েছিল, এসেছিল যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের যুগ। স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা (এদের অনেকে স্কটল্যাণ্ডের অনাথ আশ্রমগুলি হতে সংগৃহীত) যারা কৃষিক্ষেত্র ও কুটির শিল্পে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাটতে অভ্যস্ত ছিল, তারা এখন এই সব কারখানায় দিনে তেরো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতে লাগল। মজুরী মিলত এদের খুবই কম, কাজের সময় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হত না। একটি কারখানায় মোট ২০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৫০০ শ্রমিকই ছিল পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশু !

আলেকজাণ্ডার উইলসন এই নারকীয় ব্যাপার লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৭৯২ সালে ছদ্মনামে Watty and Meg এই শিরোনামায় একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতা লিখবার ফলে উইলসন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, প্রকাশ্যে তাঁর রচনার বহ্ন্যুৎসব হল। যাদের লক্ষ্য করে তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন, তাদের নিকট সর্বসমক্ষে দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করার পরই তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তির পর তিনি আমেরিকায় পালিয়ে আসেন। এই উইলসনই পরে আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য পক্ষীবিজ্ঞানী-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

নিজের চেষ্টায় অতি হীনাবস্থা থেকে প্রভূত বিত্তশালী হয়েছিলেন রবার্ট ওয়েন। ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টারে উন্নত ধরনের সুতাকাটার কল তৈরি করে অতি অল্প বয়সে অগাধ ধনসম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর কারখানাগুলি ছিল পৃথিবীর সেরা। মানবিক শ্রমনীতির দিক দিয়ে তখনকার দিনের চেয়ে যেন একশ বছর এগিয়ে। তাঁরই উদ্যোগে ১৮১৯ সালে প্রথম ব্রিটিশ কারখানা আইন পাস হয়। এই আইন শিশু-শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের সনদ স্বরূপ। এই আইনের বলে নয় বৎসরের কম-বয়স্ক শিশুদের কারখানা কাজে নিয়োগ করা বন্ধ হল। দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজের সময় নির্দিষ্ট হল বারো ঘণ্টা।

লোকহিতৈষী ও শ্রমিকদরদী আদর্শবাদী শিল্পপতিরূপে ওয়েনের খ্যাতি

বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। লোকহিতৈষণায় ব্যাপৃত থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে, মানুষ যদি সমস্বার্থমূলক কোন গোষ্ঠীতে একত্র বসবাস করে কাজ করে তা হলে তারা বর্তমানের চেয়ে আরও বেশী সুখী হতে পারবে। এ থেকে তাঁর কাল্পনিক ও অবাস্তব ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র-বাদে বিশ্বাস জন্মেছিল। ভাবতে লাগলেন বিরাট আকারে তাঁর ভাববাদী কল্পনা অনুযায়ী এমনি আদর্শ সমাজ গঠন করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবেন। এই পরিকল্পনা সফল করে তুলতে চাই বিশাল অনাবাদী উর্বর ভূমি, প্রকৃতি দেবী যেখানে দরাজ হাতে তাঁর সকল ঐশ্বর্য বিতরণ করবেন।

হারমনি গ্রামে জর্জ র‍্যাপের নেতৃত্বে একদল ধর্ম-সংস্কারক বসতি স্থাপন করেছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবার আশায় এরা জার্মানী থেকে আমেরিকায় এসেছিল। র‍্যাপপন্থী ৬০০ জন শিল্প ও কৃষিজীবী জার্মানদের এই উপনিবেশটি কিছুকালের জন্য বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই প্রতিবেশীরা তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, ওদের বস্ত্র ব্যবসায়েও মন্দা দেখা দেয়। তারা এই উপনিবেশ ত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করা স্থির করে। ১৮২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রবার্ট ওয়েন ১,৮০,০০০ ডলার ব্যয়ে ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের এই উপনিবেশটি ও তার সমুদয় উপকরণ কিনে নেন।

পরের বছর আমেরিকাবাসীদের নিকট তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে এবং সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করে তুলবার জন্য কর্মী সংগ্রহ করতে ওয়েন সারা যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিয়ে ফিরলেন। তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। যন্ত্রশিল্প ইংল্যাণ্ডে যে কুৎসিত পরিবেশ ও অভিশাপ বয়ে এনেছিল, অনুরূপ অবস্থা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা দিয়েছিল। এখানেও কারখানা শ্রমিকদের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের চেয়ে কোনক্রমে ভাল ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে শিশু ও বয়স্থা বালিকাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। মজুরীর হার ছিল কম। খাটুনির মাত্রা ছিল বেশী।

প্রথম দিকে যন্ত্রশিল্প শ্রমিকদের জীবনে যে অভিশাপ বয়ে এনেছিল তা লক্ষ্য করে অনেকে কলকারখানা-অধ্যুষিত জীবনের বদলে উন্নততর জীবনের সন্ধান করতে থাকেন। কিছু শ্রমিক পরিবার পশ্চিমাঞ্চলের দিকে চলে যান। যাদের পরিবারে পোষ্যসংখ্যা কম এবং ঘরের টান বেশী,

তাদের অনেকে পশ্চিমে যেতে পারলেন না। এরা কারখানা জীবনের অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিতে লাগলেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ঘটল সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান। এ ছাড়া দেখা দিল নতুন মানবতাবাদ। এমার্সন, থরো, হথর্ন প্রচারিত তুরীয়বাদ মানুষের আত্মিক মর্যাদার উপর জোর দিতে লাগল। মদ্যপান বর্জনের আন্দোলনের সূত্রপাত হতে লাগল। ডরোথি ডিক্স উন্মাদের চিকিৎসার জন্য প্রথম সর্বসাধারণের ব্যবহার্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন। বহু কলেজ স্থাপিত হল। এর মধ্যে ছিল কোলবি, আমহার্স্ট, মাউণ্ট হেলিউক এবং ওবারলিন। শেষোক্ত কলেজটিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ফিলাডেলফিয়া একাডেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেসের সভাপতি উইলিয়াম ম্যাকলিওর ওয়েনের পরিকল্পনার মাঝে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজের কতকগুলি মতবাদ পরীক্ষা করার সুযোগ দেখতে পেলেন। নিউ হার্মনিতে রবার্ট ওয়েনের এই আদর্শ সমাজ গঠনের কাজে তিনি দেড় লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করলেন। ম্যাকলিওর নিজে ধনী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাও করতেন। আমেরিকার বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে তিনি তাঁর সঙ্গে ওয়েনের পরীক্ষায় যোগ দিতে রাজী করালেন। এদের মধ্যে ছিলেন একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস অব ফিলাডেলফিয়া ও আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির তাঁর তিনজন সহকর্মী: ডঃ জেরহার্ড ট্রুসণ্ট, চার্লস আলেকজাণ্ডার লেসের ও টমাস সে। টস্ণ্টের জন্ম হল্যাণ্ডে। পরে তিনি আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন ও আমেরিকার নাগরিক অধিকার অর্জন করেন। তাঁর লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী ডিগ্রী ছিল। কিন্তু ডাক্তারী না করে তিনি মণিকবিদ্যা ও ভূবিদ্যার চর্চায় মন দেন এবং এই দুই ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। লেসের ছিলেন শিল্প ও প্রাণী-বিজ্ঞানী। ম্যাকলিওর তাঁকে প্যারিস থেকে ১৮১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসতে রাজী করিয়েছিলেন। এই ত্রয়ীর তৃতীয় ব্যক্তি টমাস সে ইতিমধ্যেই প্রাণী-বিজ্ঞানীরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

টমাস সে এমন এক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের দীর্ঘদিন ধর্ম ও রাজনীতিগত কারণে নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তাতে তিনি সহজেই ওয়েনের পরিকল্পনার উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠলেন। সে ছিলেন ফ্রান্সের

হিউজেনট সম্প্রদায়-ভুক্ত। ১৫৯৮ সালে হেনরি অব নাভারির রাজ অনুশাসনে (Edict of Nantes) এই হিউজেনট সম্প্রদায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৬৮৫ সালে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই সেই অনুশাসন প্রত্যাহার করে নেন। হিউজেনট সম্প্রদায়ভুক্ত লোক তখন ধর্মীয় উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যেতে থাকে। এই ভাবে টমাস সে-র পূর্বপুরুষেরা আমেরিকায় আসেন। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় টমাস সে-র জন্ম হয়। জন্মের ছয় বৎসর পর তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। সোসায়িটি অব ফ্রেণ্ডস নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালিত একটি স্কুলে তাঁকে পড়তে পাঠান হয়। স্কুলের পড়া তাঁর ভাল লাগত না। পনেরো বছর বয়সে সে-র বাপ তাঁকে তাঁর দোকানের শিক্ষানবিশিতে লাগিয়ে দেন। এই সময় সে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন। এই প্রবল আসক্তি দূর করতে, সে-র বাপ তাঁর জন্য একটি ওষুধের দোকান খুলে দেন। জন স্পীকম্যান নামে ফিলাডেলফিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত চিকিৎসককে এই দোকানের অংশীদার করে দেওয়া হয়েছিল। দুজনে মিলে তারা এই দোকান চালাবেন। কিন্তু বিজ্ঞানে স্পীকম্যানেরও খুব অনুরাগ ছিল। কাজেই কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত এই অংশীদারটিকে সে-র খুবই পছন্দ হল। কাজকারবারের দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হল না, কারণ কোন অংশীদারই ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না। ওষুধের দোকান ডুবতে বসল, শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। সে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ভাবে বিজ্ঞান সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

ফিলাডেলফিয়া সে সময় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর। এখনকার ধনী অধিবাসীরা ধনাঢ্যতা ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল এবং দরিদ্র ও হীন মর্যাদাসম্পন্ন আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে লজ্জা-বোধ করতেন। কিন্তু এদের মধ্যে 'বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া ছিল তখনকার দিনের ফ্যাশন।' ১৭৯৫ সালে ডঃ কাস্পার উইস্টার শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে একের পর এক কতকগুলি ভোজসভার আয়োজন করেন। এই ভোজসভাগুলিতে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ১৮১৮ সালে উইস্টার মারা গেলেও তাঁর বন্ধুদের বাড়ীতে এই সভার নিয়মিত অধিবেশন বসত। স্পীকম্যান এই উৎসাহী বিজ্ঞানসেবীদের মাঝে গিয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে সে-র ওষুধের দোকানের

পিছনে সভার অধিবেশন বসতে লাগল। একরাত্রিতে স্পীকম্যান বিজ্ঞানীদের একটি সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। ১৮১২ সালে একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস অব ফিলাডেলফিয়া নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করল।

এর তিন মাস পর যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ব্রিটেন রেড ইণ্ডিয়ানদের অস্ত্র সরবরাহ করছে বলে আমেরিকা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। এই রেড ইণ্ডিয়ানরা আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে দলে দলে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকাবাসীদের হত্যা করছিল। ইংল্যাণ্ড আমাদের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলেও বাধা দিচ্ছিল এবং বলপূর্বক আমাদের নাবিকদের তার নৌবহরের কাজে নিযুক্ত করছিল। যুদ্ধ ঘোষণার দু-দিন আগে ইংল্যাণ্ড এই সব অবৈধ কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন যদি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে তারবার্তা বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকত তা হলে হয়ত এই যুদ্ধ বাধত না। যাহোক্ যুদ্ধ শুরু হ'ল। ইংল্যাণ্ড আমাদের উপকূলে সৈন্য নামাল। রাজধানী ওয়াশিংটন, ডি. সি-তে অগ্নিসংযোগ করল। এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ফিলাডেলফিয়ার ফার্স্ট সিটি ট্রুপ নামে বাহিনীতে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। সাড়ে তিন মাস তিনি এই সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। এই সময় তিনি সাধারণ সৈনিকদের মত মাসিক দুই ডলার বেতন পেতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে পাঠান হয় নি। সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থেকেও তিনি তরুলতা ও কীটপতঙ্গের নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকেন।

একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস অব ফিলাডেলফিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সে-কে তার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হয় এবং তাঁকে একাডেমীর ছোট্ট সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। ১৮১৩ সালে সের পিতৃবিয়োগ হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে সে-র পিতা তাঁর জন্য ৬৪ নর্থ সেকেণ্ড স্ট্রীটে জমিসহ একটি বাড়ার $\frac{1}{8}$ অংশ রেখে গিয়েছিলেন। একাডেমীর সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়কের কাজের জন্য কোনও বেতন পেতেন না সে। অন্য কোনও আয়ের পথও ছিল না তাঁর। তাই তিন বছর তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তারপর বৈজ্ঞানিক কাজের দুটি চমৎকার সুযোগ এল। ১৮১৭ সালে উইলিয়াম ম্যাকলিওর একাডেমীর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণার জন্য ভূতাত্ত্বিক

তথ্য ও একাডেমীর জন্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি অভিযানের আয়োজন করলেন। জর্জ ওর্ড ও টমাস সে ম্যাকলিওরের এই অভিযানে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। অভিযাত্রীদল প্রথমে তীরভূমি ধরে এগিয়ে চলল, তারপর তারা ফ্লোরিডার আদিম অরণ্য ভূমিতে প্রবেশ করল। সে যেন পতঙ্গ-বিজ্ঞানের এক স্বর্গ রাজ্যে এসে পড়লেন। এখান থেকে তিনি বহু কীটপতঙ্গের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। অভিযান থেকে ফিরে এসে সেই বছরই সে ফিলাডেলফিয়া একাডেমীর 'জার্নালে' পতঙ্গ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

আমেরিকার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট জেমস ম্যাডিসনের সমরসচিব জন সি. কলহন সংগঠিত একটি নতুন সরকারী অভিযানে প্রাণী-বিজ্ঞানী রূপে সে-কে নিয়োগ করা হল। বিজ্ঞান ও সে-র পক্ষে এটি দ্বিতীয় সৌভাগ্যসূচক ঘটনা। প্লাট, রেড ও আরকেনসস্ নামে মিসৌরী নদীর প্রধান উপনদীগুলির উৎপত্তি-স্থল আবিষ্কার ও তার চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চলে অনুসন্ধানকার্য চালানোর জন্য কুড়ি জনেরও অধিক লোক নেওয়া হয়েছিল এই অভিযানকারী দলটিতে। ওর মধ্যে কয়েকজন পেশাদার ও শখের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীও ছিলেন। সে ছাড়া এই দলটিতে ছিলেন চিকিৎসক ও অস্ত্রবিদরূপে ডঃ উইলিয়াম বলডুইন, ভূতত্ত্ববিদ ও মণিকবিদরূপে আগস্টাস ই. জেসাফ, রেড ইণ্ডিয়ানদের ও পশ্চিমাঞ্চলের ভূভাগের নিসর্গ দৃশ্য আঁকবার জন্য ও সে-র সহকারী প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরূপে জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কন ও চর্ম সংরক্ষকের কাজ করবার জন্য সামুয়েল সেমুর।

এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন মেজর স্টেফেন এইচ. লং। ইনি ডার্টমাউথ কলেজের স্নাতক, ওয়েস্ট পয়েন্টের গণিত-শিক্ষক ও সেনা বাহিনীর এঞ্জিনীয়ার। ১৮১৯ সালের ৫ই মে দলটি রওনা হল। 'ওয়েস্টার্ন এঞ্জিনিয়ার' নামে একটি বাষ্পীয় পোতে চড়ে তারা গিয়ে পড়লেন ওহাও নদীতে। এই জাহাজটি প্রথম যে সব বাষ্পীয় পোত নির্মিত হয়েছিল তার অন্যতম। সেণ্ট লুইতে পৌছাতে জাহাজখানার লেগেছিল প্রায় মাসাধিক কাল সময়। এখান থেকে জাহাজখানা মিসৌরী নদী ধরে অতি মন্থর-গতিতে চলতে থাকে। কারণ একে স্রোতের প্রতিকূলে চলতে হচ্ছিল, গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র তিন মাইল। শেষ পর্যন্ত জাহাজখানা আইওয়া রাজ্যের কাউন্সিল ব্লাফ্‌সে এসে পৌছাল। কোনও বাষ্পীয় পোত এতদূর এই প্রথম এল।

প্রায় এক বছরের উপর অভিযাত্রীর দল এক বিরাট অঞ্চল পরিক্রমা করল। সে অঞ্চলের বিভিন্ন খনিজ পদার্থের নমুনা, পশুর চামড়া, শামুক, তরুলতা ও কীটপতঙ্গের নমুনা সংগ্রহ করল, ভূস্তর ও আবহাওয়া পরীক্ষা করল। বিরূপ আবহাওয়া, মাংসের মাঝে ডিম পাড়া এক ধরনের মাছির (বো ফ্লাই) উপদ্রব, সবিরাম জ্বর, পেটের পীড়া, টিক নামে মানুষ ও পশু-প্রাণীর রক্ত-শোষণকারী এক ধরনের কীটের ভীতি, এমনি সব নানাবিধ অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝে দলটিকে অভিযান চালাতে হয়েছিল। পথকষ্টে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সবাই। তা সত্ত্বেও এই অভিযাত্রীদলের বৈজ্ঞানিক বস্তু সংগ্রহমালার পরিমাণ কম ছিল না। এর মধ্যে ছিল বিরল ও ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত ষাটটি প্রাণীর চামড়া, পাঁচ শত অজ্ঞাত তরুলতা, খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য পাথর, হাজার হাজার কীটপতঙ্গ। এর মধ্যে কতকগুলি (প্রায় কয়েক শত) বিজ্ঞান জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কীটপতঙ্গের নমুনা অধিকাংশই সে সংগ্রহ করেছিলেন। অভিযান কালে প্রায় সব সময়ই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সমগ্র অভিযানকালে দৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী সংগ্রহ করে আনতে। সে বিভিন্ন রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর, বিশেষ করে ক্যানসাস ও ওমাহায় বসবাসকারী রেড ইণ্ডিয়ানদের আচার-ব্যবহার অনুসন্ধান করেন। ট্রান্সিলভানিয়া কলেজের ডঃ সামুয়েল ব্রাউন কর্তৃক প্রদত্ত টীকার সাহায্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষাও শিক্ষা করেন।

জেমস, সে এবং লং পিট্সবার্গ থেকে রকি মাউণ্টেন অঞ্চলে অভিযানের বিবরণী লেখেন। এই বিবরণী (Account of the Expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains) ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই অভিযান পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কারণ অভিযাত্রীরা প্লাট বা রেড নদীর উৎস আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি। লং-এর অভিযানের ব্যর্থতার জন্য প্রকৃতপক্ষে সরকারই আংশিক দায়ী। কারণ সরকার অভিযানের ব্যয় নির্বাহ ব্যাপারে মূঢ়ের মত মাত্রাধিক মিতব্যয়িতার ঝোঁক দেখিয়েছিলেন। তার ফলে অভিযান পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়েছিল।

পূর্ববর্ণিত সাধারণ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কলহন ১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় আর একটি অভিযান পাঠান। ব্রিটিশ ও আমেরিকান ব্যবসাদারী কোম্পানীগুলি কি পরিমাণ পশুলোমের কারবার করে সে খবর

সংগ্রহ করাও এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। লং এবারও এই অভিযানের নেতৃত্ব করলেন। অভিযাত্রীদলের ভূতত্ত্ববিদরূপে ছিলেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম কীটিং। টমাস সে এবার প্রাণী-বিজ্ঞানী ও পুরাতত্ত্ববিদরূপে দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

অভিযাত্রীদল ফিলাডেলফিয়া থেকে বর্তমানে যে স্থানে শিকাগো শহর অবস্থিত সে স্থান হয়ে মিসিসিপি নদীতে পড়ল। এখান থেকে নদীপথ ধরে গেল ফোর্টসেণ্ট অ্যাণ্টনীতে, সেখান থেকে সেণ্ট পীটার নদীর উৎসে। লঙ ও তার দলবল আমেরিকার উত্তর সীমান্ত ও মিসৌরী এবং মিসিসিপি নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল ভ্রমণ করে অনুসন্ধান কার্য সম্পূর্ণ করল। এই অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ২,০০,০০০ বর্গমাইল।

১৮৩২ সালের ৮ই আগস্ট লঙ ৪৯তম সমাক্ষ রেখা যে স্থানে রেড নদীকে ছেদ করে গেছে সেই স্থানে গিয়ে পৌছালেন। আমেরিকার জাতীয় পতাকা লঙ এখানে উত্তোলন করলেন এবং এই পর্যন্ত আমেরিকার উত্তর সীমান্ত বলে ঘোষণা করলেন এবং এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে জানালেন যে, অভিযাত্রীদল যে সব অঞ্চল আবিষ্কার করেছে তার সবই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল।

অভিযানকালে দেখাশোনা বহু বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য টমাস সে টুকে রেখেছিলেন। 'ন্যারেটিভ অব অ্যান একস্‌পিডিসন টু দি সোর্স অব দি সেণ্ট পিটার'স্‌ রিভার' (Narrative of an Expedition to the source of the St. Peter's River) নামে দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তকখানির একশ পৃষ্ঠা কেবল কীটপতঙ্গ সম্পর্কে সে-র টীকায় ভর্তি। কয়েকটি পৃষ্ঠায় এ অঞ্চলের শামুক, পাখি ও জীবাশ্ম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে এই অভিযানের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরূপেও কাজ করেছিলেন এবং বহু তরুলতা ও ফুলের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এগুলি তিনি পেনসিলভানিয়ার বেথেলহেমে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী লিউজ ডেভিড ফন স্থইনিৎস্‌-এর হাতে সমর্পণ করেন।

ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে সে লিখলেন, "পর্বতমালার পাঁচশ মাইলের মধ্যেকার ভূমি বৃক্ষাদি শূন্য ও অতিশয় অনুর্বর। সভ্য মানুষের কৃষিকর্মের অনুপযোগী। রুক্ষ অনুর্বর অঞ্চল আমাদের সুরক্ষিত সীমান্ত হতে পারবে, নির্মমভাবে নির্যাতিত রেড ইণ্ডিয়ানদের দল ও তাদের বিরাট বাইসনের

পাল (এগুলি এখানে অগণিত) এখানে যুগ যুগ ধরে আশ্রয় নিতে পারবে।” একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন ভূতত্ত্ববিদ্ ও একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর কাছ থেকে লোক এর চেয়েও নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী আশা করেছিল। কিন্তু লঙ, জেমস্ বা সে কেউই ভাবতে পারেন নি যে কোনও দিন এই শত শত মাইল পথ বাষ্পীয় শকটে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করে যাওয়া যাবে। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি যে আমেরিকার পূর্বাঞ্চল, ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও জার্মানী থেকে দলে দলে মানুষ এসে এখানে বসতি স্থাপন করবে, শুষ্ক চাষ প্রথা, সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম পরিচালনা করে তারা এই “পতিত ভূমি”কে এক বিরাট শস্যাগারে পরিণত করবে।

১৮২৩ সালে ফিলাডেলফিয়া একাডেমীতে ফিরে এসে সে তাঁর বৈজ্ঞানিক নমুনার সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলবার কাজ পুনরায় শুরু করলেন। পতঙ্গ চর্চায়ও মন দিলেন। তিনি যে হাজার হাজার পতঙ্গের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন তা ছাড়াও তাঁর বন্ধুবান্ধব ও শৌখিন পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের নিকট হতে নিয়ত শত শত কীট-পতঙ্গের নমুনা আসত তাঁর কাছে। সে বহু সংগ্রাহকের বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের চুলের ও চোখের রং, শুঁড়ের সংখ্যা, দেহ-বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও তাদের, ‘পতঙ্গের আচার-ব্যবহার, জীবন প্রণালী, ভাববিনিময় পদ্ধতি’ও পরীক্ষা করে দেখতে উৎসাহিত করে পত্র লিখতেন। কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আমেরিকায় তাঁর পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা যে সব বিষয় লিখে গেছেন তা পুঙ্খাপুঙ্খরূপে অধ্যয়নও করেছিলেন তিনি।

এ সময় আমাদের চেয়ে ইউরোপের লোকেরা আমেরিকার কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে অনেক বেশী খবর রাখত। আমাদের দেশের ছারপোকা, মাছি ও গুবরে পোকা জাতীয় কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করতেন যে সব শখের পতঙ্গ সংগ্রাহক-গণ তারা সংগৃহীত কীটপতঙ্গের নমুনার সনাক্ত ও শ্রেণীবিভক্তকরণের জন্য ইংরাজ, ফরাসী ও জার্মান পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণ করতেন। ইউরোপে বহুদিন ধরে পতঙ্গ বিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছিল। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪৩ সালের মধ্যে রেনে রেমুর রচিত ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘হিস্ট্রী অব ইনসেকটস’ প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানের এই শাখা বিপুল প্রেরণা লাভ করে। সে এই ইউরোপীয় গ্রন্থখানির অধিকাংশ বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেন। কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান পতঙ্গবিজ্ঞানীদের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন এবং তাঁদের সঙ্গে নমুনা বিনিময়

করতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন নেপোলিয়নের সেনাপতি কম্‌তে পিয়ের হ্যজাঁ।

সে-র চেষ্টায় আমেরিকার পতঙ্গ-বিজ্ঞান নিজস্ব অধিকার যেন ফিরে পেল। আমেরিকার সংগ্রাহকেরা এখন থেকে বড় বড় ইউরোপীয় পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের বদলে তাদের সংগৃহীত নমুনা ও পতঙ্গ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সে-র নিকট পাঠাতে লাগালেন। সে তাঁর অফিস ঘরে এই সব অসংখ্য কীটপতঙ্গের নামকরণ ও শ্রেণী-বিভাগের কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন। আমেরিকার এই সব অজ্ঞাতপূর্ব ও বিচিত্র কীটপতঙ্গের নামকরণ ও বর্গীকরণের কাজটা বড় সহজ ছিল না। তিনি তাঁর সহযোগীদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মাননীয়দের তিনি যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। নিজেকে তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান মনে করতেন না কখনও। নিজের ভ্রমশুদ্ধি ও সমালোচনা তিনি হাসিমুখে মেনে নিতেন। বন্ধুদের বলতেন, তাঁর মুদ্রিত প্রবন্ধে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে ও 'কোনও ক্ষেত্রে ভ্রম সংশোধনের অবকাশ রয়েছে এমন কিছু লক্ষ্য করলেই তারা যেন আমায় তা দেখিয়ে দেন যাতে আমি আরও ভাল করে কাজ করতে শিখতে পারি।'

পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিতীয় অভিযান থেকে ফিরবার এক বছরের মধ্যেই সে তাঁর 'আমেরিকার পতঙ্গ বিজ্ঞান বা উত্তর আমেরিকার কীটপতঙ্গের বর্ণনা' (American Entomology, or Descriptions of the Insects of North America) নামক গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির নামপত্রের সম্মুখের চিত্র ও কীটপতঙ্গের রেখাচিত্র আঁকেন চার্লস আলেকজাণ্ডার লেসের। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সে বিনীতভাবে গ্রন্থখানির গুরুত্ব বর্ণনা করেন। 'কোনও প্রকার আর্থিক লাভের আশা না রেখেই বর্তমান লেখক এই কাজের ভার নিয়েছিলেন। এ কাজের যে সব অবশ্যম্ভাবী বাধা-বিপত্তি রয়েছে সে বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সজাগ।......এই গ্রন্থের দোষ বা গুণ যাই থাক না কেন, লক্ষ্য করতে হবে যে এ ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস এদেশে এই প্রথম। এই প্রচেষ্টাকে কোনও অজ্ঞাত নতুন দেশে প্রথমাগত অভি-যাত্রীদের বসতি স্থাপনের প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করা চলে.....আমাদের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যদি পরিকল্পিত কার্যের এক অংশও সম্পন্ন করতে পেরে থাকি তা হলে আমরা ততটুকু প্রশংসাই দাবী করব,

যা অজ্ঞাত দেশে পরবর্তী আগন্তুকদের পথ সুগমকারী প্রথমাগত দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের প্রাপ্য।'

আমেরিকার পতঙ্গ-বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক এই গ্রন্থখানি (আমেরিকান এণ্টমলজি) সে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রসারে উদার ও মুক্তহস্ত দাতা উইলিয়াম ম্যাকলিওরকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ম্যাকলিওর সে-কে তাঁর সঙ্গে নিউ হারমনি পরিকল্পনায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। এখানে সে তাঁর প্রস্তাবিত গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ খণ্ডের কাজ চালাতে পারবেন। এখানে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে কিছু সময় বিজ্ঞান শিক্ষাও দেবেন তিনি। সে-কে প্রলুব্ধ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন যে নিউ হারমনির এই অভিনব পরীক্ষার মধ্যে তিনি শান্ত পরিবেশে, দারিদ্র্যের কবলমুক্ত হয়ে বিদ্বজ্জন সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞান সাধনা চালিয়ে যেতে পারবেন। তাঁর মনে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকল্পনা আছে তার অনেক কিছুই এই বিরাট সংগঠনের অর্থানুকূল্যে ও উপকরণ সম্ভার দ্বারা সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

২৬শে জানুয়ারী, ১৮২৬ সালে ম্যাকলিওর সদলবলে নিউ হারমনিতে এলেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থপূর্ণ বিরাট একটি গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য সে-র হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। ম্যাকলিওর ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সদস্য এবং নিউ হারমনি পরিদর্শনে আগত কয়েকজন ইউরোপীয় ভ্রমণার্থীর সঙ্গে সে কয়েকবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বার হন। এমনি একটি অভিযানে ১৮২৭ সালের শরৎকালে ম্যাকলিওর সে-কে দক্ষিণে মেক্সিকো সিটি ও ভেরা ক্রুজ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান।

টমাস সে ছিলেন দীর্ঘকায় ও সুপুরুষ। বিজ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত থাকার মাঝেও তিনি নিউ হারমনির "সেরা সুন্দরী ও কলাবতী" তরুণীদের একজনের প্রণয় যাচ্ঞা করার অবকাশ পেয়েছিলেন। ১৮২৭ সালের ১০ই জানুয়ারী "নিউ হারমনি গেজেটে" প্রকাশিত হয়েছিল যে "কয়েকদিন আগে সে লুসি সিস্টেয়ারকে বিবাহ করেছেন। তাঁরা স্প্রীংফিল্ড ছাড়িয়ে একটা জায়গায় যান। সেখানে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এদের বিয়ে দিয়ে দেন। দু'জনের মুখে তিনি কাহিনী শুনেছিলেন। তাতে তাঁর নিঃসন্দেহে এই ধারণা হয়েছিল যে এরা অতি বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ।" ১৮২৮ সালে সে-র 'আমেরিকান

এণ্টমলজি'র তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিন খণ্ডে মোট চুয়ান্নটি রঙ্গীন চিত্র ছিল। এর সবগুলিই অতি সুন্দর ভাবে আঁকা।

পতঙ্গ বিজ্ঞানই সে-র বিজ্ঞান সাধনার অধিকাংশ সময় জুড়ে ছিল। শঙ্খ বিজ্ঞান, বা বিভিন্ন শ্রেণীর শামুক পরীক্ষণ ও গবেষণায়ও তিনি অনেক ভাল ভাল কাজ করেছিলেন। যখন তিনি নিউ হারমনিতে আসেন তখনই তার সংগ্রহে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের শামুক জমে ছিল। এগুলি তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যস্ত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থান হতে বহু লোক নিউহারমনিতে তাঁর কাছে বাক্স ভর্তি কীটপতঙ্গ ও শামুকের নমুনা পাঠাতে লাগল। যে সব শামুকের বিবরণী সে-র প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থ 'আমেরিকান কন্‌চোলজির' (American Conchology) অন্তর্ভুক্ত হবে, সেই সব শামুক বাছাই হলে, লেসের সেগুলির ছবি আঁকলেন। ১৮৩০ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল। আমেরিকান এণ্টমলজি ও আমেরিকান কন্‌চোলজি আমেরিকার বিদ্বৎ সমাজের মাঝে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়েছিল। তাতে বিজ্ঞানের এই দুটি শাখা নতুন প্রেরণা লাভ করে। ইউরোপ আমেরিকায় পতঙ্গ-বিজ্ঞানের এই উন্নতি দেখে বিস্মিত হল। সে সুনিশ্চিত ভাবেই বিশ্বের বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন এবং আমেরিকার বর্ণনামূলক পতঙ্গ বিজ্ঞানের জনক আখ্যা লাভ করলেন।

সে আশা করেছিলেন নিউ হারমনির শান্তনির্মল পরিবেশে সমাহিত চিত্তে বিজ্ঞান সাধনায় দিন কাটাতে পারবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হল না। যে নয় বছর তিনি নিউ হারমনিতে কাটান তা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। এর সবটাই কিন্তু নতুন সৃষ্টির বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রোমাঞ্চ-সঞ্জাত নয়। আদর্শ সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ইণ্ডিয়ানার এই উপনিবেশের জন-সংখ্যা ১৮২৬ সালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিল এক হাজারে। এর মধ্যে ছিল সমাজের সর্বস্তরের নরনারী। এদের অনেকে ছিলেন অতিমাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। উপনিবেশের আদর্শবাদী পরিচালকবৃন্দের রচিত সাধারণ নিয়মাবলী যখন এদের মতবাদ বা কর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে লাগল তখন তারা প্রায়শঃ এবং সরবে এই সব আইনকানুনের বিরোধী মত প্রকাশ করতে লাগলেন। অনেকে ছিলেন আবার দুঃসাহসী কার্যপ্রিয়, অনেকে অলস প্রকৃতির অব্যবস্থিতচিত্ত। প্রত্যেক সংস্কার আন্দোলনের মাঝে খানিকটা যে পাগলামির মিশেল থাকে এক্ষেত্রেও তার অভাব ছিল না। আদর্শ

সমাজের অধিবাসীদের মধ্যেও দেখা দিল বাদবিবাদ, ক্ষুদ্র ঈর্ষা বা ন্যায়সঙ্গত মতভেদ থেকে জন্মাল উপদলীয় চক্রান্ত। উপনিবেশের অধিবাসীদের একত্র খুব কাছাকাছি থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি সামান্য কারণে বিরক্তি থেকে তীব্র কলহ শুরু হয়ে যেত। উপনিবেশ স্থাপিত হবার প্রথম দুবছরের মধ্যে বিবদমান এমনি দশটি গোষ্ঠী মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে যায়।

ওয়েন ও ম্যাকলিওরের মাঝে বিবাদ দেখা দেওয়ায় উপনিবেশের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ম্যাকলিওর এই আদর্শ সমাজ গঠনে দেড় লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন। চুক্তি ছিল তাঁর দায় দশ হাজার ডলারের বেশী হবে না। অতি দ্রুত যখন উপনিবেশের তহবিলের টাকা খরচ হয়ে যেতে লাগল, তখন ম্যাকলিওর ওয়েনের কাছে হিসাব চাইলেন। ওয়েন হিসাব দাখিল করতে অস্বীকার করলেন। তুমুল বাকবিতণ্ডা চলল। শেষে ম্যাকলিওর সাধারণ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানালেন, অতঃপর ওয়েনের আর্থিক লেনদেনের জন্য তিনি আর দায়ী থাকবেন না। ওয়েনের বিরুদ্ধে চল্লিশ হাজার ডলারের দাবী জানিয়ে আদালতে মামলাও রুজু করলেন। ওয়েনও আদালতের নিকট হতে এর দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের জন্যে ম্যাকলিওরের বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জারি করালেন। ১৮২৭ সালের ২৬শে মে, ক্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ ওয়েন নিউ হারমনি ত্যাগ করলেন।

ম্যাকলিওর কিছুকালের জন্য নিউ হারমনিতে কাটালেন। তারপর ১৮২৮-২৯ সালের শীতকালে সে-কে সঙ্গে করে গেলেন মেকসিকো সিটিতে, ১৮২৭ সালে ট্রুস্ট নিউ হারমনি পরিত্যাগ করে টেনেসির ন্যাসভিল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ও মণিক বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। লেসের সে-র সঙ্গে আরও দুই বছর নিউ হারমনিতে কাটালেন, তারপর তিনিও চিত্রবিদ্যার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে ফ্রান্সে রওনা হলেন। ওয়েনের চার ছেলেই নিউ হারমনিতে বাস করতে লাগল। এরা সকলেই আমেরিকার নাগরিক হয়ে গিয়েছিল।

ম্যাকলিওর চলে যাবার পর উপনিবেশটি সে ও মাদাম ফ্রেটাজিওর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল। এরূপ একটি বিরাট সংস্থা পরিচালনের উপযুক্ত ক্ষমতা সে-র ছিল না। অর্থঘটিত ব্যাপারে তাঁর অবস্থা হল তঞ্চকদের মাঝে সরল শিশুর মত। এই উপনিবেশ পরিচালনা এবং বিজ্ঞান সাধনা

ছাড়াও ১৮৩০ সালে তাঁকে নিউ হারমনির ডিসসেমিনেটর অব ইউজফুল নলেজ ফ্রম দি স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রী। (Disseminator of useful knowledge from the School of Industry) নামে পত্রিকাখানির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করাতে রাজী করান হল। তাঁর শরীর ইতিপূর্বেই ভেঙ্গে পড়তে চলেছিল, এই সব নানাবিধ কাজের চাপে জীবনের শেষ ভাগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঘন ঘন আমাশয় ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৮৩৪ সালে তিনি মারা গেলেন।

আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে বহু বিজ্ঞানী নিউ হারমনি পরিদর্শন করতে ও এখানকার বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের কর্মপদ্ধতি দেখতে আসতেন। নিউ হারমনিতে সাম্যবাদী সমাজ রচনার ব্যর্থ প্রয়াসের শেষ অধ্যায় রচিত হবার আগে এই সংস্থান আমেরিকার বিজ্ঞান ও জনশিক্ষার অগ্রগতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিউ হারমনি থেকেই আসে জোসিয়া ওয়ারেনের কনটিনিউয়াস রোলার প্রেস্, নিয়মিত আবহবার্তা, আমেরিকার প্রথম কারিগরী বিদ্যালয়গুলির একটি। এইখানেই সে-র, আমেরিকার পতঙ্গবিজ্ঞানের ও শঙ্খবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়। মিচাউক্সের উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'নর্থ আমেরিকান সিলভা'র (North American Sylva) চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় ও বইখানি পুনর্মুদ্রিত হয় এখানে।

বিরাট কোন মৌলিক অবদানের ভিত্তিতেই আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে-র গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। জীববিদ্যায় গবেষণার অবহেলিত ক্ষেত্রে তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন। একক প্রচেষ্টায় নির্ভুলভাবে বিপুল সংখ্যক কীট-পতঙ্গের বর্ণনাও দিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই। এই দুই কারণেই আমেরিকার বিজ্ঞানে তাঁকে এত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়। তাঁর সময় পর্যন্ত কোন আমেরিকাবাসীর পক্ষে এত বিপুল সংখ্যক কীটপতঙ্গ পরীক্ষা ও তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। পতঙ্গ জগতের অগণিত প্রাণীর নামকরণে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, তিনি তাও প্রভূত পরিমাণে দূর করতে সাহায্য করেছিলেন।

আমেরিকার পক্ষী সম্বন্ধেও সে কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন। তিনি চার্লস লুসিয়েন বোনাপার্টির ন্যাচারাল হিষ্ট্রি অব বার্ডস ইনহ্যাবিটিং দি ইউনাইটেড স্টেটস্ (Natural History of Birds Inhabiting the United States) নামে গ্রন্থখানি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে মুদ্রণের

উপযোগী করে তুলেছিলেন। উইলসন তার 'আমেরিকান অরনিথলজি' গ্রন্থে আমেরিকার পক্ষী বিজ্ঞানের যতটা বর্ণনা দিয়েছিলেন, নেপোলিয়নের এই গ্রন্থে তার পরবর্তী অধ্যায় রচনা করল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা প্রাণীবিদ্যায় সে-র অবদান স্বীকার করেছিলেন সেওরনিস (Sayornis) নামে গণটির তাঁর নাম অনুসারে নামকরণ করে। বোনাপার্টি তাঁর সম্মানে পিউই-র সেওরনিস সেয়াস নামকরণ করেন তাঁর নামানুসারে। সে লণ্ডনের লিনেয়েল সোসায়িটি ও ইংল্যাণ্ডের জুলজিক্যাল সোসায়িটির সভ্য ছিলেন। তিনি শুধু ইংল্যাণ্ডেই পরিচিত ছিলেন না, প্যারিসের সোসায়িটি ফিলোম্যাথিকের সংবাদদাতারূপে ফ্রান্সেও সুপরিচিত ছিলেন।

সেও তাঁর সহযোগীদের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেও যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় তরুলতা ও পশুপাখীর বিবরণী সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয়নি। এদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের কোনও নাটকীয় আবেদন ছিল না। কাজেই তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ছিল অতি সামান্যই। তাহলেও এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের অবদান ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। এরা শুধু এই বিরাট মহাদেশের অনেক অজ্ঞাত অপরিচিত অঞ্চলের পশুপ্রাণী ও উদ্ভিদের উপর আলোকপাত করতেই সাহায্য করেননি, নতুন তথ্য সঞ্চয়েও সহায়তা করে গেছেন। এই তথ্য আবার নতুন ও মৌলিক জীববিদ্যাগত সমন্বয়ের সাহায্য করেছে। সে-র প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে এগিয়ে এলেন আরও বহু বিজ্ঞানী। আজও তাঁরা আমেরিকার দুর্গমতম অঞ্চলে ফিরছেন জীববিদ্যার সামান্য এককণা নূতন তথ্যের সন্ধানে।

॥ ৬ ॥

উইলিয়াম টি. জি. মর্টন

(১৮১৯-১৮৬৮)

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমেরিকা ইতিহাস রচনা করল

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস ছিল ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যার উপর একান্ত নির্ভরতার কাহিনী মাত্র। জগতের সর্বত্র, এমন কি ইউরোপের প্রধানতম জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলিতেও, চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুব সামান্যই অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। এদেশেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে বড রকমের আবিষ্কার খুব কমই হয়েছিল। ভাগ্যান্বেষণে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য, ক্রমেই অধিকসংখ্যায় আমেরিকাবাসী পশ্চিমাঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেছেন। আপন চেষ্টায় লোকালয় হতে বহু দূরের বনজঙ্গল কেটে কৃষিভূমি তৈরি ও আত্মোন্নতির পথ প্রস্তুত করতে অভ্যস্ত হয়ে আমেরিকার মানুষের মাঝে এক ধরনের রুক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সেই সঙ্গে ইয়াঙ্কীসুলভ উদ্ভাবনী শক্তি মিলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি অভাবনীয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটল। বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। লোকালয় থেকে বহু দূরে মহারণ্যের প্রান্তে কোনও নিঃসঙ্গ চিকিৎসক যখন দেখতে পান যে দুঃসাহসে ভর করাই তাঁর রোগীর প্রাণ বাঁচানোর পথ, তখন দুঃসাহসে ভর করা তার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে ওঠে। আত্মনির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যক্তিগত সাহস, এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা যশ ও অর্থাগমের স্বপ্নই এই নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে।

তখনকার দিনে ডাক্তারেরা টার্টার এমিটিক (বমনোদ্রেককারী ঔষধ) ও ক্যালোমেল (পারদঘটিত ঔষধ-বিশেষ) প্রভৃতি রেচক ও জোলাপের সাহায্যে এবং নিজেদের তৈরি পাঁচনের (এর অনেকগুলিরই রোগ আরোগ্য ক্ষমতা ছিল সন্দেহজনক) সাহায্যে যথাসাধ্য চিকিৎসা চালাতেন। রোগ চিকিৎসায় রোগীর শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণের প্রথা ইউরোপ থেকে এদেশে আমদানী হয়েছিল। যে সব রোগীকে রক্তদান প্রয়োজন তাদেরও শিরা থেকে

রক্তমোক্ষণ করান হত। জর্জ ওয়াশিংটন যখন প্রবল সর্দি এবং সম্ভবত বীজদূষিত গলদাহে ভুগছিলেন, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারবার তার রক্ত-মোক্ষণ করান হয়। এইভাবে তাঁর মৃত্যুকাল এগিয়ে আনা হয়েছিল। রক্তমোক্ষণের দুদিন পরই তিনি মারা যান। ঘায়ের চারদিকে পুঁজ জন্মালে তা "শুভ" লক্ষণ বলে মনে করা হত। রোগ চিকিৎসার সুবিধার জন্য রোগীর গায়ে ফোস্কা পড়ান হত।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার পূর্বে এদেশে মাত্র দুটি মেডিকেল স্কুল ছিল। প্রথমটি স্থাপিত হয় ১৭৬৫ সালে কলেজ অব ফিলাডেলফিয়াতে (এটি এখন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)। দুবছর পর কিংস কলেজ (এখন কলম্বিয়া কলেজ) নিউইয়র্ক সিটিতে একটি মেডিকেল স্কুল খোলে। হার্ভার্ড ১৭৮২ সালে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের অধিকাংশ ডাক্তারদের তখন এদেশের বা ইউরোপের কোনও মেডিকেল স্কুলে শিক্ষার কোনও বালাই ছিল না। অন্য চিকিৎসকদের নিকট শিক্ষানবিশী করে তাঁরা ডাক্তারী বিদ্যা আয়ত্ত করতেন। এই ডাক্তার গুরুদের সঙ্গে তাঁরা তল্পিবাহক-রূপে ঘুরতেন। মলম ও ওষুধ তৈরি করতেন তাদের নির্দেশমত। তারপর একসময় গুরুমশাইর নিকট হতে ডাক্তারীর সনদ পেতেন। কোনও কোনও ডাক্তারের আবার শিক্ষানবিশীর পাট ছিল না। কারণ ডাক্তারী পেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য তখনও কোনও আইন পাস হয়নি। হাতুড়ে ডাক্তারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল।

যা হোক, এই অন্ধকার যুগেও ভেষজ বিজ্ঞান ও শল্যবিদ্যায় শীঘ্রই কয়েকটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হল। আমেরিকার শল্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম গৌরবময় দিন দেখা দিল ১৮০৯ সালের ক্রিস্‌মাসের দিনে কেনটাকির ডেনভিলে। এখানে তখন বাস করতেন ডাঃ এফরেইম ম্যাকডুয়েল। ইনি ইংল্যাণ্ডের এডিনবরা থেকে মেডিকেল ডিগ্রী গ্রহণ করেছিলেন।

১৮০৯ সালে মিসেস ক্রফোর্ড নাম্নী জনৈক মহিলা ডাঃ ম্যাকডুয়েলের পরামর্শ গ্রহণের জন্য এসেছিলেন। এর ডিম্বকোষে একটি টিউমার হয়েছিল। টিউমারটি তখন কেটে বাদ দেওয়া প্রয়োজন, না হলে রোগিণী মারা যাবার আশঙ্কা ছিল। তলপেটের চামড়া কেটে উদরদেশ উন্মুক্ত করে টিউমারটি অপসারিত করায় বেশ বিপদ আছে। ম্যাকডুয়েল মহিলাটিকে সে কথা বুঝিয়ে বললেন। এমনি ধরনের অস্ত্রোপচার এর আগে কেউ করেনি।

এমন কি এডিনবরায় তাঁর দুজন বিখ্যাত শিক্ষক জন বেল ও উইলিয়াম হাণ্টার কলেজে শিখিয়েছিলেন যে অস্ত্রোপচারের দ্বারা তলপেট উন্মুক্ত করলে রোগী মারা যায়। এদিকে আবার অস্ত্রোপচার করলেও ম্যাকডুয়েলের নিজের জীবনও বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ এই 'অসম্ভব অস্ত্রোপচার' ব্যর্থ হলে সীমান্তপারের এই দুর্ধর্ষ অধিবাসীরা তার ফাঁসি দেবে। মহিলাটি অবশ্য তা সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার করাতে রাজী হলেন। ম্যাকডুয়েল তাকে সাদাসিধে একটা কাঠের টেবিলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে তাঁর দেহে অস্ত্রচালনা করলেন। অস্ত্রোপচারের পরও রোগিণী বেঁচে রইল এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করল। এর সাতমাস পর তিনি 'একলেকটিক রিপজিটরিতে' (Eclectic Repository) এই অস্ত্রোপচারের বিবরণী প্রকাশ করলেন। এরপর অন্যান্য চিকিৎসকেরাও এই ধরনের অস্ত্রোপচারে হাত দিতে লাগলেন। অবশ্য খুব ধীরে ধীরে। অ্যাপেনডিসাইটিস্, মুত্রাশয়, যকৃৎ, পিত্ত, এবং প্লীহার পীড়ায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে এখন আর তাতে প্রাণসংশয়ের কারণ আছে বলে কেউ মনে করে না, বিশেষ করে অবেদনিক ঔষধ (Anesthesia) আবিষ্কৃত হবার পর। আমেরিকার সীমান্তরাজ্যের অধিবাসী চিকিৎসক-বৃন্দ ছিলেন অতিশয় দুঃসাহসী। এখানে এদের উপর ইউরোপের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রভাব ছিল ঢের কম। এই দুঃসাহসী ও সংস্কারমুক্ত চিকিৎসকদেরই একজন আবার উদরদেশে অস্ত্রোপচারের মত অভাবনীয় কাজ করে বিজ্ঞান জগতকে নূতন পথ প্রদর্শন করলেন।

১৮২২ সালে আমেরিকার ভেষজ বিজ্ঞান আর এক বিভাগে নতুন এক অধ্যায়ে উপনীত হল। ম্যাকিনাক দ্বীপের অভ্যন্তরে সুদৃঢ় এক ব্যবসা কেন্দ্রে, বন্দুক থেকে দৈবক্রমে গুলি ছিটকে এসে, আলেকসিজ সেণ্ট মার্টিন নামে একজন তরুণ ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান নাবিকের কোমরের পাশে ছিদ্র করে দেয়। নিকটবর্তী দুর্গের সেনাবাহিনীর সার্জেন, কানেটিকাটবাসী ডাঃ উইলিয়াম বীমণ্ট দেখতে পেলেন, গুলিটি আহত সেণ্ট মার্টিনের পাকস্থলীর গা ঘেষে চলে গেছে। তিনি ছিদ্রটি সেলাই করে দিলেন, কিন্তু অতিশয় দক্ষতা ও ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘাটা পুরোপুরি জুড়ল না। শুকিয়ে যাবার পর মাংসের খানিকটা পেটি রয়ে গেল। এটা সেণ্ট মার্টিনের পাকস্থলীর ছিদ্রমুখ ঢেকে রাখত। বীমণ্টের মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা এল। সেণ্ট মার্টিনের পাকস্থলীর উপর যে বিচিত্র "ঢাকনা" দেখা দিয়েছে, তা দিয়ে পাকস্থলীর

অভ্যন্তরের নাগাল পাওয়া যায়। তাতে কতকগুলি কৌতুহলপ্রদ পরীক্ষা করা চলে। পাকস্থলী থেকে ক্ষতনালী সৃষ্টি হয়ে দেহের বাইরে আসার এমনি প্রায় বারোটি দৃষ্টান্ত ভেষজ-বিজ্ঞানে ইতিপূর্বে দেখা গেলেও বীমণ্টের মত এমন অভিনব পরীক্ষা করার সাহস আগে কখনও কারও হয়নি।

পাকস্থলীতে জারক রসের প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য তার পাকস্থলীতে পরপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাতে দিতে সেণ্ট মার্টিন রাজী হল। বীমণ্ট খাদ্যের টুকরা সুতোয় বেধে সেণ্ট মার্টিনের পাকস্থলীর পেটির নিচেকার ক্ষতনালীর মধ্য দিয়ে তার পাকস্থলীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর পরিপাক ক্রিয়ার শেষে অবশিষ্ট খাদ্যাংশ সুতো টেনে তুলে আনতেন। এই পরীক্ষা কয়েক বছর ধরে চলেছিল। এর মধ্যে যার উপর এই নির্মম পরীক্ষাকার্য চালান হত সেই মানুষ-গিনিপিগ, সেণ্ট মার্টিন প্রায়ই বিদ্রোহ করত, এবং পালিয়ে যেত। আরও বেশী অর্থ কবুল করে ও অস্ত্রোপচারের উন্নততর ব্যবস্থার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হত। শেষে ১৮৩৩ সালের ডিসেম্বরে বীমণ্ট তাঁর এই বিখ্যাত পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। নিজের খরচে সুলভে এই রিপোর্টের এক হাজারকপি তিনি ছাপিয়েছিলেন। এই ভাবে বীমণ্ট বিভিন্ন খাদ্যের আপেক্ষিক পাচ্যতা ও পাকস্থলীর পাচক রসের উপাদানের সঠিক তথ্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে লোকটির পাকস্থলীতে রয়েছে অতি সামান্য পরিমাণে (প্রায় ০·৩%) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এই জিনিসটা কতকগুলি পুষ্টিকারক বস্তু, বিশেষ করে প্রোটিন পরিপাকের সাহায্য করে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে অবসাদ ও মানসিক উত্তেজনায় এই পাচক-রসের ক্ষরণ কমে আসে। এই ভাবে আমেরিকার সুদূর অরণ্যভূমি থেকে এল ভেষজ-বিজ্ঞানের একটি নূতন আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কার করলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি এর উপযোগী প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হননি। এ কাজের উপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতিও তাঁর ছিল না। অতি আদিম ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি এই পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন।

বিরল-বসতি মধ্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে এল ভেজষ বিজ্ঞানের আর একটি অনন্যসাধারণ অবদান। এটি হল ডাঃ ডানিয়েল ড্রেকের বিস্ময়কর কীর্তি, 'ট্রিটিজ অন দি প্রিন্সিপাল ডিজিজেস অব দি ভ্যালি অব নর্থ আমেরিকা' (Treatise on the Principal Diseases of the Interior Valley

of North America) নামক গ্রন্থখানি। এর কিছু অংশ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এতে অ্যালিগেনি পর্বতমালা ও রকি পর্বতমালার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের আবহাওয়া, উদ্ভিদ, ভূসংস্থান, অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা ও প্রচলিত রোগের বিবরণী দেওয়া ছিল। গ্রন্থখানি কয়েক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। এখানিকে হিপোক্রেটস-এর পর রচিত চিকিৎসা বিজ্ঞানগত ভূগোলের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রূপে অভিহিত করা হত।

বস্টন শহর থেকে এল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৮৪৩ সালে অলিভার ওয়েনডেল হোমস বস্টন সোসায়িটি অব মেডিকেল ইমপ্রুভমেণ্টের (বস্টন শহরের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকামী-দের সমিতি) সভ্যদের সামনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধটি সূতিকা জ্বর বিষয়ে। এই সূতিকা জ্বরে শত শত বছর ধরে সন্তান প্রসব কালে লক্ষ লক্ষ স্বাস্থ্যবতী প্রসূতি মারা পড়ত। বীজদূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে রোগবিস্তার রোধ করা বা জীবাণুই যে রোগ বিস্তারের কারণ এসব কথা তখন কেউ জানত না। তবু হোমস্ সূতিকা জ্বরের প্রকৃত কারণটি কি তা বুঝতে পেরেছিলেন। প্রসূতির চিকিৎসাকারী ডাক্তারের ছোঁয়া লেগেই আসলে এই রোগ ছড়ায়। শত শত বৎসর ধরে সূতিকা জ্বরে গতায়ু রোগিণীকে পরীক্ষা করে, বা ময়না তদন্তের শেষে মর্গ থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি প্রসূতিদের আঁতুড় ঘরে যেতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। "অন দি কনটাজিয়াসনেস অব দি পিউআরপ্যারাল ফিভার" (On the Contagiousness of the Puerperal Fever—সূতিকা জ্বরের সংক্রামতা সম্পর্কে) নামক প্রবন্ধে তিনি চিকিৎসকদের এই মারাত্মক অভ্যাস সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে, তাদের এই অভ্যাস ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। তিনি ডাক্তারদের বললেন, সূতিকা জ্বরাক্রান্ত কোনও রোগিণীকে পরীক্ষা করার পর জামাকাপড় বদলে, ভাল করে হাত-পা মুখ ধুয়ে নিন, অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা পর অন্য প্রসূতির চিকিৎসা করতে যাবে।

হোমসের সতর্কবাণীতে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের এবং জেফারসন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকমণ্ডল খুবই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কানাঘুষায় বলা হতে লাগল যে হোমস কোনও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত নয়। কোন রোগিণী পরীক্ষা থেকে তিনি তাঁর এই অদ্ভুত তত্ত্ব নির্ধারণ করেন নি, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর স্বকপোল-কল্পিত। যা হোক, বহু

চিকিৎসক তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন। বহু প্রসূতির জীবন রক্ষা হয় তাতে। চার বছর পর, ইগনাজ সেমেলউইজ নামে জনৈক তরুণ চিকিৎসক সূতিকা জ্বরের কারণ সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। হাঙ্গেরীয় এই চিকিৎসক অবশ্য এ বিষয় নিয়ে হোমসের চেয়ে বেশী মাথা ঘামিয়েছিলেন। এই জ্বরের সংক্রামকতা পরীক্ষা করার জন্য তিনি কয়েকটি কঠোর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেমেলউইজের কথা শুনেও অনেক চিকিৎসক হেসেছিলেন। তবু তাঁর কথা অনেকে মেনে নিয়েছিলেন। বাড়ীতে ও হাসপাতালে চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য যে সব প্রসূতির তথাকথিত ধাত্রী ও ধাত্রীবিদ্যাবিদ ডাক্তারদের কবলে পড়তে হত তাদের জীবনে এইভাবে এক নবযুগের সূচনা হল।

উনিশ শতকে ভেষজ বিজ্ঞানে চারটি বড় বড় আবিষ্কার ঘটে। তার ফলে ভেষজ বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে তিনটি ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের কীর্তি : প্রথম আবিষ্কারটি হল এই যে প্রাণীদেহ জীবকোষের দ্বারা গঠিত এই মতবাদ ; দ্বিতীয় আবিষ্কারটি হল জীবাণুই রোগ উৎপত্তির কারণ—পাস্তুরের এই মতবাদ। তৃতীয়টি হল, লিস্টারের বীজদূষণ রোধ ব্যবস্থা। ভেষজ বিজ্ঞানের চতুর্থ আবিষ্কারটি হল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে সাময়িক সংজ্ঞাহীন করার ঔষধ প্রয়োগের প্রচলন। এই ঔষধটি আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের সঙ্গে একটি বিষাদময় কাহিনী জড়িত। এতখানি দুঃখবেদনা ও বিপর্যয় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হয়ে এতগুলি ব্যক্তির জীবন আর কখনও এমন ভাবে প্রভাবিত করেনি।

১৮৪২ সালে বস্টন শহরে উইলিয়াম টমাস গ্রীন মর্টন তাঁর ইয়াঙ্কীসুলভ উদ্ভাবনী শক্তি সস্তায় নকল দাঁতের প্লেট নির্মাণে প্রয়োগ করেছিলেন। ডেণ্টাল প্লেটে নকল দাঁত সাঁটবার এক ধরনের রাং তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ডেণ্টাল ব্রিজ তৈরির কাজ তিনি জানতেন। এমন কি কিছু প্লাস্টিক সার্জারির কাজও তিনি করেছিলেন। এই যে নতুন ডেণ্টাল প্লেটটি তিনি নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এটি পূর্বেকার ডেণ্টাল প্লেটগুলির চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের। কিন্তু এটি ব্যবহারের একটি মস্ত অসুবিধা ছিল। এই নকল দাঁতের প্লেট ভাল ভাবে এবং আরামে মুখবিবরে লাগিয়ে রাখবার জন্য পোকা খাওয়া, নড়ে যাওয়া দন্তমূল এমন কি ভাল দাঁতও সম্পূর্ণ তুলে ফেলার

দরকার হত। দাঁত তুলবার সময় কোনও ব্যথা লাগবে না এমনি ব্যবস্থা যদি তিনি করতে পারেন তা হলে বিপুল পরিমাণে এই দাঁতের পাটিগুলি তিনি বিক্রয় করতে পারবেন। তাতে অনায়াসে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হবে। এমনি হাজার হাজার পাটি নকল দাঁতের সেট তিনি তৈরি করছিলেন তখন।

মর্টন আমেরিকার প্রথম দাঁতের স্কুল, বাল্টিমোর কলেজ অব ডেন্টাল সার্জারীর প্রথম স্নাতক ক্লাসে (১৮৪২) পড়েছিলেন। যুগ যুগান্ত ধরে মনুষ্য সমাজে বেদনা প্রশমক ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে আসছিল। কলেজে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা শুনেছিলেন মর্টন। প্রাচীন মিশরীয়গণ স্কন্ধের দুই মহাধমনীতে চাপ প্রয়োগ করে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়ে দেহে সাময়িক অচেতনতার সৃষ্টি করত। চীনারা সাময়িক চৈতন্য লোপ করতে মা ফাট চূর্ণ নামে একপ্রকার পদার্থ ব্যবহার করত। জিনিসটা এক ধরনের ভাং। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তারা এই চৈতন্য-লোপকারী চূর্ণ আবিষ্কার করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা অস্ত্রোপচারের সময় কোকোপাতা ও চুন চিবিয়ে সেই রস ক্ষতস্থানে ছিটিয়ে দিত। ষষ্ঠ শতকে সুইজারল্যাণ্ডবাসী ভেষজ বিজ্ঞান সংস্কারক প্যারাসেলসাস যন্ত্রণা প্রশমনে কাঁচা আফিং ও আফিং-এর আকরের ব্যবহারের বিধান দিয়ে যান। ১৮০৫ সালে সার্টুবনার কাঁচা আফিং থেকে মরফিন নিষ্কাশিত করেন এবং মনুষ্য-সমাজকে একটি অত্যুত্তম বেদনানাশক ঔষধ উপহার দিয়ে যান।

রোগ আরোগ্য করতে গিয়ে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হলে ও অন্যান্য রোগের কবলে পতিত হয়ে মানুষকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানবসমাজ এই যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আর্ত ক্রন্দন করে এসেছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বিদ্যায়তনগুলির জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতগণও মানুষের এই ধরনের বেদনা উপশমের কোনও আশা দেখতে পেতেন না। মর্টন তাঁর নতুন ধরনের দাঁতের প্লেট আবিষ্কারের মাত্র তিন বছর আগে বিখ্যাত ফরাসী অস্ত্র চিকিৎসক আলফ্রেড ভেলপি বলেছিলেন, 'অস্ত্রোপচারকালে যন্ত্রণা বোধ- দূর করার চেষ্টা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এ চেষ্টা করা এখন অর্থহীন। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে 'ছুরি' ও 'যন্ত্রণা' এই দুইটি শব্দ চিরতরে রোগীর চেতনায় যুক্ত থাকবে। এই বাধ্যতামূলক যোগাযোগের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে।'

ইতিমধ্যে কনেটিকাটের হার্টফোর্ডের এক তরুণ দন্ত চিকিৎসক এই

যন্ত্রণা নিরসনের স্বপ্ন দেখছিলেন। দাঁত তোলার সুবিধার জন্য তিনিও সাময়িক অবেদনতা সৃষ্টির কৌশলের সন্ধান করছিলেন। ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হোরেস ওয়েল্‌স হার্টফোর্ডের কুরান্ট (Courant) পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করলেন। এই বিজ্ঞাপনে গার্ডেনার কিউ. কোলটন নামে জনৈক ভ্রাম্যমাণ প্রমোদশিল্পীর বক্তৃতা ও প্রমোদ ক্রীড়া প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রমোদ কৌতুকের তালিকায় একটি বিষয় ছিল হাসি-উদ্রেককারী গ্যাসের প্রতিক্রিয়া।

হাসি-উদ্রেককারী গ্যাস বস্তুত নতুন কিছু নয়। অক্সিজেন আবিষ্কার করারও আগে, ১৭৭২ সালে প্রিস্টলে এই গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন। এর তেইশ বছর পর, হামফ্রি ডেভির বয়স যখন সতেরো তখন তিনি একবার ফুলো দাঁতের মাড়ির যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে খানিকটা এই হাসি-উদ্রেককারী গ্যাস শুঁষেছিলেন। ডেভি প্রাণীদেহের উপর এই গ্যাসের, (নাইট্রাস অকসাইড N_2O) প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, "নাইট্রাস অকসাইড গ্রহণ করলে ব্যাপকভাবে হাসির উদ্রেক ঘটতে পারে। তাই যে সব অস্ত্রোপচারের দ্বারা অতিমাত্রায় রক্ত নির্গত হয় না, সে সব ক্ষেত্রে সম্ভবত বেশ ভালভাবেই এই গ্যাস বেদনা নাশের কাজে ব্যবহার করা চলতে পারে।" তিন বছর ধরে ডেভি যখন ইংলণ্ডের স্রফশায়ারের টমাস বেডোস নামে জনৈক চিকিৎসকের সহকারীরূপে কাজ করছিলেন তখন এই গ্যাসটি হাঁপানি, শ্লেষ্মা ও হিস্টিরিয়া রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হত। অক্সিজেন কার্বন ডাইঅকসাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস রোগীদের শুঁকিয়ে বেডোস কতকগুলি রোগ চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করে-ছিলেন। এই ব্যবস্থা অবশ্য স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। যা হোক, হাসি-উদ্রেককারী এই গ্যাস ফুসফুসে টেনে নিলে যে মজার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এই ব্যাপারটা এক সময় পেশাদার প্রমোদশিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখতে দেখতে প্রমোদ-কৌতুক অনুষ্ঠানের কাছে এই গ্যাসের ব্যবহার ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কৌতুকক্রীড়া পরিদর্শনকালে ওয়েলস ও তাঁর স্ত্রী দেখতে পেলেন কয়েক ব্যক্তিকে কোলটন এই গ্যাস শুঁকতে দিলেন। এরা স্বেচ্ছায় এই গ্যাস শুঁকতে রাজী হয়েছিলেন। গ্যাসের প্রভাবাধীন থাকা কালে বেশ কিছু কালের জন্য এদের বেদনার অনুভূতি লোপ পেয়েছিল। ওয়েলসের ধারণা

হল এই গ্যাসটি দাঁত তোলার সময় বেদনা উপশমের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে বেদনা উপশমকের সন্ধান তিনি করছেন এই গ্যাসের দ্বারাই সে কাজ চলবে। এবিষয়ে তাঁর এমনি নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল যে তিনি এই গ্যাসের বেদনানাশক ক্ষমতা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ও হার্ভার্ড মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সামনে দেখানোর জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। পরীক্ষা প্রদর্শনকালে সম্ভবত কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, সাময়িক অবেদনতা সৃষ্টিতে গ্যাসটির কার্যোপযোগীতা সম্বন্ধে দর্শকবৃন্দ নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না। পরে, ওয়েলস তাঁর একজন রোগীর উপর এই গ্যাস প্রয়োগ করে দেখলেন। গ্যাসের প্রভাবাধীনে থাকাকালে রোগীটি মারা গেল। তিনি দন্ত চিকিৎসা ব্যবসায় ছেড়ে দিলেন। অন্য কয়েক প্রকার ব্যবসা করবার চেষ্টা করলেন। সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলে গভীর নৈরাশ্যে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

ইতিমধ্যে মর্টনের জীবনে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছিল। ইনি ১৮৪২ সালে কিছু কালের জন্য বস্টনে ওয়েলস-এর সঙ্গে একত্র দন্ত চিকিৎসকের ব্যবসা চালিয়েছিলেন। বস্টনের দুঃখজনক পরীক্ষা প্রদর্শনের সময় মর্টন ওয়েলসকে সাহায্য করেছিলেন। ওয়েলস সাময়িক বেদনা প্রশমনকারীরূপে নাইট্রাস অকসাইডের কার্যোপযোগিতা প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় মর্টন এই কাজের উপযোগী অন্য পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন। ভাবলেন, হয়ত ইথারের দ্বারা এই সাময়িক বিবশতা সৃষ্টির কাজ সম্ভব হবে। এই বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থটি কয়েক শতক ধরে মানুষের নিকট সুপরিচিত ছিল। শস্যজাত কোহলের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে এই বস্তুটি প্রস্তুত করার প্রণালী ১৫৪০ সালে ভ্যানেরিয়াস কর্ডাস বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। কর্ডাস ও প্যারাসেলসাস উভয়েই এই বস্তুটির বেদনানাশক শক্তি মুরগী প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীকে সাময়িক অচৈতন্য করে ফেলার ক্ষমতার কথা জানতেন। বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে এই তরল পদার্থটি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং এর গুণাগুণ সম্বন্ধে ১৮১৮ সালে জার্নাল অব সায়েন্স অ্যাণ্ড আর্টস' (Journal of Science and Arts) নামে একটি পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডের পরীক্ষার ফলাফল ইউরোপীয় চিকিৎসকদের বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। কয়েক বছর পর জন ডি. গডম্যান নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীও ইথার নিয়ে

পরীক্ষাকার্য চালালেন এবং এর বেদনানাশক ক্ষমতার প্রতি চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমেরিকার চিকিৎসকগণও গডম্যানের কথায় কর্ণপাত করেননি।

মর্টন নিজে ইথারের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলেন। ওয়েস্ট নীডহ্যামে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বিভিন্ন শ্রেণীর কীটপতঙ্গ, গ্রীনওয়ার্ম, মাছ, মুরগী ছানা ও নিজের স্প্যানিয়েল কুকুরটির উপর এই পদার্থটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দেখলেন। দেখা গেল সাময়িক অবেদনতা সৃষ্টি করতে এটি সক্ষম হচ্ছে। এর পর তিনি নিজের দেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা স্থির করলেন। একটা চেয়ারে বসে রুমালে খানিকটা ইথার ঢেলে নিয়ে হাতে একটা ঘড়ি ধরে তিনি ইথারসিক্ত রুমালখানি নাক ও মুখের কাছে ধরলেন। দেখতে দেখতে অমনি তার চৈতন্য লোপ পেল। পূর্ণ সাত মিনিট পর জ্ঞান ফিরে এল। মর্টন মনে মনে বললেন, এই সময়ের মধ্যে একটি নয়, তিনটি দাঁত তুলে ফেলা যায়। এবার মর্টন তাঁর এক বন্ধুকে বললেন এই ইথার প্রয়োগ করে তাঁকে অচৈতন্য করে তাঁর একটি দাঁত তুলতে। দাঁত তোলার সময় কোনও বেদনা অনুভব করলেন না মর্টন। বস্তুটির দ্বারা যে অবেদনিকের কাজ চলে তা পুনরায় প্রমাণিত হল।

সেইদিন সন্ধ্যায় এবেন ফ্রস্ট নামে এক ব্যক্তি সাংঘাতিক দাঁতের যন্ত্রণায় কোঁকাতে কোঁকাতে মর্টনের ডিসপেনসারীতে এল। তার পিছনের দিককার দাঁতটি জীবাণুদুষ্ট হওয়ায় সে কষ্ট পাচ্ছিল। মর্টন তাকে বললেন, দাঁত তোলার সময় একটা নতুন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে তিনি তাকে ঘুম পাড়িয়ে বিনা যন্ত্রণায় দাঁতটা তুলে ফেলতে পারেন। ফ্রস্ট এই নতুন পদ্ধতিতে দাঁত তুলতে রাজী হলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় ১৮৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মর্টন লোকটির একটি অতি দৃঢ়সংবদ্ধ মাড়ির দাঁত তুললেন। লোকটি কোনও প্রকার ব্যথা-বেদনা অনুভব করল না। মর্টন ফ্রস্টকে দিয়ে এই বেদনাহীন দন্তোৎপাটনের স্বীকৃতিসহ একটি হলফনামা লিখিয়ে নিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর দন্ত চিকিৎসা ব্যবসায় বেশ জেঁকে উঠল।

যেভাবে সাময়িক অচৈতন্যতা আনয়নকালে রোগীদের ইথার শুঁকান হত তা মর্টনের খুব মনোমত হল না। আরও ভাল ভাবে যাতে ইথার প্রয়োগ করা যায় তার জন্য একটি যন্ত্র পরিকল্পনা করে তার একটি নক্সা আঁকলেন। চেম্বারলেন নামে জনৈক যন্ত্র নির্মাতাকে দিয়ে নক্সা অনুযায়ী

একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এই যন্ত্রটি আট ইঞ্চি লম্বা একটি কাচের নল। তার এক মুখে লাগান একটি হোস, আর এক মুখে কর্কের ছিপি দিয়ে আটকান। মর্টন ভেবে দেখলেন, সর্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই এই ইথার অবেদনিকের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। তাতে তার ব্যবসাও বাড়বে। বস্টনের কোনও বিখ্যাত অস্ত্রবিদকে দিয়ে যদি এই বেদনা-প্রশমণকারী পদার্থটি ব্যবহার করাতে পারেন, তা হলে শুধু তিনি নিজে নন, বিশ্বের সকল বেদনাপীড়িত মানবই লাভবান হবেন।

মাসাচুসেট্‌স জেনারেল হসপিটালে তুজন চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পেলেন মর্টন। এরা তাঁর ঔষধ পরীক্ষা করে দেখতে রাজী হয়েছিলেন। ডাঃ জন সি. ওয়ারেন ছিলেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক ও নিউ ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক। ১৮৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার সকালে মাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালের অস্ত্রোপচার কক্ষে একটি রোগীর উপর অস্ত্রোপচার কালে এই ঔষধটি পরীক্ষা করে দেখতে তিনি সম্মত হলেন। নতুন ইনহেলেটর (অবেদনিক ঔষধ আঘ্রাণ যন্ত্র) তৈরি করতে দিলেন। সেটি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার দিন সকালে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন অস্ত্রোপচার কক্ষে। আসতে খানিকটা দেরী হয়ে গিয়েছিল তাঁর। রোগী গিলবার্ট অ্যাবটের চোয়ালের ঠিক নিচেই ডান দিকে একটা টিউমার হয়েছিল। এটি কেটে ফেলতে হবে। মর্টন রোগীর কাছে এগিয়ে গেলেন। কাচের ইনহেলেটরের কর্ক খুললেন। অ্যাবট নলটি টেনে নিয়ে মুখের কাছে ধরলেন। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

ওয়ারেন দ্রুত ও অতি দক্ষতার সঙ্গে ছুরি চালিয়ে টিউমারটি কেটে ফেললেন। রোগী তখনও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার চেতনা ফিরে এল। ওয়ারেন জিজ্ঞাসা করলেন অস্ত্রোপচার কালে তিনি কোনও বেদনা অনুভব করেছেন কি না। অ্যাবট বললেন, না। সামান্য একটু ছড়ে যাবার মত ঠেকেছে তাঁর। ডাঃ হেনরি জে. বিগলো এবং সমবেত অন্যান্য চিকিৎসকদের লক্ষ্য করে ডাঃ ওয়ারেন এবার সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ভদ্রমণ্ডলী! এ কোনও ধাপ্পাবাজি নয়।' কানে তালা লাগানো সরব প্রশংসা শুরু হল। চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে রোগীকে অস্ত্রোপচার কক্ষ হতে সরিয়ে নেওয়া হল। ডাঃ বিগলো বললেন, 'আজ আমি এমন একটা ব্যাপার দেখতে পেলাম যার কথা অচিরে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে।'

এই পরীক্ষার এক মাস পর ডাঃ বিগলো বস্টন মেডিকেল অ্যাণ্ড সার্জিক্যাল জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞান জগতকে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা জানালেন। চিকিৎসা জগতে এক নূতন যুগের সূচনা হল। ইংলণ্ডের ভেষজ বিজ্ঞানের বিখ্যাত পত্রিকা 'ল্যান্সেট' লিখল, 'ডাঃ মর্টনের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানুষের বিপুল জ্ঞান ও আবিষ্কাররাজির অন্তর্ভূক্ত হবে। এই অবেদনিকের আবিষ্কারক যে একজন আমেরিকাবাসী তা আটলান্টিক সাগরের পরপারে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে এক অতি গৌরবের বিষয়। ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ সম্পর্কিত আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানে এটি আমেরিকার দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম অবদান।' এক ধাক্কায় ভেষজ বিজ্ঞান বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল। ইথারের সাহায্যে সাময়িক অবেদনতা সৃষ্টির ক্ষমতা লাভের আগে যে সব অস্ত্রোপচার দুঃসাধ্য বলে মনে হত, অস্ত্র চিকিৎসকগণ এবার সে ধরনের অস্ত্রোপচারেও হাত দিতে সাহসী হলেন। ইতর প্রাণী দেহের উপর অস্ত্রোপচারের পরীক্ষাও নূতন প্রেরণা লাভ করল এই আবিষ্কারে। ১৮৪৬ সাল শেষ হবার আগেই লণ্ডন ও প্যারিসের অস্ত্র চিকিৎসকগণ অবেদনিকরূপে ইথার ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। পরের বছরের প্রথম দিকে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের সময় এই অবেদনিকটির সাহায্য নিতে থাকেন।

যাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর ঘটনার কথা পাঠ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এডিনবরা হাসপাতালের অস্তবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জেমস্ ইয়ং সিম্পসন। তিনি অবিলম্বে প্রসূতিদের প্রসবকালীন বেদনা উপশমে এই ইথারের প্রয়োগ শুরু করে দিলেন। এর ব্যবহারের কয়েকটি খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াতে তিনি একটি বিকল্প বেদনানাশকের সন্ধান করতে লাগলেন। ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের চেষ্টা করলেন। এই উদ্বায়ু তরল পদার্থটি সুদূর লেক অন্টারিওর তীরে কর্মনিযুক্ত থাকাকালে সামুয়েল গুথরি নামে সেনাবাহিনীর জনৈক সার্জেন প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৩০ সালের শেষের দিকে গুথরি শস্যজ সুরাসারের সঙ্গে চুনের ক্লোরাইড মিশিয়ে এই বেদনানাশক রাসায়নিক পদার্থটি তৈরী করেন। পরীক্ষার ফলাফল তিনি ১৮৩২ সালের আগে প্রকাশ করেননি। ঐ বৎসরই আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে তাঁর ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়েই অন্য দুজন রসায়নবিদ ফ্রান্সের সৌবেইরান ও জার্মানীর লেইবিগ পৃথক পৃথক ভাবে এই একই আবিষ্কার করেন।

ডঃ সিম্পসন প্রথমে খরগোশ ও অন্যান্য ছোট প্রাণীর উপর ক্লোরোফর্মের ক্রিয়ার পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা আশাপ্রদ মনে হলে তিনি ও তাঁর দুজন বন্ধু বস্তুটি শুঁকে নিশ্চিন্ত হলেন যে এটি নিরাপদ এবং সাময়িক অচৈতন্যতা সৃষ্টিতে সক্ষম। পরবর্তী পর্যায়ের কাজে হাত দিলেন তিনি ১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসে। এই সময় হতে প্রসবকালে প্রসব বেদনা উপশম করানোর কাজে তিনি ক্লোরোফর্মের ব্যবহার শুরু করেন। এইভাবে স্বাভাবিক প্রসব বেদনা প্রশমনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন স্কটল্যাণ্ডের ধর্মশাস্ত্রবেত্তারা। তাঁদের মতে এই কাজটা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী। পাঁচ বছর ধরে ঘোর বিতর্ক চলল এ নিয়ে। বিতর্কের অবসান ঘটল ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন ক্লোরোফর্মের দ্বারা প্রসব বেদনামুক্ত হয়ে তাঁর পঞ্চম পুত্র প্রিন্স লিওপোল্ডের জন্ম দিলেন, তার পর।

ইথার নাইট্রাস অক্সাইড ও ক্লোরোফর্ম যখন বেদনা উপশম করে মানুষের প্রাণ রক্ষা করে চলেছে, তখন এ বস্তুগুলির কোন্‌টি আগে আবিষ্কৃত হয়েছে তা নিয়ে ও ইথারের পেটেন্টের স্বত্ব নিয়ে এক তীব্র বিতর্ক দেখা দিল। তথাকথিক ইথার বিতর্কের কথা এখানে বিবৃত করা যেতে পারে। যে কোন যুগেই এই ব্যাপারটা ঘটতে পারত। কিন্তু তখনকার দিনে অতি দ্রুত বড়লোক হবার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা ও পেটেন্টধারীদের স্বার্থরক্ষায় আমাদের আইনের দুর্বলতার জন্যই তখন বিশেষ করে এমনি ব্যাপার ঘটা সম্ভব হয়েছে। তখনকার দিনে ইয়াঙ্কীদের উদ্ভাবন প্রবণতা চরমে উঠেছিল, নিত্যই এক একটি নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হচ্ছিল। খুব দ্রুত লোকের অর্থাগম হচ্ছিল। সুকৌশলী আবিষ্কারকদের আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুত বিত্তবান হবার জন্য মানুষ ছিল সদাই উন্মুখ।

অবেদনিকরূপে কে প্রথম ইথারের উপযোগিতা আবিষ্কার করেছিলেন? এ নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তার জট খুলে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝান সহজ কাজ নয়! ডাঃ মর্টনের ইথারের সাময়িক অবেদন সৃষ্টি ক্ষমতা আবিষ্কার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে কাহিনী বলা হয়েছে, তা থেকে ভিন্ন ধরনের আর এক কাহিনী শোনা যায় ডঃ চার্লস টি. জ্যাকসন সম্বন্ধে। নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা থেকে তাঁর কাহিনী দাঁড়ায় এই: মর্টন যখন দন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত তখন পড়াশুনার জন্য হাভার্ড কলেজের মেডিকেল স্কুলে ঢুকেছিলেন। এখানে তাঁর ডঃ

জ্যাকসনের সঙ্গে পরিচয় হয়। বস্টনে থাকা কালে তিনি তাঁর বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেছিলেন। জ্যাকসন একজন চৌকস বিজ্ঞানী, নিজস্ব একটি রাসায়নিক বীক্ষণাগার ছিল তাঁর; ভূতত্ত্ববিদ্যার চর্চা করতেন, মাথায় ঘুরত নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফন্দী-ফিকির। দাঁত তোলার কাজে অবেদনিক হিসাবে নাইট্রাস অক্সাইডের কথা মর্টন উল্লেখ করলে, জ্যাকসন তাকে ইথার ব্যবহার করে দেখতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, মর্টন যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান তা হলে জ্যাকসন তাঁকে খানিকটা বিশুদ্ধ ইথার সরবরাহ করতে পারেন। জ্যাকসন আরও জানালেন যে, দৈবাৎ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাত্রাধিক ক্লোরিন গ্যাস টেনে নিয়ে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিবারণ করতে তিনি এই রসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করেছেন। ইথারের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে প্রতিটি তথ্য মর্টন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিন্তু জ্যাকসনকে অংশীদার করে নেওয়া বা তার সঙ্গে কোনও প্রকার চুক্তি সম্পাদন করলেন না। মানুষ হিসাবে জ্যাকসনের খুব সুযশ ছিল না।

মর্টন বলেছিলেন, অস্ত্রচিকিৎসায় অবেদনিকরূপে ইথারের প্রয়োগ সাফল্যের সঙ্গে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করতে পারলে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। জ্যাকসন বললেন, মর্টনের উচিত আগে ম্যাসেচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালের ডঃ ওয়ারেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। যা হোক, এসব কাজ করবার আগে মর্টনকে কোন ট্রেডমার্কা দিয়ে জিনিসটার একটা পেটেন্ট দিয়ে নিতে তিনি পরামর্শ দিলেন। মর্টনস্ লিথিয়ন —এই ট্রেডমার্কা দিয়ে মর্টন তাঁর নিজের ও জ্যাকসনের নামে পেটেন্টের জন্য আবেদন করলেন। ইথার ও ইথার ইনহেলেটর বিক্রি করে যে মুনাফা লাভ করবেন, তার শতকরা দশ ভাগ তিনি জ্যাকসনকে দিতে রাজী হলেন। জ্যাকসন প্রথমে এই ব্যবস্থায় রাজী ছিলেন। পরে তাঁর ভয় হল, যদি সাধারণের সমক্ষে অবেদনিক হিসাবে ইথারের উপযোগিতা প্রমাণিত না হয়? তাই তিনি রয়েলটি বাবদ অর্থের দাবী ছেড়ে দিলেন। মর্টনের কাছে চাইলেন তাকে 'ইথার সম্বন্ধীয় পরামর্শ দেবার' জন্য শুধুমাত্র নগদ পাঁচশত ডলার।

অবেদনিক ঔষধ হিসাবে ইথার যে কোনও ধোঁকাবাজি নয়, ডাঃ ওয়ারেন জগদ্বাসীকে একথা জানানোর পরও মর্টন জিনিসটার প্রকৃতি গোপন

রেখেছিলেন। ডাঃ ওয়ারেনের ঐতিহাসিক পরীক্ষার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১২ই নবেম্বর, মর্টন তাঁর এই অবেদনিকটির জন্য পেটেণ্ট প্রাপ্ত হলেন। মর্টনস লিথিয়ন এই নামে পেটেণ্ট পেয়েছিলেন। পেটেণ্টের নম্বর পড়েছিল ৪৮১৮। এবার তিনি ওয়ারেন ও বিগলোর কাছে তাঁর অবেদনিকের প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করলেন। বিগলো ঔষধটির স্বরূপ বস্টনের মেডিক্যাল অ্যাণ্ড সার্জিক্যাল জার্নালে প্রকাশ করলেন। এই অবেদনিক আবিষ্কারের কথা ১৯শে ডিসেম্বর ইউরোপগামী একটি জাহাজযোগে ইউরোপে প্রেরণ করা স্থির হয়েছিল। জ্যাকসন সেই জাহাজেই এলি ছ বীমণ্ট নামে ফ্রেঞ্চ একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য তাঁর এক বন্ধুর নিকট চিঠি পাঠালেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অবেদনিক হিসাবে ইথারের উপযোগিতা যে তিনিই মর্টনের আগে আবিষ্কার করেছেন, ফ্রেঞ্চ একাডেমীতে অবিলম্বে এই দাবী উত্থাপন করতে।

অবেদনিক হিসাবে ইথার বিক্রয় করে যে প্রচুর অর্থাগমের সুযোগ রয়েছে জ্যাকসন তা কোনক্রমেই হারাতে রাজী ছিলেন না। ১৮৪৭ সালের ২রা মার্চ বস্টন একাডেমীর সভায় তিনি নিজেকে এই নতুন ইথার অবেদনিকের একমাত্র আবিষ্কর্তা বলে ঘোষণা করলেন। মর্টনের কথা কোনওরূপ উল্লেখ করলেন না। হোরেস ওয়েলসও ১৮৪৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর হার্ডফোর্ট কুরাণ্টে (Courant) বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে এই অবেদনিক আবিষ্কারে তাঁর দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন।

মর্টন সারা বিশ্বে ব্যাপক ভাবে তাঁর এই অবেদনিক বিক্রয়ের পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু এই আবিষ্কার থেকে যে বিপুল অর্থোপার্জনের আশা তিনি করেছিলেন কার্যতঃ সে আশা পুরণ হল না। ডাঃ ওয়ারেন তাঁদের হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য একটি ইথার ইনহেলেটর চেয়ে পাঠিয়ে মর্টনকে জানিয়েছিলেন যে এর জন্য তাঁকে অর্থ দেওয়া হবে। কিন্তু মাসাচুসেট্স মেডিক্যাল সোসায়িটির সভ্যগণ এই অর্থদানের তুমুল বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, ইথার অবেদনিক ব্যবহারের জন্য এমনি অর্থ প্রদান হবে 'নীতিশাস্ত্র বিরোধী'। মর্টন তখন ওয়ারেনের এই হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে তাঁর এই ইনহেলেটর বিনামূল্যে প্রেরণ করলেন। মেক্সিকোর যুদ্ধে স্থল ও নৌবাহিনী ইথার অবেদনিক ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তার জন্য সরকারের নিকট হতে মর্টন কোনও ক্ষতিপূরণ পান নি। পৃথিবীর সর্বত্র অস্ত্র চিকিৎসক

ও দন্ত চিকিৎসকগণ এবং হাসপাতালসমূহ, কোন প্রকার রয়েলটি না দিয়েই অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করে চলল। মর্টনের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে গেল। অবেদনিক ইথারের উপযোগিতা আবিষ্কার করায় তার যে রয়েলটি প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল, তা তিনি পাননি কোন কালেই। ১৮৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের (যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট) নিকট রয়েলটির বদলে তাঁকে অর্থ সাহায্য দেবার জন্য আবেদন করলেন। জ্যাকসন যদি তাঁর দাবী না তুলতেন, তা হলে মর্টন হয়ত এই অর্থ সাহায্য পেতেন। কিন্তু জ্যাকসন দাবী করে বসলেন যে তিনিই মর্টনের আগে অবেদনিক রূপে ইথারের উপযোগিতা আবিষ্কার করেছেন। তিনি আরও জানালেন যে পীড়িত আর্ত-মানবের দুঃখ থেকে তিনি অর্থোপার্জন করতে চাননি বলেই এই আবিষ্কারের পেটেণ্টে তাঁর অংশের রয়ালটির দাবী তিনি ত্যাগ করেছেন। তিনি মর্টনকে একজন হাতুড়ে ডাক্তার ও "অসৎ চরিত্রের লোক" বলে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এই সময় হোরেস ওয়েলস আত্মহত্যা করায় মর্টনের আরও মুস্কিল হল। ওয়েলস-এর স্ত্রীও কংগ্রেসের নিকট ইথার অবেদনিক আবিষ্কারক রূপে তাঁর মৃত স্বামীর সপক্ষে দাবী উত্থাপন করে অর্থ সাহায্যের আবেদন করলেন। ওয়েলস-এর স্ত্রীর এই দাবী সেনেটর ট্রুম্যান স্মিথ মর্টনকে কোনও রূপ অর্থ সাহায্য না দেবার সপক্ষে আরও জোরালো যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করলেন। এই নিয়ে কংগ্রেসে বহু অনুসন্ধান চলল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারীর পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল।

ইউরোপও এই ইথার বিতর্কে খানিকটা অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৫০ সালে ফ্রেঞ্চ একাডেমী অব সায়েন্স ৫০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের মনটিয়ন পুরস্কার 'বিশ্ব মানবের দুজন পরম হিতকারী' মর্টন ও জ্যাকসনের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতে চেয়েছিলেন। মর্টন পরম ক্রোধভরে তাঁর অংশের পুরস্কারের অর্থ প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন এই অর্থ দিয়ে তাঁর সম্মানার্থে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হল। ইংল্যাণ্ডে মর্টনকে দেবার জন্য ৫০,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু একথা জ্যাকসনের বন্ধুবান্ধবের কানে আসতেই তাঁরা এমন ঘোরতর প্রতিবাদ ও হৈচৈ শুরু করলেন যে শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থ দাতাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। মর্টন তার এক আধলাও পেলেন না।

অবেদনিক হিসাবে বিশ্ববাসীকে ইথার উপহার দেবার আট বছর পরও

এই অবেদনিকের আবিষ্কারকরূপে মর্টনকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়ে সিনেটে বিতর্ক চলেছিল। জ্যাকসন তখনও সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মর্টনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় তিনি খবর পেলেন, ইথার অবেদনিক আবিষ্কারের দাবী নিয়ে তাঁর সঙ্গে মর্টনের যে বিরোধিতা চলছে তাতে জর্জিয়ার এক গ্রাম্য ডাক্তারের সাক্ষ্য তাঁর কাজে লাগতে পারে। ১৮৫৪ সালের ৮ই মার্চ তিনি ছুটলেন জর্জিয়ার এথেন্স নামক স্থানে। এখানেই ঐ ডাক্তারটি বাস করতেন। অবেদনিকরূপে তিনি কোনকালে ইথার ব্যবহার করেছেন কিনা একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন জ্যাকসন। ডাঃ ক্রফোর্ড ডব্লিউ লং জানালেন, সত্যই তিনি ইথার ব্যবহার করে প্রথম অস্ত্রোপচার করেন। সে হল ১৮৪২ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে, ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হাসপাতালে ঐতিহাসিক পরীক্ষার চার বছর আগে।

ক্রফোর্ড লং কেনটাকির ট্রান্সিলভানিয়া কলেজে পড়াশুনা করেন। পরে তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের একজন অতি মেধাবী ছাত্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কলকৌশলের সাহায্যে ক্রীড়াপ্রদর্শনকারী একজন ভ্রাম্যমাণ বাজিকরকে হাসিউদ্রেককারী গ্যাসের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে দেখে প্রথম ক্রফোর্ড তা থেকে অবেদনিক ঔষধ প্রস্তুতের কথা চিন্তা করতে থাকেন। পরে, ইথারের প্রভাবেও যে মানুষের মাঝে কৌতুককর প্রমত্ততা দেখা দেয়, সে খবরও দেশের এই সুদূর প্রত্যন্ত ভাগ জর্জিয়ার ক্ষুদ্র মফস্বল শহর জেফারসনেও গিয়ে পৌছাল। ইথার প্রয়োগ করে নানা কৌতুক রঙ্গ সৃষ্টির প্রচলন হল। ক্রফোর্ড লং নিজে এমনি কতকগুলি ইথার প্রভাবিত কৌতুক রঙ্গানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। একদিন লং লক্ষ্য করলেন কয়েকটি যুবক ইথারের প্রভাবে কৌতুক রঙ্গে মেতে নিজেদের মধ্যে বেদম মারপিট করেছে, দেহে কালশিরা পড়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওরা তাতে কোনও প্রকার বেদনা অনুভব করছে বলে মনে হচ্ছে না। একদিন সন্ধ্যায় জেমস্ এম. ভেনেবল নামে তাঁর এক তরুণ বন্ধু গলার পিছনে তাঁর দুটি বিশ্রী টিউমার সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য তাঁর কাছে এলেন। লং তাকে ইথারের প্রভাবাধীনে বিবশ করে তার টিউমার দুটি অস্ত্র প্রয়োগে কেটে ফেলার প্রস্তাব করলেন। ভেনেবল রাজী হলেন। ১৮৪২ সালের ৩০শে

মার্চ। লং একটা তোয়ালেতে খানিকটা ইথার ঢেলে, তোয়ালেটা বন্ধুবরের নাকের কাছে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে ইথার প্রভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেই অমনি তিনি তার টিউমার কাটতে শুরু করে দিলেন। একটা টিউমার অপসারিত হলেই ভেনেবলের চেতনা ফিরে এল। লং বুঝতে পারলেন, অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করে মানুষের ইতিহাসে তিনিই প্রথম অস্ত্রোপচার করলেন।

কি ভেনেবল, কি লং, কেউই খবরটা কাগজে ছাপানোর জন্য বা ওষুধটার পেটেণ্ট নেবার জন্য ব্যস্ত হননি। লং-এর বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। এই যুগান্তরকারী ঘটনার কথা তিনি কোন মেডিকেল সোসায়িটিতেও পর্যন্ত জানাননি। আবার একবার তিনি এই পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। সেই বছরেরই ৬ই জুন তিনি দু ডলার ফি নিয়ে অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করে ভেনেবলের গলার দ্বিতীয় টিউমারটি কাটলেন। পরের মাসেই এমনি ভাবে একটি নিগ্রো যুবকের জীবাণুদূষিত পদাঙ্গুলি ছেদন করেন। পরবর্তী চার বছরে অবেদনিক রূপে ইথার ব্যবহারের ছোটখাট আটটি অস্ত্রোপচারের বিবরণী লং-এর নোট বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবেদনিকরূপে ইথারের প্রয়োগ চলতে পারে কিনা এবিষয়ে তাঁর কিছুটা সন্দেহ ছিল। প্রথম ইথার ব্যবহারের সাত বছর পর পর্যন্ত, তিনি এই বিষয় কোনও পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেননি। ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সাউদার্ন মেডিকেল অ্যাণ্ড সার্জিক্যাল জার্নালে, "অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দি ফার্স্ট ইউজ অব সালফিউরিক ইথার বাই ইনহেলেশান অ্যাজ অ্যান অ্যানাএসথেটিক ইন সার্জিক্যাল অপারেশন" এই নামে এই তথ্যটি প্রকাশ করলেন।

আমেরিকার সীমান্ত ভাগে রচিত ভেষজ বিজ্ঞানের আর একটি বিস্ময়কর কাহিনী ধীরে ধীরে বলে গেলেন লং। জ্যাকসন একমনে শুনলেন তাঁর সব কথা, তারপর ফিরলেন ওয়াশিংটনে। কাহিনীটা জানালেন জর্জিয়ার সেনেটর উইলিয়াম সি. ডসনকে। যে সিনেট কমিটি মর্টনের দাবী সম্পর্কে তদন্ত চালাচ্ছিল ইনি তার সভ্য।

ষোল বছর ধরে পেটেণ্টের জন্য এই সংগ্রাম চলল। শেষ পর্যন্ত জ্যাকসন বিজয়ী হলেন। মর্টনের পেটেণ্টের অধিকার সরকারী ভাবে ১৮৬২ সালের ১লা ডিসেম্বর নাকচ করে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল.

মর্টন উত্তরাঞ্চলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। শত শত আহত ইয়াঙ্কী সৈন্যের চিকিৎসায় অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করলেন। ক্রফোর্ড লং ওদিকে দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে যোগ দিলেন এবং জেনারেল লীর স্থল বাহিনীতে অবেদনিক হিসাবে ইথারের প্রচলন করলেন।

যুদ্ধের ভয়ভীতি ও আতঙ্কের মাঝেও মর্টন ইথারের অবেদনিক আবিষ্কারকরূপে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠিত করার ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথা ভুলতে পারেন নি। অতি অন্যায়ভাবে প্রবঞ্চিত হয়েছেন, এমনি একটা মনোভাব শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সর্বদাই তিনি চিন্তা করতেন। ভাবতেন জ্যাকসনের কথা। ইনি তখনও তাঁর শত্রুতাচরণ করে চলেছেন। অবেদনিক রূপে ইথারের প্রয়োগ আবিষ্কারকরূপে জ্যাকসনের দাবী সমর্থন করে ১৮৬৪ সালে একটি সাময়িকপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মর্টন যখন নিউইয়র্কে তখন তিনি এই প্রবন্ধটি সেখানে পাঠ করেন। এই শেষ আঘাতটি তাঁর পক্ষে হল অতি দুঃসহ। সহসা রক্তের চাপ অতিরিক্ত বেড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং কিছুকাল পর সেন্ট লিউকস্ হসপিটালে মর্টন মারা গেলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তানকে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব রেখে যান। জ্যাকসনের শেষ পরিণতিও এর চেয়ে বিশেষ ভাল হল না। দীর্ঘকাল মাত্রাধিক মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল। স্বভাবে দেখা দিল অতি উগ্রতা। তাতে তাঁকে পাগলা গারদে আটক রাখার প্রয়োজন হল। সেইখানেই ১৮৮০ সালে তাঁর মৃত্যু হল। ইথার অবেদনিক বিতর্কে জড়িত শেষ নায়ক, লঙ দু বছর আগে স্বাভাবিক ভাবে মারা গিয়েছিলেন।

এই শোচনীয় বিতর্কে উৎক্ষিপ্ত ধুলিজাল থিতিয়ে গেলে দেখা গেল পৃথিবীকে যাঁরা এই ইথার অবেদনিক স্বরূপ মহাসম্পদ দান করে গেছেন, তাঁদের সকলের ভাগ্যেই খ্যাতির পশরা মিলেছে সমান ভাগেই। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লংকে তাদের ছাত্র বলে দাবী করত। তারা তাদের ভেষজ বিজ্ঞান সৌধে এই মর্মে একটি ব্রোঞ্জ ফলক স্থাপন করল: "অস্ত্রচিকিৎসায় অবেদনিক রূপে প্রথম ইথার ব্যবহারকারী লং-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।" তাঁর প্রস্তরমূর্তি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাটুটরী হলে প্রতিষ্ঠিত হল। বস্টন শহর ডাঃ মর্টনের শাশ্বত স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক অপরূপ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করল। যে টেবিলে বসে তিনি প্রথম ইথার প্রয়োগ করেন সেটি

ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালের পুরানো অংশের গম্বুজ ঘরের একটি বেদীর উপর সযত্নে রক্ষিত হল। হার্টফোর্ড কনেটিকাট শহর হোরেস ওয়েলস-এর স্মৃতিরক্ষাকল্পে বুসনেল পার্কে একটি স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সম্মানার্থে ট্রিনিটি কলেজ গির্জায় কারুকার্যখচিত একটি সংরক্ষিত আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্লিমেথে ম্যাসাচুসেট্সের পিলগ্রিম হলে একটি দোলনা চেয়ার প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তার গায়ে একটি ফলকে এই কথাগুলি খোদিত: "এই চেয়ারে বসে ডঃ চার্লস জ্যাকসন, ১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অবেদনিক রূপে ইথারের উপযোগিতা আবিষ্কার করেন।"

আমেরিকার ইতিহাসের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়েই আমেরিকার সীমান্ত পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত পৌছাল। ১৮৩৬ সালে টেক্সাস্ মেক্সিকো থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিল। এর আট বছর পর টেক্সাস্ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্যরূপে যোগ দিল। ইংল্যাণ্ড অরিগনের সীমান্ত সম্পর্কে চুক্তিতে রাজী হওয়ায় ওয়াশিংটন, আইডাহো, মন্টানা, ওয়াওমিং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। দুবছর পর মেক্সিকোর সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ায় আমাদের সৈন্য বাহিনী রিও গ্রাণ্ড নদীর চতুর্দিকস্থ অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছু সৈন্য হত হয়। প্রেসিডেণ্ট জেমস্ কে. পোল্‌ক যুদ্ধ ঘোষণার দাবী করলেন। জন সি. ফ্রেমণ্ট ক্যালিফোর্নিয়ার ভূবিবরণী ও ভূমি সংস্থানের পরিচয় সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি মেক্সিকোবাসী আমেরিকানদের উস্কানী দিয়ে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করালেন। ১৮৪৬ সালের ৭ই জুলাই মনটেরি বন্দরে কমোডোর জন স্লোট বিধিবৎ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া দাবী করলেন। উনিশ মাস পর মেক্সিকো যুদ্ধের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বর্তমান কালের ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, নেভাদা, ইউটা, কালোরডোর খানিকটা অংশ, ও ওয়াওমিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। পরিশেষে আমরা ১৮৫৩ সালে মেক্সিকোকে ১০,০০০,০০০ ডলার মূল্য দিয়ে মেক্সিকো ও আরিজোনার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড ক্রয় করলাম। একে বলা হয় গ্যাডসডেন পারচেজ।

বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্যবেক্ষক ও প্রচারক হিসাবে ফ্রেমণ্ট আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে জনবসতি স্থাপনে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪২ সালে তিনি পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত একটি অভিযানের নেতৃত্ব করেন। এই অভিযাত্রী দল মিসিসিপি নদী পার হয়ে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। এ অঞ্চলে

ইতিপূর্বে মেজর স্টেপেন এইচ. লং-এর নেতৃত্বে আর একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। তখন লং এ অঞ্চল পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে বলেছিলেন, মিজুরী নদী ও রকি পর্বতমালার পাদদেশের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল উষর, অনুর্বর। লং-এর এই সিদ্ধান্ত ফ্রেমণ্ট মানতে রাজী হলেন না। পরবর্তী বছর আর একটি অভিযানে বেরিয়ে তিনি সিয়েরে পর্বতমালা অতিক্রম করলেন। এ অঞ্চল সম্বন্ধেও আর একটি বিবরণী লিখলেন। ১৮৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এই বিবরণী প্রকাশ করলেন। মুদ্রিত বিবরণীর দশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি এই বিবরণী পুস্তক থেকে আংশিক উদ্ধৃতি ছাপে। এইভাবে অসংখ্য মানুষ এই বিবরণী পাঠ করে। এই বিবরণী পুস্তক পাঠ করেই ১৮৪৭ সালে ব্রিগহাম ইয়ং তাঁর মরমন সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়ে গ্রেট সল্ট লেক অঞ্চলে যান। ফ্রেমণ্ট এ অঞ্চলটির বিবিধ তথ্য বৈজ্ঞানিক-সুলভ অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত বর্ণনা করেছিলেন। ইয়ঙের দেখাদেখি অন্যরাও এখানে এল। এরপর অন্য এক কারণে এই নতুন পশ্চিমাঞ্চলে দলে দলে লোক উন্মত্তের মত ছুটে আসতে লাগল।

মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার নয় দিন আগে কোলোমাতে বিপুল গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটল। কোলোমা জায়গাটা বর্তমানে যে স্থানে স্যাকরামেণ্টো শহরটি অবস্থিত তার সন্নিকোটে অবস্থিত। ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী সকালে এখানে জেমস এ. মার্শাল আমেরিকান নদীবক্ষ থেকে খানিকটা হরিদ্রাভ ধাতুপিণ্ড কুড়িয়ে পেলেন। জিনিসটা নিয়ে তিনি ছুটলেন সাটারের ফোর্টে, এখানে জন এ. সাটার নামে এক ব্যক্তির অধীনে তিনি কাজ করতেন। সাটার হরিদ্রাভ ধাতুপিণ্ডটি পরীক্ষা করে বুঝলেন এটি খাঁটি সোনা। এই দারুণ উত্তেজনাময় খবরটা তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন চেপে রাখবার। কিন্তু চেপে রাখা গেল না। দেখতে দেখতে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সোনার সন্ধানে স্যাকরামেণ্টোর পুরুষ অধিবাসীদের তিনভাগের দুভাগই ছুটল কোলোমা অভিমুখে। মোনটেরিস্থ আমেরিকান কনসাল সরকারীভাবে ঘটনাটির বিবরণী ওয়াশিংটনে লিখে পাঠালেন।

খবরটা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পাঠানোর চারমাস পর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের কানে এল। তখন 'তারা যেন উন্মাদ হয়ে উঠল'। সোনা আবিষ্কৃত হবার এক বৎসর পর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত ক্যালিফোর্নিয়ায়

ছুটে গিয়াছিল প্রায় ৪৫০০০ লোক। অনেকে পরিবার-শুদ্ধ সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছোট ছোট দলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন এরা। রওনা হবার আগে সকলে যে যতটা পেরেছিলেন ঔষধপত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন, যথাসম্ভব ডাক্তারী জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছিলেন। পথে অসুস্থ হলে এই ঔষধপত্র ও সামান্য ডাক্তারী জ্ঞান দিয়ে একে অন্যের চিকিৎসা করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রী অধিকাংশ স্বর্ণশিকারীদের পক্ষে সুদীর্ঘ স্থলপথ ধীরে উন্মত্তের মত পশ্চিমাঞ্চলে ছোটার ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ স্বরূপ। পথে রোগাক্রান্ত হয়ে যত লোক মারা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশী লোক মারা পড়েছিল পথের প্রখর দাবদাহ, তীব্র শীত, কীটপতঙ্গের উপদ্রব, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রেড ইণ্ডিয়ানদের শত্রুতাচরণে। যারা স্থলপথের কষ্টে ভয় পেলেন তাঁরা দ্রুতগামী ও নিয়মিত যাতায়াতকারী যাত্রীবাহী জাহাজে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হর্ন ঘুরে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে হাজির হলেন। দ্রুত-লিখিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পুস্তিকায় এই পথে পথে ছড়ানো স্বপ্নের স্বর্ণভূমির কাহিনী পাঠ করেছিল ইউরোপের বহু লোক। রাতারাতি বড় হবার আশায় তাদের অনেকে আমেরিকায় ছুটে এসে এই ক্যালিফোর্নিয়া-যাত্রীদের দলে ভিড়ল।

সোনার লোভে অতি-দ্রুত পশ্চিমের ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে যাবার লোকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল বিপুল। সকলেই অন্যের আগে ক্ষিপ্রগতিতে সেখানে পৌছাতে চায়। এ ঘটনা লক্ষ্য করে 'সায়েণ্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার সম্পাদক রুফাস পোর্টার একটি অভিনব পরিকল্পনা ফেঁদেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ সংগ্রহার্থীদের তিনি সাত টনের একটি বেলুনে চড়িয়ে আমেরিকার বিশাল প্রান্তর, ও পর্বতমালা পার হয়ে পশ্চিমের স্যাকরামেণ্টো উপত্যকায় পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেকে দুইশত ডলার মাশুল দিয়ে প্রায় দুইশত জন দুঃসাহসী ব্যক্তি এই বিমান-যাত্রার টিকিট কিনে বসলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন কোনও বেলুন নির্মিত হল না। বাতাসের চেয়ে হালকা ব্যোমযান তৈরি হবার তখনও অনেক দেরী ছিল। কিন্তু সেই প্রাণোচ্ছল, দুঃসাহসী, উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্দান্ত নরনারীর দল মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়ার মাটি থেকে হাজার কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণ সংগ্রহের সময় আরও অনেক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

॥ ৭ ॥

জোসেফ হেনরি

(১৭৯৭-১৮৭৮)

বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন

আমেরিকার পশ্চিম সীমান্ত যতই প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, এদিককার নতুন নতুন অঞ্চলে বাসভূমি স্থাপন, কৃষিক্ষেত্র রচনা ও খনিজ ও শিল্প সম্পদ আহরণ সম্ভব হল, তখন এই সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে পৌছাবার আরও ভাল পথঘাট ও দ্রুতগামী যানবাহন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল। রেড ইণ্ডিয়ানদের চলাচলের সংকীর্ণ পথ বা ঘোড়ায় চড়ে চলবার উপযোগী সরু পথ দিয়ে তখন আর কাজ চলছিল না। প্রয়োজন হল, উন্নততর ও প্রশস্ততর রাজপথ নির্মাণের। কৃষিজাত দ্রব্য ও পণ্য একস্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণের জন্য কৃষক ও বণিক সম্প্রদায় আরও ভাল রাস্তাঘাটের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। মোটা লাভের আশায় ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন একদল লোক তাদের এই প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এলেন। এরা নিজ ব্যয়ে বহু রাস্তা নির্মাণ করলেন। এই সব রাস্তা ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট ফটকে এসে শুল্ক দিতে হত। শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তা নির্মাণের কাজে হাত দিলেন। ১৮০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কামবার্ল্যাণ্ড রোড নির্মাণ অনুমোদন করলেন। ১৮৩৮ সাল নাগাদ এই রাস্তাটি মেরীল্যাণ্ডের কামবার্ল্যাণ্ড থেকে ৮৩৪ মাইল দূরে ইলিনয়ের ভানডালিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

জলপথে চলাচল ব্যবস্থা অবশ্য তখনও বেশ সুলভ, অধিকতর আরামপ্রদ ও অনেক কম বিপদ-সংকুল ছিল। নদীপথে চলাচলের কাজ তখন ব্যবহৃত হত রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্যানু নৌকো ও চ্যাপ্টাতল নৌকো। এগুলি ছিল খুবই মন্থর গতি। জেমস ওয়াট বাষ্পচালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পর, নৌকো ও জাহাজ চালনার কাজে বাষ্পশক্তির প্রয়োগ সম্ভব হল। ১৭৮৫ সালে, জন ফিচ্ নামে কনেটিকাটের একজন ঘড়ি ও বন্দুক সারাইওয়ালা ওহায়ো প্রদেশে রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসী কেনাবেচা সাঙ্গ করে টলতে টলতে বাড়ী ফিরছিলেন। সে সময় জেমস ওয়াট আবিষ্কৃত এই নতুন যন্ত্রটি জাহাজ চালনার

কাজে নিয়োগ করবার চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। বহু কষ্ট করে তিনি এমনি একটি বাষ্পচালিত জাহাজ নির্মাণের কাজে লেগে গেলেন। ১৭৮৭ সালে ডেলাওয়ার নদীতে তাঁর দ্বিতীয় বাষ্পীয় পোতটি প্রথম একদফা চলল। বিজ্ঞানী, আমেরিকান কনটিনেণ্টাল কংগ্রেসের সভ্যগণ, বণিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ নিবিকার তুষ্ণীভাবে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা পরিদর্শন করলেন কিন্তু বাষ্পীয় পোতের এই আবিষ্কারককে উৎসাহ দেবার জন্য কোনও কিছু করলেন না।

স্কটল্যাণ্ডে উইলিয়াম সিমিংটন একটি বাষ্পীয় পোত নির্মাণ করেন। এটি ১৮০২ সালে ফার্থ ও ক্লাইভ খালে চলাচল করত। কর্নেল জন স্টিভেনস্ ডেলাওয়ার নদীতে ফিচের প্রথম বাষ্পীয় পোত চলতে দেখেছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে নিজেই একটি বাষ্পীয় পোত নির্মাণ করলেন এবং হাডসন নদীতে চালাতে লাগলেন। ১৮০৭ সালে তিনি ফিনিকস নামে আর একটি বাষ্প-চালিত জাহাজ নির্মাণ করলেন। এটি হবোকেন থেকে যাত্রা শুরু করে ফিলাডেলফিয়ায় পৌছাল। কাজেই এটিই বাষ্পচালিত প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজের মর্যাদা পেল।

কিন্তু এই অসাধারণ কৃতিত্বও রবার্ট ফুলটনের বাষ্পীয় পোত নির্মাণের বিস্ময়কর সাফল্যের নিকট তুচ্ছ প্রমাণিত হল। রবার্ট ফুলটন চিত্রবিদ্যা পরিত্যাগ করে বাস্তুবিদ্যার চর্চায় মন দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি খাল খনন সংক্রান্ত বাস্তুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর টর্পেডো-যুক্ত ডুবো জাহাজ নির্মাণের চেষ্টায় মাতলেন। ফরাসী সরকার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য এমনি একটা অস্ত্রের সন্ধান করছিলেন। সীন নদীতে ফুলটনের ডুবো জাহাজের মহড়া দেখে তারা বললেন যদি ফুলটন টর্পেডো দিয়ে কোন ইংরাজ জাহাজ ঘায়েল করতে পারেন, তা হলে তারা তাঁকে এই ডুবোজাহাজ বানাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করবেন। কিন্তু ফুলটন কোন ইংরাজ জাহাজই ধ্বংস করতে পারলেন না।

ফুলটন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলেন। এখানে তিনি ইংলণ্ডের বুলটন ও ওয়াট কোম্পানি কর্তৃক বিশেষ ভাবে নির্মিত ষ্টীম এঞ্জিন-যুক্ত একটি বাষ্পীয় পোত নির্মাণ করলেন। ১৮০৭ সালের ১৭ই আগস্ট ফুলটনের নিমিত ক্লেরমণ্ট নামে এই বাষ্পীয় জাহাজখানি চল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে নিউইয়র্ক শহর থেকে অলবেনি অভিমুখে রওনা হল। যাত্রা সম্পূর্ণ সফল হল। স্রোতের প্রতিকূলে ১৫০

মাইল পথ চলতে জাহাজখানার সময় লেগেছিল বত্রিশ ঘণ্টা এবং ফিরে আসতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা। ১৮১৮ সালে লেক এরিতে নিয়মিত বাষ্পীয় পোত চলাচল করতে লাগল। পরের বছর প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ সাভানা আটলান্টিক সাগর পারাপার করতে লাগল।

বহু বছর ধরে এরি ক্যানাল খননের জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে আন্দোলন চলছিল। ইংল্যাণ্ডে ঋণপত্র বিক্রয়-লব্ধ অর্থে এই খাল খননের খরচ নির্বাহ হয়। ১৮১৭ সালে এই খাল খননের কাজ শুরু হয়। এই খালটির খনন কার্য সমাপ্ত হলে এটি পশ্চিমাঞ্চলে আবার প্রধান জলপথ হয়ে দাঁড়াল। এই খালটি কাটা হবার ফলে বাফেলো থেকে নিউইয়র্কে মালপত্র জলপথে বয়ে আনবার সময় কুড়িদিন থেকে কমে ছয় দিনে এসে দাঁড়াল। নিউইয়র্ক বন্দরে গম পাঠানোর জাহাজে ভাডাও শতকরা আশি ভাগ কমে গেল। নিউইয়র্ক শহর যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌবাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ১৮৪০ সাল নাগাদ সারা দেশে কয়েক ডজন এমনি খাল কাটা হল। খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ৩০০০ মাইল।

কিন্তু নদী ও খালপথ ব্যবহার করে শিল্প-বাণিজ্যে সম্প্রসারণশীল দেশের পরিবহণের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হতে পারে না। বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোন জলপথ ছিল না। ১৮০৩ সালেই ইংল্যাণ্ডের কর্নওয়ালবাসী রিচার্ড ট্রেভিচিক ওয়েলস-এর একটি খনির কাজে ব্যবহারের দশটন কয়লা বহনের উপযোগী একটি রেল এঞ্জিন নির্মাণ করেছিলেন। এগারো বছর পর জর্জ ষ্টিভেনসন 'ব্লুচার' নামে একটি বাষ্পচালিত রেল এঞ্জিন নির্মাণ করেন। ১৮২৫ সালে, তাঁর তত্ত্বাবধানে ইংল্যাণ্ডের স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত মাল ও যাত্রীচলাচলের জন্য প্রথম সাফল্যমণ্ডিত রেলপথ খোলা হয়। ১৮৩০ সালে পিটার কুপার আমেরিকায় প্রথম বাষ্পচালিত রেল এঞ্জিন নির্মাণ করেন। এটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'টম থাম'। এই এঞ্জিনটি বাল্টিমোর থেকে এলিকোটের কারখানা পর্যন্ত তেরো মাইল পথ ঘণ্টায় গড়ে এগারো মাইল গতিতে যাত্রীবাহী ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেত। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ২৮০০ মাইল রেলপথ পাতা হয়েছিল। দশ বছর পর মোট রেল পথের দৈর্ঘ্য ৯০০০ মাইলেরও বেশী দাঁড়ায়। বহু বছর ধরে সাউথ ক্যারোলাইনা রেলপথে দুর্বল-চিত্ত যাত্রীদের ভয় দূর করতে এঞ্জিন ও যাত্রীবাহী কামরাগুলির মাঝে কার্পাস তুলাপূর্ণ একটি বগি জোড়া থাকত। যাত্রীদের তখন

ভয় ছিল যন্ত্রদানবরূপী এই এঞ্জিনটি যে কোনও সময় ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে।

পরিবহণ ব্যবস্থার এই উন্নতিতে সংবাদ আদানপ্রদানের সময় কমে এলেও কিন্তু আমেরিকার মত বিরাট দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। এই বিরাট সমস্যার সমাধান করতে কোনও বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারক দলকে অর্থ সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করা হয় নি। এ থেকে তৎকালীন বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনীতিবিদদের সমাজচেতনাহীনতার এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। যা হোক, এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল এবং ব্যক্তিগত ভাবে বিজ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠা নিয়ে এই সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদ্যুৎ শক্তি নিয়ে পুনরায় গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা হ'ল এই নতুন শক্তির সাহায্যে দ্রুতগতি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। অন্যান্য বড় বড় প্রায় সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি। পৃথক পৃথক ভাবে এবং প্রায় যুগপৎ কতকগুলি গবেষকের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার চরম সাফল্যের ভূমিকা রচনা করেছিল ও আমেরিকা, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালীর বিজ্ঞানীরা এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৯০ সালে লুই গ্যালভানি প্রবহ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন। দশ বছর পর ভোল্টা বিদ্যুৎ ব্যাটারী আবিষ্কার করলেন। ১৮২০ সালে দিনেমার বিজ্ঞানী হানস্ ক্রিশ্চিয়ান অরস্টেড লক্ষ্য করলেন যে বিদ্যুৎবাহী তামার তার চুম্বকের কাজ করে। ব্যাপারটি ১৮০২ সালে প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ইতালীর বিজ্ঞানী রোমাগনসি। অরস্টেড কার্যত ব্যাপারটি পুনরাবিষ্কার করেন। ফ্রান্সে আঁদ্রে আম্পিয়র অরস্টেডের পরীক্ষার কথা শুনে, এবিষয় নিয়ে নিজে আরও পরীক্ষা চালালেন। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রেঞ্চ একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্যদের সামনে বিদ্যুৎচুম্বক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চরণ কালে চুম্বক কখন কোন দিকে বিক্ষিপ্ত হবে তার নিয়মাবলীও উল্লেখ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই, আর একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রাসোঁয়া আরাগো দেখালেন যে তামার তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচলকালে তারটি লৌহচূর্ণ আকর্ষণ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেই আকৃষ্ট লৌহচূর্ণ ভূপাতিত হয়। ১৮১৮ সালে জার্মানীর হাল শহরবাসী বিজ্ঞানী শুইগার দেখালেন যে বিদ্যুৎবাহী তারের কুণ্ডলীর পাক

সংখ্যা বাড়িয়ে তারের কুণ্ডলীর চুম্বকশলাকা নিক্ষেপ ক্ষমতা বাড়ানো চলে। পরের বছর শুইগার বিদ্যুৎপ্রবাহের অস্তিত্ব নির্ধারণ ও পরিমাপ করবার জন্য ঝুলন্ত একটি চুম্বক শলাকার চতুর্দিকে কয়েক পাক অন্তরিত তার জড়িয়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপক যন্ত্র (গ্যালভানোমিটার) উদ্ভাবন করলেন। উইলিয়াম স্টারজেন নামে জনৈক ইংরাজ ১৮২৫ সালে প্রথম বিদ্যুৎ চুম্বক নির্মাণ করলেন। ইনি লণ্ডনে এই সব বৈজ্ঞানিক খেলনা নিয়ে খেলা দেখিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। তার জড়ানো সাধারণ লোহার বাটে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলবার সময় বাটটির যে চুম্বকশক্তি বৃদ্ধি ঘটে তা লক্ষ্য করেই তিনি এই বিদ্যুৎ চুম্বক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মাইকেল ফ্যারাডে লণ্ডনের রয়েল ইনসটিটিউসনে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি নিজে হাতে করে দেখলেন। পরীক্ষার শেষে এমন অবস্থায় এসে পৌছালেন যে তখন তাঁর ধারণা হল, এবার চুম্বক থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এই পরীক্ষায় যে পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বিদ্যুৎ চুম্বকে পরিণত করা হত, তার বিপরীত পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হল। পরীক্ষাটি সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে অবশ্য পুরো দশটি বছর দেরী হয়ে গেল। এই পরীক্ষার কাজে যখন শেষ পর্যন্ত হাত দেওয়া হল, তখন দেখা গেল, দুই ব্যক্তি অনন্যনির্ভরভাবে এবং প্রায় একই সঙ্গে এই পরীক্ষাকার্য সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে সক্ষম হয়েছেন। এদের একজন হলেন লণ্ডনের মাইকেল ফ্যারাডে, অন্য জন হলেন নিউ ইয়র্কের অ্যালবেনির জোসেফ হেনরি। এই পরীক্ষাটি ছিল অতি সাধারণ কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল এতই গভীর যে এটি মানব প্রগতিতে নব যুগের বার্তা বয়ে আনল। নিয়ে এল বিদ্যুৎ শক্তির যুগ—বৈদ্যুতিক মোটর ও ডায়নামো। সুসম্বদ্ধ প্রচেষ্টায় দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল সমস্যাটি সমাধানের জন্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্য নেওয়া সম্ভব কিনা, কোন বিজ্ঞান পরিষদ দীর্ঘকালীন গবেষণার দ্বারা এই সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেলে, মাইকেল ফ্যারাডে ও জেমস্ হেনরীর এই বিদ্যুৎ পরীক্ষা অন্ততঃ দুই দশক আগে নিষ্পন্ন হতে পারত। (অবশ্য ঐ বিজ্ঞানপরিষদের বিজ্ঞানীদের দ্বারাই।)

মাইকেল ফ্যারাডে ও জোসেফ হেনরি চুম্বক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানী হিসাবে অবিনশ্বর কীর্তি রচনা করে গেছেন। এই সংক্রান্ত পরীক্ষাটি প্রথমে জোসেফ হেনরিই সম্পন্ন করেন। কিন্তু তিনি

সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না করে, অন্য পরীক্ষায় হাত দেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি নিজের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন, তখন দেখা গেল, মাইকেল ফ্যারাডে কয়েকমাস আগেই তার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে বসেছেন। ফ্যারাডে হেনরি জোসেফের চেয়ে সামান্য একটু ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে চুম্বক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। হেনরি যদি পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতেন, এবং নিজের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সাধারণ্যে প্রচার করতে কুণ্ঠিত না হতেন—তা হলে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য হত, এবং আমেরিকার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তা অভূতপূর্ব সাহায্যদানে সক্ষম হত।

প্রথম তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সৃষ্টির গৌরবলাভে জোসেফ হেনরি সমর্থ না হলেও, অন্তত প্রথম সাফল্যমণ্ডিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উদ্ভাবকের গৌরব তাঁর যথার্থই প্রাপ্য। ১৮৪৪ সালে, সামুয়েল ফিন্‌লে ব্রীশ মোর্স নামে আর একজন আমেরিকান হেনরি-আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে তামার তারের মধ্য দিয়ে বহু দূরবর্তী স্থানে নিমেষে সংবাদ প্রেরণের উপযোগী যন্ত্র ও সংকেতলিপি প্রস্তুত করে বাজারে চালু করলেন। টেলিগ্রাফে বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে স্থায়িত্ব লাভ করল। বিরাট পদক্ষেপে আমেরিকা রাতারাতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলল।

নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার ব্যর্থতা, জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত নিজের আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা থেকে অর্থার্জনের নিস্পৃহতা—হেনরির এই আচরণ সত্যিই বিচিত্র। মনুষ্য-চরিত্রের এক কৌতূহলোদ্দীপক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় এতে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ উপার্জন করছিল। জোসেফ হেনরির পক্ষেও এমনি অর্থোপার্জনের চেষ্টাই ছিল স্বাভাবিক। অর্থার্জনে তাঁর এই অনাসক্তি তৎকালীন সামাজিক আবহাওয়ারই বিরোধী। স্কটল্যাণ্ডের এক পিউরিটান বংশে তাঁর জন্ম। আদিতে এদের নাম ছিল হেনড্রি। নয় বছর বয়সে হেনরি পিতৃহীন হন। বালক হেনরি, তিন বছর একটি দোকানে অংশকালীন কাজে নিযুক্ত হন। তারপর তেরো বছর বয়সে দু বছরের জন্য একজন ঘড়ি নির্মাতা ও রৌপ্যকারের নিকট শিক্ষানবিশী করেন। এ কাজ তাঁর ভাল লাগেনি। তাঁর অভিনয় দক্ষতা ছিল। এ ছাড়া তিনি ছিলেন রোমান্সপ্রিয়। এই সব কারণে তিনি বিতর্ক ও নাট্যামোদী একদল তরুণ

পরিচালিত একটি নাট্যকে দলে যোগ দেন। হেনরি ছিলেন দীর্ঘকায়, একহারা ও সুদর্শন পুরুষ। দেখতে দেখতে তিনি এই নাট্যকে দলটির অধিনায়ক হয়ে পড়লেন। দলটির নাম ছিল রোসট্রাম (Rostrum)।

পরের বছর একটি আকস্মিক ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই সময় আহত হয়ে তাঁকে কিছুকাল গৃহমধ্যে আবদ্ধ হয়ে রোগ-শয্যায় কাটাতে হয়। তখন রেভারেণ্ড জি. গ্রেগরী লিখিত 'লেকচারস অন একসপেরিমেণ্টাল ফিলজফি, অ্যাস্ট্রনমি, অ্যাণ্ড কেমিস্ট্রি, ইনটেনডেড চীফলি ফর দি ইয়ুজ অব ইয়ং পীপল (Lectures on Experimental Philosophy, Astronomy and Chemistry for Interded chiefly for the use of young People) নামক একখানি গ্রন্থ তাঁর হাতে আসে। গ্রন্থখানির মালিক একজন তরুণ স্কটল্যাণ্ডবাসী। তিনি তার সঙ্গে সেই গৃহেই তখন বাস করতেন। পরম কৌতূহল ভরে হেনরি গ্রেগরীর বইখানা পড়লেন। বিজ্ঞানে আগে কখনও তেমন বিশেষ কোনও ঔৎসুক্য দেখাননি তিনি। জোসেফ হেনরি ছিলেন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। এই পুস্তকখানি তাঁর সামনে নতুন জগতের অসীম সম্ভাবনা তুলে ধরল, তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ভাবলেন এই অদ্ভুত বইখানি পেলে বেশ হয়। স্কটল্যাণ্ড-দেশীয় তরুণ ভদ্রলোক তাকে বইখানা উপহার দিলেন।

বইখানিতে অনেক প্রশ্ন ছিল। যেমন উপরের দিকে ঢিল ছুড়লে, ঢিলটি ছোড়া পথ ধরে বরাবর কেন চলে না? ধোঁয়া বা অগ্নিশিখা কেন সর্বদা ঊর্ধ্বগামী হয়? এইসব মনোরম ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পাবার জন্য হেনরি বারবার বইখানা পড়লেন। তাঁর বয়স যখন ছেচল্লিশ বছর তখন তিনি বইখানির একখানি আলগা পাতায় স্মারকলিপি গোছের কয়েকটি কথা লেখেন। কথাগুলি এই: 'এখানি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক নয় কোন ক্রমেই। তবু দৈবক্রমে এটি আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি আমার সম্মুখে মনন ও আনন্দের এক নতুন জগতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, প্রকৃতির রহস্য সন্ধানের দিকে আমার মনকে টেনে নিয়েছিল। এই বই পড়েই আমি সংকল্প করি যে এখন থেকে অবিলম্বে—আমি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করব।'

অর্থাভাবের ফলে হেনরি প্রাতঃকালীন স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ

পান নি। অ্যালবানি একাডেমীর দুজন বিজ্ঞান-শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু বিজ্ঞানের পাঠ নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছুকাল স্কুলে পড়েছিলেন। শেষে ছাত্র হিসাবে অ্যালবেনি একাডেমীতে ভর্তি হলেন। সেখানে পড়াশুনায় এত ভাল ফল দেখালেন যে, স্নাতকের ডিগ্রী গ্রহণ করার সময় পর্যন্ত যাতে তিনি পড়াশুনা চালাতে পারেন তার জন্য একাডেমীর প্রিন্সিপাল তাঁকে জেনারেল স্টেপেন ভন রেনসেলারের পরিবারে গৃহ শিক্ষকতার একটি কাজ জুটিয়ে দেন। এই জেনারেল স্টেপেন ভন রেনসেলারই পরে ট্রয়ে রেনসেলার পলিটেকনিক ইনস্‌টিটিউট স্থাপন করেন।

হেনরি জোসেফের বয়স তখন সাতাশ বছর তখন তিনি অ্যালবেনি ইনস্‌টিটিউটের সভ্যদের সম্মুখে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটির বিষয় ছিল বাষ্পের রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া (Chemical and Mechanical Effects of Steam)। বাষ্পচালিত এঞ্জিনের তাপ সম্পর্কিত বহুবিধ সমস্যা সমাধান তখনও বাকী ছিল। বয়লার থেকে সহসা নির্গত হওয়ার সময় বাষ্পের যে সম্প্রসারণ ঘটে তাতে বাষ্পের তাপ মাত্রায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা নিয়ে তিনি পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালান এবং লক্ষ্য করেন যে সম্প্রসারণ কালে বাষ্পের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সময় সময় এই তাপমাত্রা হ্রাস এত অধিক পরিমাণে ঘটে যে বয়লার নির্গত বাষ্পে হাত দিলে হাতে ছ্যাঁকা লাগে না। এবার তিনি আর একটা যন্ত্র নির্মাণ করেন। এর সাহায্যে দেখান যায় যে সহসা সম্প্রসারিত হলে বাতাসেরও তাপমাত্রা কমে যায়। এই যন্ত্রটি তিনি তাঁর উপরোক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। অ্যালবেনি অধিবাসীদের সামনে যন্ত্রটির পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। দর্শকদের অনেকে ছিল অ্যালবেনির অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের কোন ও বিশেষ জ্ঞান ছিল না। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখল, এই যন্ত্রটির সাহায্যে হেনরি ৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা-বিশিষ্ট একটি কক্ষে জল জমিয়ে বরফে পরিণত করলেন। হেনরি এক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটির কার্যকারিতা দেখে লোকে মুগ্ধ হল। সাধারণের চোখে তিনি একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরূপে গণ্য হলেন।

ওয়েস্টপয়েন্ট ও লেক এরির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল। এই অঞ্চল জরীপ করার কাজে এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন

হেনরি। এই কাজ শেষ হলে তিনি অ্যালবেনী একাডেমীতে সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। দুবছর পর, ১৮২৮ সালে এই স্কুলেরই গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই হেনরি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা শুরু করেছিলেন। ১৮২৭ সালের ১০ই অক্টোবর তিনি এ সম্পর্কে তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত পরীক্ষাগুলির পর আমেরিকায় বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কার্যতঃ কোনও নতুন পরীক্ষা হয়নি। এই সময় ইউরোপে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহলে পুনরায় গবেষণা শুরু হওয়ায় হেনরিও এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। "আমাদের দেশের উচ্চ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ নিজেদের অসুবিধা ও অর্থব্যয়ের ভয়ে" বিদ্যুৎ সম্পর্কিত গবেষণায় কোন প্রকার গভীর মনোযোগ দেয় না লক্ষ্য করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। প্রতিদিন স্কুলে তাঁকে সাত ঘণ্টা ছেলে পড়াতে হত। কাজেই নিজে তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয় সময় পেতেন না।

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে হেনরির প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধে কোনও চাঞ্চল্যকর তথ্য ছিল না। কিন্তু ১৮২৫ সালে স্টারজেনের তড়িত চুম্বক সমস্তক্ষণ তার মাথায় ঘুরছিল। এই ইংরাজ ভদ্রলোক, ঘোড়ার নালের আকার বার্নিশ করা লোহার বাঁটে আঠারো পাক নিরাবরণ তামার তার জড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, লোহার বাঁটটি নয় পাউণ্ড ওজন তুলতে পারত। খবরটা খুবই উৎসাহজনক। কিন্তু হেনরী চাইছিলেন, আরও শক্তিশালী তড়িৎচুম্বক। বহুদিন ধরে এমনি একটা শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করার কথা ভাবতে থাকেন। ১৮২৮ সালের এক সন্ধ্যায় তিনি বসে বসে অন্যমনস্ক ভাবে একজন বন্ধুর কথাবার্তা শুনছিলেন। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন; "কাল আমি একটা বিখ্যাত পরীক্ষা করব।" সাধারণতঃ এমনি বড়াই করে কথাবার্তা বলতেন না কখনও জোসেফ হেনরি। মনে মনে তিনি একটা পদ্ধতির কথা ভাবছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এ পদ্ধতিতে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত অতি শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক তৈরি করতে সক্ষম হবেন। তাই তিনি তাঁর মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে অমন চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

অ্যাম্পিয়রের চুম্বকবাদ হেনরি বার বার ভাল করে পড়েছিলেন। পড়ে

বুঝতে পেরেছিলেন স্টারজেনের তড়িৎ-চুম্বকে তারটি ঠিকমত জড়ানো হয়নি। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল নিরাবরণ তারের পাকগুলি পরস্পরের স্পর্শে বিদ্যুৎ ক্ষয় (শর্ট সার্কিটিং) করতে না দেওয়া, লোহার বাঁটটিকে অন্তরিত তারের দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ তারটিকে এমনি অন্তরিত করার জন্য তাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিবহণের ক্ষমতাশূন্য রেশমী সুতোয় জড়িয়ে নিতে হবে। পরের দিন সকালেই তিনি সিল্ক জড়ানো খুব সরু তার লোহার বাঁটের চারদিকে তার অক্ষদণ্ডের সমকোণ বরাবর, খুব শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। পরীক্ষা সফল হল। লোহার বাঁটের চারদিকে ববিনের সুতোর মত গায়ে গায়ে ঘেষাঘষি করে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবার সময় লোহার বাঁটটি স্টারজেনের চুম্বকের সমান আকারের চুম্বকেই তার চেয়ে বেশী ওজন তুলতে সক্ষম হন। এই হল হেনরির প্রথম মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। ১৮২৯ সাল শেষ হবার আগেই তিনি তাঁর উদ্ভাবিত ইলেকট্রো ম্যাগনেটটির এতদূর উন্নতি সাধন করলেন যে এতে অতি অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যেই চুম্বকটির ওজনের পঞ্চাশ গুণ বেশী ওজন তোলা সম্ভব হত। পরে ইয়েল কলেজের অধ্যাপক সিলিম্যান, তাঁকে এক টন ভার তুলবার উপযোগী একটি চুম্বক তৈরি করতে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। হেনরি সাহায্য করতে রাজী হলেন। তড়িৎ-চুম্বকটি তৈরি হলে দেখা গেল এটি দেড় টন ওজন তুলতে সক্ষম। শান্ত ও ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ হলেও, কিন্তু হেনরি এতে আনন্দের আতিশয্যে রীতিমত লাফিয়ে উঠেছিলেন!

লণ্ডনে মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎচুম্বকে হেনরির উদ্ভাবিত তার জড়ানোর নতুন পদ্ধতিটির খবর পেলেন। এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি একটি বিদ্যুৎ-চুম্বক নির্মাণ করলেন। ঘন-সন্নিবিষ্ট অন্তরিত তারের কুণ্ডলী তিনি একটি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি একখানা চুম্বকের বাঁট এই তারের কুণ্ডলীর ভিতর আনা-নেওয়া করতে লাগলেন। দেখা গেল তারের কুণ্ডলীর মাঝে চুম্বকের বাটটি চলাচল কালে গ্যালভানো-মিটারে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ধরা পড়ছে। কুণ্ডলীর মাঝে চুম্বকখণ্ডটি যখন স্থির নিশ্চল থাকে তখন গ্যালভানোমিটারে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। চুম্বক বাঁটটির চতুর্দ্দিকস্থ চুম্বক বলরেখাগুলির মাঝ দিয়ে যখনই তারের কুণ্ডলী চলাচল করে তখনই তারে এই বিদ্যুৎ

প্রবাহ সৃষ্টি হয়। দেখা গেল, ফ্যারাডে একটা বৈপ্লবিক আবিষ্কার করে বসেছেন। চুম্বক শক্তিকে তিনি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। ১৮৩১ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি ঘটনাটি রয়েল সোসায়িটিকে জানালেন। আবিষ্কারের বিবরণী অ্যানাল্‌স অব ফিলজফির ১৮৩২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হল। পত্রিকাটির এক কপি হেনরি সেই বছরের জুন মাসেই পেলেন। পরের মাসেই সিলিম্যানের আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্স-এর ১৮৩২ সালের জুলাই সংখ্যায় তিনি নিজের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করলেন।

ফ্যারাডে চুম্বক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করার কৌশল আবিষ্কার করার পুরো এক বছর আগেই হেনরি এই কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছিলেন, "গ্যালিলিওর পরীক্ষার কোনও কথা না জেনেই আমি নিম্নলিখিত উপায়ে চুম্বক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম: একটি চুম্বকের বাঁটের চারদিকে জড়ানো তারের দুই প্রান্ত এক বাটি পারদের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হল। তারটি আবার গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত করা হল। চুম্বকের সঙ্গে যুক্ত গ্যালভানোমিটারের তার পাতলা অ্যাসিড-পূর্ণ একটি পাত্রে ডোবান হল।" অ্যাসিড থেকে যত বারই গ্যালভানোমিটারের তার তুলে তুলে অ্যাসিডে ডোবান হত, তত বারই গ্যালভানোমিটারের কাটা সরে গিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছিল। পরীক্ষাটি ফ্যারাডের পরীক্ষারই সমতুল্য।

তা ছাড়া, ফ্যারাডে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের বিষয় প্রকাশিত করার আগেই হেনরি নিজের ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত এই ঘটনার অসীম সম্ভাবনা ধরতে পেরেছিলেন। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কোনও কার্যকরী পন্থায় এই আবিষ্কার কাজে লাগানো যায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে তিনি কোনও দেরী করলেন না। চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি ছোট বৈদ্যুতিক মটর নির্মাণ করলেন। এতে "কোনও যান্ত্রিক শক্তি ব্যতীত, শুধুমাত্র চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি দ্বারাই" পরস্পর ক্রিয়াশীল গতি উৎপন্ন হত। এই শক্তি ইতিপূর্বে কোনও যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি। মটরটি নির্মিত হয়েছিল এইভাবে—একটি আলম্বের উপর ন্যস্ত ছিল একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় বাঁট। এটি বাঁটটির দুই প্রান্তে অবস্থিত ব্যাটারির (তড়িৎ কোষের) সহিত যুক্ত। তড়িৎ-চুম্বকীয় বাঁটটির দুই প্রান্তের নিচে, ব্যাটারির কাছাকাছি

এক একটি স্থায়ী চুম্বকের উত্তর মেরু রক্ষিত। প্রতিবারই বিদ্যুৎ বর্তনীর সাময়িক ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটত। তাতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণেরও পরিবর্তন ঘটত। এতে তড়িৎ চুম্বকীয় বাঁটটি প্রতি মিনিটে পঁচাত্তর বার এই হারে ক্রমাগত দুলে চলত। পরীক্ষা কালে বাঁটটির এমনি আবর্তন এক ঘণ্টারও বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিল।

হেনরি তাঁর এই যান্ত্রিক উপায়ে শক্তি উৎপাদনকারী নতুন বৈপ্লবিক যন্ত্রটির বিবরণ অতিরঞ্জন সহকারে প্রকাশ করতে বিশেষ উৎসাহিত হননি। আবিষ্কারের এই স্তরে এটি ছিল নিছক "বিজ্ঞানীদের খেলনা"। ১৮৩৬ সালে টমাস ডেভেনপোর্ট নামে একজন কর্মকার একটি বৈদ্যুতিক মটরের পেটেন্ট রেজেষ্ট্রী করল। পাঁচ বছর আগে, নিউইয়র্কের ক্রাউন পয়েন্টের, পেনফিল্ড আয়রন ওয়ার্কসে সে হেনরির একটি ইলেকট্রো-ম্যাগনেট ব্যবহৃত হতে দেখেছিল। নিঃসন্দেহে এই তড়িৎ-চুম্বকের ভিত্তিতেই কর্মকারপ্রবর তার বৈদ্যুতিক মোটর নির্মাণ করেছিল। ইংলাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান কল-কারখানাগুলির শক্তির চাহিদা মেটাতে বৈদ্যুতিক মটর ও ডায়নামো নির্মিত হতে লাগল। প্রতিটি মটর ও ডায়নামোতে হেনরির তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৮৩২ সালের শেষের দিকে কলেজ অব নিউজার্সি (বর্তমানে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়) হেনরিকে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। এখানে অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও হেনরি তাঁর তড়িৎ সম্পর্কিত গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে যদি প্রবহমান তড়িৎ অকস্মাৎ বন্ধ হয়, তা হলে বিপরীত দিকে ক্ষাণিক আলোক প্রভা দেখা দেয়। হেনরির 'স্ব-আবেশ' এবং আবেশ দ্বারা "অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ" সৃষ্টির ঘটনাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৩২ সালের গ্রীষ্মকালে—ফ্যারাডে স্বতন্ত্র ভাবে এই ব্যাপার আবিষ্কারের দুই বছর আগে। কোনও তারের কুণ্ডলীবাহী তড়িৎ প্রবাহ যদি সহসা বন্ধ করে দেওয়া যায়। তা হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের স্ব আবেশ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হতে ক্ষণিক 'বাধা' জন্মায়। এই তথাকথিত "অতিরিক্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ" আবেশ সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে মিশে বিদ্যুৎ বর্তনী ছেদ কালে বৃহদাকার স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে। স্ব-আবেশের ফলেই ট্রামের ট্রলির তারে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। ট্রলির বিদ্যুৎবাহী দণ্ড আর ট্রামের উপরকার বিদ্যুৎবাহী তারের বর্তনীর মাঝে ক্ষণিক বিচ্ছেদ দেখা দিলে

স্ব-আবেশিত বিদ্যুৎ প্রবাহ ও সেই সঙ্গে অতিরিক্ত "বিদ্যুৎ প্রবাহ" দেখা দিয়ে এই বিচ্ছেদ স্থান অতিক্রম করে যাবার সময়ই ট্রলির মুখে এই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে।

১৮৩৭ সালে হেনরিকে ইউরোপ ভ্রমণের জন্য পুরা বেতনে ছুটি দেওয়া হল। ইউরোপ সাগ্রহে তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। এই সব দেশে তিনি তখনকার দিনের শীর্ষ-স্থানীয় বহু বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎলাভ করলেন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের সামনে তিনি বিদ্যুৎ ক্ষরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ প্রথম কে আবিষ্কার করেছেন এ নিয়ে কোনও আলোচনা হল না। সবাই তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে-ছিলেন। অন্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অগ্রগণ্যতার প্রশ্নে এতখানি নিস্পৃহতা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

হেনরি পুনরায় দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের বহু আলোচিত সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করলেন। দুইজন আমেরিকাবাসী শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান করেছিল। জোসেফ হেনরি এই দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। সামুয়েল মোর্স তাঁর এই ভিত্তিভূমির উপর নূতন যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকরী করে তোলেন। মোর্স ও হেনরি,—ঐতিহ্য, পটভূমি ও স্বার্থের দিক দিয়ে এই দুটি মানুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল অতি বিপুল। মোর্স এক কংগ্রীগেশানালিস্ট যাজক পরিবারের এগারোটি সন্তানের একটি। চার্লসটাউনে (বর্তমানে বস্টন শহরের অংশ) তাঁর জন্ম। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলিম্যানের অধীনে বিদ্যুৎ বিজ্ঞান পাঠ করলেও কিন্তু পেশা হিসাবে বিজ্ঞান গ্রহণ করেননি মোর্স। বেঞ্জামিন ওয়েস্টের নিকট তিনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন ও মনরোর চিত্র তিনি এঁকে ছিলেন। ১৮২৬ সালে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ন্যাশনাল একাডেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড ডিজাইনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১০৩২ সালে ইউরোপ থেকে ফেরবার পর মোর্সকে ইথার বিতর্ক খ্যাতে ডঃ চার্লস টি. জ্যাকসন নামে জনৈক সহযাত্রীর সঙ্গে বিদ্যুৎ সম্পর্কে আলোচনায় রত দেখা গেল। জ্যাকসন প্যারিসে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী আম্পিয়রকে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত কতকগুলি পরীক্ষা করতে দেখেন। এই পরীক্ষাগুলি দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ফেরবার সময় সঙ্গে করে

ছোট একটি তড়িৎ-চুম্বক নিয়ে আসেন। এই জিনিসটির সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে সংবাদ আদানপ্রদান করার সম্ভাবনা আছে মনে করে তিনি এই তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ১৭৯৮ সালে স্যালভা মাদ্রিদে স্থির বিদ্যুতের সাহায্যে ছাব্বিশ মাইল দূরে টেলিগ্রাফে বার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে হেনরি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিন বছর পর, অ্যালবেনি একাডেমির একটি ঘরের চতুর্দিকে টাঙ্গান এক মাইল কি তারও অধিক লম্বা একটি তারের অপর প্রান্তে একটি তড়িৎ-চুম্বক সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন। এই ভাবে তিনি প্রথম সাফল্যজনক বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করলেন। হেনরি তাঁর ক্লাসে এই বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রদর্শন করলেন, ১৮৩১ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে' ঘটনাটির বিবরণ প্রকাশ করলেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে এই সূত্রানুযায়ী ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনাযুক্ত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নির্মাণ করা সম্ভব।

মোর্স জ্যাকসনকে সেই জাহাজে আলাপ-আলোচনার সময় বলেছিলেন, 'বর্তনীর কোনও এক স্থানে তড়িতের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই তড়িতের সাহায্যে কেন সংবাদ প্রেরণ করা যাবে না তার কারণ আমি বুঝতে পারি না।' কিন্তু কি ভাবে? জ্যাকসনের সঙ্গে আলাপের পর তিন বছর পর্যন্ত তিনি চিত্রাঙ্কন নিয়ে সময় কাটালেন। সব সময় কিন্তু তাঁর মনে ফিরত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের কথা। চিত্রশিল্পীর পেশায় তেমন অর্থ উপার্জন করতে পারছিলেন না। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য শিক্ষা দেবার ফাঁকে সময় করে তিনি যেতেন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে। ডঃ লিওনার্ড ডি. গালে কলেজ গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মোর্স মনপ্রাণ দিয়ে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের কৌশল উদ্ভাবনে লেগে গেলেন।

গালে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সম্পর্কে হেনরির গবেষণার কথা জানতেন। তিনি পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে গেলেন। হেনরি খুবই সহযোগিতা করলেন, এ ব্যাপারে তিনি যতটা এগিয়েছেন তা জানালেন। অ্যালবেনি একাডেমীতে থাকা কালে তিনি মোটামুটি দীর্ঘ দূরত্বে বিদ্যুৎ সংকেত (impluse) প্রেরণের সমস্যার আংশিক সমাধান করেছিলেন। হেনরি খর চুম্বক (Intensity

Magnet) ও পরিমাণ চুম্বকের (Quantity Magnet) দ্বারা এই কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একটি অতি সূক্ষ্ম দীর্ঘ অন্তরিত তারের নিরবচ্ছিন্ন কুণ্ডলী ঘেরা খর চুম্বকের সাহায্যে তিনি তড়িৎঘাত প্রেরণ করতে সক্ষম হন। এই ভাবে তড়িৎচুম্বকের সাহায্যে তিনি ইতিপূর্বেই বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। তড়িৎ-চুম্বকটি দোলন গতিতে বিষম ছন্দে বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরসূচক ঢং ঢং আওয়াজ তুলত। হেনরির পরিমাণ চুম্বক ছিল ছোট ছোট বিবিধ মোটা তারের সমষ্টি। এগুলি একটি ব্যাটারির দ্বারা সক্রিয় হয়ে তামার তারের প্রান্তের একটি তড়িৎ-চুম্বককে শক্তিশালী করে তুলত। এর সাহায্যে ১৮৩২ সালে তিনি তাঁর গবেষণাগার থেকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে তাঁর স্ত্রীর নিকট বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণ করতে পেরেছিলেন।

মোর্স হেনরির উদ্ভাবিত পন্থা গ্রহণ করলেন এবং বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রেরণের বাকী দুটি সমস্যা সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করলেন। প্রথমটি হল, তড়িৎ ঘাত পাঠানোর দূরত্ব বৃদ্ধি। এক ধরনের রিলে প্রথা উদ্ভাবন করে তিনি এই কাজে সাফল্যলাভ করলেন। এই প্রথায় তামার তারের ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হাজার হাজার তারের পাকে জড়ানো কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করে তার সংকেতগুলি বিবর্ধিত করে তাকে দ্বিতীয় একটি বর্তনীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভাবে কোন মূল তড়িৎ ঘাতকে মাঝপথে প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে রিলের ব্যবস্থা করে যে কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর ১৮৩৮ সালে মোর্স তাঁর বিখ্যাত ডট ও ড্যাস বা মোর্স সংকেত উদ্ভাবন করলেন। এতে বিদ্যুৎ ঘাতকে বার্তায় পরিণত করা সম্ভব হল। ইংল্যাণ্ডে ১৮৩৭ সালে রেলপথে সিগনালিং-এর কাজে হুইটস্টোনের প্রবর্তিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় বিক্ষেপকারী চুম্বক শলাকা ব্যবহৃত হত। এটি ছিল জটিল সংকেত ব্যবস্থা, এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়ে অসার্থক ও অবাস্তব। হেনরি হুইটস্টোনকে তাঁর এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় কি করে বিদ্যুৎ-চুম্বক ও মোর্স সংকেত ব্যবহার করা যেতে পারে তা দেখিয়ে দিলেন।

১৮৩৭ সালে মোর্স তাঁর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পেটেন্ট করবার জন্য আবেদন করলেন। পরের বছর তিনি তাঁর এই আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রেসিডেন্ট ভন বুরেন, তার মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসের সদস্য, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ

ব্যবস্থার চূড়ান্ত কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে ৫০ পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইন নির্মাণের জন্য তিনি ৩০,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করতে সরকারকে অনুরোধ জানালেন। নতুন জিনিস সম্বন্ধে ভীতি ও সন্দেহ, সাধারণ নিষ্ক্রিয়তা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব, ১৮৩৭ সালে খাল খনন কার্যের মাত্রাধিক সম্প্রসারণজনিত আতঙ্ক সব কিছু মিলে কংগ্রেসের অর্থ মঞ্জুরীতে বাধা জন্মাতে লাগল।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পথ সুগম করবার চেষ্টা চলছিল। মোর্স যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ইংল্যাণ্ড গেলেন তাঁর টেলিগ্রাফের পেটেণ্ট নেবার জন্য। হুইটস্টোন নিজেই তাঁর বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সেখানে প্রদর্শন করছিলেন, কাজেই মোর্সের পেটেণ্টের আবেদন না-মঞ্জুর হল। তাঁকে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হল, "আমেরিকা খুবই বিরাট দেশ। সেখানেই পেটেণ্ট নিয়ে মোর্সের খুশী থাকা উচিত।" আরাগো ও গে লুস্যাক সহ ফরাসী বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ফরাসীরা তাঁর আবিষ্কারের পেটেণ্ট মঞ্জুর করে।

কিন্তু শুধু পেটেণ্টের দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নির্মাণ করা চলে না বা তা দিয়ে আবিষ্কারকের পরিবারের পেট চলে না। কংগ্রেস হেলাফেলা করে আরও পাঁচ বছর সময় নষ্ট করল। এদিকে মোর্স অনাহারে মারা যাবার উপক্রম হলেন। দুর্দশার চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলেন তখন। শেষে ১৮৪২ সালে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য কংগ্রেস আইন পাস করে ৩০০০০ ডলার মঞ্জুর করল। বাল্টিমোর থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইল পথে খুঁটির মাথায় তার টাঙ্গান হল। ১৮৪৪ সালের ২৪শে মে রাজধানী ওয়াশিংটনে বসে সংকেতলিপিতে বাল্টিমোর মিঃ ভেলের নিকট বার্তা পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, "ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেছেন?" নিমেষে সংবাদ আদান প্রদানের বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি উদ্ভাবন সম্পূর্ণ হল।

দু দিন পর বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ জনসাধারণের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। বাল্টিমোরে ডেমোক্রাট দলের জাতীয় সম্মেলনে জেমস কে. পোলক প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীরূপে ও সিলাস রাইট ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হবার খবর টেলিগ্রাফ যোগে ওয়াশিংটনে মিঃ রাইটকে জানান হয়েছিল। সম্মেলন কর্তৃক মনোনীত একটি কমিটির সভ্যবৃন্দ ওয়াশিংটনে

মিঃ রাইটকে এই মনোনয়নের খবর জানাতে রওনা হবার আগেই, তারবার্তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ রাইট মনোনয়ন গ্রহণে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা জনসাধারণকে এমন বিস্মিত করেছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ও এখন থেকে মোর্সও তাঁর টেলিগ্রাফের খবর খুব জাঁকালো ভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। ইতিপূর্বে তাঁরা মোর্স উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফের প্রায় কোন খবরই প্রকাশ করেননি।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিন্তু তবুও এই আবিষ্কারের স্বত্ব কিনে নিয়ে কাজে লাগাতে চাইলেন না। অতঃপর ধনিক সম্প্রদায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম এই বিস্ময়কর যন্ত্রটি কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করার সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে এল। আলফ্রেড ভেলের হাতে এই নবজাত শিশু দ্রুত বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। আলফ্রেড ভেল মোর্সকে তাঁর বৈদ্যুতিক পরীক্ষা কার্যে সাহায্য করেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই শত শত মাইল টেলিগ্রাফ তারের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরগুলি যুক্ত হল। মোর্স ও ভেল প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। হেনরি তাঁর নিজস্ব পথে মানবতার সেবা করে চললেন। হেনরির নিকট তাঁর ঋণ কখনও মোর্স অস্বীকার করেননি। হেনরিও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের অগ্রগণ্যতার দাবী নিয়ে কখনও মামলা-মোকদ্দমা করতে যাননি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল একান্তভাবেই শুধু কোনও একজন ব্যবহার করতে পারবেন, বিজ্ঞানের মর্যাদার পক্ষে এ অবস্থা সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করেই তিনি তাঁর বহুবিধ আবিষ্কারের কোনও পেটেণ্ট নেননি।

হেনরিকে প্রত্যহ ক্লাসে বেশ কয়েক ঘণ্টা করে নিয়মিত ছাত্র পড়াতে হত। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বৃত্তিদানকারী কোনও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কার্যতঃ তিনি কোনও অর্থ সাহায্য বা গবেষণার কাজে সহযোগিতা করবার জন্য সমকক্ষ কোনও বিজ্ঞানীর সাহচর্যও পাননি। এইসব অসুবিধার কথা স্মরণ করলে বোঝা যাবে ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চায় কি বিপুল উচ্চাঙ্গের কাজ তিনি করে গেছেন! প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের চর্চায়ও মনোনিবেশ করেন। কিছুকালের জন্য তিনি টোরির রসায়ন ও ভূবিদ্যার ক্লাস নেন। গণিত, মণিকবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, এমন কি স্থাপত্য বিদ্যা পর্যন্ত পড়ান। ক্লাসে দুর্বোধ্য ও জটিল কোন প্রশ্ন ছাত্রদের বা তাঁকে হতবুদ্ধি করলে

তিনি নিজে ঐ জটিল প্রশ্নটির সমাধানের ভার নিতেন। তিনি পরীক্ষান্তে দেখালেন যে তরল ও কঠিন পদার্থের সমমাত্রায় সংসক্তি থাকে। সবেগে অভিক্ষিপ্ত দ্রুত ধাবমান বস্তুর গতিবেগ নির্ধারণের একটি নূতন পদ্ধতি তিনি নির্ধারিত করেছিলেন। মেরু জ্যোতিঃ ও অনুপ্রভা কেন ঘটে তার কারণ অনুসন্ধানও তিনি করেছিলেন। সূর্য নিয়েও তিনি গবেষণা করেন। সূর্য-দেহের সকল অংশ থেকেই সমপরিমাণে তাপ বিচ্ছুরিত হয় কিনা, তা নির্ধারণ করার জন্যও তিনি পরীক্ষা কার্য চালিয়েছিলেন। গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে একটি থার্মোপাইল যন্ত্র সংযুক্ত করে তিনি সৌরকলঙ্ক হতে বিকিরিত তাপ পরিমাপ করতে সক্ষম হন এবং লক্ষ্য করেন যে এই অংশ থেকে বিচ্ছুরিত তাপ সূর্যদেহের অন্যান্য অংশের তাপ অপেক্ষা কম। এই বিষয়ে গবেষণা চালাতে পি. এ. সেচি নামে জর্জটাউন কলেজের একজন তরুণ অধ্যাপককে তিনি উৎসাহ দেন। সেচি শেষে সৌর পদার্থ বিজ্ঞানে কতকগুলি বিখ্যাত আবিষ্কার করেন।

হেনরি আরও কতকগুলি আবিষ্কার করেন। আজকের দিনে উপযোগিতা বিচারে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪২ সালে তিনি স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করেন যে লীডেন জার হতে এবং বজ্রপাত কালে যে বিদ্যুৎ ক্ষরণ হয় তা নিরবচ্ছিন্ন একটানা নয়। এ বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটে দুলে দুলে। একটি ছুঁচের চারদিকে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে বজ্রপাতকালীন বিদ্যুৎ দীপ্তি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করে তিনি দেখতে পেলেন অনেক সময় এতে ছুঁচটির (এটি চুম্বকত্ব সমন্বিত) উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর স্থান পরিবর্তন ঘটে। হিসাব করে দেখেছিলেন, বজ্রের বিদ্যুৎ দীপ্তি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ বার তারের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করে।

হেনরী আঠার বছর ধরে যখন সক্রিয় ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত সেই সময় ইউরোপ ও আমেরিকা এই দুই মহাদেশে এক বিচিত্র নাটক অভিনীত হচ্ছিল, ব্যাপারটা কালক্রমে হেনরির জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন বয়ে এনেছিল। এবং তাতে হেনরিকে গবেষক বিজ্ঞানী থেকে এক বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফলে আমেরিকাকে তার সেরা বিজ্ঞানীকে হারাতে হয়েছিল। তার বদলে দেশ হেনরীকে পেল বিরাট একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার সুদক্ষ ডাইরেক্টর রূপে। এই সংস্থাটি পরে এদেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮২৯ সালে হেনরি যখন তড়িৎ-চুম্বক নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন তখন লণ্ডনে জেমস্ স্মিথসন নামে এক ব্যক্তি মারা যান। এই ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁর উইলে 'মানব সমাজে জ্ঞান বিস্তার কল্পে' ওয়াশিংটন ডি. সি-তে একটি যথোপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পাঁচ লক্ষ ডলার দান করে যান। স্মিথসন কোন কালেও আমেরিকায় আসেননি। আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে তার তেমন কোনও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। ইংরাজ অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি আজন্ম পোষিত বিদ্বেষই তাঁর সম্পত্তি এমনি ভাবে আমেরিকাবাসীদের দান করার অন্যতম কারণ। ইনি ছিলেন নরদামবার্ল্যাণ্ডের ডিউকের অবৈধ সন্তান। সে জন্য তিনি মনে করতেন জন্মসূত্রে ইংল্যাণ্ডের ডিউক প্রভৃতি অভিজাতকুলের তুল্য মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় অতীব অনুকম্পার সহিত তাঁকে তাদের সমাজে গ্রহণ করতেন। স্মিথসনের বিজ্ঞানে অনুরাগ ছিল। বিজ্ঞানী হিসাবে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কাজও তিনি করেছিলেন। এক সময় তিনি রয়েল সোসায়িটির সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। হাইড্রোজেন আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেনডিস ও প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী আরাগো ছিলেন তাঁর বন্ধুদের অন্যতম। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁর আস্থা ছিল। আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এই সব কারণেই আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই বিপুল অর্থ আমেরিকান জাতিকে দান করে যান।

স্মিথসনের উইলে নির্দেশ ছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেই তবে তাঁর উইলে লিখিত অর্থ ওয়াশিংটনে একটি বিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যয় করা চলবে। ১৮৩৫ সালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন। প্রেসিডেণ্ট অ্যানড্রু জ্যাকসন আমেরিকার এই স্মিথসনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার খবর কংগ্রেসে জানালেন। এই দান গ্রহণ উচিৎ হবে কিনা তা নিয়ে ঘোর বিতর্ক দেখা দিল। জন সি. কলহান এই দান গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে একজন বিদেশীর নিকট হতে এই দান গ্রহণ করা এদেশের মর্যাদা-হানিকর। জন কুইনসি অ্যাডামস্ও এই দান গ্রহণের বিরোধিতা করেন। তিনি বললেন, এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এ দেশের নিজস্ব মহান দায়িত্ব। একজন ইংরাজের প্রদত্ত অর্থের উপর একান্ত নির্ভর-শীল হওয়া উচিত নয়। গোটা দশ বছর ধরে এ নিয়ে তর্ক চলল। তারপর কংগ্রেস এই দান গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন।

এই সময় হেনরিই ছিলেন আমেরিকার সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতিও ছিল। সরকার তাঁকে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিউসনের প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। এই পদ গ্রহণ করলে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হবে হেনরি তা বুঝতে পারলেন। কাজেই এই পদ গ্রহণ করবেন কিনা তা নিয়ে তাঁর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং এই পদ গ্রহণ করলে যে তিনি আমেরিকায় বিজ্ঞান চর্চার আরও সুযোগ করে দিতে পারবেন তা বুঝতে পেরে এই পদ গ্রহণ করতে রাজী হলেন। ১৮৪৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে জোসেফ হেনরি ছিলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের প্রাণ। "মানব সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের জন্য" স্মিথসনের উইলের এই নির্দেশ তিনি আক্ষরিক ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। স্থির করেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের সীমান্ত বৃদ্ধির জন্য তত্ত্বীয় গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সমস্যাবলী সমাধান প্রচেষ্টা ও নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্যও পরীক্ষা চালান হবে। তাঁর মত অনেক সুদক্ষ বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান সাধনায় বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হেনরি মনে করতেন ব্যক্তির দানশীলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে শুধু বিপজ্জনক নয়, গণতান্ত্রিক মানুষের মর্যাদা-হানিকরও বটে। এই সব কথা স্মরণ করেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বিজ্ঞানের প্রসারমূলক প্রকল্পসমূহে আরও ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। হেনরি চেয়েছিলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের মাধ্যমে মেধাবী ও সম্ভাবনাময় তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারের সুবিধা, আর্থিক সাহায্য ও নিখরচায় গবেষণার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দিতে।

হেনরির আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় এক শতাব্দী ধরে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসন 'আমেরিকার বিজ্ঞানের পুষ্টি সাধনের যন্ত্র' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে আর্নল্ড গুইয়টের সাহায্যে তিনি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং আবহ সংবাদ তারযোগে ইনস্টিটিউসনে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আবহ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেফিন, এস্‌পি এবং ফ্যারেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কাজের সমন্বয় সাধনের একটি পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করে তোলেন।

জেমস্ পি. এস্‌পি ছিলেন ব্যবহারজীবী। পরমাণুবাদের প্রচারক জন ডালটনের আবহতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনস্‌টিটিউসনে তিনি চল্লিশ বছর ধরে ঝড়ঝঞ্চা ও সাধারণ আবহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন, শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বক্তৃতা দেন, এবং প্রবন্ধাদি রচনা করেন। উইলিয়াম ফ্যারেল আবহাওয়ার পদার্থ বিজ্ঞান ও সমুদ্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৮৫৬ সালে তিনি আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র তরঙ্গ পৃথিবীর আহ্নিক গতির দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ের এই আবহবিজ্ঞানীত্রয়ের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন জেমস এইচ্ কোফিন। তিনি তাঁর ট্রিটিজ অন দি উইণ্ডস্ অব দি নর্দার্ন হেমিস্পেয়ার (Treatise on the winds of the Northern Hemisphere) নামক গ্রন্থে প্রথম সুস্পষ্ট ভাগে উত্তর গোলার্ধে তিনটি প্রধান বায়ু প্রবাহের অস্তিত্বের কথা জানালেন। পরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দক্ষিণ গোলার্ধের এমনি তিনটি মূল বায়ু প্রবাহ রয়েছে।

১৮৬৮ সালে এফ. এ. আর্মস্ট্রং নামে সিনাসিনাটিস্থিত ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন রেলপথের একজন কর্মচারীর মাথায় আসে, বায়ু প্রবাহের গতি ও তাপমাত্রার নির্দেশ দিয়ে আবহ বিজ্ঞপ্তির মানচিত্র প্রণয়নের কথা। পরের বছর সিনসিনাটি মান মন্দিরের অধ্যাপক ক্লীভল্যাণ্ড এবে আবহাওয়ার পূর্বাভাষের ভিত্তিরূপে এই ধরনের মানচিত্রগুলি ব্যবহার করেন। আবহবিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত এই সব কার্যাবলী থেকে ইউনাইটেড স্টেটস্ সিগনাল কোরের অংশ রূপে ১৮৭০ সালে কেন্দ্রীয় আবহ বিভাগ (ফেডারেল মেটিয়ারলজিক্যাল সার্ভিস) প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফই যুক্তরাষ্ট্রের আবহ বিভাগের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্রের আবহ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হল, গ্রেট লেক ও দেশের উপকূলভাগে ঝড়ঝঞ্চা ও বাত্যা বিক্ষোভ সম্বন্ধে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে পূর্বাহ্ণে সতর্ক করে দেওয়া।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই, কেন্দ্রীয় সরকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউসনের নিকট বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে এসেছেন। ১৮৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার হেনরিকে লাইট হাউস বোর্ডের সদস্য পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি শব্দতত্ত্বের কতকগুলি গবেষণার কাজে হাত দেন। এই সব গবেষণার ফলে তিনি লক্ষ্য

করেন, শব্দ আবহমণ্ডলের বিভিন্ন ঘনত্বযুক্ত বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হয়। তিনি কুয়াশার বিপদ-সংকেত জানাতে একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিটি পরে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন। এই পদ্ধিতিতে কুয়াশার বিপদ-সংকেত বাষ্পচালিত বাঁশী বা ভেরী-ধ্বনির বদলে সাইরেন বাজানো হত। আলোকস্তম্ভ সমূহে আলোক সংকেত সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত তিমির চর্বির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার যখন বিব্রত বোধ করছিলেন, তখন কতকগুলি পরীক্ষার পর সরকারকে হেনরি জানালেন যে তিমির চর্বির বদলে শূকরের চর্বিও ব্যবহার করা যেতে পারে। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল আলোকস্তম্ভগুলিতে এই ভাবে তিমির তেলের বদলে শূকরের চর্বি ব্যবহার করায় দীর্ঘকাল ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বছর ১০,০০০০ ডলার হারে খরচ বেঁচেছিল।

এমনি খরচ বাঁচানোয়, বিজ্ঞান সাধনা ও উন্নতি কল্পে কেন্দ্রীয় সাহায্য দানের ব্যাপারে সংসদীয় সদস্যদের মনোভাব যে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে হেনরি সে বিষয়ে খুবই অবহিত ছিলেন। তবু তিনি স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউসনের সম্পাদকরূপে বার্ষিক মাত্র ৩৫০০ ডলার বেতন গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এর চেয়ে বেশী বেতন তিনি নিতে অস্বীকার করেন। আরও অধিক বেতন ও কম গুরুভার প্রশাসনিক দায়িত্বসম্পন্ন অনেক চাকরি অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাও তিনি নেন নি। প্রশাসন আধিকারিকের কাজ হেনরি পছন্দ করতেন না। ইনস্‌টিটিউ-সনের সম্পাদকরূপে প্রশাসনিক প্রাধিকারিকের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও তিনি জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব পালনের খাতিরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপন কর্তব্য সম্পাদন করেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ছিল সবল, অটুট। বিরাশি বছর বয়সে ওয়াশিংটনে তাঁর মৃত্যু হয়।

হেনরির মৃত্যুর পনেরো বছর পর শিকাগোয় অনুষ্ঠিত তড়িৎ বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমেরিকার এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রতি তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করেন। এখানে সমবেত বিজ্ঞানীরা তড়িৎ বিজ্ঞানের পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের নামের তালিকায় হেনরির নাম যুক্ত করলেন। আম্পিয়র, কুলম্ব্, ফ্যারাডে, গস্, ওহ্‌ম, এবং ভোল্টা—তড়িৎ বিজ্ঞানের স্রষ্টা এই বিজ্ঞানীদের নামানুসারে তড়িৎ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন এককের নামকরণ করা হয়েছিল। এবার সম্মেলনে আগত এই বিজ্ঞানীরা হেনরির নাম অনুসারে বেতার যন্ত্রে

ব্যবহৃত আবেশিক রোধের নতুন এককের নামকরণ করলেন 'হেনরি'। কারণ ১৮৮৬ সালে হাৎ´সিয়ান বা বেতার তরঙ্গ আবিষ্কৃত হবার আগে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ও বৈদ্যুতিক আবেশ সম্বন্ধে গবেষণা চালনা কালে হেনরি বেতার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন। পরীক্ষাকালে তিনি বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ থেকে ২২০ ফিট দূরে চুম্বক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন এবং ১৮৪২ সালে অনুষ্ঠিত তাঁর বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, 'লীডেন জার বা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ থেকে পালাক্রমে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিক পরিবর্তন করতেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের আবেশে ছুঁচের চুম্বক মেরুর পরিবর্তন ঘটেছিল, তাই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চয়ই পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে ঠিক তরঙ্গ না হলেও তরঙ্গ সদৃশ উঁচু নিচু গতি সৃষ্টি করে থাকে।' এখানে আপন অজ্ঞাতসারে হেনরি বেতার তরঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই ভাবে তিনি একশ বছর আগে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মত আমেরিকার বিজ্ঞানের কতকগুলি বৃহৎ ও মৌলিক সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে গেছেন।

॥ ৮ ॥

ম্যাথু ফন্‌টেন মারি

(১৮০৬-১৮৭৩)

সমুদ্র বিজ্ঞানে আমেরিকার অবদান

১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ফোর্ট সামটারে কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হল। সূত্রপাত হল গৃহযুদ্ধের। তার প্রভাব এসে পড়ল বিজ্ঞানেও।

টেনিসির ন্যাসভিলে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসান অব সায়েন্সের একটি অধিবেশন বসবার কথা ছিল। অধিবেশন বাতিল হল। ১৮৬৬ সালের আগে এই বিজ্ঞান প্রসার সমিতির কাজকর্ম আর শুরু হতে পারেনি। সে বছরের সমিতির অধিবেশনে দক্ষিণাঞ্চল থেকে কোনও বিজ্ঞানী যোগ দেন নি। গৃহযুদ্ধে বহু বিজ্ঞানী মারা গিয়েছিলেন।

বহুবিধ শক্তি এই গৃহযুদ্ধ ঘটিয়েছিল। এই শক্তিগুলি দমন করার কোনও পথ ছিল না। ওসাওয়াটোমিতে জন ব্রাউনের দীপ্ত, জ্বলন্ত প্রেরণা; 'লিবারেটর' পত্রিকায় উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসনের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সুতীব্র আক্রমণ ও তার ফলে দেশের বহুলোকের দাসপ্রথার প্রবল বিরোধী হয়ে ওঠা, দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন সমর্থন করায় ইলিনয়ের এক ক্রুদ্ধ জনতার হাতে মুদ্রাকর এলিজা লাভজয়ের শহীদের মৃত্যুবরণ—এসবই মানব কল্যাণের ঐকান্তিক বাসনা থেকে দেখা দিয়েছিল। যে সব কারণে এই গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল তা যদি মূলতঃ নীতিগত হয়ে থাকে, তা হলেও এই সংঘর্ষ এড়ান চলত। কারণ অস্ত্র বলের সাহায্য না নিয়েও দাসপ্রথা বিলোপের প্রশ্নটির অন্যভাবে মীমাংসা করা চলত।

গৃহযুদ্ধ অবশ্য অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কারণ দুই বিভিন্ন ধরনের অতি-গভীর আর্থনীতিক পরিবর্তন আমেরিকার সমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে

চলেছিল। শিল্পবিপ্লবের শুরুতে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহে দ্রুত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতি তখনও প্রধানত তামাক, ইক্ষু ও কার্পাসের চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। দুই অঞ্চলের অর্থনীতির মধ্যে প্রতি বছরই ব্যবধান বেড়ে চলতে থাকায় উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রয়োজন নিয়ত ভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। দুই অঞ্চলের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামও ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে।

যে সব নতুন অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল, সেগুলিতে জনবসতি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে থাকে দাস প্রথার সমস্যা। দাস প্রথার প্রচলনযুক্ত প্রতিটি নতুন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে, দাস প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির পক্ষে অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে দাস প্রথার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা ফলবতী হয় নি। ক্রমেই দাসপ্রথা-মুক্ত অঞ্চলরূপেই অধিকাংশ রাজ্য সংগঠিত হচ্ছিল। ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিক্যান পার্টি বাসস্থানের জন্য পশ্চিমে বেশী মূল্যে জমি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের অর্থব্যয় মঞ্জুরীতেও এরা সাহায্য করেছিলেন। কংগ্রেসে রিপাবলিক্যান দলভুক্ত কিছু সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের আশঙ্কা হল। শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের সদস্যদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। দক্ষিণের অধিবাসীরা রাজ্য সমূহের বিশেষ অধিকারের সেই পুরাতন ধুয়া তুলল। দক্ষিণের অনেক রাজ্য ইউনিয়ন পরিত্যাগ করে বেরিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছিল। ক্যারোলাইনা রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই হুমকি বাস্তবে পরিণত হল।

গৃহযুদ্ধকালে অন্যান্য নাগরিকদের মত বিজ্ঞানীরাও নিজ নিজ রাজ্যের অনুবর্তী হলেন। উত্তরে জোসেফ হেনরি গৃহযুদ্ধকে উত্তরাঞ্চলের ন্যায়-সঙ্গত ধর্মযুদ্ধ বলে মনে করে প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে লাগলেন। জীব-বিজ্ঞানী লুই আগাসিজ একমাত্র তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য আদায়ের জন্য ছাড়া রাজনীতিবিদদের মনস্তুষ্টি করার কোনও চেষ্টাই করতেন না। ইংরাজ সরকার দক্ষিণাঞ্চলকে সামরিক সাহায্য দেবার উদ্যোগ করছেন, শুনতে পেয়ে তিনি রোষ ও ঘৃণায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বেকার জীবনের দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও ইংরাজ শ্রমিকগণ উত্তরাঞ্চলের প্রতি

সহানুভূতি দেখিয়ে, ইংরাজ সরকারের দক্ষিণাঞ্চলকে সাহায্য দানে বিরত থাকার জন্য আন্দোলন করতে লাগল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীর কোনও এক অংশে দাসপ্রথা বজায় থাকলে তা বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীন শ্রমিকদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ইয়েলের বেঞ্জামিন সিলিম্যান গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পাঁচ বছর আগেই ১৮৫৬ সালে নিউ হাভেনের নিউ চার্চে অনুষ্ঠিত ক্যানজাস যাত্রীদের রাইফেলদানের বিখ্যাত সভায় দাসপ্রথার প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণার পরিচয় দিয়েছিলেন। সিলি-ম্যান তখন বিরাশি বছরের বৃদ্ধ। এই সভা স্বাধীনতা রক্ষার্থে ক্যান্‌জাসে বসবাসকারী একদল ব্যক্তিকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান চলার সময়ে আশিতিপর বৃদ্ধ সিলিম্যান প্রস্তাব করলেন ইউনিয়নের স্বপক্ষে প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণের জন্য ক্যান্‌জাস যাত্রীদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হক। সিলিম্যানের এই প্রস্তাব সভায় সমর্থন লাভ করে এবং ক্যান্‌জাস যাত্রীদের হাতে রাইফেল দেওয়া হয়। সেই থেকে নিউ ইংল্যাণ্ড এমিগ্রাণ্ট কোম্পানি ক্যান্‌জাস বসবাসকামী যাত্রীদের বন্দুক সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হয়।

সে সময় দক্ষিণাঞ্চলের সব চেয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন ম্যাথুমারি। ভার্জিনিয়া প্রদেশে তাঁর জন্ম। মারিই অবশ্য দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নন। এখানে আরও অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক এখন একথা বলে থাকেন যে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি কিছুটা অনুরাগ দেখান ছাড়া মননশীলতার দিক দিয়ে দক্ষিণাঞ্চল তখন ছিল শুষ্ক মরুভূমি। এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসার লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। একথা কিন্তু সত্য নয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রভাবশালী বিজ্ঞান সমিতিগুলি উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত হলেও কিন্তু এই সব সমিতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি যে সব বিজ্ঞানী পাঠাতেন তাদের অনেকেই ম্যাসন ও ডিকসন লাইনের অপর দিকে বাস করতেন। দক্ষিণাঞ্চলের বহু লোকও ছিলেন বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু। তাঁদের অনেকে উত্তরাঞ্চলের বিজ্ঞান সাধকদের চেয়ে ঢের বেশী অবসর যাপনের সুযোগ পেতেন। ১৭৮০ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটিতে ভার্জিনিয়া বাসী সভ্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ, ক্যারোলাইনাবাসী সভ্যসংখ্যা ছিল আট। আর ম্যাসাচুসেটস্‌ ও নিউইয়র্ক থেকে ছিল এক এক জন সভ্য। এই বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধিৎসার ফলেই চার্লেস্টনের ডাঃ উইলিয়াম সি ওয়েলস্ শিশির পাত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে শিশির পাত সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত সঠিক মতবাদ প্রচার করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই ডব্লিউ বি হজসন সৌখিন প্রত্ন জীববিদ্যার (Paleontology) চর্চায় মেতে ছিলেন। তার ফলেই তিনি জর্জিয়ার সাভানা অঞ্চলের ভূগর্ভে প্রোথিত জীবাশ্ম পরীক্ষা করে অধুনালুপ্ত অতিকায় কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী সম্বন্ধে ১৮৪৬ সালে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। ভার্জিনিয়ার এডমণ্ড রুফিন মৃত্তিকা রসায়ন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকর্ম প্রবর্তনে প্রথম উদ্যোগী হন। গৃহযুদ্ধ কালে ইনিই প্রথম দক্ষিণীদের পক্ষ থেকে আক্রমণ শুরু করেছিলেন। এই দক্ষিণেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ক্রফোর্ড ডব্লিউ লঙ। ইথার অবেদনিক প্রয়োগ করে ইনিই প্রথম মনুষ্যদেহে অস্ত্রোপচার করেন।

দক্ষিণের বিজ্ঞানীরা অন্যান্য কার্যকরী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। ইয়াঙ্কী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলবাসী) উদ্ভাবন দক্ষতাকে কার্যতঃ সমগ্র আমেরিকাবাসীদের উদ্ভাবন দক্ষতা বলে গণ্য করা চলে। কারণ ১৮৪৯ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট অফিস কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত পেটেণ্টের শতকরা আঠারোটির মালিক ছিলেন দক্ষিণী আবিষ্কারকেরা। ১৭৮৭ সালে ভার্জিনিয়ার জেমস রুমজে পোটোম্যাক নদীতে একটি বাষ্পীয় পোত চালিয়ে ছিলেন। ১৮৩৪ সালে ভার্জিনিয়ার সাইরাস ম্যাক করমিক প্রথম কার্যকরী কলের ফসল কাটাই যন্ত্র নির্মাণ করেন। এতে হাতে ফসল কাটার আর প্রয়োজন রইল না। ১৮৫৬ সাল নাগাদ ম্যাক করমিক প্রায় বারো হাজারেরও বেশী এই যন্ত্র সারা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় করেন। উত্তরাঞ্চলে ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয়ের ক্ষেতে ক্ষেতে ম্যাককরমিকের এই ফসল কাটা কল গৃহযুদ্ধে উত্তরীদের দক্ষিণীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভে সাহায্য করেছিল।

গৃহ যুদ্ধ শুরু হবার আট দিন পর কমাণ্ডার ম্যাথু মারি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-মান মন্দিরের কাজে ইস্তাফা দিয়ে দক্ষিণী রাজ্যপুঞ্জের সেনাবাহিনীতে যোগ দান করেন। মারি ভার্জিনিয়ার শুধু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়েও বেশী কিছু—ভার্জিনিয়ার একজন দেশগৌরব কৃতি পুরুষ। ১৮০৬ সালে ফ্রেডরিসকবার্গের নিকট তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন সেখানে খেতখামারের মালিক। মারির খুব ছেলে বেলায় তাঁর পিতা ভাল জায়গা জমির সন্ধানে ব্লু-রীজ পর্বতমালা পেরিয়ে সেনান দোয়া উপত্যকা ধরে ঘোড়ায়

টানা ঢাকা গাড়ীতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে টেনেসির ফ্রাঙ্কলিনের নিকট নতুন সীমান্ত প্রদেশে চলে আসেন। ভাই বোনে মিলে মারিরা ছিলেন নয় জন। মারিকে পিতার খামারে খাটতে হত। বারো বছর বয়সে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। তাতে তাঁর খামারে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। তাই ডাক্তারী পড়ানোর জন্য তাঁকে পাঠান হয় হর্পেথ একাডেমীতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারির ডাক্তারী পড়া হল না। একজন বুড়ো মুচি তরুণ মারির মনে এক নতুন উন্মাদনার রং ধরিয়ে দিল। এই ব্যক্তি অবসর সময়ে গণিত চর্চা করত। ডাক্তারের বদলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরে সমুদ্র বিজ্ঞানী হতে চললেন মারি। পিতার অমতে লুকিয়ে মিডশিপম্যানের চাকরি নিলেন। ধারকরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলেন ওয়াশিংটনে। সেখানে তাকে বলা হল নিউইয়র্ক গিয়ে নৌ-বিভাগের রণতরী ব্রাণ্ডিওয়াইন-এ কাজে যোগ দিতে।

পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চ, প্রশস্ত স্কন্ধে বিরাটকায় মস্তক, কুঞ্চিত কপিশ কেশ, স্বাস্থ্য দীপ্ত রঙ্গীন মুখমণ্ডল—মারি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী তরুণ। পরে তিনি নিজে লিখেছিলেন, কাজ থেকে ছুটি পেয়ে যখন নিচতলায় যেতাম, হাতের কাছে কোনও অভিধান বা বই পেলে তা নিয়ে পড়তে বসতাম। বই এর দরকারী কোন বাক্য বেছে নিয়ে মনে করে রাখতাম। উপরে ডেকে গিয়ে কাজ করার সময় আবার সে কথা স্মরণ করতাম। জাহাজের কাজে বহু ক্ষণ ধরে তাকে ডেকের উপর চলাফেরা করতে হত। এই চলা ফেরার সময়ও তিনি বিদ্যাভ্যাসের কাজে লাগাতেন কামানের গোলার গায়ে গোলীয় ত্রিকোনোমিতির নক্সা এঁকে গোলাগুলিতে তাকে এমনভাবে বসিয়ে রাখতেন যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাহাজে কাজের মাঝে চলাফেরা করতে সেগুলি চোখে পড়ে তিনি পড়বার সুযোগ পান।

১৮২৬ সালের মে মাসে মারি প্রথম সমুদ্র যাত্রা থেকে ফিরলেন। পরিবারের লোক জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে তাড়াতাড়ি ছুটলেন টেনেসীতে। এরপর হুকুম এল, 'ম্যাসিডোনিয়ান' নামে জাহাজে কাজে যোগ দেবার। এই জাহাজখানা কেপ হর্ণ ঘুরে গেল রিও ডা জেনিরোতে, তারপর দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকুল ধরে পেরুর লমায় পৌছল। এখানে তিনি ১৮২৭ সালের মার্চ মাসে ভিসেনেজ নামে একটি যুদ্ধ জাহাজে বদলি হলেন। এই যুদ্ধ জাহাজটি চীনে গিয়েছিল। চীনযাত্রী যুক্তরাষ্ট্রের এটি দ্বিতীয় যুদ্ধ জাহাজ। আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ গুলির মধ্যে এটিই আবার প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা

করে। সমগ্র পৃথিবী বেড় দিয়ে ঘুরে আসতে জাহাজটির প্রায় চার বছর সময় লেগেছিল। ১৮৩০ সালের জুন মাসের আগে ম্যাথু মারি নিউইয়র্কে ফিরে আসতে পারেন নি।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের অফিসাররূপে পরবর্তী ও সর্বশেষ সমুদ্র যাত্রাতেই মারির ভবিষ্যৎ খ্যাতির পথ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩১ সালে ফলমাউথ নামে ছোট একখানি জাহাজের ক্যাপ্টেন রূপে মারি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার আদেশ পেলেন। জাহাজের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য এ সময় প্রয়োজন হয়েছিল সব চেয়ে অনুকূল বায়ু প্রবাহ সবচেয়ে দ্রুত সমুদ্র স্রোত এবং সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সমুদ্রপথ (Sea lanes) বেছে নেবার। এই সব তথ্য সংগ্রহের জন্য জাহাজে রক্ষিত নৌচালনা সংক্রান্ত সমুদয় পুস্তক পড়লেন মারি, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ নৌ-অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হল যে এ সম্বন্ধে নির্ভর যোগ্য তথ্য যৎসামান্য, মতামত পরস্পর বিরোধী, অনুকূল সমুদ্র বায়ু প্রবাহ ও পথ নির্ধারণের এই সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে খুবই কম।

নৌ-পরিচালনার কাজে অনুকূল বায়ু ও সমুদ্র স্রোত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রেহের প্রয়োজনীয়তা মারি তখনই অনুভব করেছিলেন। কিন্তু দশ বছরেব পরে ছাড়া এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে মারি তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া অ্যান হার্নডনকে বিবাহ করে ফ্রেডারিকস্‌বার্গে বসবাস করতে লাগলেন। দু' বছর পর তাঁর লিখিত নৌ-পরিচালনা সংক্রান্ত একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থখানি নৌবাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের পাঠ্যপুস্তকের উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থখানির নাম, 'এ নিউ থিয়োরেটিক্যাল অ্যাণ্ড প্র্যাকটিক্যাল ট্রিটিজ অন নেভিগেশন (A New Theoretical and Practical Treatise on Navigation)।

নিজ অভিজ্ঞতা থেকে মারি বুঝতে পেরেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে নিম্ন কর্মচারীদের (মিড শিপম্যান) শিক্ষার ব্যবস্থা অপ্রতুল ও ত্রুটিপূর্ণ। নৌবাহিনীর অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও সংস্কার ও আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই ত্রুটিগুলির প্রতি সংসদ সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্তনে জন সমর্থন লাভ করার আশায় ১৮৩৮ সালে তিনি 'হুইগ অ্যাণ্ড পাবলিক অ্যাড়ভাইজার' নামে একখানি পত্রিকায়

ধারাবাহিক ভাবে বারোটি প্রবন্ধ লিখলেন। এর দু বছর পর 'সাউদার্ন লিটারারী মেসেনজারে' স্ক্র্যাপস্ ক্রম দি লাকি ব্যাগ' শিরোনামায় আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন। নিজ নামে না লিখলে আরও স্বাধীনভাবে লিখতে পারবেন মনে করে তিনি প্রবন্ধগুলিতে হ্যারি ব্লাক ও উইল ওয়াচ এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছিলেন।

মারি তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে স্থলবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র ওয়েস্টপয়েণ্টের সৈনিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ নৌবিদ্যালয় (নেভাল একাডেমী) স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিছুটা তাঁর এই প্রবন্ধগুলির প্রভাবেই ১৮৮৫ সালে আন্নাপোলিসে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মারি তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে নৌবিভাগের অফিসারদের শিক্ষার সংস্কার সাধনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিদেশী ভাষা ও আন্তর্জাতিক আইন শিক্ষা তিনি এই সব নৌ অফিসারদের শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আবেদন জানিয়েছিলেন আরও বৃহত্তর নৌবাহিনী গঠন করবার, বন্দর রক্ষার আরও উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের, আফ্রিকার দাস শ্রমিক ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত আইন আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগের, ও চীনা দল দস্যুদের হাত থেকে আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজগুলির অধিকতর নিরাপত্তা বিধানের।

প্রবন্ধগুলির লেখকের প্রকৃত নাম যখন কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পারলেন তখন তাঁরা প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির উপর আরও গুরুত্ব দিতে লাগলেন। একজন পরামর্শ দিলেন, মারিকে এই নৌবিদ্যালয়ের সম্পাদক নিয়োগ করা হোক। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট টাইলারেব তাতে কোন ও আপত্তি দিল না। কিন্তু মারি উচ্চপদস্থ নৌ অফিসারদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় শত্রু সৃষ্টি করে বসেছিলেন যে তাঁরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাঁদের বিরোধিতার জন্য মারি কোন কালেই এই সম্মানজনক পদটি লাভ করতে সমর্থ হননি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ১৮৪১ সালে তিনি আবার সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে মনস্থ করলেন। নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন পুনরায় তাঁকে সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ দিতে। এখানে উল্লেখ্য এই যে, ১৮৩১ সালের পর আর তিনি কোনও সমুদ্র যাত্রায় বের হননি। বিজ্ঞানের পক্ষে অতীব সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ইতিমধ্যে মারি যাত্রী ও ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। সরকারকে তাঁর এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল তাই।

এই দুর্ঘটনায় তাঁর একটি উর্বাস্থি সাংঘাতিক ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে তিনি চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। মারির জীবনের এই দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম জীবন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

১৮৪২ সালের জুলাই মাসে মারি ওয়াশিংটনস্থিত ডিপো অব চার্টস অ্যাণ্ড ইনস্ট্রুমেণ্ট বিভাগের অধিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এই বিভাগটি পরে ইউনাইটেড স্টেটস্ নেভাল অবজারভেটরী অ্যাণ্ড হাইড্রোগ্রাফিক্যাল অফিসে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ মানমন্দির ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ) পরিণত হয়। দেশের নৌবাহিনী ও বাণিজ্য তরী সমূহের জন্য কিছু করবার মস্ত সুযোগ এবার তাঁর হাতে এল। বিজ্ঞান যে সমুদ্রগামী জাহাজের গতিবেগ বৃদ্ধি করার কাজে সাহায্য করতে পারে এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল। ১৮০০ সাল থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিরপেক্ষ আমদানী রপ্তানীকারী দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬০ সালের পূর্ববর্তী ত্রিশবছরে আমরা ৩৩৫,০০০,০০০ ডলার মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করেছিলাম। আমাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্পও অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমরা ক্লীপার নামে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী পালের জাহাজ নির্মাণ করেছিলাম। এগুলি পৃথিবীর সকল দেশের বন্দরে পণ্যসামগ্রী বয়ে নিয়ে যেত। দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশকে আরও নিবিড় ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে যেমন প্রয়োজন হয়েছিল রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের, তেমনি আমাদের নৌবাহিনী ও বাণিজ্যতরীগুলির প্রয়োজন হয়েছিল সাগরের মাঝে দ্রুততর সমুদ্র পথ। এই নিরাপদ ও দ্রুততর 'সমুদ্র পথ' নির্ধারণের সমস্যায় মারি তাঁর জীবনের বাকী সময় কাটান।

ডিপো অব চার্টস্ অ্যাণ্ড ইনস্ট্রুমেণ্টের পুরানো বাড়ীতে, ভূগর্ভস্থ অন্ধকার ঘরের, ছোট ছোট কক্ষে, পরিত্যক্ত টেবিল ও চিলে কোঠায় তাড়া তাড়া পুরানো লগবই এর গায়ে বছরের পর বছর ধুলো জমছিল। মারির মনে হল, এই সব "বাজে কাগজের" মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের স্বর্ণখনি। এগুলির খনন কার্যে তিনি লেগে গেলেন। এই লগ-বইগুলিতে লেখা ছিল সদাজাগ্রত চক্ষু অসংখ্য জাহাজের ক্যাপ্টেনদের দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ লিপি। এরা তাদের এই লগবইগুলিতে প্রতিটি বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোতের কথা লিখে গিয়েছিলেন।

মারি বুঝতে পেরেছিলেন, এই সব পুরানো তথ্যের মাঝে মাঝে যে সব ফাঁক রয়েছে তা পূরণ করা দরকার। একজন লোকের একক চেষ্টায় এইসব

তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'সমুদ্রে বায়ু প্রবাহের মাঝ দিয়ে সর্ব-ঋতুতে জাহাজ চলাচলের উপযোগী সর্বোত্তম সমুদ্র পথের' মানচিত্র অঙ্কনের এই কাজে সহযোগিতা করবার জন্য সর্ব শ্রেণীর জাহাজী মানুষই এগিয়ে আসবে। বিভিন্ন সমুদ্র বক্ষে জাহাজ চলাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র পথ ও সর্বাপেক্ষা অনুকূল বায়ু প্রবাহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মারি হাজার হাজার খসড়া মানচিত্র ছাপলেন। সেগুলি বণ্টন করলেন সমুদ্রগামী জাহাজগুলির ক্যাপ্টেনদের মাঝে। তাঁদের অনুরোধ করা হল তাঁরা যেন প্রতিদিন এতে তাদের জাহাজের গতিপথ চিহ্নিত করে রাখেন। এ কাজের বিনিময়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনগণ বিনা মূল্যে পাবেন সরকার প্রকাশিত সমুদ্রে জাহাজ চালনার সর্বাধিক উপযোগী সমুদ্র পথের মানচিত্র (পাইলট চার্ট) ও সমুদ্রে বিভিন্ন বায়ু-প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোতগুলি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি। কিভাবে সঠিক সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহের দিক ও শক্তি, সমুদ্র স্রোতের গতিমুখ ও গতিবেগ নির্ণয় করতে হবে, লক্ষ্য করতে হবে পৃথিবীর চুম্বক মেরু প্রভাবে কম্পাসের কাঁটার পরিবর্তন, সংগ্রহ করতে হবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও চাপের পরিমাণ, সমুদ্র জলের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত, কুয়াশা, তিমির ঝাঁকের আবির্ভাব, মাছ ও পাখির ঝাঁক প্রভৃতি অন্যান্য সামুদ্রিক ঘটনাবলীর তথ্য, সে সম্বন্ধে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে মারি নিজে অন্যান্য সূত্র হতে অতীতের বহুবর্ষের সমুদ্র বায়ু প্রবাহের দিকের ও গতিবেগের তথ্য সংগ্রহ করলেন। ১৮৪২ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট হতে বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ ২৬,০০০,০০০ মানচিত্র ওয়াশিংটনের নৌমান-মন্দিরে এসে জমা হয়েছিল।

পাঁচ বছর ধরে পুরানো লগবইগুলিতে বিভিন্ন নাবিকের লিখিত লক্ষ লক্ষ বিবরণী পড়ে, এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট হতে মুদ্রিত মানচিত্রে নির্দেশ মত যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল সে সব তথ্য মিলিয়ে তিনি প্রথম, 'উইণ্ড অ্যাণ্ড কারেণ্ট চার্ট অব দি নর্থ আটলাণ্টিক' (The wind and current chart of the North Atlantic) নামক তাঁর বিখ্যাত মানচিত্রটি (চার্ট) প্রকাশ করলেন। এই মানচিত্রে সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনগণ নির্ভয়ে যে সব সমুদ্র পথের অনুসরণ করতে পারেন তার নির্দেশ দেওয়া ছিল। যে সব সমুদ্রপথ ধরে চললে সমুদ্র যাত্রার সময় অনেক বাঁচবে, যে সব সমুদ্রবায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত ধরে চললে সমুদ্রযাত্রার বিপদের শঙ্কা

কমবে—সে সব পথের নির্দেশ এই মানচিত্রে দেওয়া হয়েছিল। মারি জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট নৌচালনার নির্দেশ (Sailing Directions) প্রেরণ করতে লাগলেন। ক্যাপ্টেনদের অনুরোধ করলেন মাঝে মাঝে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ লেখা কাগজ বোতলে পুরে ভাল করে কর্কের ছিপি এটে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে, এবং অন্য জাহাজ থেকে ভাসান এমনি সব বোতলের দিকে নজর রাখতে। ঠিক কোন স্থানে এই বোতল পাওয়া গেল তার যথাযথ অবস্থিতি, এবং বোতল প্রাপ্তির সময়ও লিখে রাখবার নির্দেশ ছিল ক্যাপ্টেনদের প্রতি।

মারির সংকলিত মানচিত্র ব্যবহারকারী জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট হতে যে সব খবর ওয়াশিংটনে আসতে লাগল তাতে বায়ুপ্রবাহ ও 'সমুদ্রপথ' নির্ণয়ে মারির নির্ধারিত পদ্ধতির বিজ্ঞান সম্মত নির্ভুলতার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল। নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে রিও ডি জেনিরো যেতে গড় পড়তা সময় লাগত পঞ্চান্ন দিন। ১৮৪৮ সালে যে সব কাপ্টেন মারির মানচিত্রে প্রদর্শিত সমুদ্রপথ, সমুদ্রস্রোত, ও বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী জাহাজ চালনা করছিলেন তারা পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে এই যাত্রা সাঙ্গ করতে পারছিলেন। ১০৫১ সাল নাগাদ এক হাজারেরও বেশী জাহাজ মারির এই মানচিত্র ব্যবহার করছিল। ১৮৫২ সাল নাগাদ নিউইয়র্ক থেকে কেপ হর্ন ঘুরে সানফ্রান্সিস্‌কো যাবার পথের সময় ১৮০ দিন থেকে কমে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ১৩৩ দিনে।

সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনায় মারির এই মানচিত্র যুগান্তর আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। খবরটা নৌপরিচালক মহলে মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ফলে অতি শীঘ্রই মারির এই সুকর্মের স্বীকৃতি মিলল। নিরাপদ ও সুবিধাজনক সমুদ্রপথগুলির মানচিত্র আঁকতে শুরু করবার নয় বৎসর পর প্রেসিডেণ্ট ফিলমোর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত বাণীতে মারির বিস্ময়কর কীর্তির কথা উল্লেখ করেন। নিউইয়র্কের একদল জাহাজ ব্যবসায়ী বীমাকারী মারির মহান কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে তাঁকে কিছু রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্র ও ৫০০০ ডলার উপহার দিলেন। ১৮৫৩ সালে কোলম্বিয়া বিশ্ববিত্যালয় তাঁকে সম্মানমূলক উক্টর অব ল উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেই বছরই তাঁর 'লেনস ফর স্টীমারস ক্রসিং দি আটলাণ্টিক' (Lanes for steamers crossing the Atlantic) নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়

পরের বছর তাঁকে সম্মানিত করে তাঁর নামানুসারে একটি জাহাজের নামকরণ করা হয়। মারির মানচিত্র ও নির্দেশ অনুসরণ করে ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাতে ২৪০ দিনের বদলে ২০০ দিন লাগছিল। খবরটা জানতে পেরে মারির কার্যাবলীর প্রতি ইউরোপীয়দেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

১৮৫৩ সালের ২৩শে আগস্ট ব্রাসেলসএ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। মারি এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিরূপে তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সতেরো দিন ধরে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, সুইডেন, পর্তুগাল ও নরওয়ের বিজ্ঞানীরা সমুদ্র যাত্রার বিবিধ সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। সমুদ্র ভ্রমণ তখন এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করছিল। ধীরে ধীরে পালের জাহাজের স্থান গ্রহণ করতে চলেছিল বাষ্পচালিত জাহাজ। মারি সমবেত প্রতিনিধিদের জানালেন তাঁর সমুদ্রপথ, স্রোত ও বায়ুপ্রবাহের মানচিত্র ও এইসব তথ্য সংগ্রহের জন্য মুদ্রিত মানচিত্রের খসড়া সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ ও নৌবহরের জন্যই রচিত হয়েছে। সম্মেলনে স্থির হল যে, সকল দেশই সামুদ্রিক ও আবহতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে চলবেন। যুদ্ধের সময়ও এসব তথ্য সযত্নে সংরক্ষিত হবে এবং এগুলিকে অতি পবিত্র বস্তু মন করে এর ধ্বংস সাধনে বিরত থাকতে হবে।

অন্যান্য জাতিগুলি এই সম্মেলনের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছিল। সম্মেলনের শেষে স্পেন, অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, প্রুশিয়া, চিলি, সাডিনিয়া, মুক্ত শহর হামবুর্গ ও ব্রেমেন, এবং মহামান্য পোপের অধিকারভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের এই বিরাট আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যোগদান করল। মারির নির্দেশিত সমুদ্রপথসমূহ পৃথিবীর শতকরা পচানব্বইটি পণ্যবাহী বাণিজ্য-তরী ব্যবহার করছিল। মারির প্রস্তাবিত সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহের নীতি পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশ গ্রহণ করায়, প্রতিটি জাহাজই হয়ে দাঁড়াল এক একটি ভাসমান মানমন্দির।

১৮৫৫ সালে নৌবাহিনীর নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি আইন পাস করল। মারি যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল অবজারভেটরীর কাজেই বহাল রইলেন। দু বছর পর তাঁকে নৌবাহিনীর সক্রিয় কাজে নিযুক্ত করা হল। পরের বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তাঁকে কমোডোরের উচ্চতর পদে উন্নীত করলেন।

নেভাল অবজারভেটরীর কাজে নিযুক্ত থাকা কালে মারি প্রতিষ্ঠানটির জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত কাজের উন্নতি সাধনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে দিয়ে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃ সমুদ্র বিজ্ঞানে তাঁর বিরাট অবদানের জন্যই। সমুদ্র বিজ্ঞানে তিনি "বিভিন্ন সমুদ্রবক্ষে নিরাপদে যাতায়তের পথ প্রদর্শক"রূপে খ্যাত। আটলান্টিক মহাসাগরে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের তার স্থাপনের ব্যাপারে তিনি যে সাহায্য করে'ছলেন তার জন্য আরও কিছু পরিমাণ খ্যাতি তাঁর প্রাপ্য। জাহাজের কাপ্তেনদের মারি যখন সমুদ্র বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র-স্রোতের তথ্য সংগ্রহের জন্য খসড়া মানচিত্র দিতেন, তখন তাদের সমুদ্রের তলদেশ থেকে আগত শব্দ পরীক্ষা করারও নির্দেশ দিতেন। এই তথ্য জানবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল, সমুদ্রের তলদেশের ভূ-বিবরণীর মানচিত্র অঙ্কনের জন্য। এই সব তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মারি ১৮৫২ সালে উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রের তলদেশের ভূ-বিবরণীর পরিচয়সূচক একটি মানচিত্র আঁকেন। এই মানচিত্রে দেখা গেল ৩৯ অক্ষাংশ বরাবর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়র্ল্যাণ্ড পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে মালভূমির মত সুউচ্চ খানিকটা স্থান। এই স্থানটির নাম দিয়েছিলেন মারি 'টেলিগ্রাফ মালভূমি'। ইউরোপ ও আমেরিকা এই দুই মহাদেশের মধ্যে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের কাজে এই স্থানটি ব্যবহার করা যেতে পারে। সমুদ্রতলস্থ এই মালভূমিতে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করতে পারলে তার সাহায্যে আমেরিকা ও ইউরোপের টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা যুক্ত করা যাবে। এমনিভাবে শেষে সমস্ত সমুদ্রগর্ভে টেলিগ্রাফ তার স্থাপন করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তারবার্তা আদান-প্রদান করা চলবে।

উত্তর আটলান্টিক সাগরবক্ষে যারা টেলিগ্রাফের তার স্থাপনের ভার নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম সাইরাস ডব্লিউ. ফিল্ড। ইনি মারি বর্ণিত 'টেলিগ্রাফ মালভূমির' কথা শুনেছিলেন। দুজনের মধ্যে ১৮৫৩ সাল থেকে আটলান্টিক বক্ষে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে পত্রালাপ চলছিল। ফিল্ড বহুবার মারির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। ১৮৫৭ সালে ও ১৮৫৮ সালে দুবার যখন আটলান্টিক বক্ষে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের প্রয়াস ব্যর্থ হয় তখনও উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। আটলান্টিক সাগরবক্ষে যে অতি শীঘ্রই টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করা যাবে,

মারির এ বিশ্বাস কখনও শিথিল হয়নি। ১৮৬৬ সালে উত্তর আটলান্টিক সাগরবক্ষে স্থাপিত টেলিগ্রাফ তারযোগে যখন প্রথম বার্তা প্রেরিত হয়, তখন ফিল্ড অকুণ্ঠিত চিত্তে মারির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করলেন। মারি তাঁর প্রদত্ত পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য কোনও মজুরী পাননি। এই আটলান্টিক টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করার অনুমতি দেবার জন্য তাকে ৫০০০ ডলার দিতে চাওয়া হয়েছিল। মারি এই অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

জাতির জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মাঝে বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকা সমীচীন নয়—যেসব বিজ্ঞানী এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন মারি তাঁদের অন্যতম। ১৮০৮ সালে সংবিধানের অনুশাসন বলে এদেশে আফ্রিকাবাসী নিগ্রো দাস শ্রমিক ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানী বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অবৈধ এই কারবার চলছিল। ক্রীতদাসদের সন্তান-সন্ততি জন্মে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল। তুলার বীজ ছাড়াবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর তুলার চাষে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছিল। তুলাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থপ্রসূ সমুদয় কৃষিজাত পণ্যের শীর্ষস্থানীয়। তুলার চাষের জন্য প্রচুর দাস শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হতে লাগল। দাস প্রথা তাই যুক্তরাষ্ট্রে শক্ত খুঁটি গাড়ল। দাস প্রথার উচ্ছেদের জন্য এবং নিগ্রো কৃতদাসদের আফ্রিকার লাইবেরিয়াতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য ১৮১৭ সালে আমেরিকান কলোনিজেসন সোসায়িটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু এইভাবে দাসপ্রথার উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। কারণ মালিকদের কাছ থেকে ক্রীতদাস কিনে জাহাজে ভাড়া দিয়ে তাদের আফ্রিকায় পাঠান ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া আর একটি কারণ হল নিগ্রোদের উচ্চ জন্ম হার। ১৮৪৯ সালে টেনেসির মেমফিসে চৌদ্দটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন বসল। ম্যাথু মারি এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য যে সব ক্রীতদাস আমদানী করা হবে, তাদের ব্রাজিলের বন্দরে জাহাজ থেকে নাবান হোক। তিনি আশা করেছিলেন এই উপায় অবলম্বন করলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিরতরে দাস প্রথা দূর করা যাবে। এই সম্মেলনে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমাজন নদীকে

সব দেশের জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হোক এবং এর দুই উর্বর তীর ভূমিতে আমেরিকার নিগ্রোদের বসতি স্থাপন করানো হোক।

কিন্তু যে ব্যবহার দ্বারা দক্ষিণাঞ্চল থেকে দাস প্রথা দূর করা যায়, আবার সেই সঙ্গে দক্ষিণীরা দাস প্রথার সুবিধাও ভোগ করতে পারে—এমনি স্ববিরোধী প্রয়াসের কোন ফল হল না। নয় মাস বিতর্কের শেষে, মারির এই বক্তৃতার অল্পকাল পরই, ১৮৫০ সালের আপস চুক্তি গৃহীত হয়। ক্যালিফোর্নিয়া দাস প্রথামুক্ত রাজ্যরূপে সংগঠিত হল। পলাতক ক্রীতদাসদের কঠোর শাস্তি দেবার জন্য ফিউজিটিভ স্লেভ ল (পলাতক ক্রীতদাস সংক্রান্ত আইন) পাস হল। দাস প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, পরবর্তী চার বছরে তা অনেকটা থিতিয়ে এল যেন। কিছুটা প্রীতির ভাব দেখা দিল দাস প্রথা বিরোধী ও সমর্থক দুই পক্ষের মাঝে। কিন্তু ক্যানজাস নেব্রাস্কা আইনের সমর্থন করে সিনেটর স্টেফেন এ. ডগলাস যখন কার্যতঃ ১৮২০ সালের মিজুরি আপস চুক্তি বাতিল করে দেন, তখন দক্ষিণাঞ্চলে পুনরায় অসন্তোষ বহ্নি ধুমায়িত হয়ে উঠল। ১৮২০ সালের এই আপস চুক্তিই ত্রিশ বছর ধরে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে শক্তি সাম্য রক্ষা করে এসেছিল। এই ক্যানজাস-নেব্রাসকো আইন অনুসারে ক্রীত লুসিয়ানা অঞ্চলের ৩৬°৩০′ মিঃ উত্তরের সমুদয় ভূমি ক্যান্জাস নেব্রাস্কা, এই অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার জন্য আবেদন করার আগে নিজ নিজ দেশে দাস প্রথা চালু রাখা না রাখা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই আইনের ফলে নতুন করে বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হল, ক্যান্জাসে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটল এবং সমগ্র দাস প্রথার প্রশ্নটি অতি তীব্র ও জ্বলন্ত আকার ধারণ করল। এই বছরই ১৮৫৪ সালে রিপাবলিকান পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল। এই দল হোমস্টেড অ্যাকট, (পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকামীদের বিনা মূল্যে জমি দানের প্রস্তাব করা হয় এই আইনে) ও আমেরিকায় পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত বরাবর আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি হুমকি দিতে লাগল, রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী জন ফ্রেমোণ্ট নির্বাচিত হলে, তাঁরা ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। পেনসিলভানিয়ার জেমস বুকানন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন।

পরের চার বছর খুব অশান্তিতে কাটল। ডেমোক্রাটিক পার্টিতে ভাঙন

দেখা দিল। ১৮৬০ সালের ৩র্রা নভেম্বর রিপাবলিকান দলের প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ছয় সপ্তাহ পর দক্ষিণ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হল। মারি দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী। অঙ্গরাজ্য সমূহের বিশেষ অধিকারের দাবী তিনি সমর্থন করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবার বিরোধী ছিলেন। সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারের নিকট তিনি জরুরী চিঠি পাঠালেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্য দ্রুত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। ১৮৬১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী নাগাদ আরও ছয়টি অঙ্গরাজ্য দক্ষিণ ক্যারোলাইনার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রমণ্ডলী (কনফেডারেসী) গঠন করল। এই কনফেডারেসীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন জেফারসন ডেভিস। ইউনিয়ন রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে আর একবার শেষ চেষ্টা করলেন মারি। ভার্জিনিয়া, টেনেসি এবং কেনটাকি সীমান্তবর্তী এই অঙ্গ রাজ্যগুলিকে তিনি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থেকে উত্তর ও দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির বিরোধ মীমাংসায় সালিসি করতে অনুরোধ জানালেন। ৪ঠা নভেম্বর আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করলেন। মারি লিখলেন, 'এখন আমার কর্তব্য কি তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। প্রতি ব্যক্তিকেই তার নিজ নিজ রাজ্যের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতে হবে। উত্তর ও দক্ষিণ এই পক্ষের মধ্যে যদি যুদ্ধ না বাধে তা হলে, এখন আমাদের ইউনিয়ন পরিত্যাগকারী রাজ্যগুলির পুনসংযোজনের জন্য আন্দোলন করতে হবে। ১৮৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচন এই সংযোজনের দাবীর ভিত্তিতে চালাতে হবে, ইউনিয়ন ত্যাগকারী রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং আরও এক সুখী, বৃহৎ ও গৌরবময় জাতি গড়ে তুলতে হবে।'

গৃহযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করতে অতি দ্রুত অপ্রতিরোধ্য ঘটনাসমূহ ঘটে চলেছিল। ১২ই এপ্রিল চার্লস্টন বন্দরের ফোর্ট সামটারের উপর দক্ষিণীরা আক্রমণ চালাল। তিনদিন পর লিঙ্কন ৭৫০০০ সেনার একটি রাষ্ট্রীয় বাহিনী গঠনের আবেদন জানালেন। সতেরোই ভার্জিনিয়া রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে আইন পাস করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মারি শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, ইউনিয়ন অক্ষুন্ন রাখবার। কিন্তু নিজের রাজ্য ভাজিনিয়া ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন রাজ্যসমূহের কনফেডারেসীতে যোগ দেওয়ায় তাঁর আর করবার কিছু রইল না। ২০শে

এপ্রিল তিনি আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করে নেভাল অবজারভেটরীর কাজে ইস্তফা দিয়ে অবিলম্বে দক্ষিণী কনফেডারেসী সরকারের কাজে যোগ দিতে ছুটলেন রিচমণ্ডে। রিচমণ্ড তখন কনফেডারেসীর রাজধানী। তাঁর দুই পুত্র, রিচার্ড ও জন কনফেডারেসীর স্থল বাহিনীতে যোগ দিলেন। ১০ই জুন, মারিকে কনফেডারেসীর ছোট একটি নৌবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। দক্ষিণীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে নৌবল ছিল না। উত্তরীরা মতলব করেছিলেন নৌ-অবরোধের দ্বারা দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ছিন্ন করে এবং মিসিসিপি নদীতে নৌচলাচল নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে তারা দক্ষিণী রাষ্ট্রজোটকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দেবেন। মারি বুঝতে পেরেছিলেন, অপ্রতুল নৌবল নিয়ে দক্ষিণের পক্ষে উত্তরীদের এই পরিকল্পনা বানচাল করা সম্ভব নয়। একমাত্র উত্তরীদের যুদ্ধ জাহাজগুলি ধ্বংস করতে পারলেই ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করা যেতে পারে। নব উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক টর্পেডোর সাহায্যে তিনি উত্তরীদের যুদ্ধ জাহাজগুলি ধ্বংস করবার মতলব আঁটলেন। রবার্ট ফুলটন ও সামুয়েল কোল্ট, এরা দুজনেই ইতিপূর্বে বৈদ্যুতিক মাইন নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকানদের মধ্যে মারিই প্রথম বিদ্যুত চালিত উন্নততর জলনিমজ্জিত টর্পেডো নির্মাণ করেছিলেন এবং এই নতুন অস্ত্রটি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। এই নতুন বিদ্যুৎচালিত টর্পেডোর কার্যোপযোগিতার পরীক্ষা প্রদর্শনের পর দক্ষিণী রাষ্ট্রমণ্ডলীর সরকার এই টর্পেডো নির্মাণের জন্য মারিকে ৫০০০০ ডলার অর্থ সাহায্য মঞ্জুরী করেছিলেন। এ সম্বন্ধে মারি পরে লিখেছিলেন "এই যে জাহাজী লোকজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় টর্পেডো নিক্ষেপে উড়িয়ে দেওয়া, আমি এতে কোনও গৌরব দেখি না। আমি চেষ্টা করব বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার করে, তাদের সলিল সমাধি রোধ করতে।' উত্তরীরা মারির আবিষ্কৃত এই বৈদ্যুতিক মাইনকে এমনি ভয় করত যে ইয়াঙ্কী যুদ্ধ জাহাজ ১৮৬৪ সালের আগে জেমস নদী ধরে রিচমণ্ডে পৌছানোর চেষ্টা করেনি।

উত্তরাঞ্চলের এক শ্রেণীর তোষণ নীতিবাদী ব্যক্তি গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করতেন। কারণ যুদ্ধ ব্যবসাবাণিজ্যের বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণীরা শুধু এই উত্তরী তোষণ নীতিবাদিদের সাহায্যেই যুদ্ধ জয়ের আশা করতেন না, তারা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যেরও ভরসা রাখতেন। তাঁরা ভেবেছিলেন,

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাঁদের উত্তরীদের নৌ-অবরোধ ভঙ্গ করতে সাহায্য করবে। এই আশা যখন ক্রমে ক্রমে মিথ্যা প্রমাণিত হল, দক্ষিণীরা বুঝতে পারলেন উত্তরীদের নৌ অবরোধ তাদের নিজেদেরই ভাঙ্গতে হবে নতুবা ধ্বংস অনিবার্য, তখন তারা মারির পরামর্শ অনুযায়ী বড় বড় কামান সংযুক্ত অসংখ্য ছোট ছোট গানবোট নির্মাণ করা স্থির করলেন। এমনি একশতটি গানবোট নির্মাণের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হল মারিকে। কিন্তু দক্ষিণীদের পক্ষে তখন গানবোট নির্মাণের লৌহ ও বাষ্পীয় এঞ্জিন সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। গানবোট নির্মাণের পরিকল্পনা বেশী দূর অগ্রসর হবার আগেই তাদের মারিমাক নামে যুদ্ধ জাহাজটি ইউনিয়নের মনিটর জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। এই জাহাজটিকে মারি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের বহু বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়েছিলেন। কৃষক ও কারিগরদের মাঝে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগবৃদ্ধি ও প্রসার কল্পে, কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ) ১৮৬২ সালে মরিল ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট অ্যাক্ট পাস করেন। এই আইন অনুসারে ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাজ্যে স্বতন্ত্র ভাবে বা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্তভাবে কৃষি ও শিল্প কলেজ স্থাপনের জন্য, ৩০০০০ একর সরকারী জমি পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা হল। এই বছরের গোড়ার দিকে লিঙ্কন আর একটি আইন পাস করেন। তাতে একটি নতুন সরকারী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমানে এই বিভাগটি ফেডারেল ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার (কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ) নামে পরিচিত। কৃষিশিল্প কলেজ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জমি দান করাতে এমনি যে সব কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিখ্যাত মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট্স অব টেকনলজি একটি। গৃহযুদ্ধের দরুন ১৮৬৫ সালের আগে অবশ্য এই কলেজটি চালু করা সম্ভব হয়নি।

এই সংকট কালেই অবশ্য, ফেডারেল সরকারের (যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার) উদ্যোগে আরও একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সময় কংগ্রেস একটি আইন পাস করে ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স (জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করেন। আইনে লিখিত নির্দেশ অনুসারে এই পরিষদকে "সরকার অনুরোধ জানালেই, শিল্প বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে, গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা কার্য চালাতে হবে।" তাছাড়া বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করার জন্য এই পরিষদ মৌলিক গবেষণাকারীদের বৈশিষ্ট্যসূচক

উপাধিও প্রদান করবেন। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনও বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরীর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী ও সুপরামর্শের উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। যুদ্ধজয়ে সাহায্য করবে এমনি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও কল-কৌশলের পরিকল্পনা এসেছিল প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের কাছে। তিনি এগুলির মধ্য থেকে সম্ভবপর ও কার্যকরী পরিকল্পনাগুলি বাছাই করার ভার দিয়েছিলেন জোসেফ হেনরির উপর। প্রেসিডেন্টকে প্রায়ই দেখা যেত স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউসনে এসে হেনরির সিগনালিং সম্পর্কিত পরীক্ষা ও গবেষণার কাজ পর্যবেক্ষণ করতে।

নতুন দেশ আমেরিকা, কিভাবে গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে, কৌতূহলী হয়ে তা দেখতে এসেছিলেন ইউরোপের সামরিক পর্যবেক্ষকগণ। এদের মধ্যে ছিলেন জেপলিনও। এরা আমেরিকার সেনাবাহিনীতে বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্মিত যুদ্ধ পরিচালনায় নানা ধরনের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। এরা এই যুদ্ধে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম, বৈদ্যুতিক মাইন, শত্রুর এলেকা পর্যবেক্ষণকারী বেলুন, স্বয়ংক্রিয় ক্ষুদ্র যুদ্ধাস্ত্র, ব্রাডির আদি ফীল্ডফটোগ্রাফী, বায়ুশূন্য টিনে পোরা এবং ঘনীকৃত খাদ্য এবং অবেদনিক ব্যবহৃত হতে দেখেছিলেন। এই সব যন্ত্রপাতি ও কলকৌশল ব্যবহৃত হওয়ায়, উত্তরীদের সেনাবাহিনী আমেরিকার বিজ্ঞানের কাছ থেকে পৃথিবীর তৎকালীন যে কোনও দেশের বিজ্ঞানের অনুরূপ সাহায্য লাভ করেছিলেন।

যারা দক্ষিণের কনফেডারেসী পরিচালনা করছিলেন তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন মারি। তাই এখানকার কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। রিচমণ্ডের এনকোয়ারার নামে একখানি সাময়িক পত্রিকায় তিনি কনফেডারেসী সরকারের বিরুদ্ধে অপচয়, অক্ষমতা ও আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির অভিযোগ এনে ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন। এতে তাঁর উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁকে দূরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর উপর আদেশ হল, উত্তরীদের নৌ অবরোধ ব্যূহ ভেদ করে তার নিজ রণতরী নিয়ে ইংলণ্ডে যাবার। এখানে তিনি দক্ষিণী নৌবহরের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম কিনবেন, এবং জেফারসন ডেভিসের সভাপতিত্বে পরিচালিত দক্ষিণী কনফেডারেসীর সপক্ষে ইংলণ্ডে জনসমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। মারি দু বছর ইংলণ্ডে ছিলেন। আমেরিকায় ফেরবার জন্য যখন তৈরি হলেন,

তখন গৃহযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। এর কিছুকাল পরই আততায়ীর গুলিতে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন নিহত হলেন।

মারির বন্ধুগণ তাঁকে এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে নিষেধ করেন। ইউনিয়ন সরকার যুদ্ধ জয়ের পর সাধারণভাবে ঘোষণা করে দক্ষিণী সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনেতাদের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। মারির এই বন্ধুগণ কিন্তু তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে জানালেন যে, কনফেডারেসনপন্থী যে সব ব্যক্তি, কনফেডারেশনের পক্ষে বিদেশে সহায়তামূলক কাজ করেছেন, তারা ইউনিয়ন সরকারের ঘোষিত এই রাজক্ষমার সুবিধা পাবেন না। তিনি তাই হাভানা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং অনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন সরকারের নিকট আত্মসমর্পণের লিপি প্রেরণ করে মেকসিকো সিটিতে চলে এলেন। পরাজিত দক্ষিণী কনফেডাবেসীর বহু অফিসার ও সৈনিক যে ইউনিয়ন সরকারের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন সেই সরকারের অধীনে আর ফিরে যেতে চাইলেন না। মারি এই সব লোকেদের জন্য একটি নতুন উপানবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ভেবে দেখলেন, মেকসিকোই এমন একটি উপনিবেশের পক্ষে আদর্শ স্থান হবে। কারণ এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। এখানকার বহু অঞ্চলের আবহাওয়াই দক্ষিণীদের মনোমত হবে।

মারি পরিকল্পনাটি অষ্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানের নিকট আলোচনার জন্য উত্থাপন করলেন। এই ম্যাক্সিমিলিয়ানকে, ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপলিয়ন ১৮৬৪ সালে অধিকৃত মেক্সিকোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ফরাসী সম্রাটের ক্রীড়নক এই ব্যক্তি মারির পরিকল্পনায় মুগ্ধ হলেন। ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ঘোষণার দ্বারা তিনি জানালেন যে, মেক্সিকোর দ্বার সকল দেশের অধিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত। মারি বার্ষিক ৫০০০ ডলার বেতনে অভিবাসন মহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। এই অভিবাসন প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য তাঁকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হল। অর্থাভাবে যে সব অভিবাসক এই নতুন উপনিবেশে আসতে পারছিলেন না, মারি অবিলম্বে তাদের জাহাজ ভাড়া দিয়ে মেক্সিকোতে আনবার ব্যবস্থা করলেন। প্রতি অবিবাহিত ব্যক্তি এখানে ১৬০ একর সরকারী জমি পাবেন। বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সপরিবারে আসবেন তাদের দেওয়া হবে এর দ্বিগুণ পরিমাণ জমি। অভিবাসীদের যাদের হাতে পয়সা ছিল, তাদের একর

প্রতি এক ডলার মূল্যে চাষের জমি কেনার সুযোগ দেওয়া হল ও বিরাট চাষ আবাদের জমির মালিকদের বসবাসের উপযোগী খামারবাড়ী (হাসিয়েণ্ডে)-ও দেওয়ার ব্যবস্থা হল।

মারি প্রভাবশালী দক্ষিণীদের তাঁর এই প্রকল্পে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। সম্ভাব্য অভিবাসীদের আশ্বাস দিলেন 'যখন অভিবাসীরা এই জমির দাম দেবেন, ততদিনে এই জমির দাম একর প্রতি ২০, ৩০, এমন কি ১০০ ডলার হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এই সব জমিতে পৃথিবীর যাবতীয় শস্য উৎপন্ন হয়, এবং প্রায় সারাবৎসরই ফসল পাওয়া যায়।' বিলুপ্ত দক্ষিণাঞ্চলের সেনাবাহিনীর শত শত সৈনিক ইউনিয়ন সরকারের শাসন মুক্ত দেশে ছুটে এল নতুন বসতি স্থাপনের আশায়। দক্ষিণীদের অধিকাংশই এই নতুন উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে লাগলেন। এ দেশপ্রেমীর কাজ নয়, বললেন তাঁরা। দক্ষিণী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ কালে সেনাদলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল লী। তাঁকে যখন এই প্রকল্পে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়, তিনি সরোষে এতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হবার পর মারি ইংল্যাণ্ডে গেলেন। ইচ্ছা ছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই মেক্সিকো ফিরে যাবেন। মারি মেক্সিকো মান মন্দিরের ডাইরেকটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে এই মান মন্দিরের জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনবার দরকার ছিল। আরও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল দেশের আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার যে সংকল্প তিনি করেছিলেন সেই কাজের জন্য। মারি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তার পরিবারস্থ লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার অল্প কিছুকাল পরেই সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান ও সম্রাজ্ঞী কারলোটার বিরুদ্ধে অস্ট্রীয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা সম্রাটকে সিংহাসন চ্যুত করল। সম্রাট রাজ্য হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মারির উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পাও বানচাল হয়ে গেল। নিজের স্বদেশ বলতে মারির আর কোন কিছুই রইল না। পরিবার প্রতিপালনের জন্য বক্তৃতা দিতে লাগলেন, ফ্রান্স, সুইডেন, হল্যাণ্ডের নৌবাহিনীর প্রতিনিধিদের বৈদ্যুতিক টর্পেডোর ব্যবহার শিক্ষা দিলেন এবং নিউইয়র্কের একটি পুস্তক প্রকাশনালয়ের জন্য প্রাথমিক ভূগোলের কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেন।

১৮৬৬ সালের প্রথম দিকে লণ্ডনে তাঁর সম্মানার্থে একটি বৈকালিক ভোজ সভার আয়োজন করা হয়। এই ভোজ সভায় জন টিণ্ডাল ও অন্যান্য বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত ও নৌবল সম্পন্ন দেশগুলির মঙ্গলার্থে নিঃস্বার্থ বিজ্ঞান সেবার জন্য তাঁকে ১৫০০০ ডলার উপহার দেওয়া হল। এর কিছুকাল পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধের তিক্ততা মিলিয়ে আসতে শুরু করলে, ইউনিয়ন রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রাক্তন বিদ্রোহীদের সকলকেই ক্ষমা করবার প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে লেকসিংটনে ভার্জিনিয়া মিলিটারী ইনসটিটিউটে আবহবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য মারিকে আমন্ত্রণ জানান হল। মারি তৎক্ষণাৎ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং ১৮৬৪ সালের গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন।

আবহবিজ্ঞান, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টির প্রতি কিছুকাল ধরে মারির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। আবহবিজ্ঞানে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। আবহবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে এবং আবহবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর এই মতবাদ প্রচার করে তাঁর জীবনের শেষ চার বছর কাটে। তিনি কৃষক ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণার কাজে আবহতথ্য সরবরাহ করে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আবহ অফিস স্থাপনের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট অর্থ মঞ্জুরীর আবেদনও জানিয়েছিলেন।

আবহ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের জন্য আন্দোলনও করেছিলেন তিনি। এমনি একটি সম্মেলন শেষ পর্যন্ত ১৮৭৩ সালে ভিয়েনাতে আহূত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল।

১৮৭২ সালের ২৩শে অক্টোবর সেণ্ট লুই থেকে পূর্ব ব্যবস্থা মত একটি বক্তৃতা দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে বললেন, "মরবার জন্য আমি বাড়ী এসেছি"। ১৮৭৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান। ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড শহরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ভার্জিনিয়ার গোসেন গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী মারিনদী, ভার্জিনিয়ার লিকসিংটন থেকে গোসেন পর্যন্ত বিস্তৃত মারি হাইওয়ে, (মারি রাজপথ) ব্রাজিলের নিকটবর্তী মারি আগ্নেয়-গিরি, এবং তাঁর সম্মানার্থে ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড শহরে নির্মিত বিশাল স্মৃতিসৌধ মারির নামের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে।

ইউরোপও বিজ্ঞানে মারির বিরাট অবদানের কথা জানত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানমূলক 'ডকটর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করে বিজ্ঞানে তাঁর মহান অবদানের স্বীকৃতি দেন। এই উপাধি পত্রে বলা হয়েছিল, 'মারি বায়ু-প্রবাহ, আবহাওয়া, সাগর মহাসাগর স্রোতের গতি প্রকৃতি সযত্ন পর্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞান রাজ্যের নতুন সম্পদ আহরণ করেছিলেন। এই জ্ঞান তিনি মানচিত্রে ও একটি পুস্তকে সুসম্বদ্ধ করেছিলেন—মানচিত্রগুলি আজ পৃথিবীর সব সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকরাই ব্যবহার করে থাকে—পুস্তকখানি লেখকের সুযশ পৃথিবীর সর্বত্র বহন করে নিয়ে গেছে।'

এই ভাবে, এক কথায়, সমগ্র বিজ্ঞান জগতে একজন আমেরিকাবাসীর বিপুল অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক ভিসেন্টি ব্লাসকো ইবানেজ তার 'মেয়ার নোসট্রাম' নামে পুস্তকে, মারির উল্লিখিত পুস্তক-খানিকে, নাবিকদের বাইবেল আখ্যা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের হাইড্রোগ্রাফিক অফিস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "পাইলট চার্টের" শীর্ষে একটি বাক্যে তাঁর কীর্তি অমর হয়ে রয়েছে। এই চার্টের উপরে এই বাক্যটি এখনও লিখিত রয়েছে: 'যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে লেফটেনান্ট রূপে কর্মরত থাকা কালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ম্যাথ্যু ফনটেন মারির গবেষণার ভিত্তিতে প্রচারিত।'

॥ ৯ ॥

লুই জে আর আগাসিজ

(১৮০৭-১৮৭৩)

যুক্তরাষ্ট্রে ডারউইনবাদের প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন ভাবে বিজ্ঞানের খবর সাধারণ মানুষ জানতে পারত। ক্রমবর্ধমান সংবাদপত্রগুলি ও নতুন স্থাপিত প্রদর্শশালাগুলি জনসাধারণের মাঝে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারে সাহায্য করছিল। বিজ্ঞানের সত্যিকারের প্রদর্শশালা ১৭৮৫ সালে চার্লস ডব্লিউ, পিল ফিলাডেলফিয়াতে স্থাপন করেন। এতে ছিল মাত্র গুটিকয়েক শামুক, পাথর, খড়কুটোয় ঠাসা পাখী ও জন্তু, নিউইয়র্কের অরেঞ্জু কাউন্টির একটি কৃষি ক্ষেতে ১৭৯৯ সালে প্রাপ্ত অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ও অন্যান্য কতকগুলি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক বস্তু। এর পর আরও বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রদর্শশালা নির্মিত হতে লাগল। ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞানের খেলাওয়ালারা এবং বিখ্যাত অধ্যাপকগণ দেশের সর্বত্র ব্যাপক ভাবে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের সাধারণ পরীক্ষা দেখাতেন। কৃষিক্ষেত্র, কারখানা ও খনি শ্রমিক, কৃষিকর্মী, দোকান কর্মচারী—এরা বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা কেন্দ্রে, রবিবারের স্কুলে, গবাদি পশু প্রদর্শনী ও গ্রাম্যমেলায় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা থেকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতেন। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার দাবী ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। এই দাবী মেটাতে ইউরোপ থেকে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত বক্তৃতা দেবার জন্য আমদানী করা হত। এমনি বক্তৃতা কেন্দ্রগুলির একটিতে, বস্টনের লোয়েল ইনসটিটিউটে, (স্থাপিত ১৮৩৯ সাল) চুক্তি অনুযায়ী বক্তৃতা দিতে আসার ফলেই আমেরিকা সুইজারল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে নিজ দেশের নাগরিক রূপে লাভ করে ধন্য হল। এক-

পুরুষ ধরে তিনি আমেরিকায় বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্ররূপে কাজ করেন। এই বিজ্ঞানী প্রবরের নাম লুই আগাসিজ।

১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে এদেশে আসার অল্পকাল পরই লুই আগাসিজ দেশে লিখে পাঠালেন, 'আমেরিকাবাসীদের জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এখানকার প্রায়শঃ অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাগুলিতে। এখানে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। আমি বস্টন শহরে উপস্থিত হবার অল্পকাল পরই আমাকে নিয়ে আসা হয় একটি বক্তৃতা সভায়। এই সভায় তিন হাজার সাধারণ শ্রমিক, ফোরম্যান্, কেরানী ও এই ধরনের লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সুবেশী। অতি সাধারণ শ্রমিকটির পরনেও পরিচ্ছন্ন শার্ট। একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে এদের এখানে ডেকে আনা হয়েছিল।' তিনি আরও লিখেছিলেন, 'পুরানো ইউরোপের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আছে। কিন্তু আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগের অভাব রয়েছে। অন্য দিকে আবার দেশের সমস্ত মানুষই সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। যে জিনিসটার এদের মধ্যে অভাব রয়েছে তা এদের জ্ঞানলাভের আগ্রহ বা জ্ঞান নয়। এদের প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের উপযোগী অবসর।'

উনত্রিশ বছর বয়সেই ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে গণ্য হয়েও আগাসিজকে তখনও তাঁর নিজের শক্তিমত্তা সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পাবার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝতে হচ্ছিল। তাই তিনি আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি প্রচুর দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকগণ মাঝে মাঝে তাঁকে অর্থ সাহায্য করতেন। তা হলেও বেশ অর্থ কষ্টে তাঁর দিন কাটত।

আগাসিজ ভাবলেন, আমেরিকার প্রতিটি নাগরিকের দৃষ্টি অতীত নয়, ভবিষ্যত্যের দিকে ফেরান। এখানেই হয়ত বিজ্ঞান সাধনা করা হবে শ্রেয়।

আগাসিজ যখন বস্টন শহরে এসে পৌছলেন, তখন তিনি আমেরিকার বিজ্ঞানীদের নিকট মোটেই অপরিচিত নন। বিজ্ঞানী মহলে বিজ্ঞানে বিবিধ বিষয়ে তার গৌরবজনক অবদানের কাহিনী এখানে যেন সুবিদিত। খুব অল্প লোকই অবশ্য তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের প্রতিষ্ঠালাভের সমগ্র কাহিনী জানতেন। সুইজারল্যাণ্ডের মটিয়ার্স গ্রামে তাঁর জন্ম। খুব ছেলেবেলাতেই গাছপালা ও

পশুপাখী সম্বন্ধে আগাসিজের অসাধারণ কৌতূহল দেখা যেত। এ থেকেই তাঁর মনে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হবার বাসনা জন্মায়। তাঁর পিতা অবশ্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর পেশায় কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন না। তিনি ছেলেকে পরামর্শ দিলেন, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার এই কৌতূহল, ডাক্তারীর মত কোনও সম্মানজনক পেশা শিক্ষার কাজে লাগাতে।

আগাসিজ তখন উজ্জ্বল প্রাণবন্ত তরুণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর অসীম উৎসাহ, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু মন। এই সব গুণাবলী মিউনিক কলেজে তাঁকে টেনে নিয়ে এল বিজ্ঞানসেবী একদল তরুণের সংস্পর্শে। এদের মধ্যে ছিলেন কার্ল এফ ভন মার্টিয়াস। একে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের অভিযানে ব্রাজিলে পাঠান হয়েছিল। এই অভিযান থেকে যে সব জীবজন্তু তরুলতার নমুনা তিনি সংগ্রহ করে আনেন তার মধ্যে ছিল আমাজন নদী থেকে সংগৃহীত প্রচুর মাছের নমুনা। এই নমুনাগুলি প্রণালীবদ্ধ করার সময় মার্টিয়াসের সহযোগী মারা যান। মার্টিয়াস তাঁর স্থলে আগাসিজকে তাঁর সহকারী রূপে গ্রহণ করেন। আগাসিজের জীবনে দেখা দিল এক পরম সন্ধিক্ষণ। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর।

পিতার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন আগাসিজ। তাঁকে জানিয়েছিলেন ডাক্তারীই পড়বেন। তবু তিনি কিন্তু গবেষণার এই অপূর্ব সুযোগ ছাড়লেন না। গোপনে স্থির করলেন দুই কাজ এক সঙ্গে চালাবেন। দিনে পড়বেন ডাক্তারী, রাতে মনোযোগ দেবেন মৎস্য গবেষণায়। মৎস্য পরীক্ষা ও গবেষণার কাজে গভীরভাবে আত্মনিবেশ করে তিনি অনুভব করলেন নীরস একঘেয়ে ডাক্তারের জীবনের চেয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের জীবনই তাঁর বেশী ভাল লাগবে।

১৮২৮ সালের মার্চ মাসে আগাসিজ প্রকৃতি বিজ্ঞানীর পেশা গ্রহণ সম্বন্ধে পিতার মতামত জানবার চেষ্টা করে অতি সতর্কতার সঙ্গে একখানি চিঠি লিখলেন। 'ধরুন যদি পড়াশুনা চালাতে চালাতেই আমি একটা কাজের দ্বারা খ্যাতি অর্জন করতে পারি এবং সেই সঙ্গে যদি আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া থাকে যে পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমি ডাক্তারী পাস করব; এরকম হলেও কি আপনি অন্ততঃ এক বছরের জন্যও আমাকে প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়তে এবং তারপর জীবতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে দেবেন না?' আগাসিজের বাপ জানতেন যে আগাসিজ মার্টিয়াসের মৎস্য

গবেষণায় সাহায্য করছে। তিনি ভাবলেন আগাসিজ হয়ত সাময়িক কোনও গবেষণা নিয়ে মেতেছে। দুদিন বাদে এ পাগলামি ছুটে যাবে। কাজেই কেন এ নিয়ে রাগ করা? লিখে পাঠালেন, "বিজ্ঞান সেবা হোক তোমার বেলুন। এই বেলুনে চড়ে স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু ডাক্তারী ও সার্জারী যেন থাকে তোমার প্যারাসুট যার সাহায্যে স্বপ্ন রাজ্য থেকে বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসতে হবে।"

সেই বছরই, আগাসিজ, তাঁর মৎস্য সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থের (ল্যাটিন ভাষায় লেখা) প্রথম খণ্ড শেষ করলেন। তখন তার একুশ বছর বয়স। পরের বছর বের হল দ্বিতীয় খণ্ড। এই বছরই তিনি ব্যাভেরিয়ার এরল্যাংগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডিফিল উপাধি লাভ করলেন। এই গ্রন্থ দুখানির এক এক কপি তিনি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী কুভিয়েকে পাঠালেন। তাঁকেই এই বইগুলি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থ দুখানি প্রকাশিত হবার পর আগাসিজ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ডাক্তারী পড়া চলতে লাগল, তাঁর কারণ বাপকে কথা দিয়েছিলেন ডাক্তারী পাস করবেন। মিউনিক কলেজ থেকে ১৮৩০ সালে পেলেন ডাক্তারী ডিগ্রী। এই বছরেরই শেষের দিকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে এসে দেশে ডাক্তারী শুরু করে দিলেন।

১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিল। আগাসিজ পাততাড়ি গুটিয়ে চললেন প্যারিসে, রোগ সম্বন্ধে গবেষণা চালাতে। এখানে দেখা হল মহাবিজ্ঞানী কুভিয়ের সঙ্গে। তিনি তখন খুব বুড়ো হয়েছেন। মাছের ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লেখবার যে পরিকল্পনা ছিল তাঁর তাও তিনি প্রায় পরিত্যাগ করতে মনস্থ করে বসেছেন। কুভিয়ে তাঁর সমগ্র মাছের নমুনা আর সেই সম্পর্কিত নোট সমূহ আগাসিজের হাতে তুলে দিলেন। এই মাছের নমুনাগুলি তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রহ করেছিলেন। গবেষণা সংক্রান্ত নোটগুলিও এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। কুভিয়ে আগাসিজকে জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু টাকা দিলেন। থাকবার জন্য প্যারিসে জার্ডিন ডেস্ প্ল্যাণ্টস-এ তাঁর গবেষণাগারের এক অংশ ছেড়ে দিলেন।

কুভিয়ের মৃত্যুর পর আশঙ্কা হল বুঝি আগাসিজের গবেষণার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তাঁকে দেশে ফিরে এসে ডাক্তারী শুরু করতে হবে। সৌভাগ্য-ক্রমে ঠিক এই সময়, বিজ্ঞানী হামবোল্ড একখানা ১০০০ ফ্রাঙ্কের হুণ্ডি

পাঠালেন। তাতে তাঁর পক্ষে প্রস্তরীভূত মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। হামবোল্ড তাকে ঘড়ি নির্মাতাদের ছোট্ট গ্রাম নিউ চ্যাটেলের কলেজে একটি অধ্যাপনার কাজও সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আগাসিজ ইউরোপের আরও অনেক প্রদর্শশালার কর্তৃপক্ষকে লিখলেন প্রস্তরীভূত মৎস্য সম্বন্ধে আরও তথ্য পাঠাতে। নিউ চ্যাটেলে তাঁর গবেষণাগারে নতুন নতুন সব তথ্য আসতে লাগল। তাঁর এই গবেষণার ফলাফল Recherches sur les poissons fossiles নামে ১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। সর্ব সমেত তিনি এক হাজারেরও অধিক মৎস্য পরীক্ষা করেন। এই সুবিখ্যাত গবেষণার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং পরে 'কুভিয়ে পুরস্কার' লাভ করেন।

আমেরিকায় আসবার পূর্বে আরও একটি বিশিষ্ট অবদানের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রকৃতি বিজ্ঞানীরূপে আগাসিজ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বন্ধু জা দ্য কার্পেন্টিয়ার সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য উপত্যকা ও সমতল ভূমিতে মাঝে মাঝে মসৃণ উপলখণ্ড সমূহ ছড়ান দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। এই সুবৃহৎ উপলখণ্ডগুলি জলস্রোত ঘর্ষণে মসৃণ ও গোলাকৃতি—এই উপত্যকা ও সমতলভূমি অঞ্চলে এগুলির অবস্থিতি ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এগুলি আশেপাশে ছড়ানো পাথরগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর অনেকগুলির আকৃতি এমনি বৃহৎ যে নদীস্রোতের পক্ষে এদের এইসব অঞ্চলে বয়ে আনা সম্ভব নয়। এসব স্থানে এইগুলি কিভাবে আনা হল তা সত্যিই রহস্যময়। কার্পেন্টিয়ার এর এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, হিমবাহ বা চলমান বিপুলকায় তুষার স্রোত এই সব সুবৃহৎ উপলখণ্ড বহু দূরবর্তী স্থান হতে এসব অঞ্চলে বয়ে এনেছে।

এই মতবাদের অতি তীব্র বিরোধিতা দেখা দিল। এ নিয়ে যে পরস্পর-বিরোধী মতবাদের ঝড় উঠল সেই ঘূর্ণাবর্তে আগাসিজ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিমবাহবাদ সত্য কিনা এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান স্থির করলেন। ১৮৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে পর পর আটটি গ্রীষ্মকাল তিনি সুইজারল্যাণ্ডের আলপস্ পর্বত, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের পর্বত ও উপত্যকায় অনুসন্ধান চালালেন। চলন্ত হিমবাহের বড় বড় ফাটলের মাঝে পড়ে নিহত হবার ভয় উপেক্ষা করে তিনি এগুলি পরীক্ষা করলেন। এজন্য তিনি

সুইজারল্যাণ্ডের 'নিম্ন আর' নামে এমনি একটি চলমান হিমবাহের তুষার স্তূপের উপর কুঠির নির্মাণ করে কয়েক সপ্তাহ বাস করলেন। তুষার স্রোত বাহিত উপলখণ্ডের দাগ পরীক্ষা করলেন, তুষার স্রোতবাহী কয়েক ডজন বিচিত্র ধরনের পাথর পরীক্ষা করলেন। হিমবাহের তাপমাত্রা ও চাপ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করলেন, নিজের সহকারীদের দিয়ে হিমক্ষেত্রের তরুলতা ও পশুপক্ষীর বিবরণী সংগ্রহ ও পরীক্ষা করালেন।

উপযুক্ত পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হলে আগাসিজ ঘোষণা করলেন, কার্পেন্টিয়ারের মতবাদ শুধু সত্য নয়, হিমবাহের চলাচল আরও বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক। কার্পেন্টিয়ারের মতবাদ এদিক দিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। আগাসিজ বললেন, বস্তুত হিমবাহের চলাচল ঘটেছে পৃথিবীব্যাপী। গবেষণার বলে তিনি নিঃসন্দেহ যে, তুষার স্রোত একদা উত্তর মেরু থেকে সমগ্র মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই তুষার স্রোত পরে সরে যায়, রেখে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তুষার স্রোতবাহী বিভিন্ন ধরনের বস্তু ও উপল খণ্ড। এ এক অভিনব মতবাদ। তরুণ আগাসিজের এই অদ্ভুত মতবাদ শুনে তার বন্ধু লিওপোল্ড ভনবাক হাসি-ঠাট্টা করলেন। পৃষ্টপোষক হামবোল্ড প্রস্তরীভূত মৎস্য সংক্রান্ত গবেষণার কাজ শেষ না করে আগাসিজকে এমনি সব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু আগাসিজের মতবাদ সমর্থন করার লোকেরও অভাব হল না। বাসস্থানের দুই মাইলের মধ্যে হিমবাহের পলি দ্বারা সৃষ্ট কতকগুলি অতি সুন্দর প্রান্তিক রেখা, ব্রিটেনের বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস লিয়েলকে দেখান হলে তিনি শেষ পর্যন্ত আগাসিজের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। চার্লস ডারউইন এই মতবাদ সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। প্রুশিয়ার সম্রাট আগাসিজকে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য এক হাজার ডলার পাঠিয়ে দিলেন। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হল আগাসিজের Etudes sur les glaciers নামে গ্রন্থখানি।

আগাসিজের মতবাদ যে বিপুল কৌতূহল সৃষ্টি করেছে যাঁরা বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ করে আনছিলেন তাঁরা সে কথা ভালভাবেই জানতেন। লোয়েল ইনস্টিটিউটের শ্রোতারা পৃথিবীর ও তার অতীত প্রাকৃতিক ইতিহাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় ছাড়া আর কোন্ বিষয়ের বক্তৃতা এত উপভোগ করবেন? এই শ্রোতারা ছিলেন

লোয়েলের গ্রন্থ বিজ্ঞানী মহলে প্রবল বিতর্কের সূচনা করল। তিক্ততাও কম সৃষ্টি করল না।

ভূবিদ্যায় পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যখন এমনি আলোড়ন চলছে, তখন প্রত্নজীববিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা দিল একটি অভিনব অবদান। ভূপ্রোথিত জীবাশ্ম পরীক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীজীবন সম্বন্ধে গবেষণার এই বিজ্ঞান ফ্রান্সে কুভিয়েরের নেতৃত্বে তখন সবে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ খনন করে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শিলাস্তরে পৃথিবীর অতিশয় প্রাচীন জীবজন্তু ও তরুলতার জীবাশ্ম দেখেতে পেয়েছিলেন। ততদিনে মানুষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপ্রাণী ও তরুলতা শ্রেণী-বিভক্ত করার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। ভূস্তরের গভীর তলদেশে প্রাপ্ত এমনি অসংখ্য জীবাশ্ম ও এমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত করে পরীক্ষা কবে দেখা হয়েছিল। এমনি শ্রেণীবিভাগ থেকে ধরা পড়েছিল যে সবচেয়ে আদিম ও সবচেয়ে সরল প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় পৃথিবীর সব চেয়ে আদিম শিলাস্তরগুলিতে, অপেক্ষাকৃত নবীন বা উন্নততর জীবগুলির দেহাস্থির সন্ধান পাওয়া যায় পৃথিবী পৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্তর সমূহে, বা যে সমস্ত শিলাস্তর পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সবচেয়ে শেষে দেখা দিয়েছে সেগুলিতে।

অতীত প্রাণী ও তরুলতার এই সব ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন লক্ষ্য করেই অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন। উন্নততর তরুলতা ও প্রাণীগুলির প্রজাতি কি সুদূর অতীতের প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত প্রজাতিগুলি হতে উদ্ভব হয়েছে? সৃষ্টি-কালে কি বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীগুলির প্রজাতি সংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট, তারপর পৃথিবীতে প্রাণের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কতকগুলি আদিম প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? পৃথিবীর সমুদয় প্রজাতি ঈশ্বরের অনুশাসনে যুগপৎ সৃষ্টি হয়েছে, না সরলদেহী প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে জটিলদেহী প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, এই প্রশ্নটি আর নিছক পুঁথিগত প্রশ্ন রইল না। কারণ এই প্রশ্নটি বাইবেলোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়া ধরে টান দিয়েছিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল আরও অনেক গভীর প্রশ্ন। যেমন, মানুষ কি হনুমান বা বাঁদর জাতীয় কোনও নিম্ন পর্যায়ের স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে উদ্ভব হয়েছে, না প্রথম সৃষ্টিকালে পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

কিছুকাল এইসব প্রশ্ন বিজ্ঞানী মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বভাবতই, ইউরোপ ছিল এই বিতর্কের কেন্দ্র। কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এসব

প্রশ্নের গভীর তাৎপর্যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁরাও এই ধারায় চিন্তা করছিলেন। অনেকের কাছে অভিব্যক্তিবাদের অমোঘ সত্যও ধরা পড়েছিল। অল্পকাল পরেই ডারউইনের প্রচারিত এই অভিব্যক্তিবাদেই জীব সৃষ্টির রহস্যে অভিনব আলোক সম্পাতে বিশ্ববাসী চমকিত হয়েছিল। ১৮২৬ সালেই নিউইয়র্কের 'লাইসিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির' সভাপতি ডঃ জেমস ই. ডিকে বলেছিলেন, 'স্বীকার করতেই হবে যে প্রাণীবিদগণ মানুষের প্রাণীজ ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করে গেছেন। তারা এমন ভাব দেখান যেন পৃথিবীর পরস্পর-সংযুক্ত বিরাট প্রাণ-শৃঙ্খলের সঙ্গে মানুষের কোন সংযোগ নেই। আমরা জানি, পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীই এক বিরাট প্রাণধারার অন্তর্ভুক্ত। এই মতবাদকে অনেকেই দিবাস্বপ্ন বলে উপহাস করে থাকেন। এই ভাবধারা যতই আধুনিক তথ্য প্রমাণের আলোকে বিচার করা যাবে, ততই এর যথার্থতা প্রমাণিত হবে।...... প্রতিদিনই কোন না কোনও অধুনালুপ্ত প্রাণীর সন্ধান মিলছে, যার দেহ গঠনে ইদানীন্তন প্রাণীর সঙ্গে অল্প বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কাজেই আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীই এক বিরাট প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্তর্গত, এ ধারণা অলীক বা অ-বৈজ্ঞানিক নয়।'

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রাফিনেসকের নিকট এই নতুন সত্য ধরা পড়েছিল। এ সত্য তিনি প্রকাশ করতেও ভীত হননি। ১৮৪৪ সালে সামুয়েল হালডেম্যান ঘোষণা করেছিলেন, "এই সিদ্ধান্ত করা খুবই অসঙ্গত হবে যে, প্রাণীদেহের কার্যকারক কোনও শক্তি ধীরে ধীরে বহু বর্ষ ধরে ক্রিয়াশীল হয়, প্রাণী-দেহে ধাপে ধাপে প্রকারান্তর ভেদ ঘটাতে পারে না, যাতে মূল প্রাণী থেকে ঈষৎ পৃথক, ধরা যাক, চার প্রকার প্রাণী, (বা ছয় প্রকারও) দেখা দিতে পারে না, যাতে ষষ্ঠ প্রকারের প্রাণীটিকে প্রকৃতিবিজ্ঞানী এক বিশিষ্ট শ্রেণী বলে গণ্য করতে পারেন।" ১৮৪৭ সাল নাগাদ আমেরিকার প্রত্নজীববিজ্ঞানী জোসেফ লিডি, কোনও প্রাণীর প্রজাতির জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার কারণ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। এই কারণ ব্যাখ্যা কালে প্রজাতির ধীর ও ক্রমান্বয়িক রূপান্তর সাধনে পরিবেশের গুরুত্বের উপরও জোর দিয়েছিলেন তিনি।

সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন আসা গ্রে। যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভিদবিদ্যা তখন বিভিন্ন উদ্ভিদের নামকরণ ও

শ্রেণীবিভাগকরণের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রে তরুলতার প্রকৃতি ও বিভিন্ন স্থানে তাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তরুলতার প্রজাতিতেও অভিব্যক্তি ঘটেছে, এমনি খাতে তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। যখন তাঁর মাত্র আঠাশ বছর বয়স এবং ডারউইন তাঁর চেয়ে এক বছরের বড়, সেই সময়, ১৮৩৮ সালে সর্বপ্রথম লণ্ডনে ডারউইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে গ্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নয় বছর পর আবার যখন তিনি বিদেশ যাত্রা করেন তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে ডারউইনের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ডারউইন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জোসেফ ডি. হুকারের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে গ্রে প্রজাতি সম্বন্ধে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হুকারকে লিখে জানিয়েছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোনও মূল্য আছে কি না তা জানবার জন্য হুকার চিঠিখানি ডারউইনের হাতে দেন।

বহুদিন ধরে ডারউইনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আমেরিকার বিজ্ঞানীদের উপর। তিনি আমেরিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পত্রিকা পুস্তক যত্নসহকারে পাঠ করতেন। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ডারউইনকে বহুবিধ তরুলতা ও প্রাণীর নমুনা পাঠাতেন। এইসব নমুনা হয়ত তখন সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ডারউইন। আমেরিকার এই বিজ্ঞানীদের অনেকে এমন সব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে পৌছেছিলেন, যা তিনি নিজেও তখন ঘোষণা করতে ভয় পেতেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি গ্রেকে তাঁর অভিব্যক্তিবাদের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন, 'উনিশ বছর আগে আমার মনে হয়েছিল যে, জীবতত্ত্বের চর্চায় ব্যাপৃত থাকা কালেও যদি আমি প্রজাতি-সমূহের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয় লক্ষ্য করলে তা লিখে রাখি, তা হলে হয়ত খুবই ভাল হয়। সেই থেকে আমি এই কাজই করে আসছি। প্রজাতিগুলি হয়ত স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিংবা অন্য প্রজাতি হতে তার প্রকারণরূপে দেখা দিয়েছে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে আমাকে একথা বলতেই হবে যে আমি প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট কোনও প্রজাতি বলে কিছু নেই। প্রজাতিগুলি প্রথর প্রকারণ মাত্র।'

এই সময় আসা গ্রে প্রায় নিত্যই আগাসিজের সঙ্গে দেখা করতেন। ডারউইনের এই পত্রের কথা কিন্তু তিনি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখেন।

আগাসিজের মতামতের প্রতি ডারউইনের শ্রদ্ধা ছিল। অনেক বিষয় নিয়ে তাঁর নিকট পত্র লিখতেন। তা হলেও তিনি আগাসিজের নিকট তাঁর অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত ধারণাগুলির কথা আগে কখনও প্রকাশ করেননি। কয়েক মাস পর গ্রে ডারউইনের নিকট হতে আর একখানি পত্র পান। এই পত্রে ডারউইন তাঁকে অভিব্যক্তিবাদের কথা সাবধানে গোপন রাখতে বলেন। ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আসা গ্রের নিকট লিখিত ডারউইনের এই পত্রে অভিব্যক্তিবাদের বিস্তৃত বিবরণী দেওয়া হয়েছিল। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে এমনি বিস্তৃত বিবরণী প্রথম আমেরিকায় আসে। আসা গ্রের নিকট এই পত্র এসেছিল ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিজ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার দুবছর আগে।

এই গ্রন্থখানির মত বিজ্ঞানের আর কোনও গ্রন্থই জনসাধারণ এত আগ্রহ নিয়ে পড়েনি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ডারউইন গ্রেকে লিখেছিলেন ; 'প্রকাশের প্রথম দিনেই বইখানার প্রথম সংস্করণের ১২৫০ কপি বিক্রি হয়ে যায়। এখন আমার প্রকাশক মশাই যথাসম্ভব দ্রুত আরও ৩০০০ কপি ছাপাতে ব্যস্ত। এ কথা আমি উল্লেখ করছি এই জন্য যে বইখানি এখানে এমনি দ্রুত বিক্রি হওয়ায়, আমেরিকায়ও এখানার এমনি দ্রুত কাটতি হওয়া সম্ভব মনে হয়। খুবই সুখী হব যদি আপনি বইখানার আমেরিকার সংস্করণ প্রকাশনে সাহায্য করেন এবং মুনাফার বিনিময়ে এ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।' গ্রে অবিলম্বে বিখ্যাত প্রকাশনালয় অ্যাপ্‌লটনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে 'অরিজিন অব স্পিসিজের' প্রথম আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের মত যুক্তরাষ্ট্রেও বইখানির অভূতপূর্ব সমাদর হয়। জানুয়ারী মাস শেষ হবার আগেই বইখানির ৫০০০ কপি বিক্রি হয়ে গেল।

দাস প্রথা রহিতের প্রশ্ন নিয়ে দেশের রাজনৈতিক গগনে দুর্যোগের ঘনকৃষ্ণ মেঘ জমে উঠছিল। তা সত্ত্বেও ডারউইনের এই যুগান্তকারী পুস্তকখানি আমেরিকাবাসীদের ব্যাপক ও গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাসের জন্যই এই গ্রন্থে প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ডারউইনের এই গ্রন্থ প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের স্থান সম্বন্ধে সাধারণের বহুদিনের বিশ্বাসের ভিত যেন টলিয়ে দিল। অধিকাংশ যাজক ও ধর্মনেতারা বাইবেলোক্ত সৃষ্টি কাহিনীর বিরোধী এই বিধর্মীসুলভ

মতবাদের প্রকাশ্যে তীব্র নিন্দা করলেন। তা হলেও কয়েকজন যাজক এতে বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের বিরোধী কিছু দেখতে পেলেন না। তাঁরা জোরের সঙ্গেই বললেন, 'ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সৃষ্টিকর্তারূপী ঈশ্বরের গৌরব হানি করেনি।'

অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলেও মতভেদ দেখা দিল। ভূবিদ ও এদেশের হিমবাহকদের আদি ছাত্রদের অন্যতম এডওয়ার্ড হিচক বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের ছিলেন নৈষ্ঠিক সমর্থক। তিনি প্রকাশ্যে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের বিরোধিতা করলেন। ম্যাথু মারিও ডারউইনের মতবাদ সমর্থন করতে পারলেন না।

আমেরিকার অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কিন্তু ডারউইনের জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যার মাঝে জীবতত্ত্বের এক বিরাট অগ্রগতি লক্ষ্য করলেন। আসা গ্রে এদের একজন। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ' সর্বাংশে গ্রহণ করতে না পারলেও কিন্তু তিনি তাঁর মতবাদের একজন সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন ডারউইনের মতবাদ নিতান্তই অস্থায়ী এবং শ্রেয়তর মতবাদের সোপান। অস্থায়ী মতবাদ হিসাবেও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। তা ছাড়া তাঁর মনে হয়েছিল ডারউইনের মতবাদের এই তীব্র বিরোধিতার ফলে বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন অধ্যাপক, জেফারিজ ওয়াইম্যান, অতীব ধর্মপ্রাণব্যক্তি হলেও কিন্তু ডারউইনের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। ক্লাসে ছাত্রদের সামনে, বা সাধারণের সামনে বক্তৃতা কালে তিনি এই মতবাদ সমর্থন করতে ভীত হতেন না। স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউসনের সম্পাদক জোসেফ হেনরিও ছিলেন ধর্মপ্রাণব্যক্তি। ১৮৬০ সালেই তিনি মনে করতেন যে, 'অভিব্যক্তিবাদই প্রথম জীবতত্ত্বকে সত্যিকারের বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।'

ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে যে সুতীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল সেই বিরোধে লুই আগাসিজ সম্পূর্ণ ভাবেই ডারউইনের বিরুদ্ধবাদী দলে যোগ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক অতি কৌতুককর ঘটনা। প্রথমে তিনি এই মতবাদকে 'ক্ষতিকর' আখ্যা দিয়েছিলেন। তারপর আরও কঠোর ভাষায় তাঁর বিরোধিতা প্রকাশ পেল। ১৮৬৭ সালে তিনি লিখেছিলেন "ইংল্যাণ্ডের যে বৈজ্ঞানিক মতবাদ এখন সোৎসাহে প্রসার

লাভ করছে, আমার সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি তার প্রতি আরও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে উঠছি। নতুন মতবাদটি সম্পর্কে মানুষের এই হুজুগ লক্ষ্য করে মনে পড়ছে যুবক বয়সে জার্মানীতে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা। এই সময় ওকেনের 'শারীর দর্শন' বিজ্ঞানের সমুদয় শাখার লোককেই পেয়ে বসেছিল। তবু আজ তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? আমিও বিশ্বাস রাখি, এই হুজুগের শেষ দেখে যেতে পারব।" বিখ্যাত আগাসিজ যিনি ধ্যানদৃষ্টি গভীরভাবে প্রসারিত করে পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট তুষারস্তূপের মন্থর গতি এবং হিমবাহ যুগের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, দুঃখের বিষয় তিনি ডারউইনের মতবাদের সাথে সত্যোপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না। অসীম প্রতিভাদীপ্ত আগাসিজ, বহুবর্ষ ধরে প্রাচীন সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য জীবাশ্ম পরীক্ষা করে লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, জীবরাজ্যে প্রকৃতির অদ্ভুত পরিবর্তনের লীলা। তবু আশ্চর্য, প্রাচীন লুপ্ত সমুদ্র গর্ভ থেকে প্রাপ্ত এই বিলুপ্ত ১৫০০ মৎস্যজীবাশ্ম পরীক্ষা করেও তিনি এক প্রজাতির মৎস্যের অন্য প্রকারণে পরিবর্তিত হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত দেখতে পাননি। তিনি নিজেও স্বীকার করতেন না যে, তার জীবাশ্ম মৎস্য গবেষণা, মৎস্যকুলের বিবর্তন ধারায় কোন প্রকার আলোকপাত করেছে, কিংবা ডারউইনের নব-প্রচারিত বিবর্তনবাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে।

বস্তুত আগাসিজ মৎস্যভ্রূণ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে পর পর বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রাপ্ত মৎস্য শ্রেণীর লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। এ থেকে এই সূত্রের ভিত্তি রচিত হয় যে কোনও প্রাণীর ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে সেই প্রজাতির ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। একথা আগাসিজকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি শুধু বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের মৎস্যকুলের সঙ্গে, ভ্রূণে তাদের বিভিন্ন স্তরের বিকাশের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছি, এই মাত্র বিবর্তনমূলক বিকাশের পরিণতি মানতে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত জীবিত প্রাণীই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। একটি থেকে আর একটি বিবর্তিত হয়নি।

বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে রক্ষণশীল মনোভাবই আগাসিজের এই নতুন ভাবধারার প্রতি বিরূপতার কারণ নয়। হিমযুগের মতবাদ প্রচারকালে, ভূবিদ্যা ও প্রত্নজীববিদ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর বয়সের নতুন হিসাব নির্ধারণকালে তিনি একাধিকবার সনাতন ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন।

ছয় পুরুষ ধরে আগাসিজদের পরিবার ধর্মযাজকতার বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। এই যাজক পরিবারের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার ফলেই শৈশবে তাঁর যে মানসিক বৃত্তি গড়ে উঠেছিল, তাই হয়ত পরবর্তীকালে তাঁর এমনি আপাতঃ অসঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দায়ী। নির্যাতনের হাত এড়াতে ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যাওয়া এক হিউজেনট যাজকের ষষ্ঠ পুরুষ আগাসিজের পিতা। এই হিউজেনট সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিটি তরুলতা, ফলমূল, পশুপাখী ও শিলাখণ্ডে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ দেখতে পেত। এই সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বের সব কিছুই বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিলীলা সম্বন্ধে এই ছিল তাদের ধারণা। প্রতিটি প্রজাতিই যে স্থির ও অপরিবর্তনশীল এই ধারণার সঙ্গে তা চমৎকার খাপ খেত। ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির নক্সার বিরোধিতাকামী এবং তৎস্থলে আকস্মিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত অভিব্যক্তিবাদকে অভিষিক্তকারী কোনও মতবাদ তাই তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

আগাসিজ ধর্মান্ধ নন। বর্তমান পৃথিবীপৃষ্ঠ কি ভাবে গঠিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ জেমস্ ডুইট ডানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে যে চিত্র অঙ্কিত করেন, আগাসিজ তা সমর্থন করেছিলেন। ধর্মতত্ত্ববিদদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পঙ্গু করবার যে কোনও প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতা সক্রিয় ভাবে সমর্থন করে গেছেন। ডারউইনবাদের বিরোধিতা করবার জন্য তাঁর প্রতি পিঠ চাপড়ানোর মনোভাব দেখানোর এবং অভিব্যক্তিবাদীরা ডারউইনের মতবাদের সমর্থনে প্রবল আন্দোলন চালানোয় তিনি বিরক্ত হতেন। অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে বিরাট বিতর্কের সেই প্রথম যুগে অভিব্যক্তিবাদের অতি উৎসাহী সমর্থকদের অনেকে এই মতবাদ সমর্থনে ডারউইনকেও ছাড়িয়ে যেতেন। এর পরবর্তী যুগের অধিকাংশ প্রাণীবিদই আগাসিজের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তবুও এই সময়ে কার্যতঃ প্রতিটি বিশিষ্ট প্রাণীবিদই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চার্লস ডারউইনের প্রগতিশীল মতবাদ মেনে নিয়েছিলেন এবং জীববিজ্ঞানে তাঁর অবিসংবাদী নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আগাসিজের মধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রাণবন্ত আমেরিকার বিজ্ঞান সাধনার এ এক গৌরবময় কৃতিত্ব।

নিগ্রো সমস্যায় ডারউইনের এই যুগান্তকারী মতবাদ এক কৌতুহলোদ্দীপক

অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পরস্পর-বিরোধী মতামত প্রকাশ করলেন। জন বাচম্যান ছিলেন খ্রীষ্টধর্ম সংস্কারক লুথার-পন্থী যাজক। ১৮১৫ সালে তিনি দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লসটনের একটি গির্জার প্যাস্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানচর্চার শখ ছিল তাঁর। বহু বছর ধরে তিনি তরুলতা ও পশু-প্রাণী পরীক্ষা করেছিলেন। অডুবনকে তিনি 'অরনিথোলজিক্যাল বায়োগ্রাফি' রচনায় সাহায্য করে ছিলেন। তাঁর মতে সাদা এবং কালো সব মানুষই একই সাধারণ মানব পরিবার-ভুক্ত। এই মতের সমর্থনে তিনি তিনখানি বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি দেখান যে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বন্ধ্যা হয় না। এদেরও সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় শ্রেণীর মানুষই একই প্রজাতিভুক্ত। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের গাত্রবর্ণে এবং চুলের প্রকৃতিতে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, তার জন্য দায়ী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ।

আগাসিজ বিশ্বাস করতেন, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গরা হীনতর স্তরের মানুষ। ভিন্ন গোষ্ঠী (স্টক) থেকে এদের উৎপত্তি। দাস-প্রথার সমর্থকগণ মহানন্দে আগাসিজের এই অভিমত উদ্ধৃত করে আনন্দ পেতেন : 'শ্রমবিমুখ, আমোদপ্রিয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অনুকরণপ্রিয়, দাস মনোভাবাপন্ন, সরল, সাদাসিধা, সর্বদক্ষ, সঙ্কল্প সাধনে দুর্বল, প্রভুভক্ত ও স্নেহশীল,—বর্তমান কালে আমরা নিগ্রোদের এই যে সব বৈশিষ্ট্য দেখি, যুগযুগান্ত ধরে স্বাভাবিক প্রবণতা ও মানসিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে নিগ্রোদের মাঝে কেবলমাত্র এইসব গুণাগুণই লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য জাতিগুলি অতি পুরাকালেই যখন উন্নততর সংস্কৃতি সৃষ্টি করে চলেছে, সেই সময়ও নিগ্রো জাতি বর্বরতার মাঝে নিমগ্ন, সভ্যজাতিসুলভ কোনও স্থায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করেনি।' আগাসিজ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আর আজকের এই অধিকতর মুক্ত নিগ্রো জাতির সংগীত, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মূল্যবান অবদান দেখবার সুযোগ পেতেন তা হলে হয়ত তাঁকে তাঁর মত বদলাতে হত। এখন আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ নিগ্রো প্রতি বছর আমেরিকার কলেজগুলিতে পড়াশুনা করে। চেমুরজিতে (শ্রমশিল্পে কৃষিপণ্য ব্যবহারে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রয়োগ) টাসকেজির জর্জ ওয়াশিংটন কারভারের, পরীক্ষামূলক জ্রূণতত্ত্বে আর্নস্ট ই. জাস্টের রক্ত সংরক্ষণে, চার্লস আর. ড্রিউ-এর এবং আমেরিকাবাসী

অন্যান্য নিগ্রোদের গৌরবময় অবদান মানুষের জীবন গঠনে পারিপার্শ্বিকের বিপুল প্রভাবের ফলাফল দেখিয়ে দিত।

নিগ্রোদের সম্পর্কে আগাসিজের কতকগুলি মন্তব্যে দাসপ্রথার সমর্থকেরা খুশী হলেও কিন্তু দাসপ্রথার বিরোধীরাও আবার দেখিয়ে দিতে পারতেন যে আগাসিজ মনেপ্রাণে ছিলেন দাস প্রথার বিরোধী। আগাসিজ বলেছিলেন, 'নিগ্রোরা স্বাধীনতা, আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ, জীবন, আয় ও পুত্রপরিবার সহ পারিবারিক জীবন উপভোগের অধিকারী। আইনের চোখে তাদের শ্বেতাঙ্গদের সমান গণ্য করা উচিত।... শ্বেতাঙ্গগণ কর্তৃক নিগ্রোদের শ্রমের সিংহভাগ কেড়ে নেওয়া বন্ধ করা যায় কি করে? নিগ্রো শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। কাজেই সন্তোষজনক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।'

'অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশিত হবার পর কয়েক দশক কেটে যাবার পরও, খৃষ্টধর্ম নেতাদের মধ্যে যারা বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন তারা পৃথিবীর সর্বত্র অভিব্যক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম চালালেন। ঈশ্বর পৃথক পৃথক ভাবে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এই মতে নৈতিক বিশ্বাসী এবং অভিব্যক্তিবাদীদের মধ্যে দীর্ঘকালীন তীব্র তিক্ত সংগ্রাম চলেছিল। সে সংগ্রাম আজও যে শেষ হয়েছে একথা বলা চলে না। পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে ধর্মান্ধের দল এখনও মাঝে মাঝে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। কি ভাবে, কোন্ প্রণালীতে বিবর্তন ঘটল সেই বিবর্তন পদ্ধতির পরিপূর্ণ প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও পৃথিবীর বিজ্ঞজন ও সংস্কারমুক্ত মানুষ অভিব্যক্তিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। তবুও কুড়ি বছর আগে একবার এ সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল তার রিপোর্টে জানা যায়, আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আধ থেকে একের তিন ভাগ শিক্ষক, ছাত্রদের অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করানোর চেষ্টা না করলেও অভিব্যক্তিবাদ মেনে নেবার কথা স্বীকার করতে ভয় পান। বিদ্যায়তনে এই মতবাদ প্রায়ই শোধিত করে পড়ান হয়।

আগাসিজ তাঁর নিজের গবেষণার কাজ ছেড়ে দেননি। গৃহযুদ্ধের শেষের দিকে হিমবাহ সম্বন্ধে গবেষণা পুনরায় শুরু করতে গেলেন মেইনে। এর কিছু কাল পর, গেলেন ব্রাজিলে। ইচ্ছা, ঐ হিমবাহ আর ও দেশের নদীনালার মাছ সম্বন্ধে গবেষণা চালান। ব্রাজিলের নদীনালায় অনুসন্ধানের কাজ

চালানর সময় ব্রাজিলের সম্রাট তার নিরাপত্তার জন্য মিলিটারী পাহারাদার দিয়েছিলেন তাঁকে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার সময় আগাসিজ সঙ্গে এনেছিলেন আমাজন ও তার উপনদীগুলি থেকে ১৮০০ নতুন মাছের নমুনা, সেই সঙ্গে একটি জাতির শুভেচ্ছা। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই শুভেচ্ছা লাভ তখন অতি প্রয়োজন।

বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা বা সাধারণ নীতি নির্ধারণকারী রূপে নয়, আমেরিকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আগাসিজের গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার জন্যই। বিজ্ঞান শিক্ষাদাতা ও প্রচারক রূপেই তিনি এদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য তাঁর খ্যাতি সেগুলি কার্যতঃ তিনি এদেশে আসবার আগেই আবিষ্কার করেন। কিন্তু আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর আবির্ভাবের ফলে আমরা পেলাম একজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষককে। শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন এবং জীববিজ্ঞান শিক্ষায় নূতন আদর্শ প্রবর্তন করেন।

আগাসিজ বলতেন, ছাতাপড়া পাঠ্য পুস্তক থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায় না। ছাত্রদের তিনি বলতেন, 'বই পড়ে যদি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে চাও, তা হলে ঘরের বাইরে গেলে প্রকৃতির দেখা পাবে না।' উদ্ভিদ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে বনে জঙ্গলে অভিযানে বের হওয়ার উপর এবং জীববিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গবেষণাগারের কাজের উপর তিনি জোর দিতেন। কতকগুলি গবেষণার কাজের জন্য তিনি জেলে ও কৃষকদের তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমেরিকার সব জায়গা থেকেই তার নিকট জীবজন্তু ও তরুলতার নমুনা আসত ও এই বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাঠান হত। এগুলি তাঁর গবেষণার কাজে বিশেষ সাহায্য করত। ভ্যান ওয়াইক ব্রুকস লিখেছিলেন, 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগাসিজ অনেকটা জনি অ্যাপেল-সীডের কাজ করে গেছেন। যেখানেই গেছেন, সেখানেই ছড়িয়েছেন শিক্ষার বীজ।'

আগাসিজ বলতেন, শিক্ষক ও গবেষকদের যদি এদেশে উচ্চতর মানের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ করতে হয় তা হলে তাদের জন্য সুপরিচালিত ও যথোচিত অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত প্রদর্শশালা স্থাপন অতি প্রয়োজন। এই জন্যই তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাণীবিদ্যার প্রদর্শশালাটি (মিউজিয়াম

অব কম্পারেটিভ জুলজি) স্থাপনের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। বহু বাধা বিঘ্নের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয় এর জন্য। ১৮৬০ সালের শেষের দিকে প্রদর্শশালাটির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। এই নির্মাণ কার্যে সরকার ১০০,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য করেন। আর এক লক্ষ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল জনসাধারণের নিকট হতে চাঁদা তুলে। তিনি মনে করতেন যে সব স্থান হতে পশুপ্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা হয় সেখানেই গবেষণাগারে সেগুলি পরীক্ষা করতে পারলে জীববিজ্ঞানের গবেষণার কাজে প্রভূত উন্নতি ঘটবে। যেমন বলা চলে, যে সমুদ্র থেকে সংগৃহীত সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ স্থানের কাছাকাছিই পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

তিনিই প্রথম সামুদ্রিক জীববিদ্যার গবেষণাগার স্থাপন করেন। এই গবেষণাগারটির অনুসরণে পরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এমনি সামুদ্রিক জীব বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল। মাসাচুসেটস্-এর নিউ বেডফোর্ডের আঠারো মাইল দূরে বুজার্ডস উপসাগরের পেনিকীজ দ্বীপে জীববিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি গ্রীষ্মাবকাশকালীন স্কুল খোলার আয়োজন করাই এই সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। এই স্কুলটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরে আমেরিকায় এমনি ধরনের বহু গ্রীষ্মাবকাশকালীন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই সব সংস্থা থেকেই পরে গড়ে ওঠে, মাসাচুসেট্স-এর উডস হোলে সুবিখ্যাত সামুদ্রিক জীববিদ্যার গবেষণাগার, ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোলার নিকট ডব্লিউ. ই. রিটার প্রতিষ্ঠিত স্ক্রীপস্ ইনসটিটিউসন অব ওসানোগ্রাফী, ক্যালিফোর্নিয়ার করোনা ডেল মারে কেরকহফ মেরিন লেবরেটরী, ফ্লোরিডার টোর্টুগাসে কার্নেগী ইনস্টিটিউসনের মেরিন লেবরেটরী।

পেনিকীজে গ্রীষ্মাবকাশকালীন গবেষণা স্কুল স্থাপনের প্রকল্পটিই আগাসিজের জীবনে শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের বড়সড় রকমের শেষ কাজ। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জীব বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রদের গ্রীষ্মাবকাশের সময় কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে এনে জড়ো করা। সেখানে তাঁরা ছুটি কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীর পরীক্ষা ও গবেষণা চালাতে পারবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি তিনি মাসাচুসেটস্-এর বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের নিকট পেশ করেছিলেন। পরিকল্পনাটি সুধী সমাজের সমর্থন লাভ করে। জন অ্যানডারসন নামে নিউ ইয়র্কের জনৈক ব্যবসায়ী এমনি এক পরিকল্পনার জন্য

পাঁচ হাজার ডলার প্রদান করেছিলেন এবং এলিজাবেথ দ্বীপপুঞ্জের পেনিকীজ দ্বীপটি দান করেছিলেন। ১৮৭৩ সালে পঞ্চাশ জন ছাত্রের একটি দল এই দ্বীপে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে এসেছিল। আগাসিজ, গুইয়ট ও অন্যান্য বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীরা এদের সামনে এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হলে আগাসিজ হার্ভার্ডে ফিরে গেলেন। শক্ত সুগঠিত, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন এই ছয় ফুট দীর্ঘ মানুষটি। এক জীবনের মাঝেই বহু শ্রমসাধ্য কাজ তিনি নিষ্পন্ন করে গিয়েছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে বার বার তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। যার জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে কাজকর্ম বন্ধ রাখতে বা সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হত। পেনিকীজে গ্রীষ্মাবকাশ-কালীন স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনাটি অতি দ্রুত কার্যকরী করতে গিয়ে তাঁকে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ধাক্কা তিনি আর সামলে উঠতে পারলেন না। ১৮৭৩ সালের ২রা ডিসেম্বর আগাসিজ ফিচবার্গে গিয়েছিলেন, চুক্তি অনুযায়ী 'দি স্ট্রাকচারাল গ্রোথ অব ডমেস্টিকেটেড এনিম্যালস' নামে একটি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এসে তিনি কেমন 'অদ্ভুত ঘুম ঘুম ভাব' অনুভব করতে লাগলেন। দশ দিন পর তাঁর মৃত্যু হল। পেনিকিজে গ্রীষ্মাবকাশকালীন গবেষণার স্কুল এর পর আর খোলেনি কখনও। পাঁচ বছর পর জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম কে. ব্রুকস চীসাপীক জুলজিক্যাল লেবরেটরী স্থাপন করে, তাঁর (আগাসিজের) এমনি এক গ্রীষ্মাবকাশকালীন গবেষণা স্কুল স্থাপনের স্বপ্ন সফল করে তুলেছিলেন। আগাসিজের যে সব মেধাবী ছাত্র পেনিকীজে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে জড়ো হয়েছিলেন, উইলিয়ম কে. ব্রুকস্ তাদের মধ্যে অন্যতম।

॥ ১০ ॥

জেমস ডুইট ডানা

(১৮১৩-১৮৯৫)

কেন্দ্র ও রাজ্যের ভু-জরীপ কার্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্য করল

লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক জীবনে এক বিষাদময় অধ্যায় শুরু হল। চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাস মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন চাষের জমি বা যন্ত্রপাতি ছিল না। জীবিকা অর্জনের উপযোগী কোনও শিক্ষা তারা পায়নি। দক্ষিণী রাজ্যগুলি যে সব কালা আইন (ব্লাক কোডস্) পাস করল তাতে নিগ্রোরা পুনরায় কার্যতঃ দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হল। দক্ষিণের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন কংগ্রেস, রিকনস্ট্রাকসন অ্যাক্ট্ (পুনর্গঠন আইন) নামে একটি আইন পাস করল। তাতে দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহী রাজ্যগুলিতে সামরিক শাসন চালু হল। দক্ষিণী কৃষককুল যাতে পুনরায় মাথা তুলে রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় উত্তরী শিল্পপতিদের প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে উত্তরের শিল্পপতিগণ নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। এবার এই সামরিক শাসনাধীনে তাঁরা দক্ষিণী অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দীদের আরও দুর্বল করার সুযোগ পেলেন। দক্ষিণের শিল্পোন্নতি অন্তত এক পুরুষের জন্য পিছিয়ে গেল।

পশ্চিমাঞ্চলের কৃষককুলের অবশ্য শক্তি বৃদ্ধি হল। ১৮৬২ সালে হোমস্টেড অ্যাক্ট পাস করার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল তারা। পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি ক্রমেই দাসপ্রথা মুক্ত হয়ে উঠছিল। এই হোমস্টেড অ্যাক্ট পাস হলে পশ্চিমের নবগঠিত রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথার বিস্তার আরও কমে আসবে, এই ভয়ে দক্ষিণী রাজ্যগুলির সংসদ সদস্যরা কংগ্রেসে এই আইনটি পাসে বহুবছর ধরে বাধা সৃষ্টি করে আসছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দলেরই সেনাবাহিনী গৃহযুদ্ধের অবসানে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। এই দুই বাহিনীর বহু প্রাক্তন

সৈনিক ও অন্যান্য অনেক হতাশ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তি, এই হোমস্টেড অ্যাক্টের বিধান অনুসারে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে মাথাপিছু ১৬০ একর জমি নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। এই আইন অনুসারে পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারীদের এই পরিমাণ জমি বিনামূল্যে দেওয়া হত। হোমস্টেড অ্যাক্ট অনুযায়ী বিনামূল্যে জমি পাবার কথা জানতে পেরে ইউরোপ থেকে বিশেষ করে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি থেকে দলে দলে লোক এসে আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল।

পশ্চিমাঞ্চলের নতুন রাজ্যগুলির অধিবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেলপথের প্রয়োজন অনুভূত হল। ১৮৪৯ সালে মিজুরির সিনেটর টমাস হার্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে মিজুরি নদী থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জন্য একটি বিল উত্থাপন করলেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণ-আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এই রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে গেল। ১৮৬২ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহী রাজ্যগুলি ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সময় কংগ্রেস ইউনিয়ন প্যাসিফিক কোম্পানী কর্তৃক ওমাহা থেকে পশ্চিমাভিমুখে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ অনুমোদন করে একটি বিল পাস করল। ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী স্যাকরেমেন্টো শহরের বণিককুল এতে নতুন রেলপথ খুলবার সুযোগ দেখতে পেলেন, এবং তারা সেণ্ট্রাল প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানি নামে একটি রেল কোম্পানি সংগঠন করলেন। এই রেলপথটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে গিয়ে মিশবে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথের সঙ্গে। ১৮৬৯ সালের ১০ই মে, প্রথম আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত দীর্ঘ রেলপথ নির্মিত হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তকে আরও নিবিড় ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে এর পর আরও রেলপথ নির্মিত হতে লাগল। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত যত মাইল রেলপথ নির্মিত হয়েছিল ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যেই তত মাইল (প্রায় ২৮০০০) রেলপথ নির্মিত হল।

দেশের সর্বত্র বহু রেলপথ নির্মিত হওয়ায় দেশের খনিজ সম্পদ ও ভূতাত্ত্বিক গঠন পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের কাজের সুবিধা হয়ে গেল। এতে প্রত্যক্ষভাবে মণিক-বিদ্যা ও ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটল। এদেশে মণিক ও ভূ-বিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল হ্যারিয়টের প্রথম আমেরিকায় আগমনের সঙ্গে।

এ সময় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য চালান, এদেশের ধাতুপিণ্ড ও পাথর সংগ্রহ ছিল তার অন্তর্গত। পরে শত শত পাথর ও ধাতুপিণ্ড সংগ্রহকারী আবির্ভূত হলেন। জমি খুড়ে, পাথর ভেঙ্গে ধাতু ও পাথরের নমুনা সংগ্রহই ছিল এদের নেশা। দেশের খনিজ-সম্পদের নমুনা সংগ্রহের এই শখের কাজই এদেশের শৌখিন বিজ্ঞানীদের প্রথম দিককার বিজ্ঞান চর্চার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফিলাডেলফিয়ার উইলিয়াম ম্যাকলিওরই প্রথম আমেরিকার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা কার্য শুরু করেন। ১৮০৯ সালে আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির মুখপত্র 'ট্রানজ্যাকসনে' তাঁর 'অবজারভেসনস্ অব দি জিওলজি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস্, একস্‌প্লানেটরী অব এ জিওলজিক্যাল ম্যাপ' (Observation of the Geology of the United States, Explanatory of a Geological Map) নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অ্যাপেলেসিয়ান পর্বতমালা ও আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত ধাতুপিণ্ডসমূহের গঠন অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করেছিলেন ম্যাকলিওর। এ কাজের জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশবার এই অ্যাপেলেসিয়ান পর্বতমালা পারাপার করেছিলেন। তারই ফলে আমেরিকার এক অংশের এই প্রথম ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিল। ১৮১৯ সালে দেশের কয়েকজন প্রধান ভূবিদ ইয়েলে মিলিত হয়ে আমেরিকান জিওলজিক্যাল সোসায়িটি গঠন করলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের বড় বড় খাল খনন ও সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ এবং পরে রেলপথ নির্মাণ সংক্রান্ত জরীপের কাজে অত্যন্ত সহায়তা করেছিল।

আমাদের সেরা ভূবিজ্ঞানীদের অনেকেই বিভিন্ন রাজ্য পরিচালিত ভূজরীপ কার্যের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সব জরীপের কাজ চলেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। লুসিয়ানা ও অরিগন ব্যতীত কার্যত প্রায় প্রতি রাজ্যেরই সরকারী ভূবিৎ ছিল। তারা রাজ্যের ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ সম্পদ পরীক্ষা করতেন। প্রথম দিনকার এই ভূবিদদের মধ্যে অনেকে ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী। দেশব্যাপী এমনি ভূ ও খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালানোর সময় রসায়ন বিজ্ঞানেরও কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছিল। নাব্য খাল খনন করতে, রেলপথ নির্মাণের সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ নির্ণয় করতে, এবং মূল্যবান খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রাপ্তিস্থান নির্ধারণ করতে কেন্দ্রীয়

সরকারও জরীপের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। এমনি ধারা জরীপের দ্বারাও আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে গিয়েছিল।

১৮৫৩ সালে কংগ্রেস পূব দিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের চারটি সম্ভাব্য পথ জরীপ করবার জন্য ১৫০০০০ ডলার মঞ্জুর করলেন। এই জরীপের কাজের জন্য যারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী ও কয়েকজন ভূবিজ্ঞানী। যে সব অঞ্চলে জরীপের কাজ চালান স্থির হয়েছিল তার অনেক স্থানই তরুলতা, পশুপ্রাণী, ও খনিজসম্পদের দিক দিয়ে বিজ্ঞানীদের নিকট ছিল সম্পূর্ণ নূতন। ইতিপূর্বে কেউ আর কখনও সেখানে অনুসন্ধান কার্য চালাননি। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সহযোগিতায় এই সব অঞ্চলের সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশদ ও বিস্তারিত নির্দেশনামা রচিত হয়েছিল।

প্রায় চার বছর ধরে এঞ্জিনীয়ার ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের এই দলটি দুর্গম ও আদিম অরণ্যানী পূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলের এই অংশ সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে সেখানকার মানচিত্র আঁকলেন, জরীপের কাজ চালালেন, তরুলতা ও পশুপাখীর নমুনা সংগ্রহ করলেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকলেন, বহুবিধ তথ্যের প্রচুর সংক্ষিপ্ত বিবরণী টুকলেন। এই অনুসন্ধান ও জরীপের বিবরণী তেরোটি সুবৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই বিরাট জরীপের কাজ সমর বিভাগের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট অব ইন্টিরিয়র) ও নতুন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের স্থান বিবরণী সংগ্রহের জন্য ওসব স্থানে অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার পাঠিয়েছিলেন। রেলপথ নির্মাণ ও খনিজ সম্পদ আহরণের কাজে নিযুক্ত ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাও জরীপের কাজ হাতে নিয়েছিল। শত শত বিজ্ঞানী এই বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হতে মূল্যবান তথ্যসম্ভার বয়ে আনতে লাগলেন। এই সুবিস্তৃত অঞ্চল এমন বিচিত্র ও বিপুল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ যে তার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

যে সব বিজ্ঞানী আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন জেমস ডুইট ডানা। এই নতুন দেশের ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া, তরুলতা, জীবজন্তু ও খনিজসম্পদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের রোমাঞ্চকর যুগ চলছিল যখন তখনই তাঁর জন্ম হয়। আশি বছরের অধিককাল তিনি বেঁচে ছিলেন।

আমেরিকার এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে যে পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বুদ্ধি ও বৈদগ্ধের জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই অনন্যসাধারণ পরিবারে জন্মেছিলেন মাসাচুসেট্‌স-এর একজন প্রধান বিচারপতি, কানেটিকাট রাজ্য থেকে নির্বাচিত একজন সিনেটর, একজন বিখ্যাত লেখক ('টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট' গ্রন্থপ্রণেতা রিচার্ড হেনরি ডানা), মেইন প্রদেশের একজন গভর্নর, ডার্ট মাউথ কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক, এবং 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউন' ও নিউইয়র্কের 'সান' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক চার্লস এ. ডানা।

জেমস্ ডুইট ডানা ১৮১৩ সালে নিউইয়র্কের উটিকাতে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরটির জনসংখ্যা তখন ১৭০০। বাল্যকালে ডানা ছিলেন সাধারণ আর দশটি বালকেরই মত। অত্যন্ত কৌতূহলী ও আমোদপ্রিয়। পড়াশুনা শুরু করেছিলেন স্থানীয় স্কুলেই। সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষক মশাই তাঁকে তরুলতা, পশুপাখী ও কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণের জন্য শহরের বাইরে বনে-জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। ডানাকে বিভিন্ন খনিজ ধাতুপিণ্ডের নমুনা সংগ্রহ করতে শিখিয়েছিলেনও ইনি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেঞ্জামিন সিলিম্যান নতুন ভূবিজ্ঞান ও তৎকালে ইউরোপে ভূবিজ্ঞান সম্পর্কে যে বিরাট বাগ্‌বিতণ্ডা চলছিল সে সম্বন্ধে ডানার কৌতূহল জাগ্রত করেন। সিলিম্যান ঠিক সেই সময় বিদেশ থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে এনেছিলেন চমৎকার সব ধাতুর নমুনা। তরুণ ডানা মুগ্ধ হলেন সেগুলি দেখে।

নিউ হ্যাভেনে তিন বছর কাটানোর পর, ১৮৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার নামে ছোট্ট একখানি জাহাজের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের (মিডশিপ-ম্যান) গণিত শিক্ষকের কাজ পেলেন। জাহাজটি তখন ভূমধ্যসাগর অভিমুখে যাত্রা করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে নৌবিদ্যা শিক্ষা দেবার কোন বিদ্যায়তন (নেভাল একাডেমী) ছিল না। মিডশিপম্যানগণ সমুদ্রগামী জাহাজে শিক্ষানবিশী করে নৌচালনা শিক্ষা করতেন। বেঞ্জামিন সিলিম্যান ক্লাসে ভূতত্ত্ব পড়ানোর সময় পৃথিবীর কতকগুলি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতেন। সমুদ্রযাত্রায় বের হলে এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে। ডানা জাহাজে শিক্ষকতার কাজ অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। জাহাজ ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। পথে থেমেছিল, জিব্রাল্টার, মিনোরকা, এথেন্স ও স্মার্নায়। ডানার কাজ খুবই

হাল্‌কা। ভূতত্ত্ব, স্ফটিকতত্ত্ব চর্চার সময় পেতেন। গীটার বাজানোরও অবকাশ মিলত। এই সমুদ্রভ্রমণ কালে তিনি অনেক পাথর ও ধাতুর নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।

১৮৩৪ সালে, আঠারো মাস পর জাহাজখানা নিউ ইয়র্কে ফিরে এল। নৌবিভাগের মাস্টারীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ডানা ভাবতে লাগলেন, এবার কি করা যায়? তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। উটিকাতে বাপের দোকানের কাজে লাগতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বাপ খুশী হতেন ছেলে ওকালতি বা ডাক্তরী পড়লে। ছেলের বিজ্ঞানীর পেশা গ্রহণ করবার ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ওকালতির প্রতি ডানার কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না।

ডানার সত্যিকারের ইচ্ছা ছিল কোনও কলেজে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পুঁথিপত্রের মাঝে ডুবে জ্ঞান সাধনা করতে। বাপকে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'যারা আমার মত একই বিষয়ের চর্চায় রত তাদের মধ্যে থাকার খুবই সুবিধা। যেন সহজেই একই প্রবাহে ভেসে চলা যায়।' তিনি যখন 'ডেলওয়ার' জাহাজের শিক্ষকরূপে ভূমধ্য সাগরে অবস্থান করেছেন, সেই সময় একদল বিজ্ঞানী 'ইয়েল ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসায়িটি' (ইয়েলের জীবতত্ত্ব সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। ডানা ভাবছিলেন এদের সমিতিতে যোগ দেবেন কিনা। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন সিলিম্যানের ডানাকে খুবই ভাল লেগেছিল। খুব মেধাবী ছাত্র বলে নয়, সুপুরুষ চেহারা ও সুন্দর স্বভাবের জন্য। সিলিম্যান যখন তাকে তাঁর সহকারীর পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন ডানা এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না সে কাজ নিতে। কাজটা ছিল ধরাবাঁধা, রুটিন মাফিক। সংগৃহীত বিভিন্ন শিলাখণ্ডের নমুনা তাঁকে সহজসাধ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করতে হত। অধ্যাপক সিলিম্যানের কাজের সুবিধার জন্য সংগৃহীত ধাতুপিণ্ডসমূহের নমুনা ও জীবাশ্মের বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস ও অর্থ নির্দেশ করতে হত। অল্প সংখ্যক ভূতাত্ত্বিক চার্ট (মানচিত্র)-ও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

এই কাজের মধ্যে ডানা স্ফটিক বিদ্যা চর্চার প্রচুর অবসর পেতেন। এই স্ফটিকবিদ্যা মণিকবিদ্যার একটি শাখা। ১৮০১ সালে, হাউই (Haüy) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ট্রেইট দ্য মিনারেলজী'র (Traite de Mineralogie) চারটি খণ্ডে এ স্ফটিক বিদ্যার মোটামুটি পরিচয় দেন। স্ফটিক বিদ্যার

চেয়ে মণিকবিদ্যার পরিধি আরও বিস্তৃততর। এই মণিকবিদ্যা বিভিন্ন ধরনের ধাতুর নানাবিধ বিশেষত্ব অনুযায়ী প্রকৃত বর্ণনা, শ্রেণীবিভাগ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে। মণিকবিদ্যার এক শাখায় বিশুদ্ধ ধাতব স্ফটিকের আকৃতি, স্ফটিকের বিভিন্ন পৃষ্ঠতল পরস্পরের সঙ্গে যে কোণ রচনা করে তার পরিমাপ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। এই শাখাকেই বলা হয় স্ফটিকবিদ্যা। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য বহু ধাতুস্ফটিক পাঠান হত। এমনি হাজার হাজার ধাতু-স্ফটিকের পৃষ্ঠতলের কোণ পরিমাপ করেন ডানা। ডানা নিজেও অনেক ধাতুস্ফটিক সংগ্রহ করেছিলেন। ওগুলিরও কোণ পরিমাপ করেন। স্ফটিকের বিভিন্ন পৃষ্ঠতলের কোণ ও অক্ষরেখার মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্কও তিনি নির্ধারণ করেছিলেন। ফাঁপা কাচের স্ফটিকের মডেলও তিনি তৈরি করেছিলেন। এগুলিই এদেশে নির্মিত আদিমতম ফাঁপা কাচ স্ফটিকের মডেলের অন্যতম নিদর্শন। ব্রেজেলিয়াসের রাসায়নিক পদার্থ নামকরণের পদ্ধতি এবং হাউয়ের ধাতু শ্রেণীবিভাগকরণের প্রাকৃতিক পদ্ধতির কথা পাঠ করে ছিলেন ডানা। হাউই পদার্থের গুণাগুণের যেমন কঠিনতা, দীপ্তি এবং আপেক্ষিক গুরুত্বের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগের এই তথাকথিত প্রাকৃতিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। ডানা ব্রেজেলিয়াস ও হাউয়ের এই নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগকরণের পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্ফটিকের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পরে অবশ্য শ্রেণীবিভাগ-করণের এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছিলেন। ১৮৫০ সালে তিনি যে নতুন শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা সম্পূর্ণভাবে ধাতুর রাসায়নিক উপাদান ও স্ফটিকের গঠনের ভিত্তিতে রচিত।

১৮৩৭ সালে, ডানার বয়স যখন মাত্র চব্বিশ বছর তখন তিনি তাঁর 'সিস্টেম অব মিনারলজি' (System of Mineralogy) নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি পরে আমেরিকার মণিকবিদ্যার একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হয়। পুস্তকখানি ১৯৪৪ সালে সংশোধিত হয়ে আজ এই এক শত বৎসর পরও এখনও আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যায়তনগুলিতে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই গ্রন্থে ডানা হাজার হাজার ধাতুর প্রাপ্তিস্থান, স্ফটিকের আকৃতি, রাসায়নিক গুণাগুণ ও রাসায়নিক সূত্রের বর্ণনা দেন। এই গ্রন্থ পাঠ করে আমেরিকার মানুষ ধাতুর

নমুনা সংগ্রহের নেশায় মেতে ওঠে। সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু পাহাড় পর্বত, প্রান্তর, উপত্যকা, গুহা, খনি ও শুষ্ক নদী খাতে নতুন ধাতুর নমুনা সংগ্রহের ও নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের আশায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কয়েক দশক ধরে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অভিযানে বার হওয়া আমেরিকা-বাসীদের অবসর বিনোদনের অন্যতম প্রিয় পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই গ্রন্থের প্রভাবেই।

'সিস্টেম অব মিনারলজি'র অভূতপূর্ব সাফল্য ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ রূপে ডানার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। পরের বছর তাঁর একটি দুঃসাহসী অভিযানে বের হবার সুযোগ এল। কয়েক বছর আগে চার্লস ডারউইনের জীবনেও এমনি এক ঐতিহাসিক অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ এসেছিল। 'বিগল' নামে একটি জাহাজে ইংরাজ সরকার পরিচালিত একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন ডারউইন। তাঁর ফলেই তিনি তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশ করে বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ডানা যে অভিযানে বের হলেন তাতেও এমনি বিপুলভাবে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হল। এই অভিযানটি হ'ল যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল একস্প্লোরিং একস্পিডিসন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সারা পৃথিবী পরিক্রমার সুযোগ পেলেন। তাতে সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে ভূবিজ্ঞান পর্যালোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। যে ভূবিদ্যা এতদিন ছিল শিলাখণ্ড, ধাতু ও ধাতুস্ফটিক পরীক্ষার মাঝে সীমাবদ্ধ, এখন তার পরিধির মাঝে এল পাহাড় পর্বত গিরিশৃঙ্গমালা সমেত এই গ্রহের ভূপ্রকৃতির গঠন রহস্যও। এই অভিযান থেকে ডানা যে জ্ঞানলাভ করলেন তার সাহায্যে আমেরিকার ভূপ্রকৃতির বর্তমান রূপ পরিগ্রহের সম্পূর্ণ কাহিনীর সমন্বয় সম্ভব হল। লেফটেনাণ্ট চার্লস উইলকিসের নেতৃত্বে এই সরকারী অভিযান পাঠান হয়েছিল দক্ষিণ সমুদ্রে। এই অভিযানে বেরিয়ে ডানা ভূবিদ্যা চর্চার প্রচুর অবসর পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন বিদগ্ধ-জনসঙ্গ, খুব নিকট থেকে সমগ্র পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি ও পরিচয় পরীক্ষা করার সুযোগ।

এই অভিযানের বৈজ্ঞানিক দিকটির প্রতিও উইলকিসের দৃষ্টি ছিল। পক্ষী, কীটপতঙ্গ, মাকড়শা ও বিছা জাতীয় কীট ও কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী (কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি) পরীক্ষার জন্য জাহাজে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নেওয়া হয়েছিল। ডানা এই অভিযানের মণিকবিদ ও ভূবিদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আসা গ্রে এ কাজের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ

করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান অবশ্য এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। নিছক স্থূল বাস্তব প্রয়োজন মেটাতেই এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে, 'আমাদের দুঃসাহসী নাবিকদের বিচরণ ক্ষেত্র, আমাদের সমুদ্র উপকূলের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্য চালান যায়; ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হতে পারে...এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ করে পশুলোম ব্যবসায়ে নতুন উৎসের সন্ধান মেলে।' তিমি মাছ ধরার ব্যবসায়ে আমেরিকার বহু লোক নিযুক্ত ছিলেন। এরা আশঙ্কা করছিলেন ইংরাজদের তিমি শিকারী জাহাজগুলি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে তিমি শিকার শুরু করে তাঁদের স্বার্থহানি ঘটাবে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এই অভিযান প্রেরণের এও এক কারণ বটে। এমনি নিছক স্থূল প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত অভিযান থেকে পাওয়া গিয়েছিল তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অতিশয় পরিণত ফল।

অভিযান থেকে ফিরবার পথে কলাম্বিয়া নদীর মুখে জাহাজডুবি হয়ে অল্পের জন্য ডানা সেবার রক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে চার বছর পর ওয়াশিংটনে ফিরে এসে অভিযানকালে সংগৃহীত ভূবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার ভূরি পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরীক্ষার কাজে লেগে গেলেন। এ সময় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। অভিযান কালে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তাই ভেঙ্গে তাঁর সংসার খরচ চলতে থাকে। উটিকায় বাপের দোকানে তাঁর যে অংশ ছিল, দোকান দেখাশোনার কাজ না করলেও তার মুনাফা বাবদ কিছু টাকা তিনি পেতেন। তাতে তাঁর জমা টাকার অংশ কিছু বেড়েছিল। অভিযান কালে যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলির বিবরণী প্রকাশের জন্য কংগ্রেস (আমেরিকার সংসদ) কৃপণের মত অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরী করেছিলেন। ডানা এসম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'অতীব লজ্জার বিষয় আমার নিজের রচিত গ্রন্থের এক কপিও আমি সরকারের নিকট হতে পাইনি।" অধিকাংশ কপিই বিদেশের রাজন্যবর্গ ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে বিতরণ করা হয়েছিল।

ওয়াশিংটনের সমাজ ডানার খুব ভাল লাগেনি। অধ্যাপক বেঞ্জামিন সিলিম্যানের কন্যাকে বিবাহ করে তিনি পাকাপাকি ভাবে নিউ হ্যাভেনে বসবাস করতে লাগলেন। ১৮৪৮ সালে তাঁর 'ম্যানুয়াল অব মিনারলজি'

(Manual of Mineralogy) নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। সংশোধিত হয়ে গ্রন্থখানি এখনও ছাপা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী আসা গ্রে ডানাকে কেমব্রিজে আনবার এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেঞ্জামিন সিলিম্যান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করবার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদার সাহায্যে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সিলিম্যানের নামে জীবতত্ত্ব ও ভূবিদ্যার একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হল এবং সেই নতুন পদে ডানাকে নিয়োগ করা স্থির হল। ১৮৬৯ সালে ডানাই প্রথম নবসৃষ্ট এই পদে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডানার হাতে ভূবিদ্যা এক নতুন রূপ গ্রহণ করল। ১৮৬২ সালে তাঁর 'ম্যানুয়াল অব জিওলজি' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার ব্যবহার ও প্রয়োগক্ষেত্র অনেক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে ভূবিদ্যার বিষয়গুলি এতখানি স্বচ্ছতা, লক্ষ্যপথের এতখানি স্পষ্টতা আর কখনও দেখা দেয়নি। ভূবিদ্যাকে ডানা দেখলেন মহাকালের বিরাট পটভূমিতে—ঐতিহাসিক বিজ্ঞানরূপে। আমেরিকায় এই প্রথম ভূবিদ্যাকে শিলা ও স্ফটিক সংক্রান্ত তথ্যের সমাহার বা ভূস্তর গঠন প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা রূপে গণ্য না করে সৃষ্টির আদি থেকে ভূস্তরে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে তারই জীবন্ত কাহিনী রূপে গণ্য করা হল। ডানা ভূতত্ত্বকে দেখলেন, পাহাড়পর্বত, অধিত্যকা, সমতলভূমি এবং উপত্যকায় দৃষ্ট ভূস্তরের সঙ্গে তাপ, চাপ, বর্ষণ, আবহাওয়া এবং জৈব বিবর্তনের যে ঐশী শক্তি এই ভূসংস্থানগুলি সৃষ্টি করেছে, তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। ভূসংস্থানের প্রকৃতি নির্ধারণকারী এই শক্তিগুলি এখনও ভূপৃষ্ঠে ক্রিয়াশীল।

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভূস্তরের গঠনের সময় নিরূপণ করেন। তার মতে ভূত্বকের প্রথম স্তরটি দেখা দিয়েছিল পুরাজীবীয় কালে, পনেরো কোটি বছর আগে। তারপর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পৃথিবী এসেছে সর্বশেষ স্তরে হিমযুগে, ৪০০০০ বছর আগে। ভূস্তরের গঠনের এই সময় বিভাগের সাহায্যেই ডানা উত্তর আমেরিকার বিচিত্র ভূসংস্থানের পরীক্ষা কার্য চালান। তিনি মনে করতেন, যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড বিভিন্ন অবস্থাধীনে সৃষ্ট পৃথক পৃথক শিলাস্তরের দ্বারা গঠিত এক বিরাট ভূভাগ। এই শিলাস্তরের কতকগুলি হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত। মাঝে মাঝে তা স্থানিক অবস্থা

প্রভাবে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাতে বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক অবস্থিতি গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং স্তরগুলির অবস্থিতি ব্যাখ্যা করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক ভূবিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যে ডানা এ রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করলেন।

নৌবাহিনীর শিক্ষকরূপে ডানা প্রথম সমুদ্রযাত্রাকালে যে সব ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন, চার বছর সমুদ্র পথে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, রেলপথ নির্মাণের জন্য কাটামাটি, খনিত গহ্বর, লক্ষ্য করে, দেশের নানাস্থানে শিলাস্তর ছিদ্র করে, বহু রাজ্যের ভূতাত্ত্বিক জরীপের অসংখ্য রিপোর্ট পড়ে, রেলপথ নির্মাণে নিযুক্ত এঞ্জিনীয়ারদের রিপোর্ট পড়ে, বিশেষ করে 'আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সের' অফিসে আসা প্রায় অন্তহীন ভূতাত্ত্বিক প্রবন্ধসম্ভার পাঠ করে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেই ডানা যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেন। ১৮৪৬ সালে ডানা বেঞ্জামিন সিলিম্যানের সঙ্গে 'আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্স' নামক পত্রিকাটির যুক্ত সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এ এক বিরাট কাজ—এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন তথ্য ও আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন পর্বতপ্রমাণ উপাত্ত একত্রিত করা। স্থানিক শিলাস্তর সৃষ্টির হাজার হাজার মতবাদের মধ্যে সত্যিকারের সুপ্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য মতবাদগুলি বাছাই করে নেওয়া, দেশের সর্বত্র ভূবিদ্যার যে সব নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছিল সে সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল থাকা,—অন্য কোনও লোকের পক্ষে এমনি সব হরেক রকম ঝঞ্ঝাটের কাজ করতে গিয়ে গবেষণাগারে আবদ্ধ আরাম কেদারার বিজ্ঞানীতে পরিণত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ডানার ক্ষেত্রে তা হল না। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর পাথর, শিলাস্তর সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা পরীক্ষার জন্য যে সব স্থান হতে এই সব তথ্য সংগৃহীত সে সব স্থান নিজে পরিদর্শনে যেতেন। এই সব তথ্য ও শিলাস্তরের নমুনা বিশ্লেষণ করে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পর্বতসমূহ সৃষ্টি হয়েছে তিনি তার বিস্তৃত বিবরণী রচনা করেন। 'অন দি অরিজিন অব কন্টিনেণ্টস' গ্রন্থে তিনি জানালেন যে সৃষ্টিকালীন উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হবার সময় ভূত্বক সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সংকোচনের ফলেই বিরাট উত্তপ্ত শিলাস্তূপ জেগে উঠে পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বতমালারূপী বড় বড় খাঁজ সৃষ্টি হয়। পর্বত সৃষ্টির এই ব্যাখ্যা ডানার পক্ষে নূতন নয়। কিন্তু অ্যাপেলেসিয় পর্বতমালা গঠনের

কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন এমনি ভাবেই। ভূবিজ্ঞানীরূপে ডানা এমনি বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন যে, বেইলি উইলিস বলেছিলেন, ১৮৭০ সালের শেষের দিকে কলেজে যদি আমায় জিজ্ঞাসা করা হত যে কেন পৃথিবী শীতল ও সংকুচিত হয়েছে, তা হলে আমি উত্তর দিতাম, 'কারণ ডানা বলেছেন'। এই বেইলি উইলিস পরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন।

সমুদ্রে কেন প্রবাল দ্বীপবলয় ও প্রবাল প্রাচীর সৃষ্টি হয় ডানা তারও কারণ ব্যাখ্যা করেন। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হল তাঁর 'কোরালস্ অ্যাণ্ড কোরাল আইল্যাণ্ডস' (Corals and Coral Islands) নামক গ্রন্থখানি। উইলকিস পরিচালিত দীর্ঘ সামুদ্রিক অভিযানে বের হয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী সুদীর্ঘ প্রবাল প্রাচীরগুলি এবং দক্ষিণ সমুদ্রের প্রান্তবর্তী প্রবাল প্রাচীর ও প্রবাল বলয়গুলি পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে বুঝেছিলেন, সমুদ্রের তলদেশে দলবেঁধে বাস করে যে হাজার হাজার প্রবাল কীট তাদের দেহ নিঃসৃত চুনা-পাথর জমে জমে এইসব প্রবাল দ্বীপ ও অন্যান্য প্রবাল সংস্থান গঠিত হয়ে থাকে। প্রবালকীট নিরক্ষ অঞ্চলের উষ্ণ অগভীর সমুদ্রে জন্মায়। এরা তিন ধরনের স্থল ভূমি সৃষ্টি করে থাকে—বেলা শৈল, প্রবাল প্রাচীর ও অ্যাটল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে বেলা শৈল দেখা যায়। প্রবাল প্রাচীর (বেরিয়ার রীফ) উপহ্রদ ও উপকূল ঘিরে থাকে। এই ধরনের প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপূব উপকুল বরাবর ১২০০ মাইল বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক শ ফিটের মধ্যে যখন কোনও মগ্নচড়ার উপর প্রবাল কীটপুঞ্জের দেহ নিসৃত চুনাপাথর জমতে থাকে তখনই অ্যাটল সৃষ্টি হতে থাকে। অ্যাটল হল উপহ্রদ বেষ্টনকারী প্রবাল বলয়। প্রবাল প্রাচীর ও অ্যাটল সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে ডানা বললেন, সমুদ্রের তলদেশ ধীরে ধীরে বসে যাওয়ায় ও সেই সঙ্গে প্রবাল কীটদেহ নিঃসৃত চুনা পাথরের স্তূপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এগুলি গঠিত হয়।

সিডনীতে অবস্থানকালে ডানা অ্যাটল ও প্রবাল প্রাচীর সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে ডারউইনের সাম্প্রতিক মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংবাদপত্রে পাঠ করেছিলেন। সেই প্রথম তিনি জানতে পারেন যে ডারউইন এই সব প্রবাল প্রাচীর ও অ্যাটল সম্বন্ধে পরীক্ষা কার্য ও গবেষণা চালিয়েছেন। ১৮৩৯ সালেই প্রবাল সংস্থানগুলির গঠন রহস্য সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন

ডারউইন তা সমর্থন করায় তিনি খুবই খুশী হলেন। তিনি এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা চালালেন। ডারউইন তাঁর মতবাদের সমর্থনে যত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর চেয়েও বেশী তথ্য সংগ্রহ করলেন।

ভূপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরি কেন সৃষ্টি হয়, ভূবিজ্ঞানীদের নিকট তা ছিল এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এই রহস্য সমাধানে ডানার সামান্য কিছু অবদান আছে। ডেলাওয়ার জাহাজে তিনি যখন নিম্ন পদস্থ নাবিক কর্মীদের শিক্ষকতার কাজ করছিলেন তখনই বিসুভিয়াস সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল তিনি 'অন দি কনডিসনস অব বিসুভিয়াস' (On the Conditions of Vesuvius) নামক একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। পাঁচ বছর পর তিনি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কতকগুলি আগ্নেয়গিরি শীর্ষে আরোহণ করে সেগুলি পরীক্ষা করেন। ১৮৬০ সালে যখন তিনি পুনরায় বিসুভিয়াস পরিদর্শন করেন তখন আবার তিনি আগ্নেয়-গিরিটির অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি অনুসন্ধান করেছিলেন। ১৮৯০ সালে তাঁর 'ক্যারেকটারিসটিকস্ অব ভলক্যানোজ' (Characteristics of Volcanoes) নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। সেই বছরই তিনি কলেজের কাজ হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ সালে নিউ হ্যাভেনে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে 'আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে' নেব্রাস্‌কার শিলাবিন্যাস (আংশিক) সম্বন্ধে তাঁর একটি গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিই এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শেষ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি নিয়ে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর লেখনী চালনার ষাট বছর পূর্ণ হল। এই ষাট বছরের মধ্যে তিনি সর্বসমেত ২১৫টি গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখে গেছেন।

শুধু ভূবিদ্যা ও মণিকবিদ্যার ক্ষেত্রেই ডানার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। উইলকিস পরিচালিত সামুদ্রিক অভিযান থেকে ফেরবার পর চৌদ্দ বছর ধরে তিনি এই অভিযানকালে লিখিত নোট (সংক্ষিপ্ত মন্তব্য) ও নানাবিধ সংগ্রহের বিবরণী প্রকাশে ব্যস্ত ছিলেন। এই নোট ও সংগ্রহগুলি শুধু ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে নয়, প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ধেও। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হল তাঁর 'জোফাইট' (প্রবালের অনুরূপ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর—উভয়ধর্মী জীব) সংক্রান্ত রিপোর্টটি। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীবর্গ (চিংড়ী জাতীয় প্রাণী) সম্বন্ধে রিপোর্টটি। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বৃহত্তর দৃষ্টি ভঙ্গীর ফলে তিনি সংগৃহীত উপকরণগুলির নিখুঁত শ্রেণীবিভাগ করতে পেরেছিলেন।

যে অস্থির ও বিশৃঙ্খল যুগের মাঝে ডানা জীবন কাটিয়েছেন, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি খুব সামান্যই অংশ গ্রহণ করেছেন। নিজের কাজ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ছোট্ট বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গোষ্ঠী (এঁদের মধ্যে ছিলেন পাশের বাড়ীর বেঞ্জামিন সিলিম্যানের পরিবার), এই সব নিয়ে এক বিরাট আত্মসমাহিত অধ্যাপকের জীবনযাপন করে গেছেন ডানা। প্রিয়দর্শন, সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, জ্ঞানবৃদ্ধোচিত পক্ককেশের ভার মাথায়, কবির মত মুখ, যে বিষয়ে জনসাধারণের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ, সেই সৃষ্টিতত্ত্ব ও ভূবিদ্যায় তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে সর্বজন স্বীকৃত—তবু আগাসিজের মত তিনি জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তা ছিলেন না, সাধারণের নিকট বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর ডাক পড়ত না। এক সময় ইয়ং মেনস্ ইনস্টিটিউটে একবার ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দিলেও কিন্তু তিনি ঘরে বসে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পাঠ করতে বা বাঁশী ও গীটার বাজাতেই বেশী ভালবাসতেন।

তা হলেও ডানা সমকালীন মানুষের সমস্যাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি মনে করতেন উত্তরীদের আদর্শ ই ন্যায়সঙ্গত। দেশ থেকে দাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটাই উচিত। জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রসার ও প্রচার সমর্থন করতেন। একবার তিনি সাধারণ বাগ্‌বিতণ্ডায় যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী ধর্মবেত্তারা ভূবিদ্যা বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে যে নতুন মতবাদ প্রচার করছিল তার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। তাঁদের মতে এই নতুন ভূতাত্ত্বিক মতবাদ বাইবেলের চিরন্তন সত্যের বিরোধিতা করছে, নাস্তিকতার প্রচার করছে, স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করছে। ডানা ও আগাসিজ উভয়েই ছিলেন গভীর ধর্মপরায়ণ। তাহলেও তাঁরা ভূবিদ্যার প্রচারিত এই বিজ্ঞান ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব সমর্থন করলেন। বৈজ্ঞানিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা বিপন্ন হলেই ডানা বিজ্ঞানের সমর্থনে এগিয়ে আসতেন।

জনসাধারণের কাজের মধ্যে যেতে ভয় পেলেও কিন্তু ডানা জনপ্রতিষ্ঠানের কাজের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। যুক্তরাষ্ট্রের ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে অবিসংবাদী নেতারূপে তাঁর যে খ্যাতি ছিল তাঁর ফলেই তিনি দেশের বিজ্ঞান সাধনার প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্বোচ্চ পদগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। কানেটিকাট একাডেমী অব সায়েন্সের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন তিনি।

পরে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স ও ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন।

দেশের মত বিদেশেও ডানা সমান শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। জার্মান ভূপর্যটক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী ভন হামবোল্ড ডানার ভূবিজ্ঞানের গবেষণা সমকালীন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টতম অবদানগুলির অন্যতম বলে মনে করতেন। ডানার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক মতবাদের প্রতি ডারউইনের অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৪৯ সালের আগস্ট মাসেই তিনি ডানাকে তাঁর উইলকিস্ অভিযানে সংগৃহীত বহু প্রজাতির নমুনার কয়েকটি তাকে ধার দেবার জন্য লিখেছিলেন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি-সমূহের জ্বালামুখগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ডানার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে দু জনের মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ হত।

ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিতে' বর্ণিত অভিব্যক্তিবাদ আগাসিজ যতখানি সমর্থন করতে পেরেছিলেন, ডানা পেরেছিলেন তার চেয়েও কম। ১৮৫৫ সালে ডানা বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। প্রত্নজীব বিদ্যা যে ডারউইনের বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে একথা তিনি স্বীকার করতেন না। বিশ্বস্রষ্টা যে পৃথক পৃথক ভাবে স্বয়ং বিভিন্ন পশুপ্রাণী তরুলতা সৃষ্টি করেছেন এই মতে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বলতেন, 'কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন অণু ক্রমবিকাশের নীতি অনুযায়ী বন্য অরণ্যচর পশুপ্রাণী থেকে গৃহপালিত পশু ও বাঁদর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। এক মহান অবিনশ্বর স্রষ্টাই সব পশুপ্রাণী সৃষ্টি করেছেন।' কয়েক বছর পর ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসি' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ডানা তখন প্রথম বার স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছেন। এমনি স্নায়বিক অবসন্নতায় পরে তিনি বারবার আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালের মার্চ মাসের আগে জীববিদ্যায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডারউইনের এই গ্রন্থখানি তিনি পড়ে উঠতে পারেন নি। এ গ্রন্থ পড়েও কিন্তু তিনি ডারউইনের মতবাদ সমর্থন করতে পারলেন না। তাঁকে লিখে পাঠালেন, তাঁর নিজের গবেষণা ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি এমন যথেষ্ট প্রমাণ পাননি যার ফলে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে যে প্রজাতি হতে প্রজাতিতে ক্রমবিকাশের ফলেই পৃথিবীতে পশুপাখী-তরুলতার এই বিচিত্র জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম প্রথম ডারউইন প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ ডানা সমর্থন করতে না পারলেও কিন্তু পরে এই মতবাদ আরও ভালভাবে পরীক্ষা ও অনুধাবন করবার পর এ সম্বন্ধে তাঁর বিরোধিতা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তন সহ তিনি অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করে নেন। অভিব্যক্তিবাদের এই সামান্য পরিবর্তন তিনি তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত 'ম্যানুয়েল অব জিওলজির' শেষ সংশোধিত সংস্করণে সন্নিবেশিত করে যান। 'পরবর্তী গবেষণার ফলাফল যাই হোক না কেন ওয়ালেসের সঙ্গে (এই ওয়ালেসই ডারউইনের সঙ্গে একত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ উদ্ভাবন করেছিলেন) আমি এ বিষয়ে একমত হতে পারি যে অন্ধ প্রকৃতির উর্ধ্বে এক মহাশক্তিই রয়েছে মানুষের ক্রমবিকাশের মূলে। পরমেশ্বরের ইচ্ছাও সদাসক্রিয় শক্তিতেই প্রকৃতির অস্তিত্ব, প্রকৃতির মহান সত্যগুলি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও শক্তির প্রকাশ, একথা স্বীকার করে নিলে প্রকৃতি ও তার সৃষ্টির সর্বশেষ প্রজাতিরূপী মানব সমাজের আবির্ভাব সম্বন্ধে আর কোনও রহস্যই থাকে না।' জৈব বিবর্তনকে তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ও একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ করেছিলেন।

ডানার রচিত গ্রন্থগুলি প্রকৃতি ও পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন সম্বন্ধে নতুন তত্ত্ব পরিবেশন করেছে। লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী সাগ্রহে এই গ্রন্থগুলি পাঠ করত। ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিজ' ও 'ডিসেণ্ট অব ম্যান' (১৮৭১ সালে প্রকাশিত) মানুষের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, ডানার এই ভূবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থগুলি সেই চিন্তা-বিপ্লবকে সহায়তা করে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মানসিক উন্নতি সাধনে এই কাজটিই হল ডানার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আমেরিকা মহাদেশের শিলাস্তরে লিখিত পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করার অভিনব ও বিস্ময়কর কাজের চেয়েও তাঁর ঢের বিরাট কীর্তি হল ভূপ্রকৃতি সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মনকে চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার এই অসামান্য গৌরব।

১১

ওথনিয়েল চার্লস মার্শ

(১৮৩১-১৮৯৯)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসার ও অন্যান্য জীবাশ্ম

আমেরিকার প্রত্নজীববীদ ওথনিয়েল চার্লস মার্শের মত আর কোনও বিজ্ঞানীই আপন বিজ্ঞান সাধনার মাঝে সমসাময়িক কালকে এত ভালভাবে প্রতিফলিত করে যাননি। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা কালে চলছিল শিল্প বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়। এই সময় বড বড় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। শ্রমশিল্পে যন্ত্র সাহায্যে যুগপৎ বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি (মাস প্রডাকসন) উদ্ভাবিত হয়। কলকারখানায় বহু মূল্যের যন্ত্রপাতি স্থাপিত হতে থাকে। এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণে এককালীন বহু অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হত। দেশের সর্বত্র রেলপথ বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে প্রসারিত হচ্ছিল। ফিলিপ অরমরের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টিনে ভর্তি সংরক্ষিত মাংসের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প দ্রুত প্রসারলাভ করছিল। সমরোপকরণ নির্মাণের প্রয়োজনে ও সস্তাদামের ইস্পাত থেকে তৈরি যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্ভব হওয়ায় ধাতুশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটছিল। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে এবং জল ও স্থলপথে মাল প্রেরণের মাশুলের সুবিধাজনক হারের সুযোগ গ্রহণ করতে ওহাওর সাতটি তৈল শোধনাগার একত্রিত হয়ে ১৮৭০ সালে ওহাওর স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি গঠন করল। পেট্রোল, ইস্পাত, গোমাংস, সীসা ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করতে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হত। এই বিপুল মূলধন জনসাধারণের নিকট যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করে সংগ্রহ করা হত। তাই এই ধরনের যৌথ মালিকানায় চালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে শীঘ্রই পেট্রোল, ইস্পাত, টিনে ভর্তি সংরক্ষিত মাংসশিল্প, সীসা ও

বিদ্যুৎ শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন কোম্পানিগুলি একত্রিত হয়ে ট্রাস্ট গঠন করতে লাগল।

সমাজের সর্বত্র তখন ছিল দুর্নীতির ঘোর প্রাদুর্ভাব। এই দুর্নীতি শুধু আমাদের রেলপথ, ইস্পাত, পেট্রোল, সংরক্ষিত মাংসশিল্পে নিযুক্ত বিপুল ধনী শিল্পপতিদের পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল সরকারের মাঝেও। উন্মত্ত স্বার্থচালিত সুতীব্র অর্থলিপ্সা রাষ্ট্র, কাউন্টি ও মিউনিসপ্যাল শাসন ব্যবস্থায় প্রবল অসাধুতা ও দুর্নীতি বয়ে এনেছিল।

ভোগসুখের উপকরণ অর্জনের এই প্রমত্ত প্রচেষ্টা ও তার আনুষঙ্গিক দুর্নীতি সত্ত্বেও এক নতুন আমেরিকা গড়ে উঠেছিল। ওই আমেরিকা আপন জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত, ইউরোপের প্রতি কম নির্ভরশীল। পুরুষানুক্রমে স্বীয় শক্তিতে আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পশ্চিমের নির্জন নিঃসঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বহু আমেরিকাবাসী। এ থেকে তাঁদের মাঝে দেখা দিয়েছিল এক অদ্ভুত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ। এতে তাঁরা ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের গণতান্ত্রিক মনোভাবও বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রশাসনিক সংস্কারের কথা এই সময় সর্বত্র আলোচিত হতে লাগল। পনেরো বছর আন্দোলনের পর ১৮৮৩ সালে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সিবিল সার্ভিস অ্যাক্ট (জনপালন কৃত্যক আইন) পাস হল। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরে রাজ্যসরকারগুলিও নিজ নিজ জনপালন কৃত্যক আইন পাস করতে থাকে।

সেকালের শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীদের এমনি উদ্দাম প্রতিযোগিতার মহোৎসব, বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে বিরাট ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন ও রাজনৈতিক দুর্নীতি—এ থেকে উদ্ভব হল অগাধ বিত্তশীল মুষ্টিমেয় ক্রোড়পতি। এছাড়া এই নতুন শিল্পসমৃদ্ধির যুগে অপেক্ষাকৃত সৎ উপায়ে প্রভূত বিত্ত অর্জনকারী হাজার হাজার মাঝারি ধনীরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জর্জ পীবডি। ইনি অতি হীন অবস্থা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। মুদির দোকানের কেরানীর কাজ থেকে শুরু করে ফেরিওয়ালার কাজ, স্টোর কীপারের কাজ, তুলা ও কাটা কাপড় রপ্তানীর কাজ প্রভৃতির নানা ধরনের ছোটখাট কাজ করে তিনি একটি রেল-কোম্পানীর ম্যানেজার হন। শেষ পর্যন্ত তিনি অর্থবিনিয়োগকারী বিরাট ব্যাঙ্কার ও বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৮৩৭ সাল থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছিলেন। তাঁর ব্যাঙ্কের

বিনিয়োগের ব্যবসা ও বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ বেশীর ভাগই চলত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে।

পীবডি মানবতাবাদী ও বিশ্বপ্রেমিক রবার্ট ওয়েনের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। নিজের ৮,০০০,০০০ ডলার মূল্যের সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি শিক্ষা ও জনকল্যাণে দান করে যান। পীবডি ছিলেন অকৃতদার। তাঁর বহু আত্মীয়স্বজন তাই তাঁর স্নেহ মমতা ও সাহায্য লাভ করত। এদের মধ্যে ছিলেন তাঁর ভাগ্নে ওথনিয়েল সি. মার্শ। ওথনিয়েলের মা ছিলেন জজ পীবডির এক বোন। ওথনিয়েলের বয়স যখন প্রায় এক বছর সেই সময় তাঁর মা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পীবডি তাঁর সেই ভাগ্নেটির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মার্শ প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি, পরে ভূবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। বাড়ী থেকে এক মাইল দূরে যখন এরিখালের খনন কার্য চলছিল, সেই সময় খালের কাটা মাটি ও ইট পাথরের সঙ্গে ওঠা ট্রাইলোবাইট ও ব্রোকিওপডদের (পলিয়জয়িক শিলাস্তরের মাঝে প্রাপ্ত খোলসাবৃত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ও মাছ) জীবাশ্ম দেখে পরম কৌতূহলাক্রান্ত হয়েই তিনি ভূবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অতঃপর মার্শ যখন কলেজে পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন ধনবান মাতুলের নিকট হতে অর্থ সাহায্য লাভ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হল না।

মার্শ অ্যাণ্ডোভারের ফিলিপস্ একাডেমিতে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি স্কুলের পত্রিকায় লিখতেন। অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারকার্য চালিয়ে তিনি স্কুলের বিতর্ক সমিতির (ডিবেটিং ক্লাবের) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সেই বছরই মাতুল পীবডির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল। চুপি চুপি তাঁকে মার্শ বললেন, মামা নিশ্চয়ই তাঁকে ইয়েল কলেজে পড়তে দেখলে সুখী হবেন।

১৮৬০ সালে ইয়েল কলেজ থেকে স্নাতকের পরীক্ষায় পাস করবার পর মার্শ পি বিটা কাপপা সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন এবং গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের একটি পরীক্ষায় ভাল ফল দেখানোয় বার্কলে বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি দানের সঙ্গে একটি গুরুতর শর্ত ছিল। এই শর্ত অনুযায়ী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রকে ইয়েল কলেজে স্নাতকের শ্রেণীতে এক থেকে তিন বৎসর পড়তে হত। এই সময় ইয়েল কলেজে শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল।

এখানে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিজ্ঞানী অধ্যাপক জেমস ডানা ছাত্র হিসাবে মার্শের মেধা ও কৃতিত্ব লক্ষ্য করে খুশী হয়েছিলেন। মার্শ যে বাল্যকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলা ও জীবাশ্ম সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, একথা তিনি জানতেন। তিনি মার্শকে তাঁর বাল্যকালের ভূবিদ্যার প্রতি এই অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রেখে এ সম্বন্ধে ইয়েলে আরও পড়াশুনা করতে অনুরোধ জানান। মার্শ মনস্থির করে ফেললেন: তিনি মেরুদণ্ডী প্রাণীবর্গ সংক্রান্ত প্রত্নজীববিদ্যায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবেন।

মার্শ এবার অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা ফাঁদলেন। তারপর বিপুল অধ্যবসায়, একাগ্রচিত্ততা, কঠিন সঙ্কল্প, অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৎকালীন সাফল্যমণ্ডিত বিরাট শিল্পপতিদের হিংস্র নির্মমতা নিয়ে তিনি আপন লক্ষ্য সাধনে এগিয়ে চললেন। তার লক্ষ্য ছিল, মাতুল পীবডির অর্থে যতটা ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সেবা করা সম্ভব তাই তিনি করবেন। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে তিনি মাতুলকে বিজ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্পের কথা লিখে জানালেন। পীবডি তাঁর স্কটল্যাণ্ডের প্রাসাদ থেকে এ চিঠির উত্তর দিলেন। 'যারা অর্থের জন্য আমার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, এবং যারা তাদের সচ্চরিত্রতা ও উদ্যমের দ্বারা প্রমাণ করেছে যে তাঁরা তাদের প্রতি ন্যস্ত বিশ্বাসের যোগ্য, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা জানতে এবং তাদের উদার হস্তে সাহায্য করতেই আমি সর্বদা ইচ্ছুক। তোমাকে যতটা আমি লক্ষ্য করেছি এবং তোমার সম্বন্ধে অন্যের কাছ থেকে যে সব খবর পেয়েছি তাতে আমি তোমাকে সেই অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিবর্গের তালিকাভুক্ত করলাম।' এই চিঠির সঙ্গে এল ২২০০ ডলারের একখানি চেক—মার্শের শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুলের স্নাতকোত্তর ক্লাসে দুবছর পড়বার খরচ।

১৮৬২ সালে শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাস করবার পর ইউনিয়ন স্থল বাহিনীতে একটি মেজরের পদ পেয়েও মার্শ তা করলেন না। কারণ তিনি চোখে কম দেখতেন। ইয়েল কলেজ থেকে তাঁকে অধ্যাপকের চাকরি দিতে চাওয়া হয়েছিল। তাও তিনি নিলেন না। প্রস্তুত হতে লাগলেন ইউরোপে গিয়ে মেরুদণ্ডী প্রত্নজীববিদ্যার আরও অধিক জ্ঞান আহরণের জন্য। ইউরোপে যতদিন কাটিয়েছিলেন তার বেশ কিছু সময় ব্যয়িত হয় ধনী মাতুলের নিকট হতে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য আদায়ের চেষ্টায়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে ও পত্রালাপে। মার্শের মারফৎ ইয়েল

কলেজের অধ্যাপক বেঞ্জামিন সিলিম্যান (জুনিয়ার) (ইনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন সিলিম্যানের পুত্র) খবর পেয়েছিলেন নতুন একটি নকশার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য পীবডি হার্ভার্ড কলেজকে ১৫০০০০ ডলার সাহায্য করছেন। বেঞ্জামিন সিলিম্যান (জুনিয়ার) ১৮৬২ সালে মার্শের মাতুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মার্শকে লিখলেন পীবডির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ইয়েল কলেজের জীবতত্ত্বের গৃহ নির্মাণের জন্য বা মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে।

মার্শ সিলিম্যানকে লিখে পাঠালেন, পীবডি তাঁর উইলে ইয়েল কলেজকে জীবতত্ত্বের জন্য ১০০০০০ ডলার দান করতে চান। এই অর্থ তাঁর মৃত্যুর পর পাওয়া যাবে। সিলিম্যান এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মার্শকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তার মাতুল উইলে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ দিতে চেয়েছেন তা নিতান্তই অপ্রতুল। ইয়েলে জীবতত্ত্বের যে বিরাট প্রদর্শশালা স্থাপনের পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা সম্পূর্ণ করা যাবে না তা দিয়ে। সিলিম্যান মার্শকে আরও বোঝালেন যে এই সংগ্রহশালা নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে, 'যাতে অতি শীঘ্র নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে মার্শ এখানে তার কার্যভার গ্রহণ করতে পারেন' এবং 'পীবডি তাঁর জীবদ্দশাতেই তোমাকে তোমার এবং তাঁর উভয়ের পক্ষে যথাযোগ্য সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত দেখে সুখী হতে পারেন।'

মার্শ সমগ্র ব্যাপারটি এরূপ দক্ষতার সঙ্গে পীবডির সামনে উপস্থাপিত করলেন যে উইলে প্রস্তাবিত সময়ের অনেক আগেই ইয়েল কলেজ পীবডির নিকট হতে অর্থ সাহায্য পেয়ে গেল। তদুপরি পীবডি ১৮৬৬ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন এবং উইলে প্রস্তাবিত মৃত্যুর পর এক লক্ষ ডলার দানের পরিবর্তে ইয়েল জীবতত্ত্বের একটি প্রদর্শশালা নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য তখনই ১৫০০০০ ডলার দান করলেন। এ ছাড়া মার্শ তার বিজ্ঞানের বইপত্র ও দেরাজ আলমারি কেনবার জন্য নগদ ২০০০ ডলার পেলেন। এই সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি পীবডিকে বলেছিলেন, 'ব্যবসায়ীদের যেমন মূলধন বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের তেমনি এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার। তবে বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হল এই যে তাঁদের কোনও লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয় না।' মার্শের বাকচাতুরী ও কূটবুদ্ধি ছিল এমনি তীক্ষ্ণ যে তা সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য।

এমনি ভাবে সুকৌশলে কলকাঠি নেড়ে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রত্ন জীববিদ্যার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হল ও এখানে পীবডি মিউজিয়াম অব নেচারাল হিস্ট্রি নামে জীবতত্ত্বের একটি প্রদর্শশালা স্থাপিত হল। মার্শ পরে এই প্রদর্শশালাটি অজস্র নতুন ও চমকপ্রদ জীবাশ্মে সজ্জিত করেন। মার্শকে অধ্যাপকরূপে লাভ করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিল বিত্তবান এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি ক্লাসে ছেলে পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করেই সুখী থাকতে চাননি, বরং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় করে সারাজীবন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন করে গেছেন। বিজ্ঞান সাধনায় নিজের পূর্ব নির্ধারিত ক্ষেত্র অধিকারে মার্শ ছিলেন দুঃসাহসী, উদ্যমী ও জলদস্যুর মত নির্মম। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডী প্রত্নজীববিদ্যার বিভাগটিকে তিনি এ ধরনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন রূপে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অর্থব্যয় বা খাটুনির প্রশ্ন বা ব্যক্তি বা দলের বিরোধিতা তিনি তাঁর এই সংকল্প সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেননি। ওথনিয়েল মার্শ হবেন প্রত্নজীববিদ্যার অদৃষ্টপূর্ব নমুনাবলীর সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত সংগ্রাহক, এই ছিল তাঁর বিধিলিপি।

১৮৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে দেশে ফিরবার আগে মার্শ দুই মাস ইউরোপে প্রত্নজীববিদ্যার চর্চায় কাটিয়েছিলেন। ইউরোপে যখন যেখানে গেছেন সেখানেই প্রত্নজীববিদ্যার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ডারউইনের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে সারা বিশ্বে ঘোর আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। মার্শ ইতিপূর্বেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ অকপটে গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্ন-জীববিদ্যার যে বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অনুশীলন করেছিলেন, তাতে তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদের উৎসাহী প্রবক্তা হয়ে উঠলেন। ইউরোপ থেকে ফেরবার পথে মার্শ স্কটল্যাণ্ডের প্রাসাদে তাঁর মাতুলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারপর আড়াই টন পরিমাণ জীবাশ্ম এবং ৫০০০ ডলার মূল্যের পুস্তক (প্রধানতঃ জীববিদ্যা বিষয়ক) নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পরের বছর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নজীববিদ্যার অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

চার বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল ডানার 'ম্যানুয়াল অব জিয়লজি' নামক গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থে ডানা পৃথিবীর ভূমিভাগের স্তর সমূহ গঠনের

কাল বিভাগ করেছিলেন। বিভিন্ন ভূস্তর গঠনের সমগ্র কালকে তিনি কয়েকটি অধিযুগ বা অধিকল্পে বিভক্ত করেন। এই কাল বিভাগ অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয় ১,৫০০,০০০,০০০ বৎসর পূর্বে। অনুন্নত অজটিলদেহী মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা দিয়েছিল, শেষ পুরাজীবীয় (প্যালিওজোয়িক) যুগে— আজ থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে। এই সরলদেহী মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে উচাঙ্গের মেরুদণ্ডী প্রাণী আবির্ভূত হয় শেষে নবজীবীয় (সেনোজোয়িক) অধিকল্পে—স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এই যুগ ৬০ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল। মার্শ তার জীবাশ্ম সম্পর্কিত গবেষণার কাজ এই দুই অধিকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই স্থির করেন।

ভূস্তরগুলি যেন প্রত্নজীববিদ্যার এক গভীর খনি। প্রত্নজীববিদগণ এই খনির সর্বোচ্চ স্তরের সামান্য কিছু অংশের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, জর্জ ক্রোগহান কেনটাকির বিগ বোন লিক অঞ্চল থেকে কতকগুলি জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছিলেন। ক্রোগহান ডাবলিন থেকে ১৭৪১ সালে পেনসিলভানিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আমেরিকায় তখন কোনও প্রত্ন জীববিদ ছিলেন না বলে ক্রোগহান তার সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি পরীক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন। কতকগুলি জীবাশ্ম প্রেরিত হয়েছিল লর্ড শেলবার্নের নিকট। ইনি ছিলেন আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। অন্য জীবাশ্মগুলি ক্রোগহান পাঠিয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নিকট। তিনি তখন লণ্ডনে ছিলেন। ১৭৬৭ সালে পীটার কলিনসন এগুলি সম্বন্ধে রয়েল সোসায়িটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পনেরো বছর পর জেফারসন আরও অধিক পরিমাণে জীবাশ্ম সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কিছুকাল পরই একটি গ্রথের (মেগালোনিকস্) জীবাশ্ম তাঁর হাতে আসে। ভার্জিনিয়া প্রদেশের একটি গুহা খনন করে এটি পাওয়া গিয়েছিল। আরও জীবাশ্মের সন্ধানে ১৮০৭ সালে জেফারসন ক্লার্ককে বিগবোন লিক অঞ্চলে পাঠান। এই ক্লার্ক ছিলেন ক্লার্ক ও লুইস-এর অভিযানের নেতাদের একজন। ক্লার্ক প্রায় তিন শত অধুনালুপ্ত হস্তির অস্থিসার সংগ্রহ করে আনেন। এগুলি হোয়াইট হাউসে রক্ষিত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট জেফারসন নিজে এই অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

বেশ কিছুকাল বিগবোন লিক অঞ্চলে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলিই আমেরিকার প্রত্ন জীববিদ্যার আসর জুড়ে ছিল। জীবাশ্মের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা ও বিভিন্ন পশুপ্রাণীর শ্রেণীবিভাগের মাঝেই ছিল প্রত্ন জীববিদ্যা চর্চা সীমাবদ্ধ। পরে অন্যান্য বিভাগেও গবেষণা শুরু হয় এবং আমেরিকার প্রত্ন জীববিদগণ অভিব্যক্তিবাদের বৃহত্তর পটভূমিতে বিষয়টি বিচার করতে থাকেন। মেরুদণ্ডী প্রত্নজীববিদ্যার অগ্রগতি হয় খুব সামান্যই। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত উত্তর আমেরিকার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত ডানার 'ম্যানুয়েল অব জিওলজি' নামক সাত শত পৃষ্ঠার গ্রন্থে মেরুদণ্ডী জীবাশ্ম সম্বন্ধে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল মাত্র দুই পৃষ্ঠার মধ্যে।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর স্থান বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন চিকিৎসাবিদ জোসেফ লিডে। তিনি এবং অন্যান্য অনেকেই এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলে অনুসন্ধানকার্য চালালে বহু মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ দিক দিয়ে এ অঞ্চলটি প্রত্নজীববিদদের স্বর্গরাজ্য বলে গণ্য হবার যোগ্য। ১৮৬৮ সালে মার্শ লিডের এই অনুমান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। এর কিছু আগে তিনি শিকাগো শহরে 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের' সভায় যোগদান করেছিলেন। সেখানে তিনি এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভার শেষে তিনি একটি প্রমোদ ভ্রমণকারী দলের সঙ্গে মিশে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই দলটি ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথের সমগ্র পশ্চিম অংশ ভ্রমণ করে ওয়াওমিং-এর বেণ্টন ছাড়িয়ে ষাট মাইল দূরবর্তী একটি স্থানে গিয়ে পৌছেছিল। যাত্রার শেষ এক মাইলের রেলপথ তৈরী হয়েছিল দু ঘণ্টা আগে এই ট্রেনেই আনা রেলের পাটি দিয়ে। মার্শ মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন 'এই প্রাচীন সমুদ্রের তলদেশে লুক্কায়িত রয়েছে বিপুল জীবাশ্ম ভাণ্ডার একথা বুঝতে আমার দেরী হল না যে এ অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিহাস এবং সেই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার নতুন উপজীব্য বিষয়রূপে গণ্য হবার যোগ্য। এই গবেষণায় ভূবিদ্যার কোনও ছাত্র যদি সারা জীবনও অতিবাহিত করে, তা হলেও এইটি হবে তার জীবনের সেরা কাজ।'

নিউ হ্যাভেনে ফিরে আসবার পরই তিনি এই প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্মের অফুরন্ত ভাণ্ডারে অনুসন্ধান অভিযান চালানোর একটি পরিকল্পনা রচনা করে

ফেললেন। ক্যানজাস, নেব্রাসকা, ড্যাকোটা প্রদেশসমূহ, কলোরডো, ইউটা, ওয়াওমিং, ওমনটানা,—এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক ও সুসম্বদ্ধ অনুসন্ধান চালানো তাঁর এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। এ কাজের জন্য প্রয়োজন হল একদল দুঃসাহসী তরুণের যারা বন্য বাইসন পাল ও শত্রুভাবাপন্ন রেডইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত অপরিচিত নতুন দেশে অ্যাডভেঞ্চারের জীবন সাদরে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি তরুণ দলের অভাব ছিল না। কলেজের তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে মার্শের অনেক বন্ধু ছিল। অতি নিপুণ অশ্বারোহী, বন্দুক চালনায় অব্যর্থ সন্ধানী, মৎস্য শিকারে পারদর্শী ও ক্যাম্প ফায়ারের মজলিশে গল্প বলার চমৎকার সঙ্গীরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। সুদক্ষ ব্যবসায়ীর বাস্তব বুদ্ধি ও সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে এমনি একটি অভিযান সংগঠন করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই ধরনের অনুসন্ধান অভিযান চালানোর যোগ্য নেতাও ছিলেন মার্শ। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও ছিল যথেষ্ট। অভিযাত্রীদলটিকে যখন অতিমাত্রায় শত্রুভাবাপন্ন রেড ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হত তখন তাদের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন হত। মার্শ তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিনীর নিকট হতে প্রয়োজন মত রক্ষী সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারতেন, ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানীর অফিসারদের নিকট হতে সর্ববিধ সাহায্যও আদায় করেছিলেন।

১৮৬৯ সনে জর্জ পীবডি মারা যান। উইলে তিনি মার্শকে ১০০০০০ ডলার দান করে যান। ১৮৭০ সাল থেকে শুরু করে পর পর চার বছর প্রতি গ্রীষ্মকালে মার্শ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও স্নাতকদের নিয়ে গঠিত এক একটি অনুসন্ধান দল নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে জীবাশ্ম সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন। প্রতি দলে থাকত চার থেকে বারো জন লোক। মার্শ পরিচালিত প্রত্ন-জীববিদ্যার জীবাশ্ম সংগ্রহের এই সব অভিযানে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লোহালক্কর ব্যবসায়ী সার্জেণ্ট অ্যাণ্ড কোম্পানির হেনরি বি সার্জেণ্ট, জেমস ডব্লিউ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইনি পরে ইয়র্ক থেকে কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তুলাবীজ ছাড়ানোর যন্ত্র (কটনজিন) আবিষ্কারক বিখ্যাত হুইটনির পৌত্র, এলি হুইটনি, হেনরি ওয়ার্ড বীচারের পুত্র উইলিয়াম সি বীচার, কানেটিকাটের চিনে সিল্ক মিলস্‌এর হেনরি জি চিনে।

বাফেলো বিল, স্থলবাহিনীর লোকজন, ও পনি রেড ইণ্ডিয়ান পথ প্রদর্শকদের দ্বারা চালিত হয়ে পূর্বাঞ্চল হতে আগত এই প্রাণোচ্ছল, দুঃসাহসী তরুণের দল পশ্চিমের প্রেইরি ভূমি ও রকি পর্বতমালার উচ্চ ভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবাশ্মের সন্ধানে ফিরতে লাগল। জ্বলন্ত মার্তণ্ডের অগ্নিক্ষরা তাপের মাঝে পাহাড় পর্বত, গিরিখাত ও অধিত্যকার উপর দিয়ে রসদবাহী ঘোড়াগুলি নিয়ে দলটি এগিয়ে চলে। এইসব অধিত্যকা অনেক ক্ষেত্রে সমুদ্র সমতল থেকে সাত হাজার ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। বহু পূর্বে একদা ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার সন্ধানে দলে দলে ছুটে ছিল মানুষ। তাদের গাড়ীর চাকায় পথে পথে গাড়ীর খাত সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযাত্রী দলটি দেখতে পেল, সেই সব খাতের মাঝে ঘাস জন্মেছে। রেলপথ নির্মিত হওয়ায় ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে চড়ে পশ্চিমের যাত্রীদের আর প্রেরির এই পথ ধরে চলবার প্রয়োজন হয় না। এ পথ তাই পরিত্যক্ত। যখন তেমন জীবাশ্মের সন্ধান মিলত না, সংগৃহীত জীবাশ্ম বাঁধাছাঁদা ও বাক্সবন্দী করার কাজ খুবই নীরস মনে হত, তখন দলের লোকজন বন্দুক ও শিকারের ছুরি নিয়ে বাইসন শিকারে বেরিয়ে পড়ত। মার্শ ছিলেন অসম সাহসী, প্রায় বেপরোয়া প্রকৃতির। একবার একপাল বাইসনের মাঝে পড়ে তাদের পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে তাঁর প্রাণনাশ হবার উপক্রম হয়েছিল।

এই সব আধাবৈজ্ঞানিক, আধা দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চার-পিয়াসী ছাত্রদের অভিযান থেকে পাওয়া গেল নতুন নতুন কতকগুলি জীবাশ্মের নমুনা। প্রত্নজীববিদ্যার ইতিহাসে এগুলি মার্শের নাম পুরোভাগে স্থাপনের সাহায্য করল। অভিযাত্রীদল অনুসন্ধানের শেষে পশ্চিমাঞ্চল থেকে যে পর্বত প্রমাণ জীবাশ্ম সংগ্রহ করে এনেছিল, তার মধ্যে ছিল কতকগুলি অদ্ভুত প্রাণীর জীবাশ্মের টুকরো। এই প্রাণীগুলি স্মরণাতীত কালে ধরাপৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে প্রমাণে কতকগুলি স্থানে ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। এই জীবাশ্মের অনেকগুলি সেই ফাঁক পূরণে সাহায্য করল। এইসব অভিযানে সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি যে সব মূল্যবান প্রাণীবিদ্যাগত তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ করে তিনটি বিষয় বিশ্ববাসীর পরম বিস্ময় উৎপাদন করে।

পশ্চিম ক্যানজাসে পাতলা খড়িচূর্ণ ভর্তি একটি মৃত নদীর শুষ্ক বক্ষে মার্শ দৈবাৎ ছোট্ট একটি প্রস্তরীভূত ফাঁপা হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে পান।

এটি লম্বায় ছয় ইঞ্চি। ব্যাস এক ইঞ্চি। বহু পশুপ্রাণীর হাড়গোড়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল মার্শের। তিন বছর ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদর্শশালায় ঘুরে অজস্র জীবাশ্মের নমুনাও তিনি দেখেছিলেন। এই ছোট্ট হাড়ের টুকরোটি পরীক্ষা করেই তিনি বুঝেছিলেন এটি সাধারণ কোনও জীবাশ্ম নয়। সযত্নে ঝেড়ে মুছে, কাগজে মুড়ে তিনি এটি নিউ হ্যাভেনে নিয়ে এলেন। দীর্ঘকাল গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করবার পর নিঃসন্দেহ হলেন যে 'জীবিত বা লুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র উডন্ত সরীসৃপ বা টেরোডাকটিলের পাখার হাড়ের অস্থি সন্ধিতেই এই হাড়টির অনুরূপ অস্থিসন্ধি দেখা যায়।'

মাত্র একখানি হাড, তারই ভিত্তিতেই মার্শ মনে মনে গড়ে ফেললেন সম্পূর্ণ লুপ্তপ্রায় প্রাণীটি, তারপর অতি সতর্ক বিজ্ঞানীর মতই তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। জানালেন, আমেরিকার প্রথম উড্ডুক্কু সরীসৃপ টেরানোডন (pteranodon) আবিষ্কারের কথা। এই উডন্ত সরীসৃপটির (টেরোডাকটিল) পাখার বিস্তার ছিল অন্তত কুড়ি ফুট, এটি ছিল দন্তহীন ও মৎস্য-ভোজী প্রাণী, পরিচিত যে কোনও সরীসৃপ অপেক্ষা অন্ততঃ কুডিগুণ বিরাটকায়, সম্ভবত উড়ন্ত প্রাণীদের মধ্যে বিরাটতম। এই উড্ডুক্কু সরীসৃপের অস্থির সন্ধান পাবার পর যুক্তরাষ্ট্রে খবর এল জার্মানীর আইখস্ট্যাটের (Eichstalt) ভূগর্ভ খনন করে দীর্ঘপুচ্ছ একটি টেরোডাকটিলের সম্পূর্ণ জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। আগাসিজ এটি কেনার চেষ্টা করেছিলেন। মার্শ তাঁর চেয়েও বেশী দাম কবুল করে, প্রায় ১০০০ ডলার মূল্যে জীবাশ্মটি ইয়েল প্রদর্শশালার জন্য কিনলেন।

বিবর্তনের পথে প্রথম যে পক্ষীকুলের উদ্ভব হয়েছিল তার সন্ধান দেওয়াই মার্শের প্রত্নজীববিদ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৮৬১ সালে জার্মানীর শোলন হোফেনে মাটি খুঁড়ে এই ধরনের একটি আদিমতম পক্ষীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে এই অদ্ভুত প্রাণীটি সরীসৃপের মত, অথচ এর বহিরঙ্গ পাখীর মত। প্রাণীটির নাম দেওয়া হয়েছিল আর্কিয়োপ্‌টেরিক্‌স্ (Archeopteryx)। এর পাখা ছিল, গিরগিটির মত দীর্ঘ লেজ ছিল, নখ ও পালক ছিল। মধ্যজীবীয় অধিকল্পে সম্ভবত এরা গাছে গাছে উড়ে বেড়াত। পাখীদের দাঁত থাকে না। কিন্তু এদের উভয় চোয়ালেই দাঁত ছিল। এরা সম্ভবত পাখী ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী স্তরের

প্রাণী। এই প্রাণীকুল এখন ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত। ১৮৬৫ সালে জার্মানীতে মার্শ যখন এই জীবাশ্মটি দেখেন তখন এইটিই যে পাখী ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী বিলুপ্ত প্রাণীর নিদর্শন এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। পরে ক্যানজাস প্রদেশের ভূস্তর থেকে তিনি ক্রেটাশিয়াস উপকূলের ভূস্তরে যে সব জীবাশ্ম সংগ্রহ করেন তা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই দাঁতাল পাখীর অস্তিত্বে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

দশ কোটি বৎসর পূর্বেকার ক্রেটাশিয়াস যুগের বিলুপ্ত দাঁতাল পাখীর যে নিদর্শনগুলি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার বিবরণী মার্শ ১৮৮০ সালে 'এ মনোগ্রাফ অন দি একস্‌টিনকট্ টুথড বার্ডস অব নর্থ আমেরিকা' (A Monograph on the Extinct Toothed Birds of North America) নামক একটি সন্দর্ভে প্রকাশ করেন। এইটিই মার্শের প্রথম বিখ্যাত সন্দর্ভ। জীবজগতের বিবর্তন ধারায় সরীসৃপ ও পক্ষীর মধ্যবর্তী কোনও প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন। এই দিক দিয়ে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ শৃঙ্খলে যে ফাঁক রয়ে গিয়েছিল মার্শের এই সন্দর্ভে সে ফাঁক পূরণ হল। টমাস হাকস্‌লে এমনি ধরনের প্রাণীর অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এমনি প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কার করায় মার্সের কৃতিত্ব তিনি স্বীকার করলেন। ডারউইন নিজে মার্শকে লিখে জানালেন, "আপনার আবিষ্কৃত এই প্রাগৈতিহাসিক দাঁতাল পাখিগুলি 'অরিজিন অব স্পিসি' প্রকাশের পর অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা প্রতিপাদনে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করল।"

এই আদিম যুগের ভূস্তরে বড় রকমের দ্বিতীয় আর একটি অভিনব আবিষ্কার ঘটল। এই ভূস্তরে সন্ধান পাওয়া গেল কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক অশ্বের জীবাশ্ম। এই জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করে যে প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথে আধুনিক অশ্বের উৎপত্তি হয়েছে সর্বপ্রথম তা নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এই প্রাগৈতিহাসিক অশ্বের জীবাশ্মগুলি আবিষ্কৃত হবার আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল আধুনিক অশ্বের উৎপত্তি হয়েছে পুরানো পৃথিবীর ইউরোপ ও এশিয়া খণ্ডে। আমেরিকা মহাদেশে পূর্বে কোনও অশ্ব ছিল না। স্পেন দেশীয় অভিযাত্রীরাই ইউরোপ থেকে এখানে অশ্ব আমদানী করেছিল: এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, মার্শ এবার তা প্রমাণ করলেন। এ বিষয়ে ফিলাডেলফিয়ার জোসেফ লিডি এর আগে কিছু গবেষণা করেছিলেন। আমেরিকায় প্রাগৈতিহাসিক অশ্বের কিছু কিছু জীবাশ্মও তিনি আবিষ্কার

করেছিলেন। ১৮৭৪ সাল নাগাদ মার্শ আরও অন্ততঃ ত্রিশটি প্রাগৈতিহাসিক অশ্বের জীবাশ্মের খোঁজ রাখতেন। এর প্রথম জীবাশ্মটি তিনি নেব্রাস্‌কার শুষ্ক একটি হ্রদের বুকে পুরাতন একটি কূপের সংস্কার সাধনকালে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সে ১৮৬৮ সালের কথা। এই সময় মার্শ প্রথম পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করছিলেন। এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটির নাম "প্রোটোহিপ্‌পাস্' (Protohippus)। এটি নবজীবীয় (Cenozoic) অধিকল্পে আবির্ভূত হয়েছিল। এর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বোঝা যায় এই প্রাণীটির উচ্চতা ছিল প্রায় তিন ফুট, পাগুলি ছিল খুব সরু সরু। পায়ের খুর তিনটি। ১৮৭২ সালে মার্শ আরও প্রাচীন কালের, ইওসিন (Eocene) উপযুগের অশ্ব অরোহিপ্‌পাসের (Orohippus) জীবাশ্মের সন্ধান পান। এই ছোট্ট প্রাণীটি আকারে ছিল শৃগালের অনুরূপ। এদের সামনের পায়ের খুর ছিল চারটি। দু বছর পর মার্শ সন্ধান পেলেন মাইওসেন (Miocene) উপযুগের অশ্ব মাইওহিপ্‌পাসের (Miohippus) জীবাশ্মের। এটির পায়ে ছিল তিনটি খুর। আকার ছিল মেষের অনুরূপ। প্লিওসেন (Pliocene) উপযুগের ভূস্তর হতে পাওয়া গেল প্লিওহিপ্‌পাস (Pliohippus) জাতীয় অশ্বের জীবাশ্ম। প্লিস্টোসেন (Pleistocene) উপযুগের ভূস্তর হতে মিলল আধুনিক এক-খুর যুক্ত অশ্বের (Equus) জীবাশ্মের নিদর্শন।

টমাস হাকস্‌লি ছিলেন ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের অতি-উৎসাহী সমর্থক। অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করতে গিয়ে তিনি বহু বিবাদ ও বাক্‌বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডারউইনবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে এসে তিনি মার্শের প্রাগৈতিহাসিক অশ্বের জীবাশ্ম সংগ্রহ পরীক্ষা করলেন। এগুলি দেখে তিনি এমনি বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন যে দুদিন তিনি মার্শের সঙ্গে কাটিয়ে এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখলেন। আধুনিক অশ্বের উৎপত্তি যে ইউরোপখণ্ডে এই মত পালটাতে হল হাকস্‌লিকে। বক্তৃতাকালে তিনি আমেরিকান শ্রোতাদের জানালেন, অশ্বের জন্মস্থান যে আমেরিকাতেই এ বিষয়ে মার্শের হাতে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।

১৮৭৩ সালে ছাত্রদের নিয়ে চতুর্থবার পশ্চিমাঞ্চলে জীবাশ্ম সংগ্রহের অভিযানে বের হবার পর মার্শ তাঁর সংগ্রহের পদ্ধতি বদলালেন। এই অঞ্চলে তখন রেলপথ খোলা হয়েছে। যাতায়াত অনেক সুগম। বহুলোক এসে

এখানে বসবাস করতে শুরু করেছে তার ফলে, তাদের মধ্য থেকে জীবাশ্ম সংগ্রহে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্থানীয় সংগ্রাহক পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এদের অনেকেই এখন ওসব অঞ্চল হতে জীবাশ্ম সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠাতে পারবে। এতে তিনি নিউ হ্যাভেনে থাকতে পারবেন আর সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করবার ও পীবডি মিউজিয়াম উপকরন সম্ভারে সজ্জিত করবার আরও বেশী সময় পাবেন। ১৮৭৪ সালে তাঁর কাছে খবর এল দক্ষিণ ড্যাকোটার বিগ ব্যাড ল্যাণ্ড অঞ্চলে প্রচুর জীবাশ্মপূর্ণ এলেকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তখুনি যেন মার্শ সে অঞ্চলে রওনা হন। না হলে এই জীবাশ্মগুলি অন্যের হাতে গিয়ে পড়বে। খবর পেয়ে মার্শ তথনই সে অঞ্চলে ছুটলেন। সেখানে তখন এক নিদারুণ পরিস্থিতি। মার্শ বুঝলেন, এতে শুধু তাঁর এ অঞ্চলের জীবাশ্ম সংগ্রহের পরিকল্পনাই বানচাল হবে না। এ অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বও বিপন্ন হতে চলেছে।

১৮২৪ সালে বুরো অব ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স নামক কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসটি খোলা হয়েছিল। অফিসটি প্রথমে ছিল সমর বিভাগের অধীনে। পঁচিশ বছর পর এটি স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। প্রেসিডেন্ট মনরো ও অ্যাডামস্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রেড ইণ্ডিয়ানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বাসস্থান হতে স্থানান্তরিত করা হবে না। এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কিন্তু তারা ধীরে ধীরে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হচ্ছিল। নিজ বাসভূমি হতে ক্রমাগত বিতাড়িত হয়ে, যক্ষা ও বসন্তের আক্রমণে রেড ইণ্ডিয়ান জাতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ১৮৬০ সাল নাগাদ রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র তিন লক্ষ। রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ইতিপূর্বে যক্ষা ও বসন্তের প্রকোপ ছিল না। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ই রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে এই ব্যাধিগুলি সংক্রামিত করে।

নতুন নতুন অঞ্চলে যতই রেলপথ খোলা হতে থাকে, রেড ইণ্ডিয়ান দল ততই রেলপথ হতে দূরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে থাকে। শ্বেতাঙ্গরা রেড ইণ্ডিয়ানদের অধিকৃত জমি দখল করতে থাকে। যে বাইসন শিকার করে রেড ইণ্ডিয়ানরা আহার্য সংগ্রহ করত, শ্বেতাঙ্গরা নির্বিচারে সেই বাইসনের পাল ধ্বংস করতে লাগল। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বহু খণ্ডযুদ্ধ হল। তাতে বহু লোক হতাহত হল। এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধনে ১৮৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্ট 'বোর্ড অব ইণ্ডিয়ান কমিশনার্স' (রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সম্পর্কিত কার্যাবলীর মহাধ্যক্ষ) নিযুক্ত করলেন। এর পর থেকে

রেড ইণ্ডিয়ানদের সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হল। তাদের অধীন জাতি বলে গণ্য করে, খাদ্য-বস্ত্র ও কিছু অর্থদানের ব্যবস্থা হল। কেন্দ্রীয় সরকার এদের অভিভাকত্ব গ্রহণ করলেন। রেড ইণ্ডিয়ানদের সংরক্ষিত অঞ্চলের জমির মালিকানা স্বত্ব রইল যৌথ ভাবে রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের। এই জমাজমি দেখাশুনার ভার অর্পিত হল ইণ্ডিয়ান ব্যুরোগুলির উপর। রেড ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থে এ অঞ্চলের জঙ্গল ও খনি ইজারা দেবার ক্ষমতাও এই অফিসগুলির ছিল।

প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্টের নীতিতে কোনও সুফল ফলল না। বরং তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় যে ত্রুটি ছিল, ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফিসের দুর্নীতির ফলে তা আরও বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে জেনারেল কাস্টারের একটি রিপোর্টে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। দুর্গ স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন করতে তাঁকে এ অঞ্চলে পাঠান হয়েছিল। এ অঞ্চলে সোনার সন্ধান পেয়েছেন বলে তিনি একটা রিপোর্ট পাঠালেন। তাতে সোনার লোভে দলে দলে লোক উন্মত্তের মত এদিকে ছুটে আসতে লাগল। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। রেড ইণ্ডিয়ানদের মনোভাবও বিপজ্জনক ও আক্রোশপূর্ণ হয়ে উঠল। জীবাশ্ম সংগ্রহে যাবার পথে, মার্শ পৌছালেন সাউথ ড্যাকোটার ব্লাক হিলস-এর নিকটস্থ ইণ্ডিয়ান রেড ক্লাউড এজেন্সীতে। এখানে রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার রেড ক্লাউডের সঙ্গে আলাপ হল। রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করলেন, এবং তার গোষ্ঠীর লোকজনকে ইণ্ডিয়ান ব্যুরো যে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর গো মাংস, মটরশুঁটি, শুকর মাংস, তামাক ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করে থাকে, তার নমুনা দেখালেন।

মার্শ ব্যাপারটা ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনার্স ফর ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স অফিসে জানালেন। এখানে কোনও কাজ হল না দেখে তিনি পরের দিন প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্টের সঙ্গে দেখা করে সমগ্র ব্যাপার বিবৃত করে তদন্তের দাবী করলেন। ইণ্ডিয়ান অফিসে কাজ-কারবারে কেলেঙ্কারীর আভাস পেয়ে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকা অমনি প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্টের সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করবার এই সুযোগ লুফে নিল। প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব কলম্বাস ডেলানোর অধীনস্থ ইণ্ডিয়ান ব্যুরোগুলির পরিচালনায় চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থা এবং তজ্জনিত রেড ইণ্ডিয়ানদের অপার দুর্গতি ভোগের বীভৎস

কাহিনী এই পত্রিকায় প্রকাশ করল। এর ফলে ডেলানো পদত্যাগ করলেন। কয়েকজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হল। ইণ্ডিয়ান ব্যুরোর পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হল। 'বস্টন ট্রানসক্রিপট' এই সংস্কার সাধনে মার্শ যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, প্রকাশ্যে তার প্রশংসা করলেন। ইয়েল বিশ্ববিত্যালয়ের বিজ্ঞানী দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করলেন। ১৮৭৯ সালে কংগ্রেস স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের তত্ত্বাবধানে আমেরিকান ব্যুরো অব এথনলজি নামে জাতিবিত্যা গবেষণা ও চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মেজর জন ডব্লিউ পাওয়েল এর ডাইরেক্টর মনোনীত হলেন।

যে ব্যাপারে মার্শ সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন, তার তখনও অনেক দেরী। এবার মার্শকে এক নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। এখানে বিদগ্ধ মার্শ যেন এক দুর্দান্ত জলদস্যু। যে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসার সম্বন্ধে গবেষণার কাজ তার একান্ত নিজস্ব ক্ষেত্ররূপে তিনি পূর্ব থেকে বেছে নিয়েছিলেন, এবার দেখা গেল, জলদস্যুর নির্মমতায় তিনি তার সে পূর্ব-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। ডাইনোসার কথাটি তাঁরই কল্যাণে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। আশিটি নতুন আকৃতির এবং চৌত্রিশটি নতুন বর্গের ডাইনোসারের তিনি বর্ণনা দিয়ে যান। বহু ডাইনোসারের জীবাশ্ম পুনর্গঠিত ও পুনস্থাপিত করেন।

১৮৭৭ সালের বসন্ত কালে সত্ত প্রতিষ্ঠিত পীবডি মিউজিয়ামের কাজে যখন তিনি ব্যস্ত, সেই সময় হতে ডাইনোসার সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি আকৃষ্ট হন। কলোরাডোর শক্ত খড়ি সদৃশ বালু শিলার মাঝে অর্থার লেকস্ নামে একজন ইংরাজ পাদ্রী ও স্কুল মাস্টার তরুলতার জীবাশ্ম খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ইনি অকস্ফোর্ডে বিজ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন। এক দিন ইনি মরিসন নামক স্থানে বিরাট একখণ্ড মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি দেখতে পান। এটি ছয় ফুট লম্বা, বিজ্ঞানে যেটুকু জ্ঞান ছিল তা থেকে লেকস্ বুঝতে পারলেন যে এই অস্থিসন্ধিটি অসাধারণ প্রকৃতির। ভাবলেন, জিনিসটা সম্বন্ধে ইয়েল বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক মার্শ হয়ত বিশেষ আগ্রহ দেখাবেন। ওই অঞ্চলে সকলেই তখন জানত যে মার্শ জীবাশ্ম অনুসন্ধান ও সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল। লেকস্ অস্থিখণ্ডের একটি রেখাচিত্র এঁকে নিউ হ্যাভেনে মার্শের নিকট পাঠালেন। তারপর তিনি আশেপাশের অঞ্চল থেকে আরও এক টনেরও বেশী প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত অস্থি সংগ্রহ

করে সেগুলি মার্শের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন, এগুলি পেয়ে, এই সব জীবাশ্ম কেনবার জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে মার্শ তাঁর কাছে ছুটে আসবেন। মার্শ কিন্তু শীঘ্র এলেন না। লেকস্ কিছুদিন পর এই নবাবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলির কয়েকটি এডওয়ার্ড ডি. কোপ নামে অন্য আর এক জন প্রত্নজীববিদের নিকট পাঠালেন।

এরপর দ্রুত পট পরিবর্তন হতে লাগল। কোপের নিকট জীবাশ্ম পাঠানোর খবর মার্শের কানে যেতেই তিনি লেকস্‌কে তার যোগে মরিসনে প্রচুর জীবাশ্ম প্রাপ্তির এই খবর গোপন রাখতে জানালেন। সেই সঙ্গে ক্যান্‌জাসে তাঁর একজন বেতনভোগী প্রস্তরীভূত জীবাস্থি সংগ্রাহকের নিকট তারবার্তা পাঠালেন অতিশীঘ্র মরিসনে গিয়ে লেকস্‌এর সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি কিনে নিতে এবং কোপের নিকট প্রেরিত জীবাশ্মগুলি উদ্ধার করতে। তারপর তিনি অতিদ্রুত অতিকায় নতুন ডাইনোসার সম্বন্ধে (এ নিউ অ্যাণ্ড এ জায়গানটিক ডাইনোসার) একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। প্রবন্ধটি ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। মার্শ এই অতিকায় প্রাণীটির নাম দিয়েছিলেন টিটানোসোউরাস মনটানুস (Titanosaurus Montanus)। লেকস্ প্রেরিত জীবাশ্মগুলি পেয়ে, কোপ সেগুলি কিনে নিয়ে দাম মিটিয়ে দেবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন। মার্শের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার উনিশ দিন পর তিনি আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটিতে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশও করেছিলেন। একটা নতুন ধরনের ডাইনোসারের অস্থি পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন কোপ। পরীক্ষান্তে এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে যাবেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি লেকস্-এর নিকট হতে জীবাশ্মগুলি মার্শকে দিয়ে দেবার আদেশ পেলেন। কোপ জীবাশ্মগুলির দাম দেবার সুযোগ পাবার আগেই মার্শ সুকৌশলে এগুলি কিনে নেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন।

কোপকে এত সহজে কিন্তু এই বিপুল জীবাশ্মপূর্ণ স্থান থেকে হটান গেল না। মার্শের মত তিনিও ছিলেন যথেষ্ট বিত্তবান, জ্ঞানী ও জীবাশ্ম সংগ্রহে অতি উৎসাহী। জোসেফ লিডির নিকট তিনি এক বছর শারীর-স্থান বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। কোন কলেজে শিক্ষা গ্রহণ না করে তিনি স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউশনে যোগদান করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্‌রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। কোপ ও মার্শ একত্রে

গৃহযুদ্ধকালে ইউরোপের প্রদর্শশালাগুলি দেখে এসেছিলেন। তার আগেও দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মার্শ লক্ষ্য করেছিলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী অতি চতুর, ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রয়োজন হলে প্রতিপক্ষের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করতেও পরাঙ্মুখ নন। বুঝেছিলেন এঁকে সহজে সরানো যাবে না, তবু তিনি ঘোর অহমিকা বশে বিশ্বাস করতেন, এমন একজন সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ‑ তিনি অতি সহজেই হটিয়ে দিতে পারবেন।

লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে যে সব অতিকায় প্রাণী আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ধরাপৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রস্তরীভূত অস্থি পঞ্জর নিয়ে এবার এই দুই বিজ্ঞানী বছরের পর বছর নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাতলেন। মাঝে মাঝে দুই প্রত্নজীববিদ কয়েকদিন আগে পিছে, একই জন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করতেন, তখন শুরু হত আবিষ্কারের অগ্রগণ্যতা নিয়ে বিবাদ। কখনও হয়ত দুজনেই, দুই এক ঘণ্টা আগে পিছে একই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর নামকরণ করতেন। দ্রুত প্রকাশের জন্য কোপ তারযোগে তাঁর প্রবন্ধ 'আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির' সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করতেন। মার্শ অভিযোগ করলেন অগ্রগণ্যতা লাভের জন্য কোপ পুরানো তারিখ দিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। এমনিভাবে বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগল।

লেকস্ যেদিন মরিসনে নতুন জীবাশ্ম ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন প্রায় সেই দিনই ও ডব্লিউ লুকাস নামে আর একজন স্কুল মাস্টার সেখান থেকে একশত মাইল দূরে কলোরাডোর ক্যানন সিটির নিকট অনুরূপ জীবাশ্ম ভাণ্ডার দেখতে পান। মার্শ শুনতে পেলেন লুকাস এই নবাবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি কোপের নিকট পাঠাচ্ছেন। অমনি তিনি ও তার একজন জীবাশ্ম সংগ্রহককে লুকাসের কাছে পাঠালেন, কোপ যত টাকা দিচ্ছেন তার চেয়েও বেশী টাকা কবুল করে তার নিকট হতে জীবাশ্মগুলি কিনে নিতে। লুকাস প্রথমে ইতঃস্তত করেছিলেন। মার্শ তাঁকে তারযোগে জানান যে তাঁর সঙ্গে জীবাশ্ম ক্রয়ের চুক্তি কোপ নিজে বাতিল করে দিচ্ছেন। মার্শ নিজে তার সংগৃহীত সমুদয় জীবাশ্ম কিনে নিতে প্রস্তুত আছেন। লুকাস তখনই মার্শের কাছে তাঁর সংগৃহীত সমস্ত জীবাশ্ম বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করলেন। এই কৌশলের খেলায় মার্শের জয় হল। কোপকে হার মানতে হল।

অন্যান্য সূত্র হতেও মূল্যবান জীবাশ্ম মার্শের হাতে এসে পড়তে লাগল। ১৮৭৭ সালে গ্রীষ্মকালে ওয়াওমিং-এর লারামি স্টেশন হতে একখানি চিঠি এল মার্শের নিকট। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল, 'আমাদের যেসব জীবাশ্ম আছে ও যেসব জীবাশ্মপূর্ণ ভূমির সন্ধান আমরা জানি, তা আমরা বিক্রয় করতে ইচ্ছা করি। আমরা দরিদ্র শ্রমিক, এগুলি আপনাকে তাই বিনা মূল্যে উপহার দিতে পারছি না। অর্থের বিনিময়ে এই জীবাশ্মপূর্ণ স্থানগুলির সন্ধান আমরা আপনাকে দিতে চাই এবং ভূপ্রোথিত জীবাশ্ম সংগ্রহের জন্য ভূমি খননের কাজ পেতে চাই। একজন উৎসাহী ভূবিজ্ঞানী ও বিত্তবান ব্যক্তি বলে আপনার খ্যাতি আছে। আমরা আশা করি আপনি আমাদের আবেদনে সাড়া দেবেন।' মার্শ মনে মনে বললেন, চমৎকার লিখেছে, এবং সবই যথাযথ। তখনই তাদের নিকট টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং পত্র প্রেরকদের উল্লিখিত স্থানে তাঁর একজন বেতনভোগী জীবাশ্ম সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক এই জায়গাতেই প্রায় দশ বছর আগে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানির স্থানীয় স্টেশন মাস্টার তাঁকে একটি ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত অস্থি দেখিয়েছিলেন।

ডাইনোসারের জীবাশ্মের এই ক্ষেত্রটি ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এখান থেকে যে সব জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছিল তা থেকেই মার্শ প্রত্নজীববিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিখ্যাত আবিষ্কার করেছিলেন। এখান থেকে যে হাজার হাজার জীবাশ্ম পীবডি মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে এসে জড়ো হতে লাগল, তা থেকে মার্শ ও তাঁর সহকর্মীগণ মেসোজোয়িক ও সেনোজোয়িক অধিকল্পের কতকগুলি অতিকায় প্রাণীর কঙ্কাল পুনর্গঠিত করলেন। এর মধ্যে একটি ছিল মহাকায় ব্রন্টোসোরাস (Brontosaurus)। 'বজ্র গিরগিটি' প্রাণীটির ওজন ছিল সম্ভবত চল্লিশ টন। উচ্চতা ষোল ফুট, দৈর্ঘ প্রায় সাতষট্টি ফিট। মার্শ ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয় করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রেট হলে' সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য প্রাণীটির কঙ্কাল পুনর্গঠিত করে স্থাপন করলেন। প্লাস্টারের সাহায্যে এই সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের দেহাবয়বের পূর্ণ মূর্তি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না মার্শ।

মার্শের তত্ত্বাবধানে জুরাসিক উপযুগের আর একটি মহাকায় প্রাণীর কঙ্কাল পুনর্গঠিত হল। দৈত্যের মত বিপুলকায় ও অমিত শক্তিধর এই প্রাণীটির নাম স্টেগোসরাস (stegosaurus-roofed lizard)। অতিকায়

গিরগিটি ও প্রথম সরীসৃপাকৃতি পাখীদের যুগে আবির্ভূত অস্ত্রসজ্জাযুক্ত এই প্রাণীটি ছিল অন্যান্য প্রাণীদের আতঙ্কস্বরূপ। দশ কোটি বছর আগে এই কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীটি তার অতিকায় দেহ নিয়ে এই কলোরাডো অঞ্চলে বিচরণ করত। কঠিন বর্মাবৃত দেহ, ও দীর্ঘ খাড়া শলাকাযুক্ত লেজের কল্যাণে সে যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণীগুলিকেও এরা পরোয়া করত না। এদের গায়ে পুরু চামড়ার বর্ম ছাড়াও ছিল শক্ত হাড়ের আর এক প্রস্থ অস্ত্র-সজ্জা, পিঠের উপর খাড়া হয়ে থাকত এগুলি। বিরাট লেজের শেষ অংশে ছিল বিশালাকৃতি চার জোড়া শলাকা। প্রাণীটির লেজ এরূপ বিশাল ও শক্তিশালী ছিল যে মার্শের সংগৃহীত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী বোঝা গিয়েছিল এর চলাফেরার কাজ মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না। এর জন্য এর লেজের কেন্দ্রস্থলে ছিল পৃথক আর এক প্রস্থ স্নায়ু-কেন্দ্র।

মার্শের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কথা আলোচিত হতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ঘরে। ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয়ে তিনি নিউ হ্যাভেনে নিজের বসত বাড়ী নির্মাণ করলেন। আরও ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয়ে মূল্যবান আসবাবপত্র ও শিল্পসামগ্রীতে বাড়ীখানা সাজালেন। প্রায় প্রদর্শ-শালার মত এই বাড়ীতে মার্শ প্রচুর ভোজ্য-পানীয় দিয়ে অতিথি অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করতেন। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তিনি মুগ্ধ হতেন। ধনী গৃহে নিমন্ত্রিত হতে তাঁর ভাল লাগত। ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য ও অন্যান্য দর্শকদের মার্শ তাঁর বিবিধ শিল্পসামগ্রী পূর্ণ গৃহের জাঁকজমক দেখিয়ে আনন্দ পেতেন। মার্শ ছিলেন চিরকুমার। অতিথিদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা তাঁকে নিজেই করতে হত। অবিবাহিত পুরুষ হলেও এ কাজটা তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করতেন। উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অনিচ্ছা বশঃতই মার্শ চিরকুমার রয়ে যাননি। তাঁর উগ্র অহমিকা, মহিলা সমাজে অবস্থা অনুযায়ী মানিয়ে চলে তাদের মনস্তুষ্টি করার সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দানের অক্ষমতাই তাঁর এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুগঠিত দেহ, নীল চক্ষু, ইষৎ হরিদ্রাভ কেশ, প্রায় রক্তবর্ণ শ্মশ্রুধারী এই মানুষটি ছিলেন বাহ্যিক আচার আচরণে অতিশয় কেতা দুরস্ত, কিছুটা জাঁকজমক প্রিয় স্বভাবের। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারায় বেশ কিছুটা রুক্ষতার ছাপ এসে গিয়েছিল।

মার্শ রাউণ্ড টেবল ক্লাব নামে একটি ক্লাবের সভ্য ছিলেন। এই ক্লাবে মাত্র ষোলজন সভ্য ছিল। এরা মাসে একবার কোনও হোটেলে মিলিত হয়ে সুখাদ্য ভোজন করতেন। ভোজের টেবিলে সভ্যদের মধ্যে নানা বিষয়ে লঘু আলোচনা হত। তা সত্ত্বেও কিন্তু মার্শের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। মার্শকে প্রভাবিত করা সহজ ছিল না। নিজের খেয়াল খুশী মত কাজ করতেন। দরদস্তুরিতে ছিলেন অতি পোক্ত। শেষ বয়সে প্রথম যৌবনের সেই অদম্য প্রাণশক্তির উত্তাপ, আর আমুদে স্বভাব কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। অনেকটা নিঃসঙ্গ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এর উপর আর এক যন্ত্রনা, পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী কোপ, প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগলেন। ১৮৯০ সালে দুজনের ঝগড়া প্রায় জাতীয় কলঙ্কের স্তরে গিয়ে পৌছাল, মার্শের বয়স তখন প্রায় ষাট বছর।

১৮৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগটি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যেসব ভূতাত্ত্বিক জরীপ কার্য চলছিল, তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অপচয় রোধ করা। ক্লারেন্স কিং নামে সুদক্ষ ও উৎসাহী এক ব্যক্তিকে এ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি এ কাজ ছেড়ে দিয়ে খনির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। তখন তার বদলে মেজর জন ডব্লিউ পাওয়েলকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। এর কিছুকাল পর মার্শ সরকারীভাবে মেরুদণ্ডী প্রত্নজীববিদরূপে এই নতুন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর উপর ভার পড়েছিল ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইনস্‌টিটিউসনের জন্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে জীবাশ্ম সংগ্রহ করবার। তিনি তখনও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পীবডি মিউজিয়ামের জন্য জীবাশ্ম ও অন্যান্য প্রদর্শ বস্তু সংগ্রহের কাজ করেছিলেন।

ইউনাইটেড স্টেটস্ জিওলজিক্যাল সার্ভের অধ্যক্ষরূপে মেজর পাওয়েল কোপকে (তখন তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এক সময় লিখে পাঠিয়েছিলেন তাঁর জীবাশ্ম সংগ্রহ ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিতে। মার্শ এই প্রদর্শশালাটির প্রত্নজীববিদ্যা বিভাগের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কোপ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি হাইডেন ও হুইলার সার্ভের প্রধান প্রত্নজীববিদের কাজ করেছিলেন। এ দুটি জরীপ কার্যই সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর আমেরিকায় তখন পর্যন্ত যে ৩২০০টি প্রাগৈতিহাসিক মেরুদণ্ডী প্রাণীর

জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার একতৃতীয়াংশরই নামকরণ করেছিলেন তিনি। এই কাজে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের আশি হাজার ডলারেরও বেশী তিনি ব্যয় করেছিলেন। যেসব জীবাশ্ম তাঁর নিজের নিকট ছিল তার অধিকাংশই তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি তাঁর বসত বাড়ী পর্যন্ত বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি এই আদেশে মার্শ ও লাওয়েলের প্রতি দীর্ঘ সঞ্চিত ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

কোপ মার্শের বিরুদ্ধে শুধু অন্যের গবেষণালব্ধবিষয় চুরি, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা, ইয়েল প্রদর্শশালার জন্য সরকারী অর্থে ক্রীত জীবাশ্ম বেআইনী আত্মসাতের অভিযোগই আনলেন না। তিনি অন্য প্রত্নজীববিদের জীবাশ্ম সংগ্রহে মার্শের ঘোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগও আনলেন এই সঙ্গে। মার্শ নাকি তার জীবাশ্ম সংগ্রহকারী কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিলেন, যেসব জীবাশ্মের নমুনা তাঁর কাছে পাঠান সম্ভব হবে না সেগুলি যেন ভেঙ্গে ফেলা হয় যাতে সেগুলি অন্য প্রত্নজীববিদের হাতে গিয়ে পড়তে না পারে। ১৮৮২ সালে প্রিন্সটন কলেজের অভিযাত্রীদল যখন পশ্চিমাঞ্চলে জীবাশ্মের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন তখন 'মার্শ তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য ও অঞ্চলের জীবাশ্ম ক্ষেত্রের পথ প্রদর্শকদের নিজে ভাড়া করে আটকে রেখেছিলেন, যাতে অভিযাত্রীদল তাদের সাহায্যে না পেতে পারে।'

এছাড়া কোপ পাওয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তিনি কংগ্রেসের অনুমোদন সত্ত্বেও তাঁর প্রত্নজীববিদ্যার গবেষণামূলক রচনাবলী ছাপার কাজ স্থগিত রেখেছেন। পাওয়েলের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত ইউনাইটেড স্টেটস্ জিওলজিক্যাল সার্ভেকে তিনি 'দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী ট্যামনি দলের পদ্ধতি চালিত এক বিরাট একচেটিয়া রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থা' বলে আখ্যা দিলেন। অভিযোগ আনলেন যে, এই বিভাগের ছোট বড় চাকরিতে জাঁকিয়ে বসে আছেন কংগ্রেস সদস্যদের পুত্রগণ। এই সব কংগ্রেস সদস্যগণই প্রভাব বিস্তার করে এই বিভাগটির জন্য প্রভূত অর্থ মঞ্জুর করান। ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স এমন সব সদস্যে ভর্তি যাদের সমর্থন সম্বন্ধে পাওয়েল নিশ্চিন্ত। এই ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভাপতি ছিলেন মার্শ। মার্শের সততা ও উদ্দেশ্যে কলঙ্ক আরোপ করে তিনি অতি স্থূলভাবে তাঁকে সর্ব সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন কুৎসিৎ আক্রমণ আর কখনও ঘটেনি।

প্রত্নজীববিদদের নিজেদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী নিয়ে প্রকাশ্যে এই ঝগড়া বিবাদের মাঝে দেখা দিল কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে আত্মকলহ। জরীপ কার্যের অধ্যক্ষরূপে পাওয়েল একটি সেচ পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, যে সব সরকারী জমি এই সেচ পরিকল্পনায় চাষের জল পাবে সেগুলি বিক্রয় করে লাভবান হবার আশায় পাওয়েল সিনেটের উপযোজন সমিতির (Appropriation Committe) সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করবেন। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ পাওয়েল জন স্বার্থের খাতিরেই এই সেচ পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তাতে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় বরাদ্দের কথাও উঠল। সিনেটের কয়েকজন সভ্য অপ্রয়োজনীয় জীবাশ্ম সংগ্রহে এবং প্রত্ন-জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা পুস্তক প্রকাশের কাজে জনসাধারণের অর্থব্যয়ে আপত্তি তুললেন। এই বিতর্ক শেষে কংগ্রেস সদস্যদের দুই দলের কলহে পরিণত হল। একদল জমির জরীপ কার্য সমর্থন করতে লাগলেন। কিন্তু পাওয়েল ও মার্শের কাজ এরা সমর্থন করতেন না। অপর দিকে পশ্চিমাঞ্চলের সিনেটের সদস্যগণ পশ্চিমাঞ্চলের জমির উন্নয়ন ও জলসেচের ব্যবস্থা গ্রহণ সমর্থন করতে লাগলেন।

এই কোঁদলের পরিণাম দাঁড়াল এই যে সিনেটের উপযোজন সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরীপ সংস্থা অতিরিক্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অজুহাতে প্রত্নজীববিদ্যার গবেষণার জন্য আর অধিক অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করতে অস্বীকার করলেন। ১৮৯২ সালের ২০শে জুলাই মার্শকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরীপ সংস্থার প্রত্নজীববিদের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হল। এতে মার্শের আত্মসম্মান ও মর্যাদা গভীর আঘাত পেল। ব্যাপারটা এমন এক সময় ঘটল যখন সম্পত্তি থেকে তাঁর আয়ের পরিমাণ খুবই কমে এসেছে। এর ফলে পরবর্তী জীবনে তাকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হল। ইয়েলে তাঁর ঐ জমকালো বাড়ী তিনি বন্ধক দিতে বাধ্য হলেন। এখন থেকে তাঁকে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য বেতনও গ্রহণ করতে হল। এই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার পর এর আগে এই পঁচিশ বছর তিনি কোনও বেতন নেননি!

প্রত্নজীববিদ্যার যে সব জীবাশ্ম তিনি এ যাবৎ সংগ্রহ করেছিলেন আকৃতি অনুযায়ী সেগুলি যথাযথ পুনর্গঠিত করে এবং প্রত্নজীববিদ্যার তাঁর সংগৃহীত

উপকরণগুলির বিবরণী প্রকাশ করেই তিনি জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেন। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে 'ডাইনোসোরস অব নর্থ আমেরিকা' (Dinosaurs of North America) ও 'ভার্টিব্রেট ফসিলস্ অব ডেনভার বেসিন' (Vertebrate fossils of Denver Basin) নামক তাঁর দুখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও প্রায় তিন শত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন তিনি নিউইয়র্ক শহর থেকে ডিনার খেয়ে ফিরছিলেন। পথে ঝড় বর্ষা হয়। তার মাঝেই নিউ হ্যাভেন রেল স্টেশন থেকে হেঁটে তিনি বাড়ী ফিরছিলেন। বাড়ী এসে নিমোনিয়া দেখা দিল। কয়েক সপ্তাহ রোগ ভোগের পর তাঁর মৃত্যু হল। তখন তাঁর বয়স আটষট্টি বছর। মৃত্যুকালীন এই রোগ ভোগ ব্যতীত জীবনে কখনও আর তিনি রোগে ভোগেননি। দীপ্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি চিরকালই।

উইলে তিনি নিজের পরিবারের লোকজনকে কোনও অর্থ দিয়ে যাননি। নিজের বসত বাড়ীটি তিনি দান করে যান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাঁর উইল অনুযায়ী ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পেল দশ হাজার ডলার। উইলে ত্রিশ হাজার ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর প্রত্নজীববিদ্যার অভিযানের ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করবার জন্য। নিজের আজীবন সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি তিনি সবই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পীবডি মিউজিয়ামে দান করে যান। এগুলির আনুমানিক মূল্য প্রায় দশ হাজার ডলার। বিজ্ঞানের সেবায় মার্শ প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার ব্যয় করে গেছেন। মরবার সময় তাঁর হাতে নগদ অর্থ ছিল মাত্র ২০০ ডলার। বিত্তবান ব্যক্তির পক্ষে এমনিভাবে হাতে কলমে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চায় সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল।

॥ ১২ ॥

জে. উইলার্ড গিবস

(১৮৩৯-১৯০৩)

রসায়ন বিজ্ঞানের নতুন জগতে আমেরিকা

বিপুল ধনী মার্শ মেরুদণ্ডী প্রত্নজীববিদ্যার চর্চায় সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক বিচিত্র ঘটনা। কিন্তু তবু এ তাঁরই সহকর্মী উইলার্ড গিবস্-এর জীবন কাহিনীর চেয়ে বিচিত্রতর নয়। উইলার্ড গিবস মার্শের সঙ্গে ইয়েল কলেজে একত্র কাজ করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেঞ্জামিন টমসন প্রমাণ করেন যে তাপ এক ধরনের শক্তি। কামানের খোল খোদাই করার সময় যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে উৎপন্ন তাপের পরিমাণের সঠিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই সম্পর্কটিকে বলা চলে শক্তির যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক। ১৮৪২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট মাজের সর্ব-প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে শক্তির নিত্যতাবাদ বিবৃত করলেন। পদার্থবিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট সূত্রটি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে এসে পৌঁছাল। এই সূত্র অনুসারে, শক্তি সৃষ্টি করাও যায় না, আবার শক্তির ধ্বংসও নেই। কিন্তু শক্তিকে এক রূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তিত করা চলে। সর্ব প্রকারের শক্তিতেই, যেমন, তড়িৎ, আলোক, তাপ, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক—একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তর করা চলে। প্রবহমান নদীস্রোতের শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এই ভাবে উৎপন্ন তড়িৎ বিদ্যুৎবাহী তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাউরুটি সেঁকবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রে (ইলেকট্রিক টোস্টার) যেমন তাপ উৎপন্ন করে তেমনি বিজলী বাতির অত্যুজ্জ্বল আলোকদ্যুতিও সৃষ্টি করে। কয়লার রাসায়নিক শক্তি দহনক্রিয়ার ফলে তাপও আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

শক্তির বহুরূপ। তার মধ্যে একটি হল তাপ। তাপগতিবিদ্যা (Thermo dynamics) বিজ্ঞানের একটি শাখা। তাপ সংক্রান্ত সূত্র সমূহ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বিখ্যাত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ রুডলফ ক্লসিয়াস তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করেছিলেন: Die Energie der Welt ist konstant. (শক্তির পরিমাণ নিত্য)। ইনিই আবার এমনি সরল ভাবে এর দ্বিতীয় সূত্রটিও বর্ণনা করে গেছেন। সূত্রটির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি এমনি ভাবে: Die Entropic der Welt strebt einem Maximum zu. (বিশ্বের এনট্রপি সর্বোচ্চ মাত্রার দিকে বৃদ্ধি পাবার চেষ্টা করে)। এনট্রপি (Entropy) শব্দটির দ্বারা সেই চরম অবস্থা বোঝাচ্ছে, যে অবস্থায় এসে বিশ্বের সমগ্র শক্তি সমভাবে বণ্টিত হয়। জল যেমন সর্বদা উচ্চভূমি হতে নিম্নভূমির দিকে গড়িয়ে চলে, শক্তিও তেমনি সর্বদা উচ্চমাত্রা হতে নিম্নমাত্রার দিকে বয়ে চলে। উষ্ণবস্তু যে তাপ-বিচ্ছুরণ করে, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তু সে তাপ সংগ্রহ করে নিতে পারে। কিন্তু ক্লসিয়াস বললেন, '(বাইরের কোনও প্রকার সাহায্য ব্যতীত কোনও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে) কোনও শীতলতর বস্তু হতে তদপেক্ষা উচ্চতর তাপমাত্রা-যুক্ত বস্তুতে তাপ সঞ্চালিত করা অসম্ভব।' বিশ্বের সমুদয় শক্তির এমনি সমভাবে বণ্টিত হবার ফলে বিশ্বের এনট্রপি (Entropy) বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে এনট্রপি (Entropy) বৃদ্ধি পেতে পেতে তা এক সময় সর্বোচ্চ সীমায় এসে দাঁড়ায়, তখন শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উচ্চমাত্রা থেকে নিম্নমাত্রার দিকে শক্তিবিনিময় সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে এ অবস্থায় সুতীব্র শৈত্য দেখা দেবে। সেই প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে, পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমন অবস্থা অবশ্য দেখা দেবে কোটি কোটি বছর পর।

পাশ্চাত্যদেশসমূহে এ সময় দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটছিল। তার ফলে তাপ ও শক্তির সমগ্র প্রশ্নটি আরও ভাল ভাবে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই বাস্তব প্রয়োজন হতেই বাষ্পীয় এঞ্জিনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাপগতিবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটল। বাষ্পীয় এঞ্জিন কার্যতঃ তাপ চালিত এঞ্জিন। সাদি কার্নো নামে জনৈক তরুণ ফরাসী পদার্থবিদ বাষ্পীয় এঞ্জিন সংক্রান্ত তাপীয় সূত্র প্রথম রচনা করে বাষ্পীয় এঞ্জিনের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। পরে অন্য বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানের এই শাখাটির

প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং তাপগতিবিজ্ঞানকে, বাষ্পীয় এঞ্জিনে সর্বাধিক দক্ষতা আনয়নের অস্ত্ররূপে গড়ে-পিটে নিলেন। বাষ্পীয় এঞ্জিন নির্মাণে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-ভিত্তিক যে সব অনুমানের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হত, ক্লসিয়াস সেগুলি দূর করেন। এই ভাবে তিনি বাষ্পীয় এঞ্জিনের উন্নতিবিধানে তাপগতিবিজ্ঞানকে সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগালেন।

উইলার্ড গিবসও বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ বিভাগের চর্চার জন্য গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্রটির সম্প্রসারণই তার কাছে এই শাখার একটি চমৎকার গবেষণার বিষয় বলে মনে হল। বাষ্পের মত সমপ্রকৃতির পদার্থে এই দ্বিতীয় সূত্র ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। তিনি চাইলেন রসায়ন বিজ্ঞানের আরও জটিল ও বিভিন্ন উপাদানে এবং ধাতুবিদ্যায় ব্যবহৃত অসংখ্য ধাতুমিশ্রণে বা মিশ্রিত ধাতুর ক্ষেত্রে এই সূত্রের প্রয়োগ করতে।

কয়েক বছর গিবস চুপ করে রইলেন। এ সম্বন্ধে কোনও কিছু প্রকাশ করলেন না। শুধু চিন্তা করতে লাগলেন। মনে মনে বিষয়টা নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকেন, দৈবাৎ কখনও-সখনও দু একটা গাণিতিক সূত্র কাগজে লিখে রাখেন ভবিষ্যতের জন্য। তিনি বলতেন, গণিতও এক ভাষা। এই ভাষায় তিনি তার মনে যে নতুন বিজ্ঞান-চিন্তার উদয় হচ্ছিল তা প্রকাশ করতে পারবেন। তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র প্রণয়নে গাণিতিক প্রয়োজন হিসাবে এনট্রপি (Entropy) শব্দটি ইতিপূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছিল। গিবস ভাবছিলেন, এই শব্দটি গণিতেও ব্যবহার করা যায় কিনা। শব্দটি নানা উপাদানে গঠিত মিশ্র বস্তুর "মিশ্রিততার" দ্যোতক। এই ধারণাটিকে কতকগুলি রাসায়নিক সমস্যা সমাধানের গাণিতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিজের এই ধারণাগুলি নিয়ে অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে যে কোনও ফল হবে না, তা বুঝতে পারলেন গিবস্। সম্ভবতঃ তাঁর কথা তারা কেউ ঠিক মত ধরতে পারবেন না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জ্যোতির্বিদ হুবার্ট এ. নিউটনকে এ বিষয়ে কিছুটা বোঝাতে গিয়ে দেখলেন, বন্ধুবর যেন তাঁর গাণিতিক সূত্রের অরণ্যে পথ হারিয়ে বিপন্ন হয়ে উঠেছেন। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্ররা বাহ্যতঃ মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনত, কিন্তু তাঁর দুর্বোধ্য গাণিতিক সূত্র-কণ্টকিত বক্তৃতায় তাদের ভিতরে ভিতরে হাই উঠত। গিবস্

সযত্নে তাঁর ক্লাসের বক্তৃতা তৈরি করতেন, বক্তৃতাকালে পূর্ব গৃহীত কোন নোটের বিষয়বস্তু বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত না করলেও মনে হত যেন তিনি দুর্বোধ্য গণিতের ভাষায় কথা বলছেন।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল পর তিনি তাঁর গণিতের সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করতে বসলেন। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে তাঁর এই সূত্রগুলি রচিত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে তাঁর এই সূত্র রচনার কাজ শেষ হল। এবার তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভের আকারে এই তথ্য রচিত হয়েছিল। কানেটিকাট একাডেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সের সদস্যরূপে তিনি 'অন দি ইকুইলিব্রিয়াম অব হেট্রোজিনিয়াস সাবস্ট্যানসেস্ (On the Equilibrium of Hetrogeneous substances) নামক ১৪০ পৃষ্ঠায় এই সন্দর্ভটি ছাপবার জন্য সমিতির হাতে দিলেন। এরূপ বৃহৎ ও জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ মুদ্রণ বহু ব্যয়সাধ্য। দীর্ঘ আলোচনার পর সমিতি স্থির করলেন এই সন্দর্ভের মুদ্রণ ব্যয় সংগৃহীত হলেই এটি সমিতির মুখপত্রে ছাপা হবে। গিবসের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হতে শেষ পর্যন্ত এই অর্থ সংগৃহীত হল। সেই বছরের অক্টোবর মাস ও পরবর্তী বৎসরের মে মাসের মধ্যে রচনাটি সমিতির মুখপত্র 'ট্রানজাকসনস্'-এ প্রকাশিত হল। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক প্রয়োগ সম্পর্কিত গবেষণার এটি ছিল প্রথম অংশ। এই বিষয়েরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে ১৮১ পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় আর একটি সন্দর্ভ গিবস পরে প্রকাশ করেছিলেন।

কতজন বিজ্ঞানী তখন গিবসের এই প্রবন্ধগুলি পড়েছিলেন তা বলা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে কেউ তাঁর এই যুগান্তরকারী গবেষণামূলক সন্দর্ভ নিয়ে কোনও মাথা ঘামায়নি। পরের বছর (গিবসের বয়স তখন মাত্র চল্লিশ বছর) ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স তাঁকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছিলেন। দু'বছর পর আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সেস তাঁকে রামফোর্ড পদক দানে পুরস্কৃত করেছিলেন—এসবই সত্য। তা হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এই অতি-দুর্বোধ্য সন্দর্ভের মাঝে রচয়িতার কোনও প্রতিভার স্বাক্ষর পাননি তখন। তাই তাঁরা তখন এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কাজে লাগানোরও চেষ্টা করেননি।

কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মহলে এই গবেষণামূলক সন্দর্ভটি কিছুটা ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন ইংলণ্ডের সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল তখন লণ্ডনের ক্যাভেনডিস ল্যাবরেটরীর পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের ডাইরেক্টর। ১৮৭৩ সালে গ্রাফিক্যাল মেথড্ ইন দি থার্মো-ডাইনামিকস্ অব ফ্লুইডস্ (Graphical methods in the Thermo-dynamics of Fluids) এবং এ মেথড অব জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেনটেনসন্ অব দি থার্মো ডাইনামিক প্রপার্টিজ অব সাবস্ট্যানসেজ বাই মীনস অব সার্ফেসেস (A method of Geometrical Representation of the Thermodynamic Properties of Substances by means of Surfaces) নামে প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হবার পর থেকে ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল, কানেটিকাটের এই ইয়াঙ্কী বিজ্ঞানীটির গবেষণামূলক কাজ সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে, এবং তৎপরবর্তী কালে, 'ট্রানজাকসনে' প্রকাশিত গিবস-এর এই গবেষণামূলক নূতন প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি এত মুগ্ধ হলেন যে গিবস্-এর এই গাণিতিক সূত্র লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির সভ্যদের সভায় ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, 'যে সব সমস্যা, ইতিপূর্বে দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টায় আমরা সমাধান করতে পারিনি, এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের গাণিতিক সূত্রের ভিত্তিতে তা এখন সমাধান করা সম্ভব হবে।' তিনি গিবস্-এর এই গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁর 'থিয়োরী অব হিট' নামে পাঠ্যপুস্তকখানির নূতন সংস্করণের একটি অধ্যায়ে সংযোজিত করেছিলেন। নিজের হাতে গিবস-কল্পিত তাপগতিবিজ্ঞানসম্মত পৃষ্ঠতলের সুন্দর তিনটি প্লাসটিক মডেল নির্মাণ করেছিলেন। তার একটি পাঠিয়েছিলেন গিবসকে। একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আর একজন প্রতিভাবানকে এমনি ভাবে জানালেন তাঁর অন্তরের বিপুল শ্রদ্ধাঞ্জলি !

কিন্তু অল্পকাল পরই ১৮৭৯ সালে এক অতি যন্ত্রণাদায়ক রোগাক্রান্ত হয়ে সাতচল্লিশ বছর বয়সে ম্যাক্সওয়েল মারা গেলেন। ম্যাকসওয়েলের মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীই গিবসের এই জটিল সূত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতেন এবং বিজ্ঞানী মহলে নির্ভীক প্রত্যয়ে সোচ্চারে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারতেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে এবিষয়ে তাঁর মতামতের মূল্য ছিল সমধিক। ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুতে এমনি একজন মনীষীর কণ্ঠ অকালে স্তব্ধ হয়ে গেল। 'ট্রানজাকসনসের' পৃষ্ঠায় বন্দী হয়ে বৈজ্ঞানিক

গবেষণার এই অমূল্য সম্পদ তের বৎসর অজ্ঞাত, অবহেলিত পড়ে রইল। তারপর ১৮৯১ সালে জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী উইলহেলম অসওয়াল্ড গিবসের এই জটিল গবেষণাটির মর্মোপলব্ধি করতে পেরে 'ট্রানজাকসনসের' ধুলো জমা পৃষ্ঠা থেকে এটি উদ্ধার করলেন। গিবসের সম্মতি নিয়ে (এই সম্মতি দানে গিবস নিজে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।) তিনি প্রবন্ধটির একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই জার্মান বিজ্ঞানী ১৮৮৩ সালে সর্বপ্রথম আরেহনিয়াস প্রচারিত আয়নন তত্ত্বের (Ionization Theory) উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ১৮৯৯ সালে লা চ্যাটেলি নামে আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গিবসের এই প্রবন্ধটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯০৬ সালের আগে ইংল্যাণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়নি।

আমেরিকা ইয়েল কলেজের এই বিজ্ঞানী অধ্যাপককে উপেক্ষা করে চলল। গিবস সমকালীন বিজ্ঞানীদের মনে তাঁর নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ভাল ধারণার সৃষ্টি করতে পারেননি। যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের উচ্চতর মহলের অনেকের নিকটও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। গিবস যে মার্শের মত আত্মপ্রচারকামী, বা আগাসিজের মত বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গিবস ছিলেন নম্র, লাজুক অধ্যাপক। নিজের গবেষণার কাজ নিজে একাই করতে ভালবাসতেন। অন্য পাঁচজনের মধ্যে তা ভাগ করে দেবার, পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানে নিজস্ব বিশেষ চিন্তাধারা অনুগামী দল গঠনের চেষ্টা তিনি করেননি। বস্তুত যে সব বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন সে সম্বন্ধে অন্য কাউকে বিশেষ করে তাঁর স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের বিশ্বাস করে কিছু না বলার জন্যই বিজ্ঞানী সমাজ প্রথম দিকে তাঁর বিরাট প্রতিভার কোন ইঙ্গিত পায়নি, এবং এইজন্য তিনি এসময় অখ্যাত ও অবজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিলেন। কেন গিবস তার গবেষণার বিষয়বস্তু সহকর্মী বা ছাত্রদের বলেননি? মনীষী গিবস যে, তার আশেপাশের এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিবর্গ তার দুরূহ চিন্তাধারার মর্মোপলব্ধি করার অযোগ্য, একথা মনে করে বা ভয় বা ঈর্ষা বশতঃ তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় গোপন রেখেছিলেন, তা নয়। আসলে তাঁর প্রকৃতিতে ছিল পরম অনাসক্তি। যশ বা গৌরবের প্রতি ছিল তাঁর অসীম নিস্পৃহতা। তাই গবেষণার বিষয় তিনি আগে কাউকে বলেননি।

বিজ্ঞানীরা কেন গিবসের প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতিভা

স্বীকার করে নেননি, বা গিবস-প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রের এই হাতিয়ার তাদের কাজে লাগাননি, তার আরও অন্য অনেক কারণ আছে। তার সন্দর্ভগুলি সুখপাঠ্য ছিল না, বরং ছিল খুবই দুর্বোধ্য। বক্তব্য বিষয়ের কেবলমাত্র রূপরেখা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার সৌষ্ঠববৃদ্ধি ও প্রয়োগের কাজ অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে গেছেন। প্রবন্ধে এমন কোনও বিশেষ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেননি যা অন্যের পক্ষে সহজে অনুধাবন করা চলে। কিন্তু গণিতের ভাষায় তিনি যে সব সূত্রের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা অবশ্য সহজে পরীক্ষা করা সম্ভব। অনাদরের সব চেয়ে বড় কারণ হল এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে এসময় পদার্থ-রসায়নের উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান ছিল না। আমেরিকার রসায়ন শিল্পের তখন এমন উন্নতি হয়নি যে সে শিল্প তখন উইলার্ড গিবসের এই যুগান্তরকারী গবেষণার সুফল গ্রহণ করতে পারে। ভৌত রসায়ন বিজ্ঞান, ধাতু বিদ্যা, তড়িৎ-রসায়ন বিজ্ঞানের নানাবিধ সমস্যা গিবসের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয় ছিল। শ্রমশিল্প তখনও বিজ্ঞানের এই শাখাগুলির সাহায্য নিতে শুরু করেনি।

শিল্পোৎপাদনের উন্নতি সাধনে ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণা যে অতি মূল্যবান সাহায্য দান করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিগণ তখনও তা বুঝে উঠতে পারেননি। রসায়ন শিল্পে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে তখন সবে মারাত্মক আঘাত হানতে শুরু করেছে। দূরদর্শী প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাতে হটে যেতে না হয়, তারজন্য তাদের আয়োজিত নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে তাল রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমেরিকার শিল্পপতিগণ বহুদিন এ বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তখনও তারা এসত্য উপলব্ধি করতে পারেননি যে রসায়ন বিজ্ঞানের জাদুতে পণ্যোৎপাদনের নূতন বৈপ্লবিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে পারে, বা সম্পূর্ণ অভিনব কোনও পণ্য আবিষ্কৃত হতে পারে যা হয়ত পুরাতন শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি বা পণ্যকে রাতারাতি হটিয়ে দেবে। শ্রম শিল্পের প্রয়োজনে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই নিষ্ক্রিয়তা ও আলস্যের ফলে রাসায়নিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে গিবস যে সব সূত্রাবলীর নির্দেশ দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বিজ্ঞানীই তা নিয়ে কোনও গবেষণায় ব্যাপৃত হননি। গিবসের মূল্যবান সন্দর্ভ অনাদরে অবহেলায় লাইব্রেরীর তাকে ধুলি সঞ্চয় করছিল।

গিবস তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে রাসায়নিক মিশ্রণ কালে বিভিন্ন বস্তুর সাম্যস্থিতি সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। রসায়ন দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বহু সমস্যার সমাধানের অতি চমৎকার ইঙ্গিত মেলে এই প্রবন্ধে। এ এক অতি বিস্ময়কর কৃতিত্ব। রাসায়নিক দ্রবণ (সলুসন) ও মিশ্রিত ধাতু প্রভৃতির মিশ্রণের সাম্যস্থিতির জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিবস তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী কতকগুলি গাণিতিক সূত্রের নির্দেশ দেন। এগুলিকে বলা হয় 'পর্ব প্রণালী' (Phase Rule)। পর্বপ্রণালীর গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট মিশ্রিত বস্তুতে ব্যবহার্য বিভিন্ন উপাদানের সঠিক ঘনত্ব পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এই সূত্রের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট মিশ্রিত বস্তু প্রস্তুতের উপযোগী সর্বোত্তম তাপমাত্রা ও চাপের নির্দেশ পাওয়া সম্ভব হল। এই তাপমাত্রা ও চাপে মিশ্রিত বস্তুটির বিভিন্ন উপাদানে পারস্পরিক সাম্যস্থিতি বজায় থাকবে, এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশ্রিত বস্তুটি নষ্ট করে দেবে না। এই পর্ব প্রণালীর সাহায্যে কোনও গবেষকের পক্ষে, কোনও যৌগিক লবণ বা ধাতুর এক বা একাধিক উপাদান যে অবস্থাধীনে পৃথক করা যায় তা আগে থেকেই হিসাব করা সম্ভব হল। এইভাবে, কোনও মিশ্র বস্তুর বিভিন্ন উপাদান বিচ্ছিন্ন করার সাফল্যজনক পদ্ধতি অবিষ্কারের সময় বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণাগারে যে বিষয় নিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষা চালাতে হত, তাঁরা সে দায় হতে অব্যাহতি পেলেন। পর্ব প্রণালী তাই বিজ্ঞানীদের সময় বাঁচানোয় খুবই সাহায্য করল। মাঝে মাঝে এ থেকে এমন অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত মিলতে লাগল, যে সমস্যাগুলির সমাধান বার করা ইতিপূর্বে প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল।

জন ডি ভ্যান ডার ওয়ালস্ নামে একজন বিখ্যাত ওলন্দাজ পদার্থ বিজ্ঞানী আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যাসের সাম্যস্থিতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। ইনি গিবসের গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পড়ে, তৎক্ষণাৎ তার অসীম মূল্য বুঝতে পারেন। প্রবন্ধটির প্রতি তিনি তাঁর স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন বাকুহিজ রুজেবুম নামে জনৈক ওলন্দাজ রসায়ন বিজ্ঞানী ইস্পাতের (কার্বন ও লৌহের মিশ্র ধাতু) উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। গিবস যে সূত্র দিয়েছিলেন, রুজেবুম তা লুফে নিলেন। এই সূত্রের সাহায্যে তিনি মিশ্র ধাতু ইস্পাতের বিভিন্ন উপাদানের গঠন-সৌকর্য স্পষ্ট ভাবে ধরতে পারলেন।

পর্ব প্রণালীর আর একটি প্রয়োগ দেখা দিল শ্রম শিল্পে, অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতের ক্ষেত্রে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন, এই দুইটি মূল উপাদান হতে অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) প্রস্তুত হয়। বাজারে বিক্রয়ের জন্য কারখানায় যন্ত্র সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উৎপাদন করতে গিয়ে দেখা গেল যে উৎপাদন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করতে অ্যামোনিয়া গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানে বিয়োজিত হয়ে মূল উপাদানে পরিণত হওয়া বন্ধ করা প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক ফ্রিৎস হাবেরের উপর এই সমস্যা সমাধানের ভার দেন। অ্যামোনিয়া গ্যাসের এই বিয়োজন রোধ করতে পারলে, কারখানায় প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদন সম্ভব হবে। এই অ্যামোনিয়া গ্যাসকে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করে, সেই নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে আবার তৈরি করা যাবে নাইট্রোগ্লিসারিন। এই জিনিসটি কামানের গোলা ও বোমার অতি বিস্ফোরকরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার এই অ্যামোনিয়া গ্যাস দিয়েই তৈরি করা যায় রাসায়নিক সার প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় নাইট্রেট। হাবের পর্বপ্রণালীর সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাসের ভাঙ্গন রোধের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। অধিক পরিমাণে অতি-বিস্ফোরক পদার্থ ও রাসায়নিক সার উৎপন্ন করতে পেরে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে খাদ্য-সরবরাহ বাড়ান সম্ভব হয়েছিল, মিত্রশক্তি যতদিন আশা করেছিল, তার চেয়েও বেশী দিন তারা (জার্মানরা) পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ইংরাজরাও গিবসের গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করেছিল। গিবসের সূত্র যে উন্নততর পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিল, তা অনুসরণ করেই প্রথম মহাযুদ্ধ কালে তারা প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। আবার, গিবসের এই গণিতিক সূত্রের সাহায্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়ার্লিস লেকের প্রচুর পটাস ও অন্যান্য রাসায়নিক লবণ কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানী লরেন্স হেনডারসন ও ডোনাল্ড ডি ভ্যান স্লিক রক্ত ও কলাতে (Tissue সূক্ষ্ম, বস্ত্রবৎ বোনা বা গ্রথিত কোষ সমূহ) বিভিন্ন সল্টের সুস্থিতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে গবেষণা করেন তার দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। এই আমেরিকান বিজ্ঞানীদ্বয় তাঁদের গবেষণা কার্যে পৃষ্ঠটান, আধাভেদ্য ঝিল্লি ও আস্রাবণ সংক্রান্ত চাপ সম্বন্ধে গিবসের গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। যে পদ্ধতিতে সিরাম (টিকায় ব্যবহৃত রক্তের

জলীয় অংশ) শোধিত হয় ও রক্তের প্লাজমা (রক্তরস) উৎপাদন করা হয়, তাও গিবস প্রথমে যে নির্ভুল ও সুস্পষ্ট গাণিতিক সূত্রের নির্দেশ দেন তা থেকে উদ্ভূত।

যে সব পদার্থ বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষা ও মৌলিক গবেষণার দ্বারা আঠারো ও উনিশ শতকের বিজ্ঞানে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তাঁদের প্রথম দশ জনের মাঝে গিবসকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। নিঃসন্দেহে তিনি আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও (১৯০৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়) বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে প্রায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ছিলেন।

উইলার্ড গিবসের পূর্বপুরুষ ১৬৫৮ সালে আমেরিকায় এসে বস্টন শহরে বসতি স্থাপন করেন। পর পর ছয় পুরুষ ধরে এই পরিবারের ছেলেরা অবিচ্ছিন্ন ধারায় ইয়েল ও হার্ভার্ড কলেজে শিক্ষালাভ করেন। উইলার্ডের পিতা জোসিয়া গিবস ছিলেন ইয়েলের ডিভিনিটি স্কুলের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম সাহিত্যের অধ্যাপক। গভীর পাণ্ডিত্য ও তুলনামূলক ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল।

উইলার্ডের মা মেরি ভ্যান ক্লীভ ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক ও অছির কন্যা। উইলার্ড মায়ের চতুর্থ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র। ১৮৩৯ সালে নিউ হ্যাভেনে তাঁর জন্ম হয়। নামকরণের সময় তাঁর পুরো নাম রাখা হয়েছিল জোসিয়া উইলার্ড। নামের এই উইলার্ড কথাটা গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের পরিবারের একজন বিখ্যাত পূর্বপুরুষের নাম থেকে। এর নাম ছিল সামুয়েল উইলার্ড। ইনি ১৭০১ সালে হার্ভার্ড কলেজের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের কাজ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কর্তা রূপে দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন ও কার্যনির্বাহের অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর। বালক উইলার্ড পূর্ব পুরুষদের পাণ্ডিত্যের ধারা পেলেও বংশধর্ম সঞ্চরণ-কারী জিনের বণ্টনের হের-ফেরেই সম্ভবতঃ এই বিখ্যাত পূর্বপুরুষের কার্য নির্বাহী ও পরিচালন গুণাবলীর কিছুই পান নি। ১৮৫৮ সালে উনিশ বছর বয়সে তিনি স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উপাধি গ্রহণ কালে তিনি লাতিন ভাষায় ভাষণ দেন। উইলার্ডের সর্ব শাস্ত্রে সমান পাণ্ডিত্য ছিল। শুধু গণিতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্যই তিনি পুরস্কার পান নি, পুরস্কার পেয়েছিলেন লাতিন গ্রীক ভাষাতেও। এর একটি পুরস্কারের শর্ত ছিল

পুরস্কার-প্রাপ্ত ছাত্রকে ইয়েল কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে। তাই গিবস বেঞ্জামিন সিলিম্যান (জুনিয়ার) ও হুবার্ট এ. নিউটনের অধীনে এখানে পড়াশুনা করতে লাগলেন। হুবার্ট এ. নিউটনের সঙ্গে তিনি উল্কাপাত পর্যবেক্ষণ করবার জন্য প্রায়ই কানেটিকাট একাডেমীতে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে কাটাতেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হবার দু সপ্তাহ আগে উইলার্ড গিবসের পিতা মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি ৩৮০০০ ডলারের সম্পত্তি রেখে যান। এর সাহায্যে তরুণ উইলার্ড লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন। এর পর তিনি প্রথম ইয়েল কলেজে লাতিন ভাষার টিউটরের (শিক্ষকতার) কাজ পান। পরে পান পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতার পদ। আমেরিকায় তখন সম্পূর্ণ ভাবে স্নাতকোত্তর গবেষণায়, বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এই সব ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমেরিকা থেকে দলে দলে ছাত্র যেত ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে। সেই ছাত্র ধারায় যোগ দিয়ে ১৮৬৬ সালে গিবসও গেলেন ইউরোপে। অবশ্য ১৮৬৩ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান শ্রমশিল্পের মালিকদের পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্তিত নূতন পাঠক্রম চালু হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ছাত্রদের পাঠ্য-বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তা হলেও তখন মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানের ছাত্রদের ইউরোপে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের কথাই প্রচলিত ছিল।

প্রায় তিন বছর ধরে প্যারিস, বার্লিন ও হাইডেল বার্গে সেরা গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করলেন গিবস। বিদ্বজ্জনসুলভ তীক্ষ্ণ নিষ্ঠা নিয়ে তিনি আলোক, তাপ, বিদ্যুৎতাপগতি বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিতের আধুনিকতম উন্নতি পর্যবেক্ষণ করলেন, অভিনিবেশ সহকারে সে সব শিক্ষা আত্মসাৎ করে নিলেন নিজের মাঝে। এই ভাবে নিঃশব্দে তার মাঝে গড়ে উঠল এক নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি। পরে, নিউ হ্যাভেলে এই ভিত্তিভূমির উপর তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গবেষণার সৌধ। এই বিদ্যার্জন কালে উইলার্ড গিবস খুবই খুশী হয়েছিলেন। এই কাজে এসময় খুব ব্যস্তও ছিলেন তিনি। ১৮৬৪ সালে তাঁর ছোট বোন মারা যায়। তাঁর সঙ্গে রইল

আর দুই বোন, অ্যানা ও জুলিয়া। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারিক ও তাঁর সহপাঠী এডিসন ভ্যান নেম ১৮৬৭ সালে বার্লিনে এলেন জুলিয়াকে বিবাহ করতে।

ইউরোপ থেকে ১৮৬৯ সালের জুন মাসে গিবস নিউহ্যাভেনে ফিরলেন। তিনি ইউরোপে যাবার পর থেকে আমেরিকার সমাজজীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়েছিল। সনাতন রীতি বাতিল করে দিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে একজন তরুণ রসায়নবিদকে নিযুক্ত করেছিল। শিল্পায়িত নতুন যুগের চাহিদা মেটাতে পাঠ্য ব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ইয়েল কলেজের অছিবৃন্দও। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল না, কিন্তু শিক্ষা সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি কমিটি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর আরও জোর দেবার এবং শিল্প-সমৃদ্ধ নতুন যুগের আমেরিকায় গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার সুপারিশ করেন। এই কমিটির সভ্যদের মধ্যে হুবার্ট নিউটন, এডিসন ভ্যান নেম, এবং জেমস ডানাও ছিলেন।

ইয়েল কর্পোরেশন এই সুপারিশ গ্রহণ করেন। ১৮৭১ সালে উইলার্ড গিবস আমেরিকায় প্রথম গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। সেই বছরই তরুণ ক্লার্ক ম্যাকস্‌ওয়েল ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের গাণিতিক পদার্থ বিদ্যার অনুরূপ একটি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বছরে এমনি গাণিতিক পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হওয়া কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। শিল্পায়নের যুগে, আমাদের নতুন মিলমালিক ও শিল্পপতিগণ যে তাপ ও তড়িৎ বিজ্ঞানের আরও অধিকতর ও পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ও উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই নতুন সৃষ্টিতে তারই স্বীকৃতি মেলে। এই নতুন শিল্পপতি ও মিলমালিকের দলই তখন ক্রমে ক্রমে আমাদের কলেজ-সমূহের পরিচালক সমিতিগুলি থেকে যাজক ও ব্যবসাদারদের অপসারিত করে পরিচালন কর্তৃত্ব অধিকার করছিলেন। গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই নতুন পদসৃষ্টি যুগের চাহিদাই প্রতি ফলিত করেছিল। ঠিক এই কারণেই

দুশ বছর আগে, নৌ চালনা বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল।

বত্রিশ বছর ধরে গিবস এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সত্যসত্যই এই অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়েই গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিত ও পরে তাপগতিবিজ্ঞান ছাড়াও আলোকতত্ত্ব, শব্দ, কৈশিকতা, তাপ, চুম্বকত্ব, এবং তড়িৎ সম্বন্ধেও পড়াতেন। জ্ঞানসাধকের মতই তিনি সারা জীবন বিদ্যা চর্চা ও শিক্ষাদানে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তিনি ইয়েল ম্যাথামেটিক্যাল ক্লাব সংগঠন করেছিলেন। ক্লাবের সভ্যদের সভায় "দি পেসেস অব এ হর্স" (The Paces of a Horse) শীর্ষক একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। গিবস অশ্বচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশে বহু সময় ঘোড়ায় চড়ে কাটাতেন। গিবস, তাঁর বোন অ্যানা, অন্য বোন জুলিয়া ও তাঁর স্বামী সহ হাই স্ট্রীটে তাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করতেন। বাড়ীটা স্লোয়ান ফিজিকস্ ল্যাবরেটরীর ঠিক বিপরীত দিকে। এই ল্যাবরেটরীতে গিবস-এর ছোট্ট একটি অফিস ছিল। এখানে তিনি সকালে আসতেন, পাঁচছয় জন স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সামনে দিনে আধ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় বক্তৃতা দিতেন। তারপর লাঞ্চ খাবার জন্য হেঁটে বাড়ী ফিরে যেতেন। ল্যাবরেটরীতে ফিরতেন প্রায় দুপুর একটার সময়। তারপর নিজের কামরায় বসে পরের দিনে ক্লাসের বক্তৃতা তৈরি করতেন। মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য কাছাকাছি একটু হেঁটে চলে, বিকাল পাঁচটা নাগাদ বাড়ী ফিরতেন।

১৮৭৯ সালের শেষের দিকে, তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পর, নব-প্রতিষ্ঠিত জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরের বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট তাকে সেখানে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রন জানান। পদটি খুবই লোভনীয় এবং গৌরবজনক। এদেশে গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছিল অতি ধীরে ধীরে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞের বিশেষ অভাব ছিল। কারণ দেশের সেরা গণিতবিদদের, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত জরীপ ও পূর্ত কর্মে টেনে নেওয়া হয়েছিল। জনস হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রেসিডেণ্ট সিলম্যান এই গণিতশাস্ত্রের এই দুর্বলতা ধরতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন গণিতবিদকে আনান। এর নাম জেমস জে. সিলভেস্টার। ইনি জাতিতে ইহুদী। ১৮১৪ সালে লণ্ডনে জন্ম। বাষট্টি বছর বয়সে ইনি জনস্ হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে যোগদান করেন। এর কিছুকাল পর ইনি আমেরিকান জার্নাল অব ম্যাথামেটিকস্ নামে পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। নতুন বীজগণিত তখন এদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত। গিবস এই বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণার কাজ করছিলেন। তিনি শুধু একজন বিশিষ্ট গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তখনকার দিনে এদেশের বা বিদেশের প্রায় যে কোনও বিশিষ্ট গণিতবিদের সমতুল্য ছিলেন। সিলভেস্টার এমন এক ব্যক্তিকে তাঁর গণিত বিভাগে আনার সুফলের সম্ভাবনা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই গিবসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার প্রস্তাব হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তার পর গিবস জনস্ হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। 'কারণ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী মহলে আমার ইয়েল পরিত্যাগে অভাবিত বিরোধিতা দেখা দিয়েছে।'

১৮৪৩ সালে আয়র্ল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ উইলিয়াম আর. হ্যামিলটন কোয়াটারনিয়ন (Quaternion, জ্যামিতিক সমাকলণ বিশেষ) পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতি বিশ্বের গণিতবিদ মহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। হ্যামিলটন মনে করতেন এই জ্যামিতিক সমাকলণ পদার্থ বিজ্ঞানে নানা সমস্যা সমাধানে সমর্থ হবে। গিবস এ পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কিন্তু তিনি এটিকে তাঁর পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে প্রয়োগের উপযোগী মনে করতে পারেন নি। তিনি নিজস্ব সমাকলন পদ্ধতি প্রণয়ন করেছিলেন। 'এলিমেণ্টনস্ অব ভেক্টর অ্যানালিসিস (Elements of Vector Analysis) নামে এই তথ্য পুস্তকখানি ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সালে তাঁর ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ছাপা হত। গিবসের 'ভেক্টর অ্যানালিসিস্' ক্রমে ক্রমে কার্যকরী ফলিত বীজগণিতরূপে হ্যামিলটনের কোয়াটারনিয়নের স্থান গ্রহণ করে।

হ্যামিলটনের সমাকলন পদ্ধতির সর্বপ্রধান সক্রিয় সমর্থক ছিলেন পি. জি. টেইট। ১৮৯০ সালে তিনি কোয়াটারনিয়নের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গিবসের ভেক্টর অ্যানালিসিসকে ক্লীবত্বময় অস্বাভাবিক বস্তু বলে আখ্যা

দিলেন। এই মন্তব্যের প্রতি গিবসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তাঁর এই সমালোচনার উত্তর দানের প্রয়োজন দেখা দিল। জীবনে এই প্রথম তাঁর এমনি সমালোচনার জবাব দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। এ সম্বন্ধে যে বিতর্কের সূত্রপাত হল তাতে গিবস যোগ দিলেও কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মনে টেইটের প্রতি কোনও বিদ্বেষভাব ছিল না। কিংবা তিনি নিজের ভাবধারার অগ্রগণ্যতা দাবী করেন নি, বা, কোনও উন্নততর পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করছেন এমন মনোভাবও দেখান নি। নিজের পদ্ধতি যে নির্ভুল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন গিবস। এই বিতর্ককালে তিনি শুধু চেয়েছিলেন তাঁর পদ্ধতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে। নেচার নামে পত্রিকা-খানিতে একখানি চিঠি পাঠিয়ে তিনি নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন। এই চিঠিতে তাঁর সমালোচকের প্রতি ক্রোধ বা নিন্দাসূচক একটি কথাও ছিল না। দুই বছর পর্যন্ত সমানে সবিক্রমে বিতর্ক চলতে থাকে। ১৮৯৩ সালের মার্চ মাসে তাই গিবস 'নেচার' পত্রিকায় পুনরায় একখানি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'কোনও সংস্কারের সাফল্য নির্ধারণের দুটি পন্থা আছে। প্রথম পন্থা হল সংস্কারকদের বাঁধা বুলি কত জনে কপচাচ্ছেন তার সংখ্যা গণনা করা। দ্বিতীয় পন্থা হল সংস্কারকদের প্রচারিত মূলনীতির দ্বারা সমাজের কত লোকের মন কতখানি অনুরঞ্জিত হয়েছে তার হিসাব নেওয়া। আমি ব্যাপকতর পন্থা প্রয়োগ করতে চাই।'

গিবস অন্ধ আনুগত্য ঘৃণা করতেন। ঐ পত্রেই তিনি লিখেছিলেন, 'অধ্যাপক টেইক যাকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করেন তাঁর প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্যের আমি প্রশংসা করি। সেই আনুগত্য থেকেই তিনি এমন ভাবে লিখে গেছেন যেন সব কিছু তথ্যই বিখ্যাত ক্রহাম ব্রিজে হ্যামিলটনের মনে উদয় হওয়া ভাবের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। ঐতিহাসিক সুবিচারের দাবীর কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের জ্ঞানসাধক মনীষী ও শিক্ষাগুরু এদের উভয়ের প্রতিই আমাদের কর্তব্য রয়েছে। আর পৃথিবীও খুবই বিশাল, আধুনিক মানুষের চিন্তাধারাও এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা কোনও হ্যামিলটনের আপ্ত বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।'

প্রখ্যাত মনীষীর চরিত্রমাধুর্য ও সূক্ষ্ম সুরুচিবোধ নিয়ে, বিনা জাঁকজমক ও সোরগোল না তুলে আপন নিজস্ব পথে গিবস অনেক দুর্দান্ত পণ্ডিতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে, তাদের গৌরব ধুলিসাৎ করেছেন, আবার নিজের "ত্রুটি এবং

বিভ্রান্তি"ও স্বীকার করে গেছেন। যেখানে মূলসূত্র বা মূলতত্ত্বের প্রশ্ন জড়িত সেখানে তিনি আর শান্ত বিনম্র বা সুপ্রতিষ্ঠিত পাণ্ডিত্যের শক্তি-ভীত অধ্যাপক নন। সেখানে তিনি সর্বদা নির্ভয়ে, প্রসন্ন, মধুর, বিদ্বেষহীন চিত্তে, সত্যের সমর্থনে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু কখনও কোনও কটূক্তি বা রূঢ় ভাষার আশ্রয় নেন নি। জীবনে সবচেয়ে রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন ১৮৯৩ সালে অধ্যাপক নট লিখিত একটি পত্রে ব্যক্ত সমালোচনা ও ব্যাঙ্গোক্তির প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে। ঐ উপলক্ষে গিবস বলেছিলেন, তিনি তার সমালোচকদের "অবিশ্বাস্য গোয়ার্তুমি" দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন।

রাসায়নিক সাম্যস্থিতিতে প্রযুক্ত তাপগতিবিদ্যা সম্পর্কিত শেষ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পর চৌদ্দ বছর পর্যন্ত গিবস তাপগতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আর কোন প্রকার গবেষণায় মনোনিবেশ করেননি। এমন কি এবিষয়ে কলেজের ছাত্রদের সামনে পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত বক্তৃতাও দেননি। আলোকের প্রকৃতি ও গতিবেগ নির্ধারণের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানী মহল বহুদিন ধরেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী এবিষয়ে গবেষণায়ও নিযুক্ত ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের সকল সমস্যা ও পরিস্থিতির প্রতি গিবসের জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। আলোকের প্রকৃতি উদঘাটন ও গতিবেগ নির্ণয় সমস্যার প্রতি তিনিও আকৃষ্ট হলেন। ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে তিনি আলোকের প্রকৃতি যে তড়িচ্চুম্বকধর্মী—এই মত ব্যক্ত করে আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর দীর্ঘ দশ বছর ধরে তাঁর আর কোনও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি।

এই দশকে বিকিরণ ও জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ঘটছিল। উইলিয়াম কনরার্ড রনটজেন রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করলেন। হেনরি বেকুয়েল পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পেলেন। কুরি দম্পতির গবেষণা ও রেডিয়াম আবিষ্কারে তেজস্ক্রিয়তার রহস্য সুস্পষ্ট ভাবে উদ্‌ঘাটিত হল। পিটার জীম্যান চুম্বক প্রভাবিত আলোক প্রতিক্রিয়া (Magnets optic effect) আবিষ্কার করলেন। জে. জে. টমসন তড়িৎ কণিকা সম্বন্ধে গবেষণা কালে প্রায় সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য নলের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ করছিলেন। এই পরীক্ষা থেকে ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এবং জড় পদার্থ যে তড়িৎকণিকাযুক্ত পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত এই

মতবাদ প্রচারিত হতে শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষের দিকে তেজের প্রকৃতি সম্বন্ধে ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্কের যুগান্তরকারী মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে। প্লাঙ্কের মতে কাজ হল বিভিন্ন কণিকা বা কণিকাদলের সমষ্টি (Quanta of energy)। বিজ্ঞান জগতে যখন এই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রচারিত হচ্ছিল তখনও গিবস কোনও নতুন কিছু প্রকাশ করলেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন যে বিজ্ঞানে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনও মৌলিক তথ্য তিনি প্রকাশ করতে পারছেন ততক্ষণ তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করবেন না, এই ছিল তাঁর মনোভাব।

১৯০১ সালে। ঠিক যে সময় লণ্ডনের রয়েল সোসায়িটি তাপ গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র সর্বপ্রথম রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও তাপশক্তির মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনার কাজে বিস্তৃত ভাবে প্রয়োগ করার এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশংসনীয় অবদানের জন্য গিবসকে কোপলি পদক দিয়ে পুরস্কৃত করতে উদ্যত হয়েছেন, সেই সময়ই গিবস তাঁর শেষ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কীর্তি রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে গিবসের তৎকালীন ছাত্র ই. বি. উইলসন বলেছেন, অধ্যাপক গিবস তাঁর 'দি এলিমেণ্টারী প্রিন্সিপলস অব স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস্' (The Elementary Principles of Statistical Mechanics) নামক গ্রন্থখানি লেখার কাজ মোটামুটি নয় মাসের মধ্যে শেষ করেন। এই সময়ে তিনি আবার নিয়মিত অধ্যাপনাও করেছেন।

আর্থার হাস বলেছেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থখানি 'পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর ভেদরেখা।' ১৯০১ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পরই পদার্থ বিজ্ঞানে বিংশ শতাব্দীর সূচনা হয়েছিল। তারপর থেকে স্টাটিস্টিক্যাল মেকানিকস্ সম্বন্ধে বিপুল পরিমাণ গবেষণা হয়েছে। তবু আজও গিবসের সেই পুরানো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিকসই কোয়ানটাম স্ট্যাটিস্টিকস্ (কোয়ানটাম সংখ্যাতত্ত্ব) ও কোয়ানটাম মেকানিকস্-এর (কোয়ানটাম বিদ্যা) নতুন সাজপোশাকে ফিরে এসে জড় প্রকৃতি ও বিকিরণের বহু সমস্যা ব্যাখ্যার কাজে শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে কাজ করছে।

উইলার্ড গিবস কখনই সবল ও বলিষ্ঠদেহের অধিকারী ছিলেন না। ছেলেবেলায় একবার তিনি প্রবল হামজ্বরে ভুগেছিলেন। সেই হাম জ্বরই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে চিরকালের মত দুর্বল ও ক্ষীণজীবী করে

তুলেছিল। শান্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত জীবনযাপনের ফলেই মৃত্যুর আগে সামান্য কয়েকদিন ছাড়া কোনও বড় রকমের অসুখে না ভুগে তিনি জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চৌষট্টি।

মহান বিজ্ঞানী গিবস বিবিধ ধাতু মিশ্রণ ও দ্রবণে বিভিন্ন সল্টের মিশ্রণ কার্যের মধ্যে শৃঙ্খলার অনুসন্ধান করে গাণিতিক সূত্রে সে নিয়ম-শৃঙ্খলার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতি সঞ্জাত বিভ্রান্তির মাঝে সুশৃঙ্খল ও সুসম্বন্ধ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যে আমেরিকা সংগ্রাম করে চলেছিল তিনি সেই আমেরিকার মূর্ত প্রতীক। যে সব শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশিল্পে অভূতপূর্ব পরিবর্তন বয়ে আনছিল গিবসকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এই সব শক্তির অচেতন যন্ত্রী। গিবস যে তাঁর বিখ্যাত গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন একথা একেবারে প্রবাদের মত প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর বন্ধু চার্লস এ পিয়েস´ লিখেছেন, গিবসের এই প্রবাদীয় নিস্পৃহতা বিশ্বাস করার অর্থ হবে তাকে 'একটি প্রতিভাবান নির্বোধ মনে করার সামিল। এই নির্বোধটি পেরিগোর্ডের শূকরের মত আপন মনে গণিতিক ছত্রাক তুলে চলেছিল, এগুলি যে তার কোনও কাজে লাগতে পারে এবিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।'

ছাত্রজীবনেও গিবস আমেরিকার ভবিষ্যৎ যন্ত্রযুগের কথা চিন্তা করে গেছেন। ১৮৬৩ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভের জন্য তিনি প্রথম যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন তার বিষয়বস্তু যে ছিল অত্যন্ত আধুনিক 'অন দি ফর্ম অব দি টিথ অব হুইলস ইন দি স্পার গিয়ারিং' (On the forms of the Teeth of Wheels in the Spur Gearing) এটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার নয়। যে যন্ত্রের চাকা ও দাঁড়ওয়ালা ইস্পাতের গীয়ার আমেরিকাবাসীর জীবনে আনবে বিপুল পরিবর্তন সে সম্বন্ধে তার কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল সন্দেহাতীত। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার আগে তিনি সত্য সত্যই 'রেলগাড়ীতে ব্রেকম্যানের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে ও ব্রেকের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে' একটি স্বয়ংক্রিয় ব্রেকের নকসা ও পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। গিবস আরও দুটি জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হল একটি নতুন ধরনের গভর্নর। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুলে এটি নির্মিত হয়েছিল। আরও একটি জরুরী বাস্তব সমস্যা সমাধানে

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বিষয়টি হল যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোত্তম ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি প্রবর্তন। দেশে যাতে ওজন ও পরিমাপে মেট্রিক পদ্ধতি গৃহীত হয় গিবসের বন্ধু ও প্রতিবেশী হুবার্ট এ নিউটনের নেতৃত্বে তার জন্য একটি আন্দোলন চলেছিল। গিবস এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

গিবস ছিলেন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভানসমেণ্ট অব সায়েন্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। আমেরিকায় যে যন্ত্রযুগের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। ১৮৮৬ সালে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের সভায় মাল্টিপল অ্যালজাব্রা সম্বন্ধে বক্তৃতাদান কালে নিম্নোক্ত মন্তব্যে তার এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়: 'বীজগণিতের মত শ্রমলাঘবকর পদ্ধতি মানুষ আর কখনও সৃষ্টি করেনি। শ্রমশিল্পে যখন বিবিধ শ্রমলাঘবকর যন্ত্রের ব্যবহারই আমাদের এ যুগের বৈশিষ্ট্য তখন গণিত বিজ্ঞানে এমনি একটি অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম শ্রমলাঘবকর পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হবে তা অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত।'—এই কথাগুলি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গজদন্তমিনারে বাসকারী উদাসীন বিজ্ঞানীর অবাস্তব সূত্র রচনার মত শোনায় না।

॥ ১৩ ॥

সামুয়েল পিয়েরপণ্ট ল্যাংলি

(১৮৩৪-১৯০৬)

আমেরিকান বিজ্ঞান মানুষকে আকাশে ওড়বার ক্ষমতা এনে দিল

যে চৌষট্টি বছর উইলার্ড গিবস বেঁচে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে এদেশে বৈজ্ঞানিক কৌশলে অনেক নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে। গিবস যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৮৩৯ সালে চার্লস গুডইয়ার তাপ প্রয়োগে রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে রবার শক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সাত বছর পর ইলিয়াস হাউ সেলাইকল উদ্ভাবন করলেন। ১৮৬৬ সালে সাইরাস ডব্লিউ ফিল্ড সমুদ্রের মাঝ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করলেন। এর দু বছর পর, ক্রিস্টোফার সোলস ও কার্লোজ গ্লিডেন প্রথম সাফল্যমণ্ডিত টাইপ রাইটার নির্মাণ করে বাজারে বিক্রি শুরু করলেন। ১৮৭০ সালের পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে জর্জ ওয়েস্টিং হাউসের স্বয়ংক্রিয় এয়ার ব্রেক, আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোন এবং এডিসনের গ্রামাফোন ও বিজলীবাতি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৪ সালে ওটমার মার্গেনথালের লিনোটাইপ উদ্ভাবন করলেন। চার বছর পর বারোজ যোগ করার যন্ত্র নির্মাণ করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তরুণ দুরেয়া ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম মোটর গাড়ী নির্মাণ করলেন। এরা ছিলেন সামান্য কারিগর। পূর্ববর্তী কয়েকজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে এডিসন প্রথম চলচ্চিত্র উদ্ভাবন করলেন। জার্মানী থেকে আগত আবিষ্কারক চার্লস পি স্টেনমেটজকে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি তাদের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। মোটর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্রথম দুই শতাধিক পেটেণ্ট তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯০৩ সালে গিবস যে বছর মারা যান, সে বছর মানুষ আকাশ জয় করল। আমেরিকানদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কারিগরী কৌশলে নির্মিত

মোটরচালিত ও বাতাসের চেয়ে ভারি বিমান সাফল্যের সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করে এই বিজয় সম্ভব করে তুলেছিল।

এই সব আবিষ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। এই সব আবিষ্কারকদের অনেকেই ছিলেন কারিগর। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক বা এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা এদের ছিল না। কিন্তু এদের হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ কারিগরী দক্ষতা থেকে এরা এই সব যন্ত্র উদ্ভাবন সংক্রান্ত অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলেছিলেন। আকাশ জয়ের সাফল্যের শেষ অঙ্কের কাহিনী এমনি দুজন সুদক্ষ কারিগর ও বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন আমেরিকানের কাহিনী। এদের নাম উইলবার ও আরভিল রাইট। আমেরিকার তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী সামুয়েল পি ল্যাংলি যখন বাতাসের চেয়ে ভারি বিমান নির্মাণের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন, তারপরই এরা দুজনে এমনি ধরনের আকাশযান নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বাইসাইকেল নির্মাণের কারখানা ছিল। এদের মাথায় চেপেছিল গ্লাইডার ওড়ানোর নেশা। এর ঠিক দশ বছর আগে আকাশে ওড়ার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন ল্যাংলি। ১৮৮৬ সালে বাফেলো শহরে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের সভায় পাখীদের আকাশে ওড়ার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়া হচ্ছিল। সেই প্রবন্ধ শুনে ল্যাংলি আবার আকাশে ওড়ার সমস্যাটির প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হলেন। মনে পড়ল, ছেলেবেলায় মাঠের মাঝখানে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখায় ভর দিয়ে ভেসে চলা উড়ন্ত বাজ ও শিকারী বুজার্ড পাখীগুলির দিকে তাকিয়ে থাকার কথা। এদের পাখাগুলি এ সময় মনে হত যেন নিশ্চল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতেন, বাতাসের চেয়ে শতগুণে ভারি ঐ পাখি কি ভাবে অমন স্বাচ্ছন্দ্যে আকাশে ভেসে চলে? ল্যাংলির আগেও অনেকেই এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, এবং আশ্চর্য হয়ে কারণ খুঁজেছেন।

বহুদিন ধরে মানুষের ধারণা ছিল যে পাখা ঝাপটানোর ফলেই পাখীরা আকাশে উড়ে চলতে পারে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মানুষ প্রথমে উড়বার যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকনও মনে করতেন পাখীর এই পাখাঝাপটানোর ফলে যন্ত্র তৈরি করতে পারলেই মানুষের পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব হবে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৫০৫ সালে পাখীদের আকাশে ওড়া সম্বন্ধে (Treatise on the flight

of Birds) একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইতে দা ভিঞ্চি পাখার সাহায্যে আকাশে ওড়বার একটি যন্ত্রের সচিত্র বর্ণনা দেন। এই যন্ত্রটির বড় বড় পাখাগুলি চালক হাতের শক্তিতে পুলি ও দড়ির সাহায্যে টেনে চালাবেন। বহু শতাব্দী পর ১৮০৯ সালে স্যার জর্জ কেইলি এমনি ঝাপটানো পাখাযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে ওড়ার বৈজ্ঞানিক অসুবিধা প্রদর্শন করলেন। তিনি আকাশযান তৈরির নতুন সূত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। শেষে আকাশে ওড়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। এই সূত্র হল : কোণ ও তল বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলার সময় উপরের দিকে উঠতে থাকে।

১৮৮৭ সালে ল্যাংলি, বাতাসের চেয়ে ভারি আকাশযানের আকাশে উড়বার সূত্র নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি পরীক্ষা শুরু করলেন। এ কাজ করবার উপযোগী পূর্ণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। তিনি শিকাগোর একজন সাফল্যমণ্ডিত স্থপতি ও সিভিল এঞ্জিনীয়ার। বাপের মত কয়েক বছর তিনি সৌখিন জ্যোতির্বিদের কাজও করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে, ল্যাংলির বয়স যখন ত্রিশ বছর, তখন তিনি নিউ ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। স্থির করলেন যে স্থপতি ও বাস্তুবিদের জীবিকা ছেড়ে দিয়ে তিনি পুরোপুরি পেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলবেন। এই উদ্দেশ্যে ছোট ভাই জন ল্যাংলিকে সঙ্গে করে তিনি ইউরোপে রওনা হলেন। জন হার্ভার্ডের লরেন্স সায়েন্টিফিক স্কুলের স্নাতক। দুজনে ঘুরে ঘুরে ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান সমিতি. বিভিন্ন মানমন্দির ও পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করলেন।

এদেশে ফিরে এসে ল্যাংলি হার্ভার্ড মানমন্দিরের সহকারীর কাজ পেলেন। দু বছর পর আন্নাপোলিসের নেভাল একাডেমীতে গণিত শিক্ষকের ও একাডেমীর মানমন্দিরের ডাইরেকটরের পদগ্রহণ করার আমন্ত্রণ এল তাঁর কাছে। এই পদে তিনি একবছর কাজ করলেন। তারপর পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও অ্যালেগেনি মানমন্দিরের ডাইরেকটরের পদে যোগদান করলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাইও অধ্যাপনার কাজ করতেন। মানমন্দিরে ল্যাংলি পেলেন শুধু একটি নিরক্ষ দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Equatorial telescope)। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের সংক্রমণ পরিমাণ যন্ত্র (Transit Instrument) বা জ্যোতির্বিদগণের কোনও

আধুনিকতম যন্ত্রপাতি পেলেন না। নতুন এবং উন্নততর যন্ত্রপাতির জন্ম চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করতে হল।

ল্যাংলি লক্ষ্য করেছিলেন, দেশের সর্বত্র তখন রেলপথ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হচ্ছে। পিটস্‌বার্গ থেকে চতুর্দিকে বহু রেলপথ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই সব রেলপথের সময় নির্ধারণের কোনও নির্দিষ্ট মান নেই। তাতে রেল চলাচলের ব্যাপারে নানা ভুলভ্রান্তি দেখা দিত, নানা অভিযোগ আসত জনসাধারণের তরফ থেকে। দেখা দিত বিভ্রান্তি। ল্যাংলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনার ভিত্তিতে দিনে তুবার স্বয়ংক্রিয় ভাবে এবং যুগপৎ নির্ভুল সময় নির্ধারণের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। পেনসিলভানিয়া রেলরোড কোম্পানি তাদের রেলস্টেশন সমূহে নির্ভুলভাবে সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা করার কাজে তাঁকে নিযুক্ত করল। বহুবছর ধরে এই রেলপথের প্রতিটি স্টেশনের ঘড়িতে ল্যাংলির নির্ধারিত নির্ভুল সময় দেখান হত।

পেনসিলভানিয়া রেল পথের বিভিন্ন অংশের সময়ের তারতম্য ও ভ্রান্তি দূর করার মত নিছক বাস্তব প্রয়োজন সাধনের কাজটি ল্যাংলি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য। পরবর্তী সতেরো বছর তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণায় কাটালেন। সৌর গবেষণার ক্ষেত্রে কতকগুলি অতি উচ্চাঙ্গের তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। ল্যাংলি প্রথমে সৌর কলঙ্কের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

একদল বিজ্ঞানী মনে করতেন সৌর কলঙ্কগুলি হল কঠিন ও স্বচ্ছ বস্তু। ঘুরছে সূর্যদেহের চারদিক ঘিরে। সূর্য পৃষ্ঠের যখন যে স্থানে এরা অবস্থান করে তখন সেখানে এই সৌর কলঙ্ক দেখা দেয়। আর একদল বিজ্ঞানী মনে করতেন এগুলি সূর্যদেহে অবস্থিত মহাকায় আগ্নেয়গিরি সমূহ হতে নির্গত বিরাট ধূম্রকুণ্ডলী। কেউ বলতেন, এগুলি সৌর আবহমণ্ডলের মেঘমালা। আবার আর একদল জ্যোতির্বিদ বলতেন এগুলি সূর্যপৃষ্ঠের মহাকায় পর্বত শৃঙ্গ। সূর্যদেহের উত্তপ্ত গলিত ধাতু ও শিলাপ্রবাহের জোয়ারের সময় শৃঙ্গগুলি ডুবে যায়। ভাটার সময় আবার জেগে ওঠে।

ল্যাংলি এর কোনও মতই গ্রহণ করলেন না। দীর্ঘকাল ধরে, সাদাচোখে, দূরবীন সাহায্যে তিনি এই সৌর কলঙ্কগুলি পরীক্ষা করলেন। তখন সূর্যপৃষ্ঠ পরীক্ষার জন্য আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী বিশেষ যন্ত্র নির্মিত হয়নি। কাজেই সূর্যদেহ পরীক্ষার ক্ষমতা তখন ছিল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায়

পরীক্ষা চালিয়েও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সৌর কলঙ্কগুলি সূর্যপৃষ্ঠের অন্তর্মুখী অতিকায় ঘূর্ণাবর্ত। পরীক্ষার ফলে এ কথাও তার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল যে বিশাল গোলকাকৃতি গহ্বররূপী এই সৌর কলঙ্কগুলির মাঝ দিয়ে যান্ত্রিক ক্রিয়ায় যেন সূর্যদেহের উপরিভাগের বাষ্প ভিতরের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে।

উনিশ বছর পর, আমেরিকার খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ জর্জ এলিরি হ্যালি, নিজ উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের (স্পেকট্রোহেলিওগ্রাফ) সাহায্যে সৌর কলঙ্কগুলি পরীক্ষা করে. সৌর কলঙ্ক সম্বন্ধে ল্যাংলির মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আসলে, সূর্যদেহে কলঙ্ক দেখা যায় সেই সব অঞ্চলে, যেখানে 'সুস্পষ্ট ঘূর্ণিজাল তড়িৎ ও চুম্বক ঝড়ের বা ঘূর্ণাবর্তের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়', সূর্যের উপরিভাগের বাষ্প সেখানে উর্ধ্বপানে ধাবিত না হয়ে, ঘূর্ণাবর্তের অভ্যন্তরদেশ অভিমুখে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অঞ্চল হতে দূরে ধাবিত হয়।

তিনপলা কাচের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় সূর্যালোক বর্ণালী সৃষ্টি করে। সৌর কলঙ্ক সম্পর্কিত গবেষণার শেষে, ল্যাংলি এই বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে বণ্টিত তাপ নির্ধারণের সমস্যা নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। এই তাপের পরিমাণ খুবই সামান্য। এত সামান্য পরিমাণ বিকিরিত তাপ নির্ধারণের উপযোগী কোন সূক্ষ্মযন্ত্র তখনও বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। তখনকার দিনে সর্বাপেক্ষা সুবেদী তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র ছিল থার্মোপাইল। বর্ণালীর তাপ, এই থার্মোপাইল যন্ত্রেও ধরা পড়ে না বলে, ১৮৭৯ সালে ল্যাংলি এর চেয়ে আরও সুবেদী যন্ত্র নির্মাণ করতে মনস্থ করলেন।

এক বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ল্যাংলি একটি নতুন তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এটির নাম দিলেন বোলোমিটার। এ সম্বন্ধে তিনি 'দি বোলোমিটার অ্যাণ্ড র‍্যাডিয়েন্ট এনার্জি' (The Bolometer and Radiant Energy) নামে প্রবন্ধটি রচনা করেন, গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিজ্ঞানে তা একটি চিরস্মরণীয় অবদান। বোলোমিটারের মুল অংশ হল প্লাটিনামের কালো সরু একটি তার। এই তারটিতে সূর্যালোক পড়লে, তা বিকিরিত তাপ শুষে নেয়। এই তাপ তার পরিমাণ অনুপাতে অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই নতুন যন্ত্রটি শুধু অতি সামান্য পরিমাণ তাপ নির্ধারণ করতেই সক্ষম হল না, এক ডিগ্রীর দশ লক্ষ ভাগের একভাগ

তাপমাত্রার পার্থক্যও ধরতে পারত। বোলোমিটারের সাহায্যে ল্যাংলি সূর্যের বর্ণালীর সব কটি রঙের তাপই পরীক্ষা করলেন এবং লাল উজানী আলোর বর্ণালীর এক অংশের সন্ধান পেলেন। বর্ণালীর এই অদৃশ্য রঙ নিয়ে ইতিপূর্বে আর কখনও গবেষণা হয়নি।

সূর্যের সম্পূর্ণ বর্ণালী সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ল্যাংলি সৌরবিকিরণ পরিমাপের কাজে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮৪ সাল নাগাদ, হুইটনি পর্বতস্থিত মানমন্দিরে এ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা চালাবার পর সূর্যের এই বিকিরিত তাপ সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর আরও একটা কারণ দেখতে পেলেন। আমেরিকার মত এই বিরাট দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দানের আরও নির্ভুল ও সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের আশু এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পারার মূল্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এতে যারা জমিচাষ করেন, জমির ফসল স্থল ও সমুদ্রপথে চালান দেন, এবং অনুরূপ অন্যান্য সহস্র কাজে ব্যাপৃত, তারা আবহাওয়ার বিরূপতা বা খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুযোগ পাবেন।

ল্যাংলি ভাবলেন, আবহাওয়া কখন কেমন থাকবে, তা আগে থেকে অনায়াসেই বলে দেওয়া যাবে, যদি আমরা এই সৌর বিকিরণের মূল পরিমাণ ও প্রকার জানতে পারি। ধরতে পারি পৃথিবীতে আসবার পথে সূর্যকিরণ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কি ভাবে জমি সূর্য-তেজ শুষে নেয়, কি ভাবে পৃথিবীর তাপ ধরে রাখার কম্বলরূপী এই বায়ুমণ্ডলটির সাহায্যে সূর্যকিরণ এই গ্রহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কি ভাবে ক্রম-ক্ষীয়মাণ মাত্রায় তাপ বিকিরিত হয়ে তা পুনরায় আবার এই তাপরক্ষার কম্বলরূপী এই আবহমণ্ডলেই ফিরে আসে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ঠিক আগে সূর্যতাপের পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করলেন ল্যাংলি। এ পরিমাণটির নাম দিলেন, বিকিরণের সৌর ধ্রুবক। উপত্যকা ভূমিতে স্থাপিত একটি কেন্দ্র এবং ভূপৃষ্ঠ হতে কয়েক হাজার ফিট উর্ধ্বে হুইটনি পর্বতে স্থাপিত মানমন্দির হতে পর্যবেক্ষণ করে, ল্যাংলি এই সৌর ধ্রুবকের কতকগুলি বিভিন্ন মাত্রা নির্ধারণ করলেন।

এই বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন চার্লস গ্রীলি অ্যাবট। ১৯০৪ সালের জুন মাসে, ল্যাংলি ও অ্যাবট জানালেন, সূর্য যে একটি

বিকিরণ মাত্রা পরিবর্তনশীল তারকা, তার প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। অন্য ভাবে বলা চলে, সৌর তেজ বিকিরণের তীব্রতায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা, অতএব আবহাওয়াও যে নিঃসন্দেহে এই সৌর বিকিরণের তারতম্যের সঙ্গে জড়িত সাহস করে এমন কথাও তাঁরা বললেন। অ্যাবট তাঁর নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে সৌর প্রকৃতি পরীক্ষা করে চললেন। পঞ্চাশ বছর ধরে, দুই গোলার্ধের সুউচ্চ পর্বতমালায় অবস্থিত, বহু মানমন্দির ও মরুভূমি অঞ্চল থেকে সূর্য পরীক্ষা করে, তিনি সৌরলোক সম্বন্ধে নানা নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে এমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করায় শুধু এদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ল্যাংলি খ্যাতি অর্জন করলেন। ১৮৭৮ সালে তাঁকে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হল। ১৮৮৭ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদ লাভ করলেন। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিষ্টিউসনের সম্পাদক নিযুক্ত হবার পর উনিশ বছর ধরে সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয়ে তাঁর গবেষণা শক্তি প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত করলেন। এই বিষয়টি হল, বিমান বিজ্ঞান। ১৮৮৬ সালে সেই পাখীর উড্ডয়ন বিষয়ক প্রবন্ধটি শোনবার পর হতে এই সম্পর্কিত পুরানো সূত্রগুলির পুনরালোচনা ও পুনর্বিবেচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই বছরই তিনি গবেষণার কাজ শুরু করলেন। ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের বাথ্ তহবিল থেকে কিছু অর্থ সাহায্য লাভ করেছিলেন এই গবেষণার কাজ চালানোর জন্য। ১৮৯১ সালে এক্সপেরিমেণ্টস ইন এরোডায়নামিকস (Experiments in Aerodynamics) নামে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল।

কৃত্রিম বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে তিনি কোন তলের (surface) উর্ধ্বোত্থান শক্তির পরীক্ষা শুরু করলেন। ত্রিশ ফুট দীর্ঘ দুটি প্রতিসম পাখা যুক্ত একটি সুবৃহৎ ঘূর্ণমান টেবিল নির্মাণ করলেন। পাখাদুটি অনুভূমিক অবস্থায় মাটি থেকে আট ফুট উচুতে থেকে ঘুরত। টেবিলটি প্রথমে দেড় অশ্বশক্তির একটা গ্যাসোলিনের এঞ্জিন দ্বারা ঘোরান হত। পরে এই পাখাগুলিতে সর্বোচ্চ-হারে ঘণ্টায় প্রায় সত্তর মাইল গতিবেগ সঞ্চারিত করার জন্য টেবিলটি দশ অশ্বশক্তিযুক্ত একটি বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে ঘোরান হত।

বিভিন্ন গতিবেগ-সম্পন্ন বায়ুপ্রবাহের মধ্যে চলাচলকারী বিভিন্ন ওজনের

বক্রতল সম্পর্কে ল্যাংলি এই ভাবে কৃত্রিম বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এইসব পরীক্ষাকালে বায়ুপ্রবাহ ভেদকারী তলের উর্ধ্বোত্তলন শক্তি লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। এর সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের সুপরিচিত সূত্রগুলি প্রয়োগ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'এরূপ যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব যা তলে এমন গতিবেগ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হবে যে তাতে বাতাসের চেয়েও নিঃসন্দেহে ঢের ভারি বস্তু শূন্যে ভাসিয়ে রাখা যাবে, প্রবল গতিবেগসহ বস্তুটিকে শূন্যে চালানো যাবে এবং ভাসমান বস্তুটি নিজের ভার ছাড়াও অন্য বস্তুভার বহন করে নিয়ে যেতে পারবে।' আগে মানুষের ধারণা ছিল বায়ুপ্রবাহ একটানা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ল্যাংলি লক্ষ্য করলেন যে আসলে ব্যাপারটা ঠিক এমন নয়। বায়ুপ্রবাহ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছোট ছোট বিভিন্ন ঢেউ-এর আকারে প্রবাহিত হয়। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দি ইণ্টারন্যাল ওয়ার্ক অব দি উইণ্ড' (The Internal work of the wind) নামক গ্রন্থখানিতে ল্যাংলি এই মত প্রকাশ করলেন যে বায়ুপ্রবাহের এমনিভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে চলার জন্য (Internal work) বাতাসের চেয়ে ভারি মোটরহীন কোনও আকাশযানকে এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা শূন্যে ভাসিয়ে রাখা যায়। পরে গ্লাইডারগুলি যখন আকাশে দীর্ঘকাল ভেসে থাকতে সক্ষম হল, তখন দেখা গেল ল্যাংলির এই মত সত্য।

পরে ল্যাংলি পূর্ববর্তী পরীক্ষকদের উড্ডয়ন সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণ করলেন। বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে চলনশীল সমতল তলের উর্ধ্বোত্তলন শক্তির নিয়ামক সূত্রের নতুন প্রমাণের সন্ধান পেলেন। এর পর যে কাজটা তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল তাই তিনি করলেন। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে বিমানের ছোট ছোট মডেল নির্মাণ করে তিনি সেগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। এই মডেলগুলি গ্যাসোলিন এঞ্জিন চালিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চল্লিশ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার পথ ধরে উড়েছিল।

এইভাবে যে নতুন জ্ঞান লাভ করলেন, তাতে বিমানের মডেলে আরও পরিবর্তন সাধন করে ১৮৯৬ সালে নতুন মডেলের একটি বিমান নির্মাণ করলেন। এর পাখার দৈর্ঘ্য বারো ফিট। বিমানটি পনেরো ফিট লম্বা। প্রেষিত (কমপ্রেসড) কার্বন ডাই-অক্সাইডের শক্তিতে বিমানটি চালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে বাষ্পীয় এঞ্জিনের শক্তিতে এটি চালানোর ব্যবস্থা করা হল।

পোটোমাক নদীতে বাঁধা একটি হাউস বোট থেকে যন্ত্র সাহায্যে ছাব্বিশ পাউণ্ড ওজনের এই আকাশযানটিকে শূন্যে ওড়ালেন ল্যাংলি। দেখলেন আধ মাইল উড়ে এঞ্জিন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিমানটি নিরাপদে মাটিতে নাবল। ছ মাসের মধ্যেই তিনি এর চেয়ে আরও বড় একটি বিমানের মডেল তৈরী করলেন। মডেলটির নাম দিলেন 'এরোড্রোম নং ৬'। ১৮৯৬ সালের ২৮শে নভেম্বর এ বিমানটি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিবেগে এক মাইল তিন চতুর্থাংশ পথ উড়েছিল। এই সময়ই ল্যাংলি তাঁর এই স্মরণীয় কথাগুলি লিখেছিলেন: 'যন্ত্রযান সাহায্যে আকাশে ওড়া যে সম্ভব তা প্রদর্শন করার ভার আমি নিজের কাঁধে চাপিয়ে ছিলাম। এ কাজের এক অংশ আমি শেষ করলাম। দ্বিতীয় অংশ হল, ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এবং কার্যকরী ভাবে এই আকাশযানের পরিকল্পনাটির উন্নতি সাধন। এ কাজ অন্য কেউ নিষ্পন্ন করবে এইটাই আমি আশা করব। পৃথিবীর সম্মুখে এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, মাথার উপর শূন্যমার্গে মানুষের অবাধ চলাচলের পথ উন্মুক্ত হতে চলেছে—একথা আজ যদি মানুষ বুঝতে না পারে তাহলে তাদের অতি অলস ও নিষ্ক্রিয় বলেই গণ্য করব।'

বিমান বিজ্ঞানের আরও উন্নতি সাধনের কাজ 'অন্য কেউ করবে' এই আশায় ল্যাংলি আরও কিছুকাল কাটালেন। বহু বিদেশী সরকার সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধাস্ত্ররূপে আকাশযানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এ খবর শুনতে পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্তারা এই সময় বিমানপোত নির্মাণে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮৯৮ সালে স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই বছরের প্রথম দিকে স্থল ও নৌবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে গঠিত একটি বোর্ড ল্যাংলির বিমান নির্মাণ প্রয়াস সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালালেন। বাতাসের চেয়ে ভারি বিমানপোত নির্মাণ সম্ভব বলে তাঁরা রিপোর্ট দিলেন। তাঁরা জানালেন, এই বিমানপোতকে শত্রু এলাকা পর্যবেক্ষণের কাজে লাগান যেতে পারে। এর পর সমরবিভাগ বিমান পোত সম্বন্ধে আরও গবেষণা ও বিমান পোত নির্মাণ ও পরীক্ষার জন্য ৫০ হাজার ডলার মঞ্জুর করল। ল্যাংলিকে এই প্রকল্পের ভার নিতে বলা হল। ল্যাংলি বিনা পারিশ্রমিকেই এ কাজ করতে রাজী হলেন। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসন এই গবেষণার কাজে আরও ৩০ হাজার ডলার মঞ্জুর করল।

ল্যাংলি অবিলম্বে একজন চালক বহনের উপযোগী বড় ধরনের একটি

বিমানপোত পরিকল্পনা ও নির্মাণের কাজে লেগে গেলেন। বুঝলেন, মনুষ্যবাহী বিমানপোত নির্মাণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হালকা অথচ শক্তিশালী একটি মোটরের। কোনও যান্ত্রিক উৎক্ষেপ যন্ত্রের সাহায্যে বিমানটি শূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার পর এই মোটরের শক্তিতে সেটি শূন্যে উড়তে থাকবে। এঞ্জিনীয়ার চার্লস এম ম্যানলিকে সঙ্গে নিয়ে এমনি একটি মোটর এঞ্জিনের সন্ধানে তিনি ইউরোপে গেলেন। ইউরোপ তখন অন্তর্দাহী এঞ্জিনের উন্নতি সাধনে অত্যন্ত ব্যস্ত। পরিবহণ কার্যে ব্যবহৃত শকটরূপে তখন মোটরগাড়ীর ব্যবহার শুরু হয়েছে। ইউরোপের কতকগুলি কারখানা ইতিমধ্যেই মোটরের জন্য এঞ্জিন তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল। ল্যাংলি যেখানেই যান শুনতে পান তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অত হালকা মোটর এঞ্জিন নির্মাণ করা অসম্ভব। পরিকল্পিত বিমানপোতের খোলটি তখন তৈরী হয়ে গেছে। এটি ছিল পঞ্চাশ ফিট লম্বা, আটচল্লিশ ফিট চওড়া। এর পাখার আয়তন ছিল ১০৪০ বর্গ ফিট।

এ অবস্থায় শুধু একটি কাজই করবার ছিল ল্যাংলির। সেই কাজই করলেন তিনি। ম্যানলিকে বললেন, হালকা একটি এঞ্জিনের নক্সা তৈরী করে এঞ্জিনটি স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের কারখানায় তৈরী করে নিতে। ম্যানলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাহান্ন অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি এঞ্জিন নির্মাণ করে ফেললেন। এঞ্জিনটি জলের সাহায্যে শীতল রাখার ব্যবস্থা ছিল। এর ওজন ছিল, প্রতি অশ্বশক্তিতে পাঁচ পাউণ্ডের কম। হাউস বোটের উপর থেকে বিমানটি যন্ত্র সাহায্যে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের হাউস বোট নির্মিত হতে লাগল। সেই সময় নতুন এঞ্জিনটি বিমানে সংযোজিত করার পরীক্ষা চলতে লাগল। এঞ্জিন স্থাপনের জন্য বিমানের কাঠামোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও অদলবদলের কাজ শেষ হলে বিমানটি হাউস বোটের ছাদে ওঠান হল। বিমান সমেত হাউসবোটটিকে পোটোমাক নদী ধরে চালিয়ে ওয়াশিংটন হতে চল্লিশ মাইল দূরে এক স্থানে টেনে আনা হল।

বিমানটি ওড়ানোর প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল ১৯০৩ সালের ৭ই অক্টোবর। ম্যানলি বিমানটি চালনার ভার নিলেন। পরীক্ষাকালে বিমানের সামনের অংশ হাউস বোটের বিমান নিক্ষেপক যন্ত্রে আটকে বিমান ও বিমান চালক পোটোমাক নদীতে নিক্ষিপ্ত হল। দু মাস পর, ১৯০৩ সালের ৮ই

ডিসেম্বর দ্বিতীয় বার বিমানটিকে ওড়ানোর চেষ্টা হল। বহু লোক বিমান ওড়ার পরীক্ষা দেখতে এসেছিল। তারা যখন দেখল, বিমানখানা আকাশে না উড়ে চালকসহ নদীর জলে পড়ে গেল, তখন তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। খবরের কাগজওয়ালারা ল্যাংলির পাগলামি-সৃষ্ট যন্ত্রের আকাশে ওড়ার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার খবর ছাপল। খোলাখুলি ভাবে তারা ল্যাংলির তীব্র সমালোচনা করল। ল্যাংলির বয়স তখন প্রায় সত্তর। এই ব্যর্থতা ও ধিক্কারে তিনি মর্মাহত হলেন। ফিরে গেলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনে। ইচ্ছা আবার শুরু করবেন সৌর বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা। আকাশযান নিয়ে সতেরো বছর ধরে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তা সাঙ্গ হল। সমর বিভাগ থেকে আর কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না এই পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য।

পোটোমাক নদীতে পরীক্ষাকালে চালকসহ ল্যাংলির বিমান ডুবে যাবার ঠিক নয় দিন পর একজন তরুণ আমেরিকান উত্তর ক্যারোলাইনার কিটি হাকর বালিয়াড়ি অঞ্চলে প্রথম আকাশ পথে বাতাসের চেয়ে ভারি বিমান চালনা করলেন। জায়গাটি ল্যাংলির বিমান পরীক্ষা স্থান থেকে বিমান পথে মাত্র ১০০ মাইল দূরে। নিজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আর একজন তরুণ আমেরিকাবাসীর এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যে অতীব আনন্দিত হলেন ল্যাংলি। তাঁর মনে কোনও তিক্ততা বা দ্বেষ ছিল না।

আকাশ বিজয় শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল উইলবার ও অরভিল রাইট নামে দুই ভ্রাতৃদ্বয়ের কল্যাণে। এরা চার্চ অব দি ইউনাইটেড ব্রিদ্রেন ইন ক্রাইস্ট-এর বিশপ ও রিলিজিয়াস টেলিস্কোপ নামক পত্রিকার সম্পাদক মিলটন রাইটের পুত্র। এই দুই ভাই ছিলেন রাইট সাইকেল কোম্পানি নামে ডেটনে ছোট্ট একটি সাইকেল কারখানার মালিক। কারখানাটি তাঁরা ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে যে সাইকেল তাঁরা নির্মাণ করতেন তার নাম ছিল ভ্যান ক্লীভ সাইকেল। সাইকেল নির্মাতারূপে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রকার যান্ত্রিক কলকৌশল সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ১১ই আগস্ট শেষবার গ্লাইডারের সাহায্যে আকাশে ভেসে বেড়ানোর কসরৎ দেখাতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন জার্মানীর বিখ্যাত অটো লিলিয়েনথাল। ইনি এমনি দু হাজার বারেরও বেশী এই গ্লাইডার ওড়ানোর কসরৎ দেখিয়েছিলেন। লিলিয়েনথালের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা খবরের কাগজে পড়েই সাইকেলের ছোট্ট

কারখানা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিমান নির্মাণের চেষ্টায় মেতেছিলেন দুই ভাই। লিলিয়েনথালই প্রথম গ্লাইডারে চড়ে আকাশে ওড়েন। অর্থাৎ তিনি বায়ু প্রবাহের সাহায্য নিয়ে তার গ্লাইডার যানটি আকাশ পথে চালনা করেছিলেন। গ্লাইডার বায়ুস্রোত ধরে ভেসে চলে। ইংরাজী গ্লাইডিং (Gliding) শব্দটির অর্থ হল বায়ুস্রোত ধরে ভেসে চলা। গ্লাইডিং শব্দ থেকে এসেছে গ্লাইডার শব্দটি। বায়ু প্রবাহে গা ভাসিয়ে গ্লাইডারের এইভাবে বাতাসে ভেসে চলার ও আকাশে ওড়বার যে ক্ষমতা দেখা গিয়েছিল সেই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় স্বয়ংচালিত ও বাতাসের চেয়ে ভারী বিমান নির্মাণের চেষ্টা করতে লাগলেন।

অটো লিলিয়েনথাল গ্লাইডার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ১৮৯৬ সালে। পার্শি পিলচের নামে জনৈক ইংরাজও গ্লাইডার নিয়ে আকাশে ওড়ার পরীক্ষা কালে মারা যান ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে। এই সব শোচনীয় দুর্ঘটনার পরও রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমান নির্মাণের বিপজ্জনক পরীক্ষা চালিয়ে যান। উড্ডয়নের সমস্যা সমাধানে ল্যাংলি যতটুকু সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের মত উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান উড্ডয়নের উপযোগী যান নির্মাণের জন্য যে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন, এই সব ব্যাপারে তাঁদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। ১৯০৬ সালে উইলবার রাইট অকটেভ ক্যানুটকে লেখেন, 'আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মানুষের পক্ষে আকাশে উড্ডয়ন সম্ভব এই মত পোষণ করতেন। যে সব কারণে আমরা সক্রিয়ভাবে উড্ডয়নের উপযোগী বিমান নির্মাণের কাজে হাত দেবার আগে এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হই, স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের কর্ণধারের এই অভিমতই তার অন্যতম। তিনি আমাদের কতকগুলি গ্রন্থ পাঠের পরামর্শ দেন। এগুলি পাঠ করবার পর উড্ডয়নের কতকগুলি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব ধারণা গঠনের সুযোগ হয়েছিল। এক অতি সঙ্কটজনক সময়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম। এর জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।'

গ্লাইডার চালনার সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানের সন্ধান পাবার জন্য রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগকে লিখলেন। তাঁরা তাদের প্রকাশিত আবহাওয়ার যে সব বিজ্ঞপ্তি পাঠালেন সেগুলি পরীক্ষা করে তাঁরা বুঝলেন

যে উত্তর ক্যারোলাইনা উপকূলের কিটি হক নামক স্থানের সরু বালিয়াড়ি অঞ্চলই এ কাজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্থান হবে। এখানে সর্বদা প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। এমনি নিয়মিত বায়ু প্রবাহই দরকার ছিল তাদের পরীক্ষা কার্য চালানোর জন্য। ওরা ক্যারোলাইনা উপকূলে এলেন। ১৯০০ সালে তাঁদের প্রথম বাইপ্লেন গ্লাইডারটি ওড়ালেন ঘুড়ির মত করে দড়ি বেধে। ১৯০১ সালে দ্বিতীয় একটি বিমান ওড়ালেন গ্লাইডারের মত বিনা এঞ্জিনে।

ডেটনে ফিরে এসে অরভিল একটি ছোট উইণ্ড টানেল তৈরি করলেন। একটির মুখ ষোল বর্গ ইঞ্চি চওড়া, লম্বা আট ফিট। এই উইণ্ড টানেলে গ্যাসের সাহায্যে পাখা চালিয়ে হাওয়া সরবরাহ করা হত। এই উইণ্ড টানেলের সাহায্যে তারা বিভিন্ন বক্রতা যুক্ত তল নিয়ে বায়ু প্রবাহের উর্ধ্বোত্তোলন শক্তি টান, চাপকেন্দ্র ও অন্যান্য তথ্য নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা চালালেন।

উইণ্ড টানেলের পরীক্ষা থেকে যে সব তথ্য তারা আহরণ করলেন তার সাহায্যে পুরানো গ্লাইডারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নতুন একটি গ্লাইডার নির্মাণ করলেন। ১৯০২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কিটি হকে প্রত্যাবর্তন করে তারা এই গ্লাইডারটি নিয়ে এক হাজারেরও বেশীবার আকাশে উড়লেন।

এই সময় দুই ভাই-ই উড্ডয়ন কালে প্রস্তাবিত বিমানটিকে কিভাবে সাম্যাবস্থায় রাখা যায় সে সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছিলেন। প্রথম প্রথম বিমান আকাশে উডবার সময় বিমান চালক বিমানে মাঝে মাঝে আপন স্থান পরিবর্তন করে বিমানটিকে সাম্যাবস্থায় রাখবার চেষ্টা করতেন। গ্লাইডার যাতে এক দিকে ঢলে পড়া অবস্থায় না ওড়ে তার জন্য তাঁরা গ্লাইডারের পাখা বাঁকানো ও ঘোরানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করলেন। গ্লাইডার ক্রমেই আরও নিরাপদে মাটিতে নাবাতে শিখছিলেন তাঁরা। গ্লাইডার ওড়ানোর সময় দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমে আসছিল। এরপর তাঁরা এই গ্লাইডারে এঞ্জিন স্থাপন করলেন। এঞ্জিনটি তাদের সর্বশেষ বিমানটির জন্য নির্মিত হয়েছিল। ল্যাংলি মনে করতেন হাউস বোটের উপর থেকে যন্ত্র সাহায্যে উৎক্ষেপ করা ব্যতীত বিমানটি শূন্য মার্গে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের বিমানটি মাটি থেকে উৎক্ষেপ করাই স্থির করলেন।

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর অরভিল রাইট গ্যাসোলিন মোটর-যুক্ত বাইপ্লেন গ্লাইডারে উঠলেন। এই মোটরটি ছিল চার সিলিণ্ডার-যুক্ত

বারো অশ্বশক্তি চালিত। মোটর চালু করা হল। মোটরের সঙ্গে বাই সাইকেলের চেনের দ্বারা যুক্ত দুইটি পুসার জাতীয় প্রপেলার বিপরীত দিকে ঘুরতে লাগল। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নিজেরাই এই প্রপেলার দুটির পরিকল্পনা করেছিলেন। একটা তারের সঙ্গে বিমানটি বাধা ছিল। তারটি কেটে দিতেই বিমান বাতাসের বেগে এগিয়ে চলল। খানিকটা পথ ছুটল, তারপর মাটি ছেড়ে উর্ধে উঠল। বিমানের নিয়ন্ত্রণ তখন অরভিলের হাতের মুঠোর মাঝে। বারো সেকেণ্ড অতি সুন্দর ভাবে উড়ে ১২০ ফিট গিয়ে নিরাপদে মাটিতে নামল বিমানটি। বাতাসের চেয়ে ভারি আকাশ যানে মানুষের আকাশে ওড়ার চেষ্টা সফল হল। একজন আমেরিকাবাসী পুনরায় ইতিহাস রচনা করল। সেই দিন বিমান খানা আরও তিনবার উড়েছিল।

চতুর্থবার উড়বার শেষে, উইলবার রাইট যখন বিমান থেকে নেমে আসছেন, তখন হঠাৎ দমকা হাওয়ার মাঝে পড়ে বিমানখানা গুরুতর ভাবে জখম হল। পরের বছর বসন্ত কালে ডেটনের নিকট একটি ময়দানে পরীক্ষা শুরু করলেন দুই ভাই। একটা নতুন বিমান তৈরি করলেন এবার তাঁরা। এতে বসালেন সতের অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট একটি মোটর। পাইলট সমেত বিমানটির ওজন দাঁড়াল প্রায় ৯০০ পাউণ্ড। বিমানখানি বহুবার ওড়ালেন দুজনে। দু বছরের কম সময়ের মধ্যেই তাঁরা ডেটনের নিকট বৃত্তাকারে চব্বিশ মাইল পথ এই বিমানে চেপে ওড়লেন। ১৯০৬ সালের ২২শে মে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কৃত বিমানের পেটেণ্ট রেজেস্ট্রীকৃত হল। পেটেণ্টের নম্বর পড়েছিল ৮২১৩৯৩।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের বিমানের পেটেণ্ট লাভের প্রায় তিন মাস আগে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে, বাহাত্তর বছর বয়সে সাউথ ক্যারোলাইনার আইকেন শহরে ল্যাংলি মারা গেলেন। অকটেভ ক্যানুট ও স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনে ল্যাংলির অন্যান্য বন্ধুরা মনে করতেন, ল্যাংলিই প্রথম মনুষ্যবাহী বিমান নির্মাণ করেছিলেন। তাদের মতে ত্রুটিযুক্ত উৎক্ষেপন ব্যবস্থা জনিত দুর্ঘটনার ফলেই বিমানটি আকাশে ওড়ানো সম্ভব হয়নি। ল্যাংলির এই বিমানের মডেলটিকে নদী বক্ষ হতে উদ্ধার করে মেরামত করবার পর এটিকে সর্ব সাধারণকে প্রদর্শনের জন্য এখন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনে যথাযোগ্য মর্যাদা-সহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ল্যাংলি, না রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, কে আগে বিমান নির্মাণ করেন, এ নিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রে বহুদিন ধরে বিতর্ক চলেছিল। এ সময় ল্যাংলির বন্ধুগণ তাঁকেই প্রথম আবিষ্কারকের মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ল্যাংলি ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। বেঁচে থাকলে তিনি যে কখনই এই অগ্রগণ্যতার বিতর্কে যোগ দিতেন না, তা সুনিশ্চিত। তিনি বিতর্ক পরিহার করে চলতেন। নিজের চারদিকে এক হিমশীতল সম্ভ্রমতার নির্মোক সৃষ্টি করে চলতেন তিনি। লোকজনের সঙ্গে বড় বেশী মেলামেশা করতেন না। প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন লাজুক। কথা কম বলতেন। তাঁর বন্ধু জোটাই ছিল তাই ভার। বিয়ে করেননি ল্যাংলি। নিকট-আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না। নিঃসঙ্গ নিরালা জ্ঞানতপস্বীর জীবন কাটিয়ে গেছেন তিনি। এমনি সংসারবিবাগীর জীবন কাটিয়েও তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচার ও বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি ছিলেন আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের প্রেসিডেণ্ট, আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, কাউন্সিল অব ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের সভ্য। তার উপর উনিশ বছর ধরে ছিলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সক্রিয় সম্পাদক। এই মহান প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তিনি নানাভাবে ধারণ ও বহন করে গেছেন। জন-সাধারণের জন্য আয়োজিত কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা দেবার ভার তিনি নিয়েছিলেন। 'দি নিউ অ্যাসট্রনমী' (The new astronomy) নামক সাধারণ পাঠকদের উপযোগী একখানি গ্রহ নক্ষত্র জগৎ সংক্রান্ত পদার্থ বিজ্ঞানের বই তিনি লিখেছিলেন। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনি নিউইয়র্কে ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্ক স্থাপন করেন। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি ও অ্যাস্ট্রো ফিজিক্যাল অবজারভেটরী স্থাপনের জন্য তিনি অনিচ্ছুক কংগ্রেসের নিকট হতে মোটা রকমের অর্থ সাহায্য আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিমান আবিষ্কারের কাজে ল্যাংলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা স্মরণীয় করে রাখার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিমানবাহী জাহাজটির নাম তারই নামানুসারে রাখা হয়। ১৯২২ সালে এটি নির্মিত হয়। ভার্জিনিয়ার নরফোকের নিকট ল্যাংলি ফিল্ডের নামকরণ করা হয়েছে আমেরিকার এই মহান বিজ্ঞানীর সম্মানার্থে, যার তত্ত্বীয় গবেষণা আজকে ও আগামী কালের বিরাট বিমান বহর সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

॥ ১৪ ॥

এলবার্ট এব্রাহাম মাইকেলসন

(১৮৫২-১৯৩১)

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বিপ্লবে আমেরিকার অংশ গ্রহণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকায় দ্রুত শিল্পায়ন ও ফলিত বিজ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিলেও সেখানকার একদল বিজ্ঞানীদের মনোযোগ তত্ত্বীয় গবেষণার বৃহত্তর ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ। এই সব তত্ত্বীয় গবেষকদের মধ্য থেকেই অবশেষে আবির্ভূত হলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি মৌলিক গবেষণায় আমেরিকায় প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। ইউরোপের বিপ্লবী জনগনের যে অংশ মার্কিন দেশে আশ্রয় নেন, তাদের ইতিবৃত্তই হল এলবার্ট এব্রাহাম মাইকেলসনের (Albert Abraham Michelson) কাহিনী। ১৮৪৮ সালে ইউরোপে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ায় দেখা দিয়েছিল অশেষ নির্যাতন, নিপীড়ন। বহু লোক ইউরোপ থেকে পালিয়ে গেল। এই সব রাজনৈতিক শরণার্থীদের অনেকে এল আমেরিকায়।

এই শরণার্থীদের সঙ্গে এলেন মাইকেলসনের ইহুদী পিতামাতা। এই ইহুদী দম্পতি তাদের দুই বৎসরের শিশুপুত্র এলবার্টকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৫৫ সালে আমেরিকায় আসেন প্রুশিয়া ছেড়ে। সোনার লোভে মানুষ ছুটছিল তখন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে। সেই হিড়িকে সামুয়েল মাইকেলসনের ভগ্নী সেখানে গিয়েছিলেন।

মাইকেলসন দম্পতিও তাঁর কাছেই যাওয়া স্থির করলেন। সমুদ্র পথে পানামা হয়ে তাঁরা এলেন পশ্চিম উপকূলে। সানফ্রান্সিসকোর গ্রামার স্কুলে

(প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) পড়াশুনা শুরু করলেন এলবার্ট। পিতামাতা সানফ্রান্সিসকো ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি এই গ্রামার স্কুলেই পড়াশুনা করেন। তখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ চলছে। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করতে পশ্চিমের সমৃদ্ধিশালী রৌপ্যখনিগুলি হতে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের রৌপ্য উত্তোলিত হচ্ছে। এবার মাইকেলসনরা এসে বসতি স্থাপন করলেন এই বর্ধিষ্ণু খনি অঞ্চলের মাঝখানে।

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার জন্য বালক এলবার্টকে পরে সানফ্রান্সিসকোতেই ফেরত পাঠান হল। সেখানে সে স্কুলের অধ্যক্ষের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতে লাগল। অধ্যক্ষ অচিরেই বালক মাইকেলসনের অসাধারণ কারিগরী দক্ষতা লক্ষ্য করলেন এবং পড়াশুনায় তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এই দক্ষতার জন্য ছাত্রাবস্থাতেই তাকে স্কুলের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ভার দেওয়া হয়েছিল। ষোল বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তরুণ মাইকেলসন ফিরে গেলেন বাপ মায়ের কাছে। তখন তাঁরা বসবাস করছেন নেভাদার ভার্জিনিয়া শহরে। জায়গাটা 'কমস্টক লোড' রৌপ্যখনি শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে।

খনি শ্রমিকদের জীবন ভাবপ্রবণ তরুণ মাইকেলসনকে আকৃষ্ট করত। পাহাড় খুঁড়ে বের করা, বিরাট বিরাট চুল্লীতে গলানো বহুবর্ণের এই বিচিত্র ধাতুপিণ্ডগুলি তিনি সংগ্রহ করতেন। এমনি সব বিচিত্র বস্তু সংগ্রহের শখ ছিল তাঁর। পেশা হিসাবে খনি শ্রমিকের জীবন তাকে এর বেশী আকৃষ্ট করেনি। মা চাইতেন এলবার্ট ডাক্তার হোক। বাবার ধারণা নৌবাহিনীর কাজেই ছেলের স্বাভাবিক প্রবণতা। এলবার্ট শেষ পর্যন্ত নৌবাহিনীর কাজ নেওয়াই স্থির করলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিদ্যালয়ের (Naval Academy) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এলবার্ট কিন্তু নৌবাহিনীর চাকরি তখন তার কপালে জুটল না। চাকরি পেল অন্য একটি যুবক। সে পরীক্ষায় এলবার্টের সমান নম্বর পেয়েছিল। অন্য কোনও কাজে নৌবাহিনীতে কোনও সুযোগ পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টায় সেই অঞ্চলের কংগ্রেসের সদস্য মারফৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করা মনস্থ করলেন এলবার্ট। গেলেন রাজধানী ওয়াশিংটনে। সেখানে প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্ট তাকে জানালেন, শেষ বিশেষ দশটি পদের নিয়োগ তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তা

হলেও তিনি তাঁকে নৌবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। অধ্যক্ষ তাঁকে "একাদশতম" পদে গ্রহণ করলেন। এলবার্ট পরম বিস্মিত ও পুলকিত হলেন এ ব্যাপারে।

আনাপোলিসে চারটি বছর অতি দ্রুত কেটে গেল। কোনও নাটকীয় ঘটনা এ সময় তাঁর জীবনে ঘটেনি। ছাত্র হিসাবে তিনি অতীব বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই নৌ বিদ্যালয়েই পরে তিনি রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি একাজ করেছিলেন। পরে অল্প কিছু দিনের জন্য ওয়াশিংটনে নৌ-সারণীর (Nautical Almanac) অফিসেও কাজ করেছিলেন।

নাবিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময়ই মাইকেলসনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হাতে খড়ি। তাঁর গবেষণার বিষয় এখানে ছিল আলোক বিদ্যা। বিজ্ঞানের এই শাখাটিতেই প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁর মনোযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আলোকের গতি নির্ধারণই তখন কতকগুলি অত্যন্ত জরুরী সমস্যা সমাধানের পক্ষে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৬৭৫ সালে তরুন দিনেমার বিজ্ঞানী ওলাস রোমার পরীক্ষার দ্বারা প্রথম আলোকের বেগ নির্ধারণ করেন। এর পর থেকে আরও নির্ভুল ভাবে এই বেগ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ তার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে যে সময় নেয়, রোমার তার পরিমাপ করে আলোকের বেগের হিসাব কষেণ (সেকেণ্ডে ১৮০০০০ মাইল)। আলোকের বেগ তাৎক্ষণিক—রোমারের পরীক্ষার দ্বারা এই পুরাতন ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। তিনি দেখিয়েছিলেন, আলোকের বেগ অতি প্রচণ্ড হলেও সীমিত ও পরিমাপসাধ্য।

রোমার যে পদ্ধতিতে আলোকের বেগ নির্ণয় করেছিলেন তাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হত। আরও নির্ভুলভাবে এই গতি-বেগের হিসাব কষবার জন্য বিজ্ঞানীরা এমন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন যাতে আকাশের গ্রহতারার উপর নির্ভর না করে, সম্পূর্ণভাবে বীক্ষণাগারের পরীক্ষা দ্বারাই আলোকের এই গতিবেগ নির্ণয় সম্ভব হয়। ১৮৭৭ সাল নাগাদ বীক্ষণাগারে আলোকের বেগ নির্ণয়ের এমনি তিনটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি উদ্ভাবন করেন আরমঁ ফিজো। দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করেন এর তেরো বছর পরে জঁ ফুকে। তৃতীয় পদ্ধতিটি

উদ্ভাবন করেন, ১৮৭২ সালে আর একজন ফরাসী বিজ্ঞানী, মেরি আলফ্রেড কর্ণু।

ফিজোই সর্বপ্রথম বীক্ষণাগারে আলোকের বেগ নির্ধারণে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর হিসাব মত এই বেগ দাঁড়িয়েছিল সেকেণ্ডে ১৯৫,৩৪৪ মাইল। এই অতি বিপুল বিস্ময়কর বেগের (এর সাহাযো আলোকরশ্মি সেকেণ্ডের এক অষ্টমাংশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে) কথা শুনে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের চক্ষু স্থির। একি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য ? ছোট্ট যন্ত্রপাতি নিয়ে মানুষের পক্ষে এই বিপুল বেগের পরিমাপ করা যে সম্ভব তা মনে হল অবিশ্বাস্য।

আলোর বেগের হিসাব শুনে ত বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরে যাবার দাখিল। তাঁরা সবে সে বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন। এমন সময় ফুকো অন্য একটি পদ্ধতিতে আলোকের বেগ নির্ধারণ করলেন। মিনিটে পাঁচশত বার ঘূর্ণমান ছোট একটি আয়নার অবস্থিতির কৌণিক পরিবর্তন দ্বারা সূক্ষ্ম একটি তারের প্রতিবিম্ব বিচ্যুত হতে যে সময় নেয় তার উপর নির্ভর করে, তিনি এই বেগের হিসাব করেন। ফুকোর পরীক্ষা অনুযায়ী আলোকের বেগ নির্দিষ্ট হল সেকেণ্ডে ১৮৫,১৫০ মাইল।

তরুণ মাইকেলসন এই আলোকের বেগ নির্ণয়ের সমস্যাটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৮৭৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ফুকোর পদ্ধতির সামান্য অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন সাধনের উপায় উদ্ভাবন করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। তিনি ফুকোর যন্ত্র থেকে অবতল প্রতিফলকটিকে বাদ দিলেন। তাতে তার পক্ষে যতদূর খুশী আলোকরশ্মি পাঠানো সম্ভব হল। তিনি এ যন্ত্রে দুটি সমতল পৃষ্ঠ আয়না ব্যবহার করা স্থির করলেন। তার একটি থাকবে স্থির নিবদ্ধ। আর একটি সেকেণ্ডে ১৩০ বার ঘুরবে। দুটি আয়নার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ৫০০ ফিট।

পরের বছর মে মাসে মাইকেলসন 'আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে' প্রথম তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠালেন। এই প্রবন্ধে আলোকের বেগ নির্ধারণ কল্পে তাঁর নতুন পদ্ধতির অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাতে কোনও পরীক্ষার ফল ছিল না। ঠিক এর আগেই নৌবিভাগের অফিসার মাইকেলসন, কুমারী মার্গারেট হেমিংওয়েকে বিবাহ করেন। আলোক বিদ্যার এই গবেষণায় কুমারী মার্গারেটের পিতা আকৃষ্ট হলেন। তিনি জামাতাকে তাঁর এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চালানোর জন্য দু হাজার

ডলার (প্রায় দশ হাজার টাকা) দান করলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মাইকেলসন গেলেন সেণ্টলুইতে। সেখানে 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সে' (মার্কিন বিজ্ঞান সম্প্রসারণী সভা) আলোর বেগের নতুন মান উপস্থাপিত করলেন—সেকেণ্ডে ১৮৬, ৫০৮ মাইল। হিসাব করে দেখেছিলেন সংখ্যাটা দশ হাজারের এক ভাগের মধ্যে নির্ভুল।

মাইকেলসন স্থির করলেন বুদ্ধি ও উদ্ভাবন কৌশলের সাহায্যে আলোকের বেগের যতটা নির্ভুল হিসাব বার করা সম্ভব তা করবেন। না করা পর্যন্ত গবেষণা চালাবেন; ইউরোপীয় তত্ত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞানীরা আলোকের বেগের সমস্যাটি নিয়ে গবেষণায় কতদূর এগিয়েছেন? প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের আশায় তিনি, ১৮৮০ সালে যাত্রা করলেন ইউরোপে। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী, কন্যা ও শিশুপুত্র ট্রুম্যান। এই ট্রুম্যানই পরে একজন জাতিবিদ্ ও রেড ইণ্ডিয়ান জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জন করে। এর পরের দু বছর মাইকেলসন ফ্রান্স ও জার্মানীর এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে আলোকের বেগ সংক্রান্ত যত কিছু তথ্য পেলেন সব কিছুই আয়ত্ত করে নিলেন।

পদার্থ বিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন ছিল। ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস নামে একজন ওলন্দাজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৬৭৮ সালে আলোক তরঙ্গবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী দীপ্তিমান বস্তু (যেমন প্রজ্জ্বলিত দেশলাই কাঠি বা সূর্য) কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পন আলোক দ্রষ্টার চোখে এসে আঘাত না হানা পর্যন্ত আলোক তরঙ্গ রূপে এগিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু এইটাই সব নয়। হাইগেন্সও বিশ্বাস করতেন না যে ব্যাপারটা এমনি সরল। আলোক বায়ুশূন্য স্থানও অতিক্রম করে যেতে পারে! এমনি বায়ুশূন্য স্থানে হাইগেন্সের কল্পিত আলোক তরঙ্গ বহন করবার কোনও বস্তু নেই। তাহলে এই বায়ুশূন্য স্থানের মাঝ দিয়ে আলোক তরঙ্গ বহন করে আনে কে? এই বিভ্রান্তিকর প্রশ্নটির জবাব দিতে গিয়ে হাইগেন্স একটা মজার জিনিস কল্পনা করে নিলেন। এমনি কল্পনা বিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর আগে ভূয়ো বিজ্ঞানীরা, পরে নিয়েছেন অব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাধকরা। তরঙ্গবাদ, বা আলোকরশ্মি ঢেউ খেলে চলে, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করলেন, ঈথর।

এই কল্পিত ঈথর বস্তুটি এক অতি রহস্যময় পদার্থ। এটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এমন কি কঠিন পদার্থের মাঝেও। আলো জেলির মত থলথলে এই ঈথরে কম্পন সৃষ্টি করে, তাই আলোক রশ্মি সম্পূর্ণ নির্বাত স্থানও অতিক্রম করে যেতে পারে। আরও বহু ক্ষেত্রে পরে বিজ্ঞানীদের এই ঈথরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হতবুদ্ধি বিজ্ঞানীদের বৃথা সমাধান সূত্র হাতড়ে মরার হাত থেকে উদ্ধার করেছিল এই ঈথর। বিজ্ঞান জগতের সৃষ্ট এই অলীক বস্তুটি প্রাচীন ও জরাজীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। যাঁরা ঈথরের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট, তারাই এখন এ নিয়ে মাথা ঘামান। যা হোক, এটা বোঝা গিয়েছিল যে, আলোকের ধর্ম অনুযায়ী তার চলাচলের জন্য চাই এমন এক ধরনের মাধ্যম, যার মাঝ দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করলেও, আলোক রশ্মির যাত্রাকালীন প্রাথমিক শক্তির এতটুকু ক্ষয় বা হ্রাস হবে না। তাহলে ঈথর বলে সত্যিই কি কোন বস্তু আছে?

মাইকেলসন ভাবলেন, ইউরোপের প্রধান বিজ্ঞানীরা যে প্রশ্ন নিয়ে তখনও মাথা ঘামাচ্ছেন, তার উত্তর হয়ত তিনি বার করতে পারবেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন ঈথর যদি কোনও বস্তু হয় এবং তা যদি সমুদ্রের মত পৃথিবীর চার দিকে ছড়ানো থাকে, তাহলে এই ঈথর সমুদ্র আলোক রশ্মি চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নদীর স্রোতের প্রতিকূলে এক মাইল নৌকা বেয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা নদী বক্ষে আড়াআড়ি ভাবে ঐ পথ নৌকা বেয়ে ফিরে আসার সময়ের চেয়ে বেশী। তাই আলোকরশ্মি যদি পৃথিবীর আবর্তন গতির সমকোণ ধরে এসে পড়ে তাহলে তা পৃথিবীর চারদিক ঘেরা ঈথর সমুদ্র দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিহত হবে। আর পৃথিবী ঘিরে যদি এই ঈথরের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে যে দিক দিয়েই আলোকরশ্মি এসে পড়ুক না কেন তাতে তার আসার সময়ের কোনও তারতম্য হবে না।

মাইকেলসন তাই নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করে দেখা স্থির করলেন। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে তিনি একটি আলোকরশ্মি প্রেরণ করবেন। সমদূরত্বে প্রেরণ করবেন আরও একটি আলোকরশ্মি, তবে এটি প্রেরিত হবে প্রথমটির সমকোন বরাবর। দুটি আলোকরশ্মিই শেষে ফিরে যাবে মূল যাত্রারম্ভ বিন্দুতে। যদি ঈথরের অস্তিত্ব থাকে তাহলে দুটি আলোক রশ্মি পৃথক পৃথক সময়ে মূল যাত্রারম্ভ

বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছাবে এবং ব্যভিচার (interference effect) সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ পরস্পরকে অতিক্রম করে যাবে এবং পালাক্রমে আঁধার ও আলোর পটি রচনা করবে। আর ঈথরের অস্তিত্ব যদি না থাকে, দুটি আলোকরশ্মিই যদি একই মুহূর্তে মূল যাত্রারম্ভ বিন্দুতে ফিরে আসে, তাহলে কোনও ব্যভিচার দেখা দেবে না।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আলোকই সর্বাধিক গতিসম্পন্ন বস্তু। তাই মাইকেলসনের পক্ষে দরকার হয়েছিল অতি নির্ভুলভাবে পরীক্ষা চালানোর। যন্ত্রের অতি ক্ষুদ্রতম ত্রুটি বিচ্যুতি বা পরিচালনায় ক্ষুদ্রতম ভ্রান্তিতে পরীক্ষায় অসম্পূর্ণ ফলাফল দেখা দেবে। এসব অসুবিধায় তিনি দমলেন না। পরীক্ষা চালানোর জন্য তৈরি করলেন একটি যন্ত্রের নক্‌সা। বার্লিনের এক যন্ত্র নির্মাতা তা দেখে যন্ত্র নির্মাণ করলেন।

এই নতুন যন্ত্র (ইণ্টারফেরোমিটার) সাহায্যে মাইকেলসন একটি আলোক-রশ্মিকে (A) অতি সূক্ষ্ম রূপার পর্দা ছাওয়া একখানা সমতল কাচের পাতের (B) উপর ফেলে, দু ভাগে ভাগ করলেন। এই রূপার পর্দা এতই পাতলা যে তাতে আলোকরশ্মির এক অংশ প্রতিফলিত হয়ে এগিয়ে যায় D-এর দিকে আর এক অংশ কাচের পাতভেদ করে যায় C-এর দিকে। দুটি আলোকরশ্মিই মোটামুটি সমান উজ্জ্বলতায় পাত থেকে নির্গত হয়ে আসে। মূল আলোকরশ্মির অর্ধাংশ তার সমকোণ বরাবর এগিয়ে যায় এবং অপরার্ধের সমান পথ অতিক্রম করে। যাত্রাশেষে মূল আলোকরশ্মির দুটি দ্বিধা বিভক্ত অংশই এসে একত্র মিলিত হয়। চিত্র দেখুন।
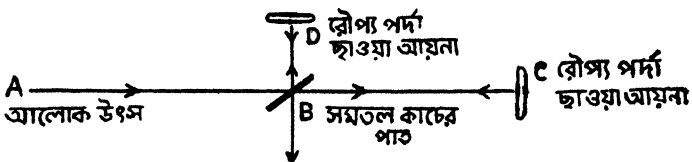
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে ক্লীভল্যাণ্ডের (ওহাও) কেস স্কুল অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন মাইকেলসন। (ইতিমধ্যে

তিনি নৌবাহিনীর কাজে ইস্তফা দিয়েছেন)। এখানে তিনি ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে আলোকের বেগ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার কাজও চলতে লাগল। ঈথর, বায়ু, জল ও কার্বন বাইসালফাইড মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে এ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

১৮৮৪ সালে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ কলেজের অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডব্লিউ মোর্লির (Edward W. Morley) দেখা হয়। ঈথরের অস্তিত্ব নির্বাচনের জন্য উভয়ে একত্র আর এক দফা পরীক্ষা চালানো স্থির করেন। ১৮৮৭ সালে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষা পরে মাইকেলসন মোর্লি ঈথর সম্প্রবাহ পরীক্ষা নামে খ্যাতি লাভ করে। এতে মাইকেলসনের তৈরি উন্নত ধরনের ইণ্টারফেরোমিটার ব্যবহৃত হয়েছিল। পরীক্ষা কম্পন, চাপ ও টানজনিত ভ্রমপ্রমাদ মুক্ত রাখতে অতিকায় সম্পূর্ণ ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রটি ভারী একটি প্রস্তর ফলকের উপর চাপিয়ে তরল পারদের উপর ভাসান হল। এবার যন্ত্রটি চালিয়ে ফলাফল দেখা হল। আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য মহাশূন্যে পৃথিবীর গতিপথের সমকোণ ধরে প্রস্তরফলকে স্থাপিত সমগ্র যন্ত্রটিকে ঘোরানো হল। যন্ত্রটিকে যে কোন দিকেই ঘোরান যাক না কেন কোনও ভাবেই ঈথর দ্বারা আলোকরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হবার কোনও প্রমাণ পেলেন না মাইকেলসন ও মোর্লি, কোনও স্থাণু নিশ্চল ঈথরও দেখতে পেলেন না।

মাইকেলসন অবশ্য জানালেন যে স্থির নিশ্চল ঈথর না থাকলেও তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায়। 'এই অনুমানের সাহায্য নিয়ে যে পৃথিবী তার সঙ্গে প্রায় সমগতিতে চতুর্দিকের ঈথর সমুদ্র টেনে নিয়ে চলেছে, তাতে ঈথর ও পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের আপেক্ষিক গতি থাকছে শূন্য বা যৎসামান্য।'

আলোর প্রকৃতি সম্পর্কিত সমগ্র সমস্যাটি, ঈথরের প্রকৃতি, পরম গতির (Absolute motion) অর্থ, এ সবই তখনও ছিল বিতর্কমূলক বিষয়। পরম গতি বলে কোনও কিছু আছে কিনা তা নির্ণয় করতে কি আলোকের ব্যবহার চলে? যদি ঈথরের অস্তিত্ব থাকে তবে তা কি নিশ্চল? এই সব প্রশ্নে পরস্পর বিরোধিতা ও অসঙ্গতি ছিল। ঈথরের যদি অস্তিত্ব থাকেও তাহলেও পরীক্ষায় মাইকেলসন ও মোর্লি যে নেতিবাচক ফলাফল দেখতে পেয়েছিলেন তারও হয়ত সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ ১৮৯৫ সালে দুজন

বিখ্যাত গণিত তত্ত্ববিদ পৃথকভাবে, মাইকেলসন মোর্লির পরীক্ষা মেনে নেওয়া ও সেই সঙ্গে ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করার অসুবিধা দূর করার পথের ইঙ্গিত দিলেন। ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের জর্জ এফ ফিট্‌জেরাল্ড ও লীডেনের হেনড্রিক এ লরেনজ এক অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁদের জটিল গণিতিক যুক্তিতর্ক শেষ পর্যন্ত যাতে এসে দাঁড়ায় তা হল এই : কোন বস্তুর বেগ যদি প্রচণ্ডভাবে বাড়ান যায় তা হলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য কার্যত কমে আসে। অন্যভাবে বলা চলে কোনও নির্দিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করছে যে কাঠিটি তা যখন তার দৈর্ঘ্য রেখা বরাবর মহাশূন্যে বিপুল বেগে ছুটতে থাকে তখন তার আকার হ্রস্বতর হয়ে আসে। প্রকৃত সঙ্কোচন, অর্থাৎ যষ্টিটির স্থির নিশ্চলাবস্থায় ও প্রচণ্ড গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্যের পার্থক্য নির্ভর করে তার গতিবেগের উপর।

সনাতনপন্থী পদার্থবিজ্ঞানী এরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় বিচলিত হলেন। তাঁরা বললেন, দণ্ডটি যত দ্রুতই দৈর্ঘ্যরেখা বরাবর ছুটুক না কেন, তার দৈর্ঘ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হতে কেউ দেখেনি। কথাটা অবশ্য সত্য। কিন্তু বাস্তবে ইঞ্জিনিয়ারগণ যে বেগ নিয়ে কারবার করেন লরেন্‌জ ফিট্‌জেরাল্ড তার কথা বলেন নি। যে বেগের কথা তাঁরা বলেছেন, তা বুলেটের গতিবেগের চেয়েও বেশী। তাঁদের এই হিসাবের আঁকজোখ অনুযায়ী ঘণ্টায় ৩০০ মাইল গতিতে চলা একটি যষ্টির শতকরা এক ভাগের দশ নিখর্ব ভাগ হ্রাস পাবে। এই সঙ্কোচন এতই ক্ষুদ্র যে যন্ত্রে তা ধরা যায় না। অবশ্য সেকেণ্ডে ৯০০০০ হাজার মাইল বেগ ধরে হিসাব করলে কাগজে কলমে এই সঙ্কোচনের মাত্রা দাঁড়াবে শতকরা তেরো ভাগ। গতিবেগ আরও বাড়ালে এই সংকোচনের শতকরা হারও বাড়বে। এই বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইলে (আলোকের গতিবেগে) আনলে সঙ্কোচনের শতকরা হার কাগজে কলমে দাঁড়াবে এক শততে। অন্যভাবে বলা চলে আলোকের গতিবেগে চললে বস্তুরূপী যষ্টিটি সম্পূর্ণ সঙ্কোচনের ফলে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সমপরিমাণ তেজে রূপান্তরিত হবে।

লরেন্‌জ ফিট্‌জেরাল্ডের সঙ্কোচনবাদে যে বিষয় বিবৃত হয়েছিল মাইকেলসনের সিদ্ধান্তে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই নতুন মতবাদের দ্বারা বেশ খানিকটা প্রতীতি সহ মাইকেলসন মোর্লির পরীক্ষার আপাত নেতিবাচক ফলাফলের কারণ ব্যাখ্যা করা চলল, কারণ মার্কিন বিজ্ঞানীদ্বয় পরীক্ষা কালে ইণ্টারফেরোমিটারের বাহুর সঙ্কোচন হিসাবের মধ্যে ধরেননি।

এই সঙ্কোচনের প্রভাব ঈথর সমুদ্র দ্বারা আলোক রশ্মির গতিবেগ মন্দায়নের তুল্য মূল্য। সাধারণ লোকের ত কথাই নেই, অধিকাংশ বিজ্ঞানীর নিকটও লরেন্‌জ ফিট্‌জেরাল্ড মতবাদ সম্পূর্ণ আজগুবি মনে হয়েছিল। কিন্তু গাণিতিক পদার্থ বিদ্যার একটু চিন্তাশীল ছাত্রেরা এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাটি আরও যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

লরেনজ ফিট্‌জেরাল্ডের মতবাদ অতি অভিনব। মাইকেলসনের ঈথর সম্প্রবাহ পরীক্ষার আপাত নেতিবাচক ফলাফল ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলেও এর ভিত্তি ছিল প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রের উপর। এই মতবাদ প্রাচীন পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের একেবারে ধরাশায়ী করতে পারেনি। আরও সুতীব্র বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া বাকী ছিল তাদের। সুদূর ১৮৮১ সালে মাইকেলসন যে পরীক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন, ইলেকট্রন, একস্‌-রে ও তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে যে সব ভূরি পরিমাণ তথ্য এসে জমা হয়েছিল, তা থেকেই এল এই প্রচণ্ড বিস্ময়ের চমক। ১৮৯৭ সালে জে জে টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করলেন। প্রমাণ করলেন যে জড় পদার্থ তড়িৎধর্মী। রেডিয়াম সম্বন্ধে গবেষণা কালে দেখা গিয়েছিল বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনগুলি ইতিপূর্বেই যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও ঢের বেশী বেগে ছুটে চলে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ১৯০১ সালে কাফম্যান হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখালেন, প্রায় আলোকের বেগ সম্পন্ন রেডিয়াম বিচ্ছুরিত ইলেকট্রন কণাসমূহের ভর পরিবর্তন ঘটে। এই ভর পরিবর্তন নির্ভর করে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রন কণার বেগের উপর। অন্য ভাবে ব্যাপারটা বলা চলে, নিউটনের মত অনুযায়ী ভর ধ্রুব নয়। তেজ দানা প্রমাণ, ফোটন সমন্বয়ে বা এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণ্ডিল দ্বারা গঠিত, ১৯০০ সালে ম্যাকস্‌ প্ল্যাঙ্ক তেজ সম্বন্ধে তাঁর এই মত প্রচার করেও প্রাচীন পদার্থ বিদ্যার ভিত চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মাইকেলসন মোর্লির পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যা এক কাণাগলিতে এসে ঠেকেছিল। যদি ঈথর না থাকে তা হলে আলোক কিসের দ্বারা বাহিত হয়? পদার্থ বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলি মাইকেলসন মোর্লির পরীক্ষার ফলাফলের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারল না।

আইনস্টাইন যখন সুইজারল্যান্ডের বার্ণে পেটেন্ট পরীক্ষকের কাজ করছিলেন, তখনই ঈথর সম্প্রপাতের জটিল সমস্যা, আলোর গতিবেগ,

ভরের অপরিবর্তনীয়তা, জড় ও শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। গণিত ও পদার্থ বিদ্যার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ তীক্ষ্ণধী ছাত্ররূপে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ম্যাকস্ওয়েলের আলোকের তড়িৎচ্চুম্বকীয় মতবাদ ও ইলেকট্রন সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞান অনুযায়ী তিনি চলমান বস্তুর তড়িৎ-গতি সম্পর্কিত সমস্যার পুনপরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হলেন। লরেনজ ও তাঁর সহচর পদাথ বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে পরম গতি বলে একটা জিনিস আছে। এই তথাকথিত পরম গতি দর্শকের বা যে বস্তুর (যেমন পৃথিবী) সম্বন্ধে একথা বলা হয় তার অবস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ও ধ্রুব। সমকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেও আনইস্টাইন এই মত মেনে নেবার কোনও কারণ দেখতে পেলেন না। পরম গতির এই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করলেন তিনি। আঁকজোক কষে বার করলেন নিজস্ব গাণিতিক সমাধান। ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিকবাদ নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধরূপে তা প্রকাশিত হল। এই সময় আইনস্টাইনের বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা পালটে দিলেন। স্থান এমন কি কাল সম্বন্ধেও আমাদের সমগ্র ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ পদার্থ বিদ্যার প্রাঙ্গণ থেকে সমগ্র পরমগতির ধারণা চিরতরে নির্বাসিত করল। পরম গতি বা পরম স্থিতি বলে কোনও কিছু নেই। গতিকে, পৃথিবী সূর্য বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর বা কাঠামোর (Framework) সঙ্গে বিচার করতে হবে। গতি আপেক্ষিক, পরম নয়।

বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ স্যার আর্থার এডিংটন একবার পরম গতি ও আপেক্ষিক গতির অর্থ বোঝাতে একটি মজার উপমা দিয়েছিলেন। মনে কর কোনও লোক লিফটে বন্ধ হয়ে মহাশূন্য দিয়ে নিচে পড়ছে। পড়ার সময় মহাকর্ষের টানে তার গতি বেড়ে চলেছে। লোকটি পৃথিবী বা তার মহাকর্ষের কথা জানে না। পকেট থেকে সে এবার একটি আপেল বার করে হাত টান করে সেটি হাত থেকে ফেলে দিল। আপেলটি শূন্যে ভাসতে লাগল, লিফ্টের তলদেশে পড়ল না। কারণ আপেলটি লিফটের সমান দ্রুত বেগে পড়ছে। কাজেই লিফটের চেয়ে বেশী দ্রুত বেগে নিচের দিকে পড়তে পারে না। লিফটের মধ্যকার লোকটির নিকট

আপেলটিকে মনে হবে গতিহীন। লোকটি এবার পকেট থেকে আর একটি আপেল বার করে, হাত মেলে পূর্বেকার আপেলটির সমান লেভেলে অথচ সেটির তুলনায় তার দেহের আরও কাছে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় আপেলটিও শূন্যে দৃশ্যতঃ নিশ্চল ভাসবে। মনে করা যাক, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি এক ফুট দূরে ছাড়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর লোকটি লক্ষ্য করবে দুটি আপেল একই উচ্চতায় স্থির থাকলেও কিন্তু দুটির মধ্যকার ব্যবধান যেন কমে এসেছে। তখন লিফ্টের ভিতরের মানুষটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইবেন যে আপেল দুটি পরস্পরকে আকর্ষণ করেছে, তাই পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে।

লিফটের বাইরে থেকে কোনও পর্যবেক্ষক কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যাপার লক্ষ্য করবেন। তিনি দেখবেন, পৃথিবীর মহাকর্ষ টান দ্বারা আকর্ষিত হয়ে আপেল দুটি মহাশূন্য দিয়ে নেবে আসছে। ছুটে চলেছে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে। দুটিরই গতিপথ তাই কাছাকাছি চলে আসছে, দুটি আপেলের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে আসছে। মহাকর্ষ টানই আপেল দুটির মধ্যকার দূরত্ব হ্রাসের জন্য দায়ী, লিফটের মধ্যে আবদ্ধ লোকটির ধারণা অনুযায়ী আপেল দুটির মধ্যকার কোনও অজ্ঞাত আকর্ষণ নয়। বেগ তা হলে কি? গতি কি চরম? অর্থাৎ সাধারণতঃ যা মনে করা হয়। পর্যবেক্ষকদের অবস্থিতি ও গতি নিরপেক্ষ একই ধরনের, না গতি আপেক্ষিক, পর্যবেক্ষকের অবস্থিতি ও গতির উপর নির্ভরশীল? আইনস্টাইন দেখালেন যে পরম গতি বলে কোনও কিছু নেই—সব গতিই আপেক্ষিক।

আইনস্টাইন আরও দেখালেন যে পরম বা চূড়ান্ত বলা যায় এমন খুব কম জিনিসই আছে। তা হলেও কিন্তু শব্দটা আলোর বেগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। তিনি প্রমাণ করলেন যে, আগে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে ধারণাই থাক না কেন, আলোর বেগই প্রকৃতির স্বল্প সংখ্যক অপরিবর্তনীয় ধ্রুবকের একটি। এটি সকল পর্যবেক্ষকের পক্ষেই সমান এবং আলোক উৎসস্থান নিরপেক্ষ। এই সিদ্ধান্ত মাইকেলসনের পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে খাপ খায়। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইন বার্লিনে ফিরে এসে সাধারণ আপেক্ষিকবাদ নামক তাঁর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর অংশগ্রহণ সমর্থন করতে অস্বীকার করায় তিনি এর আগে বার্লিন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পদার্থ বিজ্ঞানের এই বিরাট ভাঙ্গাগড়ার যুগে মাইকেলসনের এই পরীক্ষাটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মৌলিক গুরুত্বসূচক। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের নিকট লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন মাইকেলসনের নিকট তাঁর ঋণের কথা এই ভাবে বর্ণনা করেন, "বিশেষ আপেক্ষিকবাদের সূত্রের যথার্থতায় আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর করতে মাইকেলসনের পরীক্ষা যে আমার গবেষণার কাজের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে, তাঁর এই পরীক্ষাও তার ফলাফল জানবার আগেই আমি আমার এই সূত্রের যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। যা হোক, মাইকেলসনের পরীক্ষা আলোক বিদ্যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কার্যতঃ সব সন্দেহ দূর করল এবং দেখিয়ে দিল যে পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে গভীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।"

আইনস্টাইন এই আপেক্ষিকবাদের বোমা ফাটানর পর বিজ্ঞানী মহলে যে বিরাট বিতর্ক দেখা দিল তা অবিস্মরণীয়। গবেষণাগারের পরীক্ষার দ্বারা এই সূত্রের যথার্থতা যাচাই করার যখন চেষ্টা চলছে, তখনই বিশ্বের কয়েকজন সেরা গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ সমর্থন করলেন। আইনস্টাইন তাঁর এই মতবাদ এমন অকাট্য যুক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আর সেই সূত্র সংক্রান্ত গণিতের হিসাব ছিল এমনি নিখুঁত যে তাঁরা আপেক্ষিকবাদে প্রদত্ত নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। অতি সতর্ক বিজ্ঞানীর নিস্পৃহতা নিয়ে মাইকেলসন এই বিতর্ক লক্ষ্য করতে লাগলেন। এমনি সতর্ক বিজ্ঞানীরা ...ও বির্তক মূলক বিষয়ে সমস্ত তথ্য প্রমাণ সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং ...শ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত না শোনা পর্যন্ত কোনও মতামত প্রকাশ করতে চান না। তিনি স্বীকার করলেন যে, আইনস্টাইনের গাণিতিক সমীকরণগুলি নির্ভুল, কিন্তু যুক্তি পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মাইকেলসন প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদ ছিলেন না। গণিত অপেক্ষা পদার্থ বিদ্যার ছাঁচেই তিনি চিন্তা করতেন। উদ্ঘাতন যুক্ত সমীকরণ থেকে পৃথক রাশি বা প্রতীক অপনয়ন করে করে সেটিকে জটিলতা মুক্ত করে কোন সরল সূত্রে পরিণত করার দক্ষতা অবশ্য তাঁর ছিল। আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে তিনি খুব কম কথাই বলেছেন। এর গুণাগুণ সম্বন্ধে লিখেছেনও কম। নতুনতর পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর কোনও সক্রিয় আকর্ষণ ছিল না। রঞ্জন রশ্মি ও জীম্যান প্রতিক্রিয়া (চুম্বক প্রভাবে

বর্ণালী রেখার বিস্তৃতি) সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করলেও, তাপগতিবিদ্যা, তেজস্ক্রিয়তা, ইলেকট্রনিক ও কোয়াণ্টা সম্বন্ধে কোনও গবেষণা করেননি।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের সময় মাইকেলসন ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে পড়াতে হত অল্প সময়ের জন্যই। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্ররা বিশেষ করে তাঁর অধ্যাপক জীবনের প্রথম দিকের ছাত্রগণ—তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তাদের মনে হত মাইকেলসনের পাণ্ডিত্য তাদের নাগালের বাইরে। আর তিনি যেন ছাত্রদের নিকট হতে তাদের শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত মেধা দাবী করেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইকেলসন গবেষণা করতে লাগলেন। পড়ানোর চেয়ে গবেষণার কাজেই তাঁর মন ছিল বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সভায় কচিৎ কখনও যোগ দিতেন। গবেষণার কাজে তিনি তাঁর স্নাতকোত্তর কোনও ছাত্রের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তাঁর নিজস্ব কর্মচারীদের মধ্যে সর্বদা একজন সুদক্ষ নক্সাকার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে দক্ষ কারিগর থাকত। গবেষণার কোনও সূত্র বা ভাব মাথায় এলে ধীরমস্তিষ্কে গভীর চিন্তাসহকারে ধীরে ধীরে তিনি সেটিকে বিস্তারিত করে তুলতেন। যখনই বুঝতেন যে পরিকল্পিত গবেষণাটি কার্যোপযোগী, তখনই তিনি সেটির নক্সা ছকে ফেলতেন এবং তাঁর যন্ত্রপাতি নির্মাতাকে ডেকে পাঠাতেন। যন্ত্রপাতি নির্মাণের ফরমায়েস দেবার সময় সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতেন, আশা করতেন যে প্রথমবার নির্দেশ নেবার পর যন্ত্রনির্মাতা তাঁর পরিকল্পিত যন্ত্রটি নিখুঁত ভাবে তৈরি করে এনে দেবে। এর মাঝে আর কোনও নির্দেশ বা পরামর্শ নেবার তার প্রয়োজন হবে না।

মাইকেলসনের মাঝে কিছু পরিমাণে ছিল শিল্পী ও সৌন্দর্যপিয়াসীর মন। জলরঙা ছবি আঁকার, বেহালা বাজানোর সখও তাঁর ছিল। কবির যেমন কাব্য সৃষ্টি, তেমনি দৃষ্টিতেই দেখতেন তিনি তার পদার্থ বিজ্ঞান সাধনা। লাউয়েল ইনস্‌টিটিউটে এক বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, 'কোনও কবি যদি পদার্থ বিজ্ঞানীও হন, তা হলে তাঁর পক্ষে আলোক তত্ত্ব তার মনে যে আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও প্রায় মুগ্ধ বিস্ময় সৃষ্টি করে তা তিনি অতি নিপুণভাবে

প্রকাশ করতে পারবেন। আমি স্বীকার করি, বিজ্ঞানের শিল্প ও সৌন্দর্যের দিকটিও আমার কাছে কম আকর্ষণীয় নয়।"

তাঁর প্রকৃতির এই শিল্প ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও পরীক্ষা গবেষণা বিষয়ে তার অতি নিপুণ তৎপরতাই তাকে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকরূপে গড়ে তুলেছিল। নিখুঁতভাবে কাজ করার উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। লক্ষ্যস্থলে পৌছাবার জন্য ছিল তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই গুণগুলিই তাঁকে আমেরিকার অন্যতম বিশিষ্ট গবেষকের মর্যাদা এনে দিয়েছিল। পদার্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে কি ধরনের? তাঁর ধারণা ছিল, আগামীকালের পদার্থ বিদ্যা হবে আরও সূক্ষ্মতর, এমন সব সূক্ষ্ম সুবেদী যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, যা দিয়ে ষষ্ঠ দশমিক পর্যন্ত নির্ভুলভাবে বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের কাজ চালানো যাবে। আগামী যুগের পদার্থ বিদ্যা হবে পুরানো পদার্থ বিদ্যারই পরিশীলিত রূপ। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছেন। কারণ তাঁর নিজের গবেষণাই পদার্থ বিজ্ঞানে এক নতুন বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল। পরবর্তী যুগে পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে লাগল তাঁর ধারণা অনুযায়ী সূক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের সুবিধা লাভ থেকে নয়, গাণিতিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যাবলীর আংশিক বিচার বিশ্লেষণ থেকে, এমনি বিচার বিশ্লেষণ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে গতি, সময়, কাল, তেজ ও জড় নতুন সংসার সৃষ্ট হয়েছে।

ইথর সম্প্রপাত সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা ছাড়া, মাইকেলসন সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরাট ভাঙ্গাগড়ার কাজে কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনা তাকে বিশেষ বিচলিত করত না। যুক্তরাষ্ট্রের'সামরিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি অবশ্য স্বতন্ত্র। স্পেন কর্তৃক মেইন জাহাজ ডুবানোর কথা শিকাগো বিদ্যালয়ে পৌছাতেই তিনি স্পেনের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলতে থাকেন। অন্য সকলে যখন এ বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সমস্ত তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং সংগৃহীত তথ্য সযত্নে বিচার বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত কোনও সত্যিকারের বিজ্ঞানী কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করেন না, তখনই তিান দেশের সম্মান রক্ষার্থে অবিলম্বে স্পেনের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণার দাবী তোলেন। পরে প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি পুনরায় সামরিক

বাহিনীতে যোগ দেন। লেফটানেন্ট এর পদে নিয়োগ করে তাকে এ সময় ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠান হয়। এই সময় তিনি কতকগুলি সরকারী প্রকল্পে বিশেষ করে কামানের রেঞ্জ ফাইণ্ডার (পাল্লা নির্দ্ধারণকারী যন্ত্র) আরও নিখুঁতভাবে গড়ে তুলবার কাজে নিযুক্ত হন। একটি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেঞ্জ ফাইণ্ডার উদ্ভাবনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এটি পরে আমেরিকার নৌবাহিনীর ব্যবহার্য সাধারণ যন্ত্রপাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে মাইকেলসন পুনরায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন। ত্রিশ বছর আগে যে বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল এবার তিনি সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ঈথরের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য মাইকেলসন ইণ্টারফেরোমিটার নামে একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯০ সালে যন্ত্রটির বর্ণনা দেবার সময় তিনি আর একটি কাজে এটির সম্ভাব্য প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, খণ্ডগ্রহ, উপগ্রহ এবং সম্ভবত নক্ষত্রের দৃশ্যমান আকার নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। নক্ষত্রগুলি পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে। সাধারণ দূরবীনে তাই এগুলির দৃশ্যমান আকার নির্ধারণ করা চলে না। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ডাইরেকটর জর্জ এলিরি হ্যালির আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়ে কতকগুলি নক্ষত্রের ব্যাস নির্ধারণের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই পরীক্ষাকালে তাকে সাহায্য করেন ফ্রান্সিস জি পিজ। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে মাইকেলসন এই পরীক্ষা শুরু করেন। পিজ সেই বছর ডিসেম্বর মাসেই কতকগুলি নক্ষত্রের প্রথম চূড়ান্ত ব্যাস নির্ণয়ে সক্ষম হলেন। এই কাজের জন্য তারা বিশেষভাবে নির্মিত কুড়ি ফুট দীর্ঘ ইনটারফেরোমিটার ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রটিকে ক্যালিফোর্নিয়ার পাসেডেনা শহরের নিকটবর্তী উইলসনের পর্বতে স্থাপিত মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। তখনকার দিনে এইটিই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণযন্ত্র।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানী মাইকেলসনই প্রথম নক্ষত্রের ব্যাস নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যুজ্জ্বল আর্দ্রা নক্ষত্রের ব্যাস প্রায় ২৪ কোটি মাইল—বিশ্ববাসী যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হতচকিত হয়ে গেল এই খবর শুনে। আশ্চর্য! এই নক্ষত্রটির ব্যাস আমাদের সূর্যের চেয়েও

২৫০গুণ বেশি। বস্তুত এই নক্ষত্রটির তুলনায় আমাদের সূর্যদেব ত পুঁচকে বামন। মাইকেলসনের এই পরীক্ষা বিশ্ববাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

মাউন্ট উইলসনের মানমন্দিরে ফিরে এসে আলোকের গতিবেগ ও ঈথর সম্প্রপাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা চালানোর জন্য হ্যালি মাইকেলসনকে আর একবার আমন্ত্রণ করলেন। কেস স্কুল অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের ডেটন সি মিলার ঈথর সম্প্রপাত সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা চালান এবং দাবী করেন যে ঈথরের অস্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রার প্রমাণ তিনি পেয়েছেন এইসব পরীক্ষা থেকে। ঈথরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, এ প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য আর একবার পরীক্ষা কার্যের অনুষ্ঠান তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর পর ফিরে এলেন মাইকেলসন। উইলসন পর্বতের চূড়ায় স্থাপন করলেন তাঁর নতুন যন্ত্রপাতি। এখান থেকে আলোক রশ্মি পাঠালেন এণ্টনিও পর্বতের চূড়ায়। সেখানে আবার এই আলোক রশ্মি পুনরায় উইলসন পর্বতের চূড়ায় প্রতিফলিত করার জন্য আর একটি দর্পণ স্থাপন করা হয়েছিল। পাঁচ দফা পৃথক পৃথক হিসাব নেওয়া হল। আলোকের গতিবেগের হার পাওয়া গেল গড়ে সেকেণ্ডে ২৯৯,৭৯৬ কিলোমিটার। এই সব পরীক্ষায় এবারও ঈথরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না।

মাইকেলসনের শেষ পরীক্ষার বিষয়বস্তুও এই আলোকের গতিবেগ। কুয়াশা, ধোঁয়া এমন কি আবহমণ্ডলের বাধা অতিক্রম করে আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করার সঙ্কল্প করেছিলেন তিনি। শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে যদি সম্ভব হয়, সম্পূর্ণ নির্বাত স্থানের মধ্য দিয়ে ছুটন্ত আলোক রশ্মির সাহায্য নিয়ে তিনি এবার আলোকের গতিবেগ নির্ধারণের পরীক্ষা করতে চান। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে পুনরায় আমন্ত্রিত হলেন মাইকেলসন, এই পরীক্ষা কার্য চালানর জন্য। বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স তখন সাতাত্তর। তবু পরীক্ষা চালাতে তাঁর অসীম আগ্রহ। রকফেলার ফাউণ্ডেসান, কার্ণেনী কর্পোরেশন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আর সেই মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির—সকলে সহযোগিতা করলেন এই পরীক্ষায়। প্রয়োজনীয় অর্থ জোগালেন এরা, সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই পরীক্ষার পরিকল্পনায় ও খুটিনাটি বিবরণী বিস্তৃতভাবে ছকে দিলেন

মাইকেলসন। এই ছক অনুযায়ী পরীক্ষা কার্য চালানোর ভার দিলেন, ফ্রান্সিস জি পিস্ ও ফ্রেড পিয়ারসন নামে তাঁর দুজন সহকারীর উপর।

সান্টা এনার নিকট আরভিন র‍্যাঞ্চে পরীক্ষা কার্য চালানোর জন্য একটি স্থান নির্বাচিত হল। ধাতুপ্রলেপ দেওয়া ইস্পাতের চাদর দিয়ে তিনফুট ব্যাসযুক্ত এক মাইল দীর্ঘ একটি বিরাট নল নির্মাণ করা হল। ষাট ফিট লম্বা এক একটি অংশ রিভেট করে এবং ঝালাই করে এই বিরাট নলটি নির্মিত হয়েছিল প্রেষিত বাতাসের টারবাইনের সাহায্যে অতি কোমলায়নিত চশমার কাঁচ দ্বারা তৈরি বত্রিশপলযুক্ত একটি দর্পণকে তার অক্ষদণ্ডের উপর ফেরানোর ব্যবস্থা করা হল। ভ্যাকুয়াম পাম্পের দ্বারা শুষে সমগ্র নলটি বায়ুশূন্য করা হল যাতে নলের মধ্যে বায়ুর চাপের পরিমাণ দাঁড়ায় আধ মিলিমিটার পারার সমতুল্য, তুলনায় তখন নলের বাইরে স্বাভাবিক বায়ুর চাপের পরিমাণ ৭৬০ মিলিমিটার।

এই নলটির দুই মুখ বন্ধ ছিল। এই নিশ্ছিদ্র ও প্রায় বায়ুশূন্য নলের মধ্যে দুই প্রান্তের দুটি ঘূর্ণমান দর্পণের সাহায্যে আলোকরশ্মি প্রেরণ ও প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হল। এইভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভেজাল তথাকথিত ঈথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোকের গতিবেগ নির্ধারণের ব্যবস্থা হল।

এই পরীক্ষার শেষ বছরে, কি তারও আগে থেকে মাইকেলসনের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর পক্ষে তখন নিজে পরীক্ষা চালান ও পরীক্ষা কালে নির্ণেয় মাপজোক গ্রহণ ও সমীক্ষণ করার কাজ করা সম্ভব ছিল না। এই কাজ তাই করতে হল পিয়ারসনকে। পিস সংগৃহীত তথ্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজ করতে লাগলেন। রোগ শয্যা থেকে মাইকেলসন নির্দেশ দিতে লাগলেন। মস্তিষ্কের রক্তকোষ সমূহ হতে রক্তক্ষরণের ফলে ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে মাইকেলসনের মৃত্যু হল। তখন তাঁর বয়স উনআশি বছর। নির্বাত স্থানে আলোকের গতিবেগ নির্ধারণের পরীক্ষণ চলতে লাগল। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চলল। এই পরীক্ষা থেকে শেষে বায়ুশূন্য স্থানে আলোকের গতিবেগের হিসাব পাওয়া গেল গড়ে সেকেণ্ডে ২৯৯,৭৭৮ কিলোমিটার (১৮৬,২৬৪ মাইল)। এই হিসাব ভবিষ্যতে বহুদিন পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ধ্রুবকরূপে গণ্য হবে। মৃত্যুর প্রায় দুসপ্তাহ আগে মাইকেলসন পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্টের ভূমিকা লিখে রেখে যান।

পৃথিবীর বহুস্থান হতে মাইকেলসন বিবিধ সম্মানে ভূষিত হন। আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসায়িটী, আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর দি এডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সেজ, ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সজ—যুক্তরাষ্ট্রের এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে এই পুরস্কার তিনিই প্রথম পেয়েছিলেন। এই বছরই, লণ্ডনের রয়েল সোসায়িটী তাঁকে কোপলে পদকে ভূষিত করেন। দীর্ঘকাল তিনি বেঁচে ছিলেন। এই সময়, শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও যে আমেরিকা নিঃসন্দেহে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে শুরু করেছে, তা তিনি লক্ষ্য করে গেছেন। নোবেল পুরস্কার পেয়ে মাইকেলসন যেমন ব্যক্তিগত ভাবে নিজে বিশ্বের নিকট হতে সম্মান লাভ করেছেন, তেমনি গৌরবান্বিত করে গেছেন আমেরিকাকেও। নিজের জীবদ্দশায় তিনি আরও অনেক আমেরিকাবাসীকে এই বিখ্যাত পুরস্কার লাভ করতে দেখে গেছেন। ১৯১২ সালে আলেক্সিজ ক্যারেল (ভেষজবিজ্ঞানে), দু বছর পরে থিয়োডোর ডব্লিউ রিচার্ড, (রসায়নবিজ্ঞানে), ১৯২৩ সালে রবার্ট এ মিলিকান (পদার্থবিজ্ঞানে), ১৯২৭ সালে আর্থার এইচ কম্পটন, (বিকিরণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য) নোবেল পুরস্কার পান। মাইকেলসন মারা যাবার আগের বছরে, কার্ল ল্যাণ্ডস্টাটনার, ভেষজ বিজ্ঞানে এই পুরস্কার পেয়েছেন। আরও পঁচিশ বছর বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন, এই সুদীর্ঘ তালিকায় আরও পঁচিশ জন বিজ্ঞানীর নাম যুক্ত হয়েছে।

॥ ১৫ ॥

টমাস হাণ্ট মর্গান

(১৮৬৬-১৯৪৫)

আমেরিকার বিজ্ঞানের বয়ঃসন্ধি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীব বিজ্ঞানের দুটি পুরাতন প্রশ্নের আলোচনা চলছিল। প্রথমটি হল জীব বিজ্ঞানের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : বীজ নিষেকের পর ভ্রূণ কোষ হতে কিভাবে জীবন্তপ্রাণীর সৃষ্টি হয়? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল জীবজগতে অভিব্যক্তির কার্যপ্রণালী কিভাবে চলে? কোন কৌশলে জীব দেহে কুল লক্ষণ (বংশগতির বৈশিষ্ট্য) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়? এ বিষয়ে 'ব্যক্তিজনিই জাতিজনির পুনরাবৃত্তি করে' উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রূণ তত্ত্বে ছিল এই মতবাদের প্রাধান্য। এর অর্থ ছিল এই, মাতৃগর্ভে পুষ্ট হওয়াকালীন কোনও প্রাণীর ভ্রূণের ক্রমপরিণতির কালে কোনও প্রাণীর ভ্রূণ যে যে প্রাণীরূপ অতিক্রম করে আসে প্রাণীটিও বিবর্তনকালে সেই সেই প্রাণীরূপের মধ্য দিয়েই বিশেষ প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির ভ্রূণের ক্রমপরিণতির ধরন পরীক্ষা করেই উপরোক্ত মতবাদ সত্য বলে জীববিজ্ঞানীদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল। যেমন, শূকরের ভ্রূণ ক্রমপরিণতি লাভ করে শূকর শাবকে পরিণত হবার আগে সরীসৃপ, মৎস্য, প্রভৃতি নিম্নবর্গের প্রাণীয় আকৃতি গ্রহণ করতে দেখা যায়।

এই মতবাদের প্রাধান্যের ফলে, জীববিজ্ঞান তখন যেন এক কানা গলিতে এসে পৌছেছিল। জীব বিজ্ঞানীদের নিকট তখন প্রশ্ন দাঁড়াল, বিবর্তনের পদ্ধতি ও বংশগতি সম্বন্ধে এই মতবাদই অসন্দিগ্ধ চিত্তে মেনে চলা হবে, না, দুঃসাহসে ভর করে এই গলির পথ ছেড়ে নতুন পথে এগোতে হবে? বাস্তব সম্মত নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির বিচার অতি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজন মেটালেন, আমেরিকার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী টমাস

হাণ্ট মর্গান। 'বংশানুক্রমের মূলাধার হল জিন' (Genes) এই তত্ত্ব প্রচার করে তিনি বিবর্তন পদ্ধতি ও বংশগতি সঞ্চরণ রহস্য ব্যাখ্যা করলেন।

মর্গানের পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ইংরাজ অভিজাত বংশোদ্ভূত। কেন্‌টাকি শহরে তাঁরা বাস করতেন। কলেজে পড়বার সময়, এই কেন্‌টাকি শহরের স্টেট কলেজেই ভর্তি হলেন মর্গান। জীবিকারূপে কোন পেশা গ্রহণ করবেন, প্রথমে সে সব কিছুই স্থির ছিল না। জীবতত্ত্ব ভাল লাগত মর্গানের। তাই সে দিকেই ঝুকলেন। মনে মনে প্রায় স্থির করে ফেলেছিলেন, ছাত্রজীবনের শেষে, জীবতত্ত্বকেই পেশারূপে গ্রহণ করবেন। পরে জনস্ হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভাল লাগল অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা ও শারীর বৃত্ত। এই দুইটি বিষয় নিয়েই সময় কাটতে লাগল তাঁর।

এই সময় ইউরোপে একদল জীব বিজ্ঞানী প্রচার করছিলেন যে গর্ভাশয়স্থ ভ্রূণের বিকাশ পদ্ধতি, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ এ পদ্ধতি বিজ্ঞানে অনধিগম্য ও অজ্ঞাত এক দৈব শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জীব বিজ্ঞানীদের বলা হত প্রাণবাদী বা অধ্যাত্মবাদী (Vitalist)। কিন্তু এর পর একদল জীব বিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তাঁরা ভ্রূণের বিকাশের প্রশ্নটি রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। যে কৌশলে গর্ভস্থ ভ্রূণ পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাঁরা তার রহস্যোদ্ঘাটন করতে চাইলেন। মর্গানের মন এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের প্রতি আকৃষ্ট হল। শারীরবিদ উইলহেলম রাক্‌স-এর একটি পরীক্ষা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। রাক্‌স রসায়ন প্রয়োগে একটি ভেকের বাড়ন্ত ভ্রূণের দুটি জীব কোষের একটি নষ্ট করে দেখিয়েছিলেন যে ভ্রূণটি তাতে সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়ে আংশিক ভেকের আকার নিয়ে পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে মানুষ শুধু ভৌত নয়, রাসায়নিক পরিবর্তনের সাহায্যে সত্য সত্যই ভ্রূণের পূর্বনির্দিষ্ট বিকাশের পথ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল। যৌন সংগম ব্যতিরেকে শুধু রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রণালীতে সী আরচিন নামে একটি সামুদ্রিক প্রাণীর অপুংজনি গর্ভোৎপাদন করে জ্যাক লোব বিজ্ঞান জগতে পরম বিস্ময়ের সঞ্চার করলেন। ইনি এবং অন্যান্য কলকৌশলবাদী (mechanists) জীববিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক কলকৌশলে ভ্রূণের বিকাশে নানারূপ পরিবর্তন সাধনের প্রলুব্ধকর

সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন। প্রাণবাদীরা এই কলকৌশলবাদী জীববিজ্ঞানীদের প্রবল বিরোধিতা করতে লাগলেন।

"প্রাণবাদীরা" বলতে লাগলেন শারীরিক রাসায়নিক পরিবর্তন বীজনিষিক্ত ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ শাবকে বিকশিত হবার বিস্ময়কর ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করতে পারে না। ভ্রূণ কোষে শুক্রাণু প্রবেশের পর গর্ভাবস্থায় যে সব ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা তাঁরা স্বীকার করতেন। তাঁরা জোর দিয়েই বলতেন তুলনায় এই তুচ্ছ পরিবর্তন ব্যতীত ভ্রূণের বিকাশ বিবর্তন ও শেষ পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করছে এক অদৃশ্য অলক্ষ্য শক্তি। অপর দিকে বিজ্ঞানের শক্তিতে বিশ্বাসী "কলকৌশলবাদী" জীববিজ্ঞানীরা বলতেন প্রকৃতির রাজ্যের সমুদয় ঘটনাই কোনও রহস্যময় বা দৈবশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিমুক্ত ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফল। এক সময় প্রতিটি অতিজটিল দেহী জীবও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে তৈরি করতে সক্ষম হবেন, একথা বিশ্বাস করতেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না।

১৮৯৫ সালে মর্গান গেলেন নেপলস্ এর পশুশালায়। সেখানে তার পাশের ঘরেই কাজ করতেন হানস্‌ড্রিস্। ভ্রূণ কোষে জীবের বিকাশের রহস্যের সব কিছুই পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। তরুণ "কলকৌশলবাদী" প্রাণীবিজ্ঞানীদের এই প্রত্যয়ে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে নিয়ত একথা ঘোষণা করে চলেছিলেন। তরুণ প্রাণীবিজ্ঞানীদের এই সঙ্ঘবদ্ধ অভিযানের সামনে "প্রাণবাদীরা" কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করে টিকে ছিলেন। দার্শনিক প্রাণবাদীদের দলে যোগ দিলেন। এই বিতর্কে মর্গান অবশ্য কোনও দলেই যোগ দিলেন না। 'প্রাণবাদ' ও প্রাণবাদীদের ব্যবহৃত এনটেলিচি (Entelechy) প্রাণবাদীদের মতে এই শক্তিই ভ্রূণকোষে সকল প্রাণীকেই উদ্দেশ্যমূলক লক্ষ্যের পানে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে গড়ে তোলে, প্রাণ প্রৈতি (Elan Vital) ও পবিত্রতাবাদ (Holism) প্রভৃতি যে সব কথা এই বিতর্কে টেনে আনা হত সে সব তাঁর কাছ নিছক শূন্যগর্ভ ঠেকত। তিনি বহু বারই বলেছেন আপ্তবাক্য আওড়ান যেমন যুক্তি নয়, তেমনি বিশ্বাস করতেন যে কোনও রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় শক্তির কথা এমনি ধরনের বিতর্কে টেনে আনা বিজ্ঞানচর্চার বিধিসম্মত নয়। তবে একথাও তিনি জানালেন যে পরীক্ষার ও প্রমাণের সমর্থনের সাহায্যে কল-কৌশলবাদ এখনও তার দাবী

প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। এ মতবাদ এখনও নিতান্তই সরল কল্পনা-মূলক।

বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সাধারণতঃ বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করতেন যে পরিবেশ প্রভাবেই ধীরে ধীরে জীবজগতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে শেষে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অনেকের কাছে এই ব্যাখ্যা খুব বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয়নি। বহু শতাব্দী ধরে চীনারা মেয়েদের পায়ের পাতা ছোট করবার জন্য ছেলেবেলা থেকেই লোহার জুতো পরিয়ে তাদের পা বেঁধে রাখত। সরকারী অনুশাসনে এই প্রথার পরে বিলোপ ঘটলে চীনা মেয়েদের পা বাঁধা বন্ধ হল। তখন কিন্তু মেয়েদের পায়ের পাতা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। যেন কোন কালেই পায়ের পাতা বাঁধার প্রথা প্রচলিত ছিল না তাদের। এক্ষেত্রে বহু শতাব্দী ধরে পুরুষানুক্রমে পায়ের পাতার স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ হলেও দেখা গেল তাতে স্বাভাবিক ভাবে ছোট পায়ের পাতাওয়ালা চীনা মেয়ে জন্ম নিচ্ছে না। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্ট পরিবেশে চীনা মেয়েদের পা ছোট হলেও সে বৈশিষ্ট্য উত্তর-পুরুষে সঞ্চারিত হচ্ছে না। পরিবেশ প্রভাবেই যদি উত্তর-পুরুষে কুল-সঞ্চারী বৈশিষ্ট্য দেখা না দেয়, তা হলে কি ভাবে এই বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়? তা হলে কি পরিবেশ ছাড়াও অন্য কোনও প্রক্রিয়া রয়েছে যার সাহায্যে এ কাজ চলে থাকে?

হিউগো দ্য ব্রিজ নামে একজন ওলন্দাজ জীববিজ্ঞানী দৈবাৎ একদিন আমস্টারডামের নিকট একটি মাঠে এক নতুন ধরনের সান্ধ্য প্রিমরোজ ফুল জন্মাতে দেখেন। এ গাছটি কেউ সেখানে লাগায়নি। আপনা থেকেই জন্মেছিল। এ ফুল গাছটি একটি নতুন ধরনের প্রজাতি কিনা, অর্থাৎ এ থেকে আবার এমনি ধরনের ফুল গাছ জন্ম নেবে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি এই ফুলের পঞ্চাশ হাজার বীজ বপন করলেন। যথা কালে দেখতে পেলেন প্রিমরোজ ফুলের এই নতুন প্রকরণের বীজ থেকে অনুরূপ ফুলের গাছ জন্ম নিচ্ছে। এর মধ্যে আবার কতকগুলি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গাছও জন্ম নিয়েছে। এগুলি খর্বাকৃতি। এ থেকে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে কোনও প্রজাতি থেকে অকস্মাৎ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে এবং এই নতুন প্রজাতির প্রজনন ক্ষমতাও থাকতে পারে। যে প্রণালীতে কোনও পুরাতন জীবকুল হতে নতুন লক্ষণাক্রান্ত জীব জন্ম নেয় ও বংশবৃদ্ধি করে দ্য ব্রিজ তার নাম দিলেন পরিব্যাক্তি (Mutation)।

এইখানে মিলল অভিব্যক্তির প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণার চাবিকাঠি: সজীব প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে পরিব্যক্তি লক্ষ্য করা। এই প্রথম বিজ্ঞানের হাতে এমন এক অস্ত্র এল, যার সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে বিবর্তন ও বংশগতির রহস্যোদ্ধার করা চলবে। ১৯০৯ সালে মর্গান এই অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বেশীর ভাগ জীববিজ্ঞানী টের না পেলেও এটা তখন তার কাছে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান যে পরিব্যক্তির ব্যাপারটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে 'জীব ও উদ্ভিদকুল সৃষ্টিতে পরিব্যক্তি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে কি ভাবে জীবজগতে অভিব্যক্তি ঘটল তার কার্যপ্রণালী নিয়ে জল্পনা কল্পনা করার দিন এখন অতীত হতে চলেছে।'

বিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর অনুসন্ধান কার্য এখন থেকে গবেষণাগারেই চালান যাবে। এমনি ধরনের অনুসন্ধান চালানোর পক্ষে সান্ধ্য প্রিমরোজ মর্গানের নিকট খুব সন্তোষজনক বলে মনে হল না। তিনি খুঁজছিলেন ক্ষণস্থায়ী কোনও জীব বা উদ্ভিদ, গবেষণাগারে বিভিন্ন অবস্থাধীনে যার সহজেই বংশবৃদ্ধি ঘটানো চলবে। ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, পায়রা, এমন কি এঁটেল পোকা নিয়েও পরীক্ষা চালালেন। শেষে একদিন একটি নতুন পতঙ্গের কথা শুনতে পেলেন।

ড্রসোফিলা মেলাজগাস্টার বা ভিনিগার ফ্লাই, খুব ছোট্ট একধরনের মাছি, প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা। সাধারণতঃ পচা ফলের উপর এগুলিকে বসতে দেখা যায়। এই মাছিগুলির ডিম একদিনে সরু শাদা শূকে পরিণত হয়। শূকগুলি আবার আরও দুই বা তিন দিন পরে (পুত্তলিতে) পরিণত হয়। পাঁচ দিন পর এই পুত্তলি থেকে বের হয় পাখাওয়ালা পূর্ণাঙ্গ মাছি। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি ফুটে বের হতে মাত্র দশ দিন লাগে। তাতে মাত্র এক বছরের মধ্যেই এই মাছি গুলির ত্রিশ পুরুষ জন্ম নেয়। সাধারণতঃ যে সব প্রাণী নিয়ে গবেষণাগারে জীববিজ্ঞানের পরীক্ষা চালানো হয়, সেগুলির বৃদ্ধি হার তুলনায় খুবই মন্থর। এদিক দিয়ে সেগুলির চেয়ে এই ছোট ছোট মাছিগুলি নিয়ে জীববিজ্ঞানের পরীক্ষা চালান খুবই সুবিধাজনক। মর্গান এমনি কতকগুলি ছোট ছোট মাছি সংগ্রহ করলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে জীবজগতের এই তুচ্ছ অনাদৃত প্রাণীটি সুপ্রজনন বিদ্যার পরীক্ষা ক্ষেত্রে একদা অতি বিখ্যাত হয়ে উঠবে। যেন ঘুটে কুড়ুনি মেয়ে রাতারাতি হয়ে দাঁড়াল রাজরানী।

১৯০৯ সালের সেই প্রথম বছরের শরৎ ও শীত কালে এই মাছিগুলিকে নানা ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থাধীনে রেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন যে এর ফলে কোনও নতুন প্রজাতি বা পরিব্যক্তি দেখা দেয় কিনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার দিক দিয়ে কোনও উৎসাহজনক ফল দেখা গেল না। তারপর ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে দেখা গেল শাদা চোখওয়ালা একটি মাছি জন্ম নিয়েছে। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, পচা ফলে বসা মাছিগুলির চোখ হয় সাধারণতঃ লাল। এবার মর্গান হাতে পেলেন একটি সুস্পষ্ট পরিব্যক্তিযুক্ত প্রাণী; এটি তিনি বংশগতির পরীক্ষাকার্যে ব্যবহার করতে পারবেন। এই শাদা চোখো মাছির সঙ্গে তিনি সাধারণ লাল চোখো মাছির বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করা স্থির করলেন। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, এমনি ভাবে একটি আগস্টিনিয়ান মঠের বাগিচায় মেণ্ডেলীয় তত্ত্বের উদ্ভাবক তরুণ সন্ন্যাসী গেগর মেণ্ডেল হলদে মটর-শুঁটির সঙ্গে সবুজ মটরশুঁটির মিশ্র জননের সাহায্যে সঙ্কর মটরশুঁটি উৎপাদন করেছিলেন।

মনন ও পরীক্ষা কার্যের প্রভূত সময় পাবেন বলে ম্যাণ্ডেল যাজকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। যাজক জীবন গ্রহণের আগে কিভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্য জীবের মাঝে সঞ্চারিত হয়, এসম্বন্ধে তিনি কিছু গবেষণাও করেছিলেন। যাজক সন্ন্যাসীর জীবনেও তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। উন্নত শ্রেণীর গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রজনন কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা তাঁকে এ কাজে খুবই সাহায্য করে। এদের এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ধরতে পারেন যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর প্রাণী সর্বদা অনুরূপ প্রাণীর জন্ম দেয় না, শুধু জন্মদেবার ঝোঁক দেখায়। মেণ্ডেল অবাক হয়ে ভেবেছিলেন বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের কোনও গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা? এক সঙ্গে এক জোড়া বিষম কৌলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত চারা গাছের বংশগতি সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষা করার কাজে তিনি লেগে গেলেন।

যে বছর মর্গানের জন্ম হয়, সেই বছরই মেণ্ডেল তাঁর সাত বৎসর ব্যাপী উদ্ভিদ প্রজননের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। এই পরীক্ষা কালে তিনি লক্ষ্য করেন যে কোনও লম্বা জাতের মটরশুঁটি গাছের সঙ্গে যখন সেই প্রজাতির কোনও বেঁটে জাতের মটরশুঁটি গাছের মিশ্র জনন করা হয়, তখন তা থেকে যে সংকর মটরশুঁটি চারা উদ্ভব হয় তাতে প্রথম পুরুষে সবগুলিই হয় লম্বা জাতের। এবারের মটরশুঁটি চারাগুলির নাম দিয়েছিলেন 'এফ-১'। এই

লম্বা 'এফ-১' জাতের মটরশুঁটি চারার ফুল যখন আবার এই জাতের মটরশুঁটি ফুলের রেণু দ্বারা পরাগিত হয়ে ফলোৎপন্ন করল, আর সেই বীজ থেকে যে নতুন গাছ জন্মাল, তখন দেখা গেল তার প্রতি তিনটি হয়েছে লম্বা জাতের, একটি বেঁটে জাতের। সবগুলিই লম্বা জাতের চারা ফলেনি এবার। এই দ্বিতীয় পুরুষের চারাগুলির নাম দেওয়া হল 'এফ-২'। প্রতি তিনটিতে একটি কৌলিক 'বৈষম্য'—এই মেণ্ডেলীয় সমানুপাতিক হার শুধু একটি কৌলিক বৈশিষ্ট্য সূচক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বহু সংখ্যক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই হার সুনির্দিষ্ট নয়, গড়পড়তা। মিশ্র জননের বীজ থেকে প্রথম পুরুষে কোনও বেঁটে জাতের মটরশুঁটি দেখা দেয়নি। বেঁটে জাতের গাছ দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় পুরুষে। কাজেই বেঁটে জাতের গাছের বৈশিষ্ট্যকে এখানে ধরা হল প্রচ্ছন্ন, লম্বা জাতের গাছের বৈশিষ্ট্যকে বলা হল প্রকট বা প্রধান (বংশজাত বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যের সূত্র)। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে দ্বিতীয় পুরুষে ('এফ-২') বেঁটে গাছের ফুল ঐ জাতেরই অন্য গাছের ফুলের রেণুর দ্বারা পরাগিত হয়ে ফলোৎ-পাদন করলে তা থেকে আবার যখন নতুন গাছ জন্মায়, তার সবগুলিই হয় বেঁটে জাতের। কিন্তু এই দ্বিতীয় পুরুষের লম্বা জাতের দ্বারাই যদি আবার এমনি জাতের রেণুতে পরাগিত হয়ে ফলোৎপাদন করে, তখন সেই ফল থেকে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের গাছ। এর মাত্র এক তৃতীয়াংশ হয় লম্বা ধরনের। বাকী দুই তৃতীয়াংশ প্রথম পুরুষের 'এফ-১' গাছগুলির মত প্রতি তিনটিতে একটি লম্বা ও একটি বেঁটে এইভাবে দেখা দেয়।

এই মিশ্রণে প্রজনিত কোনও গাছই মাঝামাঝি আকারের হয়নি। একটির বৈশিষ্ট্য আর একটিতে মিশে যায়নি। মেণ্ডেল শুধু বংশগত ও একটি একক-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যের সূত্র আবিষ্কার করেননি, বংশগত বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য সৃষ্টির সূত্রও আবিষ্কার করেন: 'প্রতি জনকের (পৃথক লক্ষণের) একক পরস্পরকে প্রভাবিত না করে সন্ততির জনন-কোষে একটি সুনির্দিষ্ট সমানুপাতে বিভক্ত হয়ে যায়।' সন্ততির জনন-কোষে জনকের সাদা, কালো, দীর্ঘাকৃতি বা খর্বাকৃতির বৈশিষ্ট্য পরস্পরকে প্রভাবিত করে না, পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বা এককে বিরাজ করে।

পঁয়ত্রিশ বছর মেণ্ডেলের এই গবেষণা ব্রুনের প্রকৃতি বিজ্ঞান পরিষদের কার্যবিবরণীর পুরানো ফাইলেই চাপা পড়ে থাকে। ১৯০০ সালে তিনজন গবেষক পৃথক পৃথক ভাবে এই তত্ত্বের সন্ধান পান।

সংখ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বারা এই মেণ্ডেলীয় তথ্যের সত্যতা নির্ধারণের তখন ধুম পড়ে যায়। কেমব্রিজের উইলিয়াম ব্যাটেসন মহা উৎসাহে মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব প্রচার শুরু করেন। মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী গিনিপিগের গায়ের রং মানুষের গায়ের রং, ও ঘোড়ার গায়ের রং অন্যান্য এমনি একক-বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের প্রমাণ পেয়েছেন বলে অনেক জীব-বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন। সন্ন্যাসী মেণ্ডেলের প্রজনন ও বংশগতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলল এতে।

মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব সকল জীববিজ্ঞানী কিন্তু মেনে নেননি। "বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চালনকারী অসাধারণ ব্যাপারটির ব্যাখ্যাকামী এই ধরনের মেণ্ডেলীয় আচার সম্বন্ধে মর্গানের নিজের মনে বেশ সংশয় ছিল। মেণ্ডেলের মতই কি সত্য? মর্গানের মনে প্রশ্ন জাগত। হয়ত তাঁর এই ছোট ছোট মাছিগুলিই এ প্রশ্নের জবাব দেবে।

এই শাদা চোখো মাছিটির সঙ্গে মর্গান একটি লাল চোখো মাছির সঙ্গম ঘটালেন। নয় দিন পর বোতলে দেখা দিল বিরাট এক ঝাঁক মাছি। ইথার অবেদনিকের সাহায্যে অতি সাবধানে এগুলিকে সংজ্ঞাহীন করে এবং বিবর্ধক কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল এর মধ্যে ১২৩৭টি লাল-চোখো ("এফ-১")। এইটাই আশা করা গিয়েছিল, কারণ লাল-চোখো মাছির বৈশিষ্ট্যই বংশগতিতে প্রাধান্য লাভ করার কথা এক্ষেত্রে। এই ১২৩৭টি লাল চোখো মাছিগুলির স্ত্রী পুরুষের সাহায্যে আবার দশ দিন পর নতুন এক ঝাঁক মাছি ("এফ-২") প্রজনন করা হল। সংখ্যায় প্রায় চার হাজার। প্রতিটি মাছি অতি মহামূল্য রত্নের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করে পরীক্ষা করা হ'ল। কি দেখতে পেলেন মর্গান? দেখলেন, এবারে জন্ম নিয়েছে ২৪৫৯টি লাল চোখো স্ত্রী মাছি। ১০১১টি লাল চোখো পুরুষ মাছি এবং ৭৮২টি সাদা চোখো পুরুষ মাছি। মেণ্ডেলের সূত্র এমনি মিশ্র প্রজননের ক্ষেত্রে প্রতি তিনটি লাল চোখো মাছির জন্য একটি শাদা চোখো মাছি সৃষ্টির যে অনুপাতের নির্দেশ দেয়, এই পরীক্ষায় লাল শাদা মাছির সমানুপাতিক হার মোটামুটি তারই অনুরূপ হতে দেখা গেল।

পরিব্যক্তি সাধিত এমনি শাদা চোখো ড্রসোফিলার সন্ধানই শুধু পাননি মর্গান। পেয়েছিলেন আরও বিভিন্ন ধরনের পরিব্যক্তির সন্ধান। এই বছর (১৯১০ সাল) মার্চ মাসে মর্গান মাছির ঝাঁকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের

পাখাওয়ালা একটি মাছি দেখতে পান। এটির নাম দিলেন ফুটকি পাখা মাছি। অজস্র ধারায় এই মাছিগুলির তিনি বংশবৃদ্ধি করিয়ে চললেন। তাঁর গবেষণাগারের টেবিল, তাক দুধের বোতল ও নানা আকারের অসংখ্য শিশিতে ভরে উঠল। পরিব্যক্তি সাধিত নতুন নতুন মাছির উদ্ভব হতে লাগল আপনা থেকেই। বছরের শেষে মর্গানের সংগ্রহে পনেরোটি বিভিন্ন প্রকার পরিব্যক্ত ড্রসোফিলা মাছির নমুনা জমল। এই প্রতি প্রকার পরিব্যাক্ত মাছিই আপন পূর্ণ বৈশিষ্ট্যসহ বংশবৃদ্ধি করে। এই পরিব্যক্ত মাছিগুলির মধ্যে প্রজনন ও মিশ্র প্রজনন সাধন করা, তার ফলে সৃষ্ট নতুন পরিব্যক্ত মাছির আবির্ভাবের দিকে নজর রাখা—এসব কাজে অসম্ভব পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই অসংখ্য মক্ষিফুলের সেবাযত্ন ও লালনপালন ছাড়াও কলাম্বিয়া গ্রাজুয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতে হত মর্গানকে। তার উপর ঠিক এই সময় প্রাণীবিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপক কামাই করলেন। মর্গান তাঁর ক্লাসগুলিও নিতে বাধ্য হলেন।

এই ক্লাসে পড়ত কেলভিন ব্ল্যাকম্যান ব্রিজেস নামে একটি ছেলে। ছেলেটির মাথায় লম্বা লম্বা কোঁকড়ান রুক্ষ চুল। জন্ম নিউ ইয়র্কের স্কুইলারস্ ফলসএ। কেলভিন শুধু সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানে অনুরাগী নয়, দৃঢ় সঙ্কল্প তার, সে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে। মর্গানের প্রাণীবিদ্যার ক্লাসে তার সামনে সদ্য-নতুন ও মনোমুগ্ধকর সুপ্রজনবিদ্যার বিচিত্র জগৎ উদ্ঘাটিত হল। সে মুগ্ধ, প্রভাবিত হল। মর্গানের শিষ্যত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হল। সে মর্গানের কাছে প্রস্তাব করল, ঐ যে নানা ধরনের ফলের বোয়মে, দুধের বোতলে, গবেষণাগারের নানা জাতের কাচের পাত্রে যে অসংখ্য মাছি অতি দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে এগুলির পরিচর্যায় তাঁকে সাহায্যের জন্য তাঁর একজন সহকারীর প্রয়োজন। মর্গান এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন। ১৯২০ সাল থেকে শুরু করে ব্রিজেস পাঁচ বছর মর্গানের আংশিক সময়ের সহকারীরূপে কাজ করলেন। সেই সঙ্গে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশুনাও চলতে লাগল। ১৯১৬ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন।

১৯১১ সাল শুরু হতে না হতে মিস এডিথ এম. ওয়ালেস নামে মর্গানের গবেষণার একজন সহকারী ও শিল্পী হলদে পাখাওয়ালা একটি মাছির সন্ধান পেলেন। তারপর মর্গান আবিষ্কার করলেন অস্বাভাবিক উদরযুক্ত

একটি মাছি। সেই বছরের ১০ই নভেম্বর ব্রিজেস আবিষ্কার করলেন একটি নতুন পরিব্যক্ত মাছি। এর নাম দেওয়া হল "ফোস্কাওঠা" (Blistered) মাছি। মর্গান ইংরাজী (ওয়াই) আকৃতির পাখাযুক্ত ও মিস মিলড্রেড হজ জোড়া পা-ওয়ালা মাছির সন্ধান দিয়ে গবেষণাগারের কর্মীদের চমকিত ও বিস্মিত করে তুললেন। এর আগে ব্রিজেসও দুটি অস্বাভাবিক ধরনের পাখাযুক্ত মাছি আবিষ্কার করলেন।

ড্রসোফিলা মাছির গবেষণা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। বছর শেষ হবার আগে আরও পঁচিশটি পরিব্যক্ত মাছি পাওয়া গেল। সব শুদ্ধ সংখ্যা দাঁড়াল চল্লিশটি। তিন বছরের মধ্যেই মর্গানের সংগৃহীত মূল এক জোড়া ড্রসোফিলা মাছি থেকে পরিব্যক্তি সাধিত বহু নতুন মাছি উৎপন্ন হল। এত দ্রুত প্রকৃতি রাজ্যে যে এত বিপুল সংখ্যক পরিব্যক্তি ঘটতে পারে বিজ্ঞানীদের নিকট তা ছিল ধারণাতীত। নিঃসন্দেহে পরিব্যক্তিই নূতন প্রজাতি সৃষ্টির একটি কারণ। এই অতি সহজে নিয়ন্ত্রণসাধ্য এবং পরিব্যক্তি সাধিত বিচিত্র ড্রসোফিলা মক্ষি সম্ভার নিয়ে মর্গান সুপ্রজনবিদ্যাকে নির্ভুল গণিতবিদ্যার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এই সব গবেষণায় ব্যস্ত থাকা কালে একটা বিষয় লক্ষ্য করে তিনি বেশ ধাঁধায় পড়েছিলেন। ১৯১০ সালে পরিব্যক্তি সাধিত প্রথম মাছিগুলির মধ্যকার একটি শাদা চোখো স্ত্রী মাছির সঙ্গে লাল চোখো পুরুষ মাছির সংযোগ ঘটিয়ে যখন নতুন এক ঝাঁক সংকর মাছি উৎপন্ন করলেন তখন সে ঝাঁকে শাদা ও লাল চোখো পুরুষ মাছি দেখা গেলেও কিন্তু শাদা চোখো একটিও স্ত্রী মাছির দেখা পাওয়া যায়নি। কেন এই নতুন ঝাঁকে কোনও শাদা চোখো স্ত্রী মাছি দেখা দিল না; তার সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া দুঃসাধ্য। কারণ সাধারণতঃ মাছির ডিম থেকে প্রায় সমান হারে স্ত্রী ও পুরুষ মাছি জন্ম নিয়ে থাকে। বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে মর্গান পড়লেন স্ত্রী ও পুরুষ সন্তান জন্মের রহস্যের মাঝে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের ক্ষেত্রে হিমিওফিলিয়া রোগ যখন বংশানুক্রমে শুধু মেয়েদের মাঝেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে এই শাদা চোখের বৈশিষ্ট্যও শুধু তেমনি স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনও একটি সেক্সে সঞ্চারিত হতে সক্ষম। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা হয় 'সেকস অনুষঙ্গ'। কারণ স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনও একটি সেক্সের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটির সংযুক্ত হবার প্রবণতা দেখা যায়।

যথাযথ প্রজননের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে খুদে পাখা বা হলদে পাখা এগুলিও সেক্‌স অনুষঙ্গিত বৈশিষ্ট্য।

সেকস্ অনুষঙ্গিত বৈশিষ্ট্যে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা মর্গান লক্ষ্য করলেন। যেমন, দেখা গেল যে শাদা চোখো মাছির হলদে পাখা থাকে। এই ধরনের মাছির সঙ্গে যখন কোনও লাল চোখো ধূসর পাখা মাছির সংযোগ ঘটিয়ে নতুন মক্ষিকুল সৃষ্টি করা হয়, তখন নবজাত সব শাদা চোখো মাছিগুলির পাখা হয় হলদে, ধূসর নয়। মেণ্ডেলের বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের সূত্র অনুযায়ী এই বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি একক রূপে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয় এবং মিশ্র জননকালে স্বতন্ত্র ভাবে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু শাদা চোখো মাছিগুলির সর্বদা এই হলদে পাখা প্রাপ্তি দেখে মনে হল যেন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শুধু সেক্‌স অনুষঙ্গিত নয় একত্রে প্রকটিত হবার ঝোঁকও এদের দেখা যায়।

কিন্তু প্রজননের পরীক্ষাকালে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গ বা অনুরক্তির একটা অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন এবার মর্গান। তিনি বললেন যে এই সব সেক্‌স অনুষঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ মুল জনন কোষের নিউক্লিয়াসে এগুলি একক (ইউনিট) বা গুচ্ছ (ব্লক) রূপে যুক্ত থাকে। কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের এমনি একত্রে যূথবদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হবার প্রবণতার নাম দিলেন মর্গান 'অনুষঙ্গতা' (linkage)। তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেক্‌স অনুষঙ্গতাই একমাত্র অনুষঙ্গতা নয়। ১৯১১ সালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে কালো দেহ এবং লুপ্তপ্রায় পাখার বৈশিষ্ট্য একত্র অনুষঙ্গিত হলেও এগুলি সেক্‌স অনুষঙ্গ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্ত্রী-পুরুষ উভয় মাছিতেই সর্বদা একত্রে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কালো দেহ বক্র পাখা, বেলুন পাখা ও ফুটকি পাখার সঙ্গে একত্র দেখা দিতে পারে, কিন্তু কখনও হলুদ পাখার মত সেক্‌স অনুষঙ্গিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেখা দেয় না। এই সেক্‌স অনুষঙ্গ দলটির নাম দেওয়া হল অনুষঙ্গ দল নং ১; কালো দেহ, হ্রস্ব পাখা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসূচক অন্য দলটির নাম দেওয়া হল অনুষঙ্গ দল নং ২। দু বছর পর আবিষ্কৃত হল যে পাটলচক্ষু মাছিদের কখনও হলুদ বা হ্রস্ব পাখা থাকে না। আবার ঘনকৃষ্ণদেহী মাছির শাদা চোখও দেখা যায় না। ঘনকৃষ্ণদেহী ও পাটল চক্ষু মাছি প্রজনন করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেগুলি বংশবৃদ্ধি করতেও সক্ষম তা দেখা গেছে। ঘনকৃষ্ণদেহ ও পাটল চক্ষু

পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু অন্য দুটি অনুষঙ্গ দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। অতএব এরা তৃতীয় একটি অনুষঙ্গ দল।

১৯১৪ সালে গ্রীষ্মকাল নাগাদ দেখা গেল, যে সব বিভিন্ন পরিব্যক্ত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং যেগুলি বংশগত সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য নির্ভুলভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, সেগুলি যেন তিনটি স্বতন্ত্র দল বা শ্রেণীতে বিভক্ত। একটা বড় দলে সব বৈশিষ্ট্যগুলিই সেক্স অনুষঙ্গ, যেমন শাদা চোখ ও ইংরাজী Y-এর মত পাখার বৈশিষ্ট্য। আরও বড় একটি দলের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য জীবদেহের নানা অঙ্গে প্রকটিত। যেমন হ্রস্ব পাখা ও কালোদেহ। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সেক্স অনুষঙ্গ নয়। তবে পরস্পর যুক্ত। পরিশেষে রয়েছে সমান বড় দৈহিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত আর একটি দল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সেক্স অনুষঙ্গ নয়। আবার দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যুক্তও নয়। অথচ পরস্পর-যুক্ত। কাজেই মর্গান এই মতবাদ প্রচার করলেন, যেহেতু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তিন শ্রেণীর, অতএব জনন কোষেও নিশ্চয়ই রয়েছে তিন ধরনের বস্তু। এক একটি বস্তু এক একটি দলের পরস্পর-সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু জনন-কোষের অন্য দুটি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত নয়। এইভাবে মর্গান মেণ্ডেলের সূত্রের সঙ্গে আরও একটি সূত্র জুড়লেন, কারণ যাজক মেণ্ডেল এই অনুষঙ্গের ঘটনা ধারণা করতে পারেননি।

মিশ্র প্রজননের পরীক্ষায় সাক্ষ্য ব্যতীত এই মতবাদের সমর্থনে মর্গানের আর কি প্রমাণ ছিল? প্রমাণ ছিল অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের। ১৮৭৭ সালে পুংজনন কোষের সন্ধান মেলার পর দেখা গিয়েছিল যে এতে আরও ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াস নামে একটি বস্তু আছে। জনন-কোষের এই নিউক্লিয়াসই যে বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারণের বাহক, ১৮৮৫ সাল নাগাদ পৃথক পৃথকভাবে অন্ততঃ তিনজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রায় যুগপৎ এ কথা ঘোষণা করেন। পরে দেখা গেল, এই নিউক্লিয়াসে রয়েছে আরও অতি ক্ষুদ্র বস্তু। ওয়ালডেয়ার ১৮৮৮ সালে এর নাম দিয়েছিলেন ক্রোমোজোম। কারণ কোষের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এটি সহজে রসায়ন দ্রব্যে রঞ্জিত হয়। ১৯০২ সালে উইলিয়াম সাটন নামে একজন তরুণ আমেরিকান বিজ্ঞানী সুস্পষ্ট ভাবে দেখালেন যে, জনন-কোষ পরিণত অবস্থা লাভের সময় তার যে সুপরিচিত আচরণ দেখা যায় তা কতকগুলি প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়। এই প্রক্রিয়াগুলি মেণ্ডেলীয় তত্ত্বে প্রস্তাবিত

বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের ব্যাখ্যা দেয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জনন-কোষের সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হল। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, বিভিন্ন জীবের জনন-কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। সংখ্যাগত পার্থক্য বিরাট। ড্রসোফিলা মাছির জনন-কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে চারটি স্বতন্ত্র ক্রোমোজোম। এদের তিনটি বেশ বড় বড় আকারের; আর একটি খুবই ছোট, যেন মনে হয় সামান্য একটি বিন্দু মাত্র। এই তিনটি বৃহদাকার ক্রোমোজোমই তিন শ্রেণীর বংশগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য দায়ী। পরীক্ষাকালে মর্গানের গবেষণার মাঝে হঠাৎ যে সব নতুন পরিব্যক্ত মাছি দেখা দিত, সেগুলির আবির্ভাবের কারণও এই রহস্যময় তিনটি ক্রোমোজোমের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। মনে হল মর্গানের অনুষঙ্গবাদ যেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

কিন্তু ঐ ছোট্ট ক্রোমোজোম, এটি কি? আমেরিকার প্রধানতম কোষ গবেষক এডমাণ্ড উইলসন এর নাম দিয়েছিলেন এম (m) ক্রোমোজোম। এটি যেন দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত হয়ে দেখা দিয়েছিল। শেষে এর রহস্যোদ্ধার করলেন হারম্যান জে. মুলার। মর্গানের অধীনে ডক্টরেট উপাধির জন্য গবেষণাকালে ১৯১৪ সালে তিনি একটি বাঁকা পাখা মাছির সন্ধান পেলেন। নতুন এই পরিব্যক্ত মাছিটির অনুষঙ্গদল নির্ধারণের জন্য রুটিন মাফিক যথারীতি পরীক্ষাকার্য চালান হল। নির্ধারিত বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত মাছির সঙ্গে এই নতুন বাঁকা পাখা মাছিটির মিশ্র প্রজনন সাধনের এক দফা বিস্তৃত চেষ্টা চলল গবেষণাগারে। দেখা গেল নির্দিষ্ট তিনটি অনুষঙ্গদলের কোনটির ক্রোমোজোমের সঙ্গেই এই বাঁকাপাখা নতুন মাছিটির ক্রোমোজোম মিলিত হতে পারছে না। স্বভাবতই এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে বাঁকাপাখা মাছিটির এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য দায়ী চতুর্থ, ক্ষুদে ক্রোমোজোমটি। এটি আপাতঃ দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় ভাবে যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল, অপেক্ষা করছিল কোনও পরিব্যক্ত লক্ষণের সঙ্গে মিলিত হবার। যে ক্ষুদে ক্রোমোজোমটি কিছুকাল আগে অনুষঙ্গবাদের সত্যতা স্বীকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই এখন তার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বপক্ষে অতিরিক্ত প্রমাণ হয়ে দেখা দিল। এখন থেকে এই ক্ষুদে ক্রোমোজোমটিকে এম ক্রোমোজোম না বলে, চতুর্থ ক্রোমোজোম আখ্যা দেওয়া হল।

কলাম্বিয়ার গবেষণাগারের কর্মীরা আবার উল্লসিত হয়ে উঠলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁরা নতুন পরিব্যক্ত মাছির সন্ধানে লেগে গেলেন। বার করতে হবে সেই ধরনের অনুষঙ্গিত মাছি যা এই চতুর্থ ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। মর্গান ও তার সহকারী গবেষকদল অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসলেন এমনি মাছি আবিষ্কারের সাধনায়। চতুর্থ ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলন উপযোগী অনুষঙ্গিত মাছি আবিষ্কৃত হবে, অনুষঙ্গবাদের সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে, এই আশায় দিনরাত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাছে তাঁরা চোখ রেখে হাজার হাজার মাছির পরীক্ষা করলেন, ব্যথায় মাথা টনটনিয়ে উঠত এই অসাম ধৈর্যের পরীক্ষায়। কিন্তু তবু হাল ছাড়লেন না। শেষে এমনি অনুষঙ্গিত মাছির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মিস হজ প্রথম (১৯১৪ সালে) একটি চক্ষুহীন মাছি আবিষ্কার করলেন। পাচ বছর পর ব্রিজেস বক্ষস্থলে লোমহীন এক ধরনের মাছি আবিষ্কার করলেন। এর নাম দিলেন মুণ্ডিত পরিব্যক্ত (Shaven mutant)। দেখা গেল এই লক্ষণগুলি বাঁকাপাখা ও মিস হজের চক্ষুহীন মাছির সঙ্গে অনুষঙ্গিত, কিন্তু অন্য তিনটি বড় বড় অনুষঙ্গদলের কোনও একটির কোন লক্ষণের সঙ্গেই অনুষঙ্গিত নয়। ব্যাপারটি খুবই চমকপ্রদ। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা গেল এই অনুষঙ্গদল ও ক্রোমোজোম সম্বন্ধে। লক্ষ্য করা গেল যে প্রতিটি অনুষঙ্গদলে যতগুলি করে পরিব্যক্তি সাধিত মাছির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি ক্রোমোজোমগুলির আকারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সমানুপাতিক। যেমন, দেখা গেল যে এই অতি ক্ষুদে 'এম' ক্রোমোজোমটির প্রভাবে যে পরিব্যক্তি সাধিত হয়েছে, এমন খুব কম সংখ্যক মাছির সন্ধান মেলে। তুলনায় অন্য তিনটি ক্রোমোজোমের অন্তর্গত বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অনুষঙ্গিত মাছির সংখ্যা ক্রোমোজোম প্রতি এক শতেরও অধিক হতে দেখা যায়।

সুপ্রজনন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্রিজেস, মুলার ও স্টার্টাভ্যাণ্ট—এই তিনজন প্রতিভাবান কর্মীর সাহায্য মর্গান লাভ করেছিলেন। এদের সমকক্ষ কর্মী বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে কোনও শাখায় পাওয়া দুঃসাধ্য। এ দিক দিয়ে মর্গান ছিলেন ভাগ্যবান। দুর্বোধ্য রহস্যজালের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গবেষকদের গবেষণার কাজ যখন প্রায় রুদ্ধ হবার উপক্রম করত, এমনি অনেক ক্ষেত্রে একাধিকবার এই প্রতিভাবান জীববিজ্ঞানী স্টার্টাভ্যাণ্ট

এগিয়ে এসে সংকট মোচন করেছেন। স্তব্ধগতি গবেষণা আবার দ্রুত তালে চলেছে। মর্গান তাঁকে আরও ভালভাবে ড্রসেফিলা মাছির সেক্স অনুষঙ্গতা নিয়ে গবেষণার ভার দিয়েছিলেন। গবেষণার ফলে তিনি একটি মূল্যবান তত্ত্ব নির্ধারণে সক্ষম হন।

বহু জীববিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন; প্রতি ক্রোমোজোমে জিন (gene) নামক আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু রয়েছে। এগুলি জীবদেহের এক একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতীক। যেমন, শাদা চোখ, হলদে আর লুপ্তপ্রায় পাখা সৃষ্টির জন্য প্রথম ক্রোমোজোমটিই দায়ী বলে মনে করা হত। বস্তুত ডি ভ্রাইস ও অন্যান্যরা এই মত পোষণ করতেন, কিন্তু এই ধারণার সপক্ষে তাঁরা কোনও পরীক্ষাভিত্তিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেননি। ক্রোমোজোমে ঠিক কিভাবে এই জিনগুলি অবস্থিত তা অবশ্য জানা যায়নি। জীববিজ্ঞানীরা মনে করতেন ক্রোমোজোম সূত্রে এগুলি সরল রেখার আকারে সাজানো। স্টার্টাভ্যাণ্ট এবার সর্বপ্রথম দাবী করলেন যে জিনগুলি ক্রোমোজোমে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নয়, একটির নীচে আর একটি—এমনিভাবে মটরমালার আকারে সুবিন্যস্ত। মটরমালার মত সাজানো, প্রতিটি দানা নির্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপিত, মল্‌টি-ক্রোমোজোম রূপী স্বচ্ছ ফিতায় বসানো, জিনগুলির এই বর্ণাঢ্য চিত্র মনোহর ঠেকলেও কিন্তু এই মনোহর চিত্রই আর একটি তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করল। এই তত্ত্ব প্রতিটি ক্রোমোজোমে প্রতিটি জিনের পারস্পরিক অবস্থান নির্ণয় করল।

সামনে ছিল আরও দুস্তর বাধা। একটি অতিক্রম করতে না করতেই মর্গানের সামনে দেখা দেয় আর একটি দুর্লংঘ্য বাধা। শাদা চোখ আর হলদে পাখার লক্ষণগুলিকে সেক্স অনুষঙ্গিত মনে করা হত। দেখা গেল কয়েকটি ক্ষেত্রে, শতকরা হিসাবে অতি সামান্যই তারা সেক্স অনুষঙ্গ বিমুক্ত হয়ে গেছে। যেমন, যখন লাল চোখো, ধূসরপাখা স্ত্রীমাছি ও শাদা চোখো হলদে পাখা পুরুষ মাছির সংযোগে নতুন মাছির ঝাঁক সৃষ্টি করা হয় তখন দেখা যায় দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি এক শতটি মাছির মধ্যে একটি বের হয় লাল চোখ আর হলুদ পাখা নিয়ে, বা শাদা চোখ আর ধূসর পাখা নিয়ে। স্পষ্টতই মর্গানের অনুষঙ্গবাদ তত্ত্বে কোনও গুরুতর ভুল রয়েছে। জীবদেহে বিভিন্ন লক্ষণ সৃষ্টির পিছনে অনুষঙ্গবাদ ব্যতীত আরও অন্য কোনও কিছুর হাত রয়েছে। না হলে কি করে, সাদা

চোখো আর ধূসর পাখাওয়ালা বা লাল চোখো আর হলুদ পাখাওয়ালা দু ধরনের নতুন মাছি দেখা দিল। হয়ত বিরুদ্ধবাদীর কথাই সত্য। যে নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতি বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চালনের কাজ করে থাকে, অনুষঙ্গবাদ তা পুরোপুরি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি। প্রকৃতির এই অন্যতম গোপন সূত্রটি এখনও রহস্যাবৃত।

অনুষঙ্গবাদের সূত্রে কেন এই বাহ্যত ব্যতিক্রম দেখা দেয়? মর্গান আবার এর ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে কোনও জীবের স্ত্রী ও পুং জনন-কোষ সন্তানোৎপাদনের উপযোগী হবার আগে এরা হ্রস্বীকরণ ক্রিয়া (Reduction Division) নামে এক অতি অনুপম ও বিচিত্র বিভাজন ক্রিয়া অতিক্রম করে আসে। অধিকাংশ জীবের জনন-কোষে সাধারণতঃ পূর্ণ দুই প্রস্ত ক্রোমোজোম থাকে। যেমন, ড্রসোফিলা মাছির জনন-কোষে থাকে আটটি ক্রোমোজোম, বা চারটি ক্রোমোজোম-যুক্ত দুই প্রস্ত। নিষিক্ত হবার পূর্বে প্রতি প্রস্তের ক্রোমোজোমগুলি একত্রিত হয়ে পরস্পরের গায়ে জড়িয়ে যায়, তারপর আবার পৃথক হয়ে যায়। এক এক প্রস্তের ক্রোমোজোমগুলি যায় জনন-কোষের এক প্রান্তে। অন্য প্রস্তগুলি অপর প্রান্তে। এই প্রক্রিয়ার পর দেখা যায়, দুই সারি ক্রোমোজোম পরস্পরের সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়েছে। এর পরই জনন-কোষটি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়, এর একটিতে (তখনও অনিষিক্ত) থাকে চারটি ক্রোমোজোম। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় "হ্রস্বীকরণ ক্রিয়া"। এই প্রক্রিয়া না ঘটলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন কালে অন্তহীন ক্রোমোজোম সৃষ্টি হত। একটি পরিণত পুংজনন কোষ দেহের নিম্নভাগ বাইরে রেখে উপরিভাগ স্ত্রীজনন-কোষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়, তখন পুং ও স্ত্রীজনন-কোষের নিউক্লিয়াস একত্রীভূত হয়ে যায়। নিষিক্ত জনন-কোষে আবার দেখা দেয় আটটি ক্রোমোজোম, এক এক প্রস্তে চার চারটি হারে দুই প্রস্ত। নব জাতক তাই জন্মের শুরু থেকে পিতা ও মাতা উভয়েরই এক এক সেট বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন শুরু করে।

এই হ্রস্বীকরণ প্রক্রিয়ার পূর্বে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে পারে। আমরা জানি গর্ভাধানের ঠিক পূর্বে অপরিণত পুং ও স্ত্রীজনন-কোষের দুই প্রস্তের ক্রোমোজোমগুলি কিছুকাল পরস্পরের গয়ে পেচিয়ে যায়।

মর্গানের ধারণা, এমনি প্যাঁচ খাওয়ার পর মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবার সময়, এক প্রস্তের একটি ক্রোমোজোমের খানিকটা আর এক প্রস্তের অন্য আর একটি ক্রোমোজোমের সঙ্গে অদল বদল হয়ে যেতে পারে, তাতে উভয় প্রস্তের ক্রোমোজোমের খানিকটা খানিকটা নিয়ে নতুন একটি ক্রেমোজোম গড়ে উঠতে পারে। এই "ক্রোমোজোমীয় আলিঙ্গনই" মর্গানের মতে জীবদেহে লক্ষণ সমূহ সৃষ্টি ও স্বাভাবিক অনুষঙ্গ দল ভাঙ্গবার জন্য দায়ী। কারণ অনেক সময় একই ক্রোমোজোম সমষ্টির (সমসংস্থ) অন্তর্গত দুটি বিভিন্ন ক্রোমোজোম সাধারণতঃ সব দিক দিয়ে একই রকম হলেও, দু একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণেই, দুটি মূল জনন-কোষের, বা স্ত্রীজনন-কোষের এক্স-ক্রোমোজোমের পারস্পরিক বিনিময় বা বদলাবদলির ফলেই শতকরা দেড়ভাগ হলদে চোখো লালপাখা বা শাদা চোখো ধূসর পাখা মাছি জন্ম নিয়ে থাকে।

স্টার্টাভ্যাণ্ট ঘোষণা করেছিলেন জিনগুলি ক্রোমোজোমে সরল রেখাকারে অবস্থিত। 'অদল-বদল' প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে মর্গান এবার জিনগুলির অবস্থিতি নির্ণয়ের একটা পথ দেখতে পেলেন। তিনি এই যুক্তি দেখালেন, স্টার্টাভ্যাণ্টের মতানুযায়ী জিনগুলি যদি রেখাকারে সুবিন্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে এগুলি চোখে দেখা না গেলেও পরীক্ষার সাহায্যে এগুলির পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হবে। বুঝলেন জিনের অবস্থিতি রহস্য নির্ধারণের সূত্র নিহিত আছে খুব অল্প সংখ্যক লাল চোখো হলুদ পাখা মাছিগুলির মাঝে। এগুলি লাল চোখো ধূসর পাখা স্ত্রীমাছি আর শাদা চোখো হলুদপাখা পুরুষমাছির সংযোগে সৃষ্টি হয়েছিল। এমনি মিলনে এধরনের মাছি সাধারণতঃ জন্মায় না। ব্যতিক্রম হিসাবে শতকরা অতি সামান্য একটি অংশ জন্ম নেয়। 'এই দৃশ্যত' ব্যতিক্রমের ঘটনা অদল-বদলের প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে যখন পরস্পরের গায়ে পেচিয়ে যায়, তখন অদল-বদলের ক্রিয়া ঘটে, দুটি ক্রোমোজোমের খানিকটা খানিকটা অংশ বদলাবদলি হয়ে যায়। ক্রোমোজোম সূত্রের কোন্‌স্থানে স্বভাবতই ভাঙ্গনের প্রবণতা দেখা দিতে পারে? মর্গান মনে মনে ভাবলেন। স্পষ্টতঃ অদল-বদল ক্রিয়া সংঘটনকালে জিনগুলির মধ্যকার দূরত্বই এগুলির বিচ্ছিন্ন হবার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবে। তিনি ভাবলেন, "অদল-বদল ক্রিয়া চলাকালে

যে জিনগুলি জিন মালার সবচেয়ে দূরে অবস্থিত সেগুলিই সহজে বিচ্ছিন্ন হবে। কারণ ক্রোমোজোমের যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানকার জিনগুলি অন্য অংশের জিনগুলি থেকে অনেক দূরে।" অতএব জীবদেহে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যদি জিনের অদল-বদল ক্রিয়ার সাহায্যে ক্বচিৎ কখনও সঞ্চারিত হতে দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে এগুলি নিশ্চয়ই খুবই ঘনসন্নিবিষ্ট। অপর পক্ষে, কতকগুলি লক্ষণ যদি অদল-বদল ক্রিয়া সংঘটনকালে সহজেই সঞ্চারিত হয়, তা হলে সেগুলির সংশ্লিষ্ট জিন ক্রোমোজোম সূত্রের খুব দূরে দূরে অবস্থিত বলে বুঝতে হবে।

এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে পরীক্ষা কার্য চালাতে আর দেরী করলেন না মর্গান। তারপর শুরু হল জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি কঠিন ও বিস্ময়কর গবেষণা। অতি নিপুণভাবে হাজার হাজার ব্যাপক ও সযত্ন নিয়ন্ত্রিত অদলবদলের পরীক্ষা কার্য অনুষ্ঠিত হ'ল গবেষণাগারে। লক্ষ লক্ষ মাছি এবং শতাধিক পরিব্যক্তি সাধিত মাছি এই সব গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছিল। অসংখ্য পরীক্ষার ফলাফল তালিকাকারে সাজান হ'ল, সমীক্ষিত হল। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হল। শীতের রাতে ঠাণ্ডার প্রকোপে শূককীটগুলি সময়মত বাড়তে চাইত না। তাতে শূককীট হতে মাছির বাচ্ছার জন্ম নিতে দেরী হয়ে যেত। এই দেরী বন্ধ করতে ব্রিজেস এক ধরনের বিশেষ ইনকিউবেটর তৈরি করলেন। শীঘ্রই পচা ফলে বসা ড্রসোফিলা মাছির বিভিন্ন পরিব্যক্তির মানচিত্র অঙ্কনের বিরাট কাজের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিবরণী নিপুণভাবে ছকে ফেলা হল এবং ক্রমোজোমের গঠনশৈলী ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে লাগল।

গবেষণার ফলাফল রাশি সংখ্যার হিসাবে যখন পাওয়া যেতে লাগল তখন মর্গান জিনের অবস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। বিচার করে দেখলেন, হলুদ পাখা সাদা চোখো মাছির ক্ষেত্রে অদলবদল ক্রিয়া চলে শতকরা ১·৫ ভাগ, ওয়াই (Y) পাখা ও শাদা চোখো মাছির ক্ষেত্রে চলে শতকরা ৫·৪ ভাগ। এ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ওয়াই-পাখা মাছির জিন শাদা চোখো মাছির জিনের চেয়ে অনেক দূরে, হলদে পাখার জিন যত-দূরে তার চেয়েও বেশী দূরে। ওয়াই-পাখা যদি হলদে-পাখার তুলনায় শাদা চোখোর বিপরীত দিকে থাকে, তা হলে আশা করা যায় অদলবদল ক্রিয়ার ফলে ব্যতিক্রম লক্ষণযুক্ত মাছির সংখ্যা দাঁড়াবে শতকরা ৬·৯ ভাগ। আবার, ওয়াই-পাখা মাছির জিন যদি হলুদ পাখার সঙ্গে একই দিকে থাকে তা হলে

অদলবদলের হার হবে শতকরা ৩'৯ ভাগ। পরীক্ষায় পাওয়া গেল শতকরা ৬'৯—এই হিসাব। অতএব মর্গান ওয়াই পাখাকে ক্রোমোজোমের মানচিত্রে শাদা চোখো মাছির নিচে স্থান দিলেন। এই ক্রোমোজোমের মানচিত্র শাদা চোখে দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার জন্য চল্লিশ হাজার গুণ বড় করে আঁকা হয়েছিল। এমনি পরীক্ষা ও যুক্তি বিচারের সাহায্যে ক্রোমোজোমের মানচিত্রে আরও অসংখ্য একক লক্ষণ বা জিনের অবস্থিতি নির্ণীত হল।

ড্রসোফিলা মাছির এই জিনের মানচিত্র রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলগুলির পারমাণবিক সংখ্যার সারণীর সঙ্গে তুলনীয়। বার বার এই মানচিত্রের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হত। হয়ত নতুন পরিব্যক্তি সাধিত মাছি দেখা দিল, অদলবদল ক্রিয়ার পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেল নতুন তথ্য, পাওয়া গেল সাময়িক ভাবে দুর্বোধ্য এবং আপাত বৈষম্যপূর্ণ ফলাফল—এ সবেরই জন্য প্রয়োজন হয় ক্রমোজোম নক্সাচিত্রের ঘন ঘন সংস্কার সাধন। এই সব অনিবার্য পরিবর্তনের জন্য সুতীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত মর্গানকে। সমালোচনা করতেন বিশেষ করে সেই সব জীববিজ্ঞানীরা যারা মর্গানের এই জিন দ্বারা বংশগতি সঞ্চালনের উদ্ভট মতবাদের বিরোধিতা করতেন, এর ধ্বংস কামনা করতেন। মর্গান এদের বিরোধিতায় বিশেষ বিচলিত হননি, জিন তত্ত্বের যথার্থতায় তিনি কখনও বিশ্বাস হারান নি।

১৯২২ সালের মে মাসে মর্গানের গবেষণাগার থেকে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটি এই গবেষণাগারের খ্যাতি আরও বাড়িয়ে দিল। এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন মর্গানের স্ত্রী লিলিয়ান ভি. মর্গান। আঠারো বছর আগে কুমারী লিলিয়ানকে মর্গান বিবাহ করেন। লিলিয়ান তখন ছিলেন তাঁর এক ছাত্রী। কিছুদিন ঘরসংসারের কাজে আটকা থাকবার পর শ্রীমতী মর্গান পুনরায় গবেষণার কাজে যোগ দেন এবং স্বতন্ত্র ভাবে গবেষণা চালিয়ে পুরুষ লক্ষণাক্রান্ত একটি স্ত্রী-মাছি আবিষ্কার করেন। এই বিচিত্র মাছিটি কি ভাবে সৃষ্টি হল, তা তাঁর কাছে বেশ দুর্বোধ্য ঠেকল। এটির শরীরের এক পিঠে কতকগুলি প্রচ্ছন্ন সেক্স অনুষঙ্গ লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ পরিস্ফুট। এর মাথা, বুক, পা, রং, চোখ, পাখা ও ব্যালান্সার, পেটের আকার—এর কোন কিছুই পরিণত বয়স্ক স্বাভাবিক পুরুষ বা স্ত্রী-মাছির মত নয়। কতকগুলি লক্ষণ পুরুষের, কতকগুলি লক্ষণ স্ত্রী-মাছির। শ্রীমতী মর্গান প্রজনন ও মিশ্র প্রজননের সাহায্যে হাজার হাজার এমনি বিচিত্র উভলিঙ্গ মাছি উৎপাদন

করলেন, এদের ক্রোমোজোমের নক্সায় বিভিন্ন লক্ষণগুলি পরীক্ষা করলেন, ভাবতে লাগলেন, কি ভাবে এই উভ-লিঙ্গের লক্ষণাক্রান্ত অদ্ভুত মাছিটির সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এ প্রশ্নের একটি তাত্বিক সমাধান শীঘ্রই ধরা দিল। সি. ই. ম্যাকক্লাং নামে একজন আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক ফড়িং নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে জীবকোষের ক্রোমোজোমে একটি বা দুটি বিশেষ ধরনের ক্রামোসোমই জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। এই বিশেষ ধরণের ক্রোমোজোমটি এখন একস্ (x) ক্রোমোজোম নামে পরিচিত। চার বছর পর জীববিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে কতকগুলি কীট-পতঙ্গের স্ত্রী-দেহে প্রথম অনুষঙ্গ দলে এক জোড়া ক্রোমোজোমের দুটিই থাকে একস্ ক্রোমোজোম, পুরুষ দেহে থাকে মাত্র একটি এক্স ক্রোমোজোম ও ওয়াই (y) ক্রোমোজোম নামে আর একটি ক্রোমোজোম। মিস ষ্টিভেনস্ পরীক্ষা সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে ড্রসোফিলা এমনি ক্রোমোজোম বিন্যাসযুক্ত মাছি। এখন ব্যাপার হল এই যে, নিষিক্ত ভ্রূণ কোষের যেগুলি দুটি এক্স ক্রোমোজোম লাভ করে সেটি স্ত্রী কীট রূপে জন্ম নেয়, যেটি একটি এক্স ক্রোমোজোম ও একটি ওয়াই ক্রোমোজোম পায় সেটি হয় পুরুষ কীট। ক্রোমোজোমের এই বিন্যাসই স্থির করে কীটটি পুরুষ বা স্ত্রী কোন লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নেবে। এই এক্স ও ওয়াই ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত হয় অনুষঙ্গ দল নং ১। আগেই বলা হয়েছে এ দলের সব লক্ষণগুলিই একত্রে জীবদেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

নিষিক্ত ভ্রূণকোষে এক্স বা ওয়াই ক্রোমোজোমের অবস্থিতি অনুযায়ী জীবের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, এই তত্ত্ব জানতে পারার ফলেই মর্গান সেক্স অনুষঙ্গিত লক্ষণগুলি ধরতে সক্ষম হলেন। পুং ও স্ত্রী-জনন কোষে এই লিঙ্গ সূচক ক্রোমোজোমের পার্থক্য আবিষ্কৃত হবার পর মানুষের রং না চিনবার অক্ষমতা, রাতকানার দোষ, এবং হিমোফিলিয়া প্রভৃতি সেক্স অনুষঙ্গিত লক্ষণের কারণ নির্ণয় খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াল।

শ্রীমতী মর্গান মনে মনে এই যুক্তির অবতারণা করলেন, যদি হ্রস্বীকরণ ক্রিয়ায় (Reduction Division) কোনও স্ত্রী মাছির জনন-কোষের ক্রোমোজোমের দুটি অংশ পৃথক না হতে পারার দরুন দৈবক্রমে দুইখণ্ড সামান্য একটু যুক্ত হয়ে থাকে, তা হলে তখন ভ্রূণ কোষে দুটি এক্স ক্রোমোজোমই প্রবেশ করে। এতে এমন একটি নিষিক্ত ভ্রূণ-কোষ সৃষ্টি হবে, যাতে পুং ও স্ত্রী উভয়

জনন-কোষের লিঙ্গ নির্দেশক ক্রোমোজোমগুলিরই দেখা পাওয়া যাবে। বাস্তবিকই যদি এমন হয়, তা হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রই এর প্রমাণ দেবে। সাবধানে তিনি একটি ভ্রূণ কোষ চিরে ফেললেন। দেখা গেল দুটি ক্রোমোসোম ইংরাজী V অক্ষরের ন্যায় এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তে যুক্ত। কোষটির গড়ন থেকে বোঝা গেল এবিষয়ে তাঁর যুক্তিনির্ভর অনুমানই সত্য। এই স্ত্রী পুরুষ উভয় লক্ষণাক্রান্ত মাছিটির ভ্রূণ কোষে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লক্ষণ নির্দেশক ক্রোমোজোমই ছিল, অতএব এটি উভয় লিঙ্গের লক্ষণই পেয়েছে। এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটিই শ্রীমতী মর্গানের শেষ আবিষ্কার নয়। ১৯৫২ সালে বিরাশি বছর বয়সে মারা যাবার সময় পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে বহু মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করে গেছেন।

এই নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ বিপুল ভাবে জিন তত্ত্বের সত্যতা সমর্থন করল। বিখ্যাত ইংরাজ জীববিজ্ঞানী বেটসন্ তখনও ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত এই গবেষণা সন্দেহের চোখে দেখতেন। ১৯২২ সালে তিনি মর্গানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পূর্ণোদ্যমে তখন গবেষণাগারের কাজ এগিয়ে চলেছে। জীব কোষ সংক্রান্ত গবেষণা লব্ধ বিবিধ তথ্য তাকে জানানো হল। তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। এই সব তথ্যপ্রমাণ তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ না খেলেও তাঁকে স্বীকার করতে হল যে ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত এ গবেষণা পক্ষপাতদুষ্ট নয়; ত্রুটিহীন। রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্যে তিনি ইংল্যাণ্ডে তাঁর স্ত্রীর নিকট লিখে পাঠালেন, "মূল প্রশ্নে আমি হার না মেনে উপায় দেখছি না। এই ক্রমোজোমগুলি নিশ্চয়ই আমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চরণের সঙ্গে কোন না কোনও প্রকারে জড়িত রয়েছে।"

বেটসন জিন তত্ত্ব সমর্থন করছেন, এই সংবাদ প্রকাশিত হবার পর বিশ্বের জীব বিজ্ঞানী মহলে গভীর আলোড়ন দেখা দিল। অচিরেই এর ফলাফল দেখা গেল। ইউরোপের সব দেশের জীববিজ্ঞানীদের নিকট হতে এই পরিত্যক্ত ড্রসোফিলা মাছির শূক কীটের কালচার পাঠানোর জন্য অনুরোধ আসতে লাগল। শীঘ্রই ইংল্যাণ্ড ও জাপানে তরুণ গবেষকদল ড্রসোফিলা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। জার্মানী থেকে তরুণ সুপ্রজননবিদ্ দল নিউ ইয়র্কে, মর্গানের গবেষণাগারে এলেন শিক্ষা গ্রহণ করতে। শিক্ষান্তে দেশে ফিরে গিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। সোভিয়েত রুশকে প্রচুর ড্রসোফিলা মাছি দেওয়া হল। তাঁদের গবেষকগণ আমেরিকার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে

চললেন। সে দেশেও এই সুপ্রজনন বিদ্যার গবেষকদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন মস্কোতে ইনসটিটিউট অব জেনেটিকস্-এর নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটিত হল, তখন সোবিয়েত ইউনিয়ন ড্রসোফিলা সংক্রান্ত গবেষণাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত গবেষণার অকাট্য প্রমাণই মর্গানের জিন তত্ত্বকে জীব বিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তনবাদের পর এক বিশিষ্ট মতবাদের মর্যাদা এনে দেয়নি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে প্রথম যখন গবেষণার জন্য ড্রসোফিলা মাছির ঝাঁক উৎপাদন করা হচ্ছে, সেই সময় রলিনস্ এ এমার্সন নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যান পালন বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনি এমন একটি উদ্ভিদ বা জীবের সন্ধান করছিলেন, যা ছাত্রদের হাতে দিতে পারলে তারা তা পরীক্ষা করে আরও ভালভাবে মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব শিখতে পারবে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর চোখ পড়ল ভুট্টাদানার উপর। খই ভাজবার শাদা শক্ত ভুট্টাদানা ও সাধারণ মিষ্টি ভুট্টা দানার পরাগ সংযোগে দুটির মিশ্র প্রজননের ব্যবস্থা করলেন। যে সংকর ভুট্টা দানা সৃষ্টি হল, তার এক বস্তা তিনি ছাত্রদের দিলেন, তা থেকে মেণ্ডেলীয় সমানুপাতের হার বার করতে। পরীক্ষায় মেণ্ডেলীয় সমানুপাত অনুযায়ী, দুই বিভিন্ন প্রকারের ভুট্টাদানার ৩ ঃ ১ হার পাওয়া গেল না; তিনি আশ্চর্য হয়ে এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। শীঘ্রই এর কারণও আবিষ্কার করলেন।

১৯১৪ সালে তিনি কালোদাগ ওয়ালা-পাতা যুক্ত পরিব্যক্তি সাধিত ভুট্টা গাছের প্রথম সন্ধান পান। তারপর তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। এখানে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রতি বছর একবার তিনি ও তাঁর ছাত্রগণ গবেষণাকালে লিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (নোট) ও অপ্রকাশিত তথ্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের জন্য এখানে মিলিত হতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকার ভুট্টা সুপ্রজননবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা তথ্যের বিনিময় কেন্দ্র। অনুষঙ্গ, অদলবদল ক্রিয়া ও ক্রোমোজোমের জিন চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে যে সব বিপুল গবেষণা হয়েছে, সেগুলি আলোচনা করতেন তাঁরা। এসব বিষয়ে অগণ্য সমস্যা ছিল, একজন গবেষকের পক্ষে তা নিয়ে গবেষণা করা দুঃসাধ্য। এই সব সমস্যাগুলি পৃথক পৃথক গবেষণার জন্য ভাগ ভাগ করে আলাদা করা হত।

ভুট্টা সম্পর্কিত এমারসনের গবেষণা স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়েছিল। মর্গানের গবেষণার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না প্রথমে কিন্তু মর্গানের ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত প্রথম গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর তার এই গবেষণায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এমারসন ও তাঁর অনভিজ্ঞ গবেষকদল, তাদের গবেষণার কাজে মর্গান ও তাঁর সহকর্মীদের কর্ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চললেন। বুঝেছিলেন, ড্রসোফিলা মাছির জিনের মানচিত্রের মত তাদের এই ভুট্টার জিনের মানচিত্র জিন সংক্রান্ত গবেষণার সহায়ক হবে। যে সময়ে ভুট্টার মাত্র একবার ফলন হয়, সেই সময়ের মধ্যে পচা ফলে বসা ড্রসোফিলা মাছির ত্রিশ পুরুষ উৎপন্ন হয়ে যায়। এই কারণে নয়, অন্যান্য বহুবিধ কারণেই তাঁদের মর্গান ও তাঁর কর্মীদের গবেষণা অনুসরণ করতে হত। কিন্তু ড্রসোফিলা গবেষকদের তুলনায় তাদের একটা মস্ত সুবিধা ছিল। ভুট্টার জনন কোষের ক্রমোজোমগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে খুব সহজে পরীক্ষা করা যায়, এই কোষগুলির গঠন-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সরল বলে এগুলির চিত্রাঙ্কন সহজতর। ভুট্টার (Zea Mays) জনন-কোষে থাকে দশজোড়া ক্রোমোজোম ; তার সবগুলিই বিভিন্ন আকৃতির।

ভুট্টার ক্রোমোজোমের, জিনের কতকগুলি বিচিত্র নিশানা পাওয়া যায়। যেমন কোনও স্ফীতি, কোন সংকুচন, রসায়ন দ্রব্যে রঞ্জিত করা যায় না এমন কোনও অঞ্চল, কোনও উপ-জিন, টাকু-সুতা সম্বন্ধের মত কোনও বিশিষ্ট প্রকৃতি—এমনি সব নিশানা ভুট্টার জিনগুলির মানচিত্র রচনার সাহায্য করে। ইতিমধ্যে দুই শতাধিক পরিব্যক্ত ভুট্টার সন্ধান পাওয়া গেছে। রং, পাতা, পরাগধানী, পরাগের বন্ধ্যাত্ব, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, কার্বোহাইড্রেড (মিশ্র শালিজাতীয় পদার্থ, প্রাণী দেহের গঠনমূলক বস্তু) বিপাক ক্রিয়া, জ্রূণ মুকুল, সিলকস্ (Silks ভুট্টার ফুল) অন্তর্বীজ সারি সংখ্যা, মুল বৃদ্ধি, যৌন বিকৃতি প্রভাবিতকারী শতাধিক জিন, ভুট্টার ক্রোমোজোমে শুধু মাত্র দশটি অনুষঙ্গ দলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। ভুট্টার (Zea Mays) জিনের মানচিত্র ড্রসোফিলার মানচিত্রের পাশে স্থান পাবার যোগ্য।

মানুষের সুপ্রজনন তত্ত্ব অতিশয় জটিল। তবে এই বিদ্যা মানুষের সামনে প্রলুব্ধকর সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরে। মর্গান মনে করতেন মানুষের জিনের জটিল গঠন-শৈলীর জন্য বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চরণ সংক্রান্ত মেণ্ডেলীয় তত্ত্বের প্রয়োগ এখানে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাঁর মত ছিল বংশানুক্রমে প্রাপ্ত

মানুষের বহু বৈশিষ্ট্যের বিকাশ। মানুষের গুণাগুণের পরিবর্তন ও বহিঃ-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, সুনিশ্চিত ভাবে মানুষের কোনও অনুষঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় না।

অন্য অনেক জীবের তুলনায় মানুষ দীর্ঘজীবী। মানুষের জনন কোষে থাকে আটচল্লিশ, বা সম্ভবত ছেচল্লিশটি ক্রমোসোম। ক্রোমোজোমে ১০,০০০ থেকে ১০০,০০০ বিভিন্ন ধরণের জিন থাকে। রোমাঞ্চকর উপন্যাসে ও সন্দেহ-জনক কল্পনাবিলাস ছাড়া মানুষের সুপ্রজনন তত্ত্বের সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। এর একটা বড় কারণ হ'ল মানুষকে গবেষণাগারে গিনিপিগ বা পচা ফলে বসা ছোট ছোট মাছির মত ব্যবহার করার প্রচণ্ড অসুবিধা রয়েছে। সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে মানুষের কোন গোষ্ঠীর শোধন ও উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি বাজে কথা লেখা হয়েছে। এত বাজে কথা আর কোন শাখায়ই লেখা হয়নি।

১৯২৬ সালে মর্গানের গবেষণাগারের একজন প্রবীন কর্মী বার্লিনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সুপ্রজনন বিদ্যা কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রোতাদের সামনে একটি চমকপ্রদ ঘোষণা করলেন। মানুষের পক্ষে জীবজগতের অভিব্যক্তি সৃষ্টিমূলক পথে পরিচালিত করার এবং নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা নাটকীয় ভাবে দেখা দিল এই ঘোষণায়। পচা ফলে বসা ড্রসোফিলা মাছি নিয়ে গবেষণা চালিয়েই এই গবেষক এই ঘোষণা করেন। কয়েক বছর ধরে ড্রসোফিলা মাছির লিঙ্গ নির্দেশকারী ক্রোমোজোম সম্বন্ধে হারমান জোসেফ মুলার যে দীর্ঘকালীন পরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়েছিলেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি তারই ফলাফল ঘোষণা করেন।

জীবজগতে বিবর্তন ঘটে মানুষের আবির্ভাব হতে লেগেছে শতাধিক কোটি বৎসর। বিবর্তনবাদীরা এমনি কথাই বলে থাকেন। মুলার ভেবে দেখলেন, কোন প্রণালীতে বংশগত বৈশিষ্ট্য পুরুষাণুক্রমে সঞ্চারিত হয় তা নির্ধারণ করতে পারলে বিবর্তনের এই দীর্ঘ সময় হয়ত অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। ১৯১৪ সালে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে তিনি প্রথমে স্বতোবৃত্ত পরিব্যক্তির স্বাভাবিক হার নির্ণয়ের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তারপর তিনি ড্রসোফিলা মাছির নিষিক্ত ভ্রূণ কোষে তাপ ও নব উদ্ভাবিত রঞ্জন রশ্মি নিক্ষেপ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তির হার বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন।

নিভৃত নির্জনে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মত এই গবেষণা নিয়ে দীর্ঘ আট বছর কাটিয়েছিলেন মুলার। শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগৃহীত ভূরি পরিমাণ তথ্যাদি পরীক্ষা করে ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পরই তিনি সম্মেলনে তাঁর যুগান্তরকারী ঘোষণা করেন। ড্রসোফিলা মাছির ক্রমোজোমের জিনগুলির বিন্যাস তিনি নড়িয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতিজ বিন্যাস ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন এগুলি। পরিব্যক্তির হার তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন দেড়শো গুণ। কৃত্রিম উপায়ে তিনি বিবর্তন প্রণালী তরান্বিত করেছেন। তিনি সত্য সত্যই কৃত্রিম ভাবে প্রজাতির রূপান্তর সাধনে সফল হয়েছেন। ড্রসোফিলা মাছির উপর সাধারণ রঞ্জন রশ্মিপাত করে তিনি নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। একস্‌রে টিউবের বিকিরণের সাহায্যে মুলার পরম পবিত্র লিঙ্গ নির্দেশক একস্‌ ওয়াই ক্রোমোজোমের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন, খোদগারী করেছেন খোদার উপর। নিয়ন্ত্রণ সাধ্য এই কৃত্রিম পরিব্যক্তি দেখিয়ে দিল যে মানুষকে বিবর্তনের জন্য আর প্রকৃতির মন্থর গতির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।

মুলারের প্রদর্শিত পথে আরও অনেকে গবেষণা শুরু করলেন। বিপুল সম্ভাবনাময় এক সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র খুলে গেল এতে। পুরুষ, কুমারী এবং গর্ভবতী স্ত্রী ড্রসোফিলা মাছির উপর এই নতুন রঞ্জন রশ্মিপাত করে ফলাফল পরীক্ষা করা হ'ল। একজন রুশ গবেষক ড্রসোফিলা মাছির জনন-কোষে রঞ্জন রশ্মি পাত করে প্রথম পুরুষেই পরিব্যক্তি ঘটালেন। তারপর তিনি এই পরিব্যক্তি সাধিত বাচ্ছাগুলির উপর পুনরায় রঞ্জন রশ্মি পাত করে পরিব্যক্তিগত পরিবর্তন ধারা পাল্‌টে দিলেন। তাতে তৃতীয় পুরুষের মাছিগুলি স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থা নিয়ে জন্ম নিল। পরিব্যক্তি ধারা উল্টো দিকেও চালনা করা যায়—এতে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির গবেষক কর্মীরা শরবতী লেবুর বীজের উপর রঞ্জন রশ্মি পাত করলেন। এই বীজ থেকে যে শরবতী লেবু গাছ জন্ম নিল তাতে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ফুল ধরল। সাধারণতঃ শরবতী লেবু গাছে ফুল ধরতে লাগে ছয় বছর সময়। অন্য একদল বিজ্ঞানী টমেটো গাছের মুকুলে রেডিয়াম রশ্মি ও রঞ্জন রশ্মি পাত করে নতুন এক ধরনের টমেটো উৎপাদন করলেন। এ গুলির সঙ্গে অন্যান্য জাতের টমেটোর মিশ্র জনন চলে না। এ গুলি এবং পরবর্তী কালে এ ধরনের আরও পরীক্ষা উন্নততর ধরনের জীবের উপর

পরীক্ষার সূত্রপাত করবে। এই ধারায় গবেষণার ভবিষ্যৎ কি সে সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা অবশ্য শক্ত। কারণ এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কি রূপ নেবে তা কিছুই বলা চলে না।

১৯০৯ সালে যে শুভ মুহূর্তে মর্গান বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালনের সমস্যা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন, তারপর থেকে পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই নতুন সুপ্রজনন বিদ্যা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বহু শাখায় প্রযুক্ত হয়েছে।

সভ্যজগতের গবেষণাগার সমূহে সুপ্রজননবিদগণ জিন তত্ত্বের সত্যতা ঘোষণা করেছেন। জিন একটি সুনির্দিষ্ট চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত সত্তা। পরমাণুর মতই এর অস্তিত্ব নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অস্পষ্ট ক্রোমোজোমের সূত্রে গাথা পুঁতির মালা এই জিনগুলি। এরাই সমস্ত জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষেরও। এক অদৃশ্য বিধাতা কি আমাদের ভাগ্যজাল বুনে চলেছেন? যদি তাই বুনে চলেন তা হলে তাঁর সে বুনুনি চলছে জিনের পুঁতিভরা ক্রোমোজোমের সুতো দিয়ে।

১৯২৫ সালে স্টার্টভ্যাণ্ট প্রথম প্রদর্শন করেন যে, জিনগুলির বৈশিষ্ট্য বিধায়ক ক্ষমতা আশেপাশের অন্যান্য জিনগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতি জিনই একটি স্বতন্ত্র একক। সাধারণ ভাবে এগুলি পরিবর্তিত বা স্থানচ্যুত হলে জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের হেরফের ঘটে, তা হলেও এক অর্থে জীবের প্রতি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণই যে জিনগুলির সমষ্টিগত প্রভাবের ফলাফল, এ কথাও সত্য। ব্রিজেস এই জৈনিক সাম্যের (Genetic Balance) ব্যাপারটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই যে, পরিণত জীবদেহের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সমগ্র ক্রোমোজোমগুলির সকল জিনগুলির যুক্ত ক্রিয়ার ফলাফল। ঠিক কি ভাবে এই জিনগুলি একত্র কাজ করে তা বোঝা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে এই জিনগুলিই হ'ল সকল সক্রিয় গুণাগুণের বিকিরণ কেন্দ্র।

১৯২৮ সালে অধ্যাপক মর্গান ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নব-প্রতিষ্ঠিত জীববিজ্ঞান শাখার চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করলেন। স্টার্টভ্যান, কেলভিন ব্রিজেস ও জ্যাক শুলট্‌ৎস তাঁর অধীনে গবেষক রূপে নিযুক্ত হলেন। ড্রসোফিলা মাছি নিয়ে গবেষণা পুরোদমে চলতে লাগল।

১৯৩৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়োফিলাস এস. পেন্টার, 'এ নিউ মেথড ফর দি স্টাডি অব ক্রোমোজোম রিএরেঞ্জমেণ্টস অ্যাণ্ড দি প্লটিং অব ক্রমোজোম ম্যাপস্' (A new Method for the study of Chromosome Rearrangements and the Plotting of Chromosome Maps) নামে ক্রমোজোমের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর আগে ক্রোমোজোমের গঠন শৈলী ছিল নিতান্তই অনুমানের বিষয়। এই প্রতিভাদীপ্ত গবেষণাকে মর্গান সুপ্রজননবিদ্যার এক চিরকালীন সম্পদ বলে আখ্যা দিয়ে দিলেন। এর আগে ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণাই চলত এর ভ্রূণকোষের ক্রোমোজোম নিয়ে। কতকগুলি দ্বিপক্ষ পতঙ্গের সুবৃহৎ লালাগ্রন্থি ক্রমোজোমের গঠনশৈলী যে ডোরাকাটা দাগ সমন্বিত, কিছুদিন থেকে তা অবশ্য জানা গিয়েছিল। আর পরিণত ড্রসোফিলা শূকের লালাগ্রন্থি কোষের ক্রমোজোম যে তার ভ্রূণকোষের ক্রমোজোম অপেক্ষা সত্তর গুণ বৃহৎ তাও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল।

পেন্টার এই বৃহৎ ক্রমোজোমগুলির বিস্তৃত গঠন শৈলী আরও প্রকটিত করবার জন্য এগুলি এসিটোকারমাইন রঙে (অম্লাত্তক লাল রঙে) রঞ্জিত করবার এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। এই কৌশলের সাহায্যে তিনি সুবৃহৎ ক্রোমোজোমগুলিতে প্রায় এক হাজার বৃত্তাকার রেখার সন্ধান পেলেন। এই বৃত্তাকার রেখাগুলির অনুক্রমের সঙ্গে তিনি ব্রিজেস রচিত মানচিত্রের জিনের অনুক্রমের নিকট সাদৃশ্য প্রদর্শন করলেন। পেন্টার ক্রমোজোমের গবেয়ণায় এই নূতন ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সূত্রপাত করবার পর ব্রিজেস ও পেন্টারের পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধনের জন্য এবং ক্রোমোজের আরও পূর্ণতর ও বিস্তৃততর রূপ নির্ধারণের জন্য পেন্টারের প্রদর্শিত পথে গবেষণা শুরু করলেন।

ক্রোমোজোমের মানচিত্রের ত্রুটি ও দ্বিত্ব পরীক্ষা করে, এর সংস্কার সাধনের জন্য ব্রিজেস বৃহৎ লালাগ্রন্থি নিয়ে গবেষণা চালাতে লাগলেন। কাজটি ক্রমেই কঠিন ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল, পরীক্ষার ফলাফল জমে উঠছিল পর্বতপ্রমাণ। ১৯৩৬ সালে পুত্র ফিলিপ এম, ব্রিজেস, পিতার গবেষণা কার্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। দু বছর পর কেলভিন ব্রিজেস, তাঁর 'রিভাইজড্ ম্যাপ অব দি স্যালিভারি গ্লাণ্ড একস্ ক্রোমোজোম, (Revised Map of Salivary Gland X Chromosome) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু প্রতিভাবান, সরল, সাদাসিধা প্রকৃতির কেলভিন ব্রিজেস তাঁর গবেষণা শেষ করে যেতে পারেননি। এই গবেষণা কাজে তিনি এত অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছিলেন যে, ১৯৩৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, উনপঞ্চাশ বছর বয়সে হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি লস এঞ্জেলস্ শহরে মারা যান।

মানুষের পক্ষে প্রকৃতির চূড়ান্ত রহস্য, ব্যাখ্যার প্রয়াস যে নিছক কল্পনাবিলাস, মর্গান এ কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। জটিল যন্ত্রপাতি নয়, দুখানি নিপুণ হাত, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিস্তৃত গভীর জ্ঞানসম্পন্ন কল্পনা প্রবণ মন, বৃহত্তর সমস্যা সমাধানক্ষম বিষয় নিয়ে একনিষ্ঠ অধ্যাবসায়ে গবেষণা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা—এরই সাহায্যে তিনি সৃষ্টিলীলার অন্যতম রহস্য (বংশগত বৈশিষ্ট্য সঙ্কলন প্রণালী) সমাধানের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মর্গানের এই অবদান সৃষ্টি লীলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের সমাধান সম্ভাবনা খুব নিকটে এগিয়ে এনেছে।

মর্গানের জিন তত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তনবাদ স্পষ্টতর করে তোলে। বিবর্তনবাদের পরিপূরক স্বরূপ কাজ করল তাঁর এই তত্ত্ব। জীব জগতে বিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডারউইন জোর দিয়েছিলেন পরিবেশ পরিবর্তন-জাত ঈষৎ প্রকারণগুলির (মূল প্রজাতি থেকে সামান্য একটু পার্থক্যযুক্ত প্রাণী) উপর, এই প্রকারণগুলি বংশানুক্রমে জীবদেহে সঞ্চারিত হয় এবং প্রাণের উৎপত্তির আদিকাল থেকে প্রকৃতি রাজ্যে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে সত্তারক্ষার যে নাটকীয় লীলা চলে এসেছে জীবজগতে, সেই সময় ধীরে ধীরে এগুলির আকার-প্রকারভেদ ঘটে। এই সময় জীবদেহের ক্ষতিকর পরিবর্তনগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়, জীবের উদ্বর্তনের সহায়ক পরিবর্তনগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন অপ্রতিরোধ্য যুক্তি। নির্মম নিষ্ঠুর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে জীবজগতের বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে—জীব জগৎ হতে অধুনালুপ্ত বহু প্রাণীর অন্তর্ধানের এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলেও প্রাকৃতিক নির্বাচন যে জীবজগতের বিবর্তনের অন্তরালবর্তী সৃজনী শক্তি নয়, এ কথা আজ আমরা স্বীকার করি। জীব জগতে বিবর্তন সংঘটনে, পরিব্যক্তির যে আংশিক সৃষ্টিধর্মী ভূমিকা রয়েছে মর্গান তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এখন আর আমরা বিবর্তন সংঘটনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ও জীব-জগতের সত্তা রক্ষার সংগ্রামের কথা আগের মত জোর দিয়ে বলি না।

জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত নতুন নতুন বিপুল সংখ্যক তথ্যের নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে এখনও। এখন এই সিদ্ধান্ত করা খুবই সঙ্গত হবে যে, পরিব্যাক্তি সৃষ্ট উপাদানের উপর কোন এক ধরনের নির্বাচিত পদ্ধতির ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থেকেই উত্তরোত্তর জটিল দেহী বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যে কোন মতবাদেরই ভিত্তি হতে হবে বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের প্রণালী, জিন তত্ত্বের দ্বারা মর্গান যার ব্যাখ্যার চেষ্টা করে গেছেন। যা হোক মর্গান বিশ্বাস করতেন যে, পরীক্ষাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভিত্তিতেই আমরা পরিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করতে পারি। এমনি পরীক্ষা ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী গ্রহণ করার ফলেই রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি ঘটেছে। বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী ল্যান্সিলট হগবেন বলেছিলেন, 'এখন থেকে দুশো বছর পর যখন বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত ইতিবৃত্ত লিখিত হবে, তখন হয়ত দেখা যাবে যে সে ইতিহাসের পাতায় চার্লস্ ডারউইনের নামের চেয়ে টমাস হাণ্ট মর্গানের নাম অনেক বেশীবার উল্লেখ করা হয়েছে।'

নতুন সুপ্রজনন বিদ্যা ইতিমধ্যেই উন্নত শ্রেণীর গৃহপালিত পশুপক্ষী উৎপাদনে কার্যকরী সাহায্য প্রদানে সক্ষম হয়েছে। নতুন সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্য নিয়েই উৎকৃষ্টতর মাংস প্রদানকারী গবাদি পশু, বেশী দুধ দেওয়া গাভী ও পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশী ডিম দেওয়া মুরগী উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। উন্নততর তরুলতা ও শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই নূতন বিদ্যা লুথার বারব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পুরাতন পদ্ধতিকে আরও নির্ভুল ও সহজনিয়ন্ত্রণসাধ্য ভিত্তিতে স্থাপিত করল। এই বিদ্যার সাহায্য নিয়ে জর্জ এইচ. শুল এক সংকর ভুট্টা উৎপাদন করলেন। এ থেকে দেশের সর্বত্র বৃহৎ আকারে নতুন নতুন শ্রেণীর সংকর ভুট্টা উৎপাদনের পরীক্ষা কার্য শুরু হয়ে গেল। এমনিভাবে উন্নততর শস্যকণা উৎপাদন ও শস্যের ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন ফসলের মোট মুল্য কোটি কোটি ডলার বৃদ্ধি পেল। ছাতাপড়া রোগ রোধকারী, অতি গুরুত্বপূর্ণ গম গাছ, শৈত্য সহনক্ষম এমন কি পঙ্গপালের উপদ্রব্যের হাত হতে আত্মরক্ষা-সক্ষম গম চারা, সিগারেট নির্মাতাদের জন্য বিশেষভাবে উৎপাদিত নতুন ধরনের তামাকপাতা, মৃদু গন্ধবিমুক্ত বাঁধা কপি—এমনি অন্যান্য অনেক মূল্যবান শস্য সর্বপ্রথম এই নতুন সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে উৎপন্ন হল।

জিন তত্ত্ব আরও একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা সমাধানের

ইঙ্গিত দিয়েছে। এগুলি হল জড়বুদ্ধি, দুর্বলচিত্ত ও কয়েকটি শ্রেণীর মানসিক বিকৃতির সমস্যা। মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতি জাতীয় ব্যাধির ক্ষীণতম সন্দেহ দেখা দিলে, বিবাহের পূর্বে প্রায়ই এগুলি বংশানুক্রম কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করতে অনুরোধ জানান হয়। নতুন সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে এমনি অনুসন্ধান কার্য চালান এখন সম্ভব হয়েছে। শিশুর পিতৃত্ব নিয়ে যেখানে সন্দেহ দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে এখন আইনজীবীগণ বিভিন্ন রক্তদলের (ব্লাড গ্রুপের) বংশানুক্রম-ধর্মিতা সম্পর্কিত জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে থাকেন। ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি যে মানুষের চোখের রং, চুলের রং, ব্লাড গ্রুপিং, ধবল, হাতে পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল জন্মানো—এসব তত্ত্ব মেণ্ডেলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা দিয়ে থাকে। পশু প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশগত লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা এখন অনেক বেশী জানি। প্রকৃতি সমস্ত জীবদেহেই একই কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন, এই জ্ঞানের ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্যানসার, যক্ষা এবং বহুমূত্র প্রভৃতি. গুরুতর এবং সম্ভবত বংশগত ব্যাধি নির্মূল করবার চেষ্টা করছেন।

১৯৩৩ সালে মর্গান শারীরবৃত্ত ও ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে শারীরবৃত্তে বংশগতি সম্পর্কিত তাঁর আধুনিক মতবাদের যে গুরুত্ব রয়েছে তা স্বীকৃত হল, তাঁর প্রবর্তিত নূতন সুপ্রজনন বিদ্যা ভেষজ বিজ্ঞানে ভবিষ্যতে যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে তা মেনে নেওয়া হল। পাসাডেনাতে যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর এসে পৌছাল, গবেষণাগারের সমুদয় কর্মী সে সংবাদে পরমোল্লসিত হয়ে উঠলেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে মর্গান সেই বছরই শীতকালে সুইডেনে গেলেন না। পরের বছর বসন্তকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখলেন। তখন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মর্গান ও কন্যা তাঁর সঙ্গে যান।

সেই বছর বসন্তকালে স্টকহলমে বিজ্ঞানী, কুটনীতিবিদ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় নোবেল পুরস্কার গ্রহণ কালে মর্গান 'দি রিলেশান অব জেনেটিকস্ টু ফিজিওলজি অ্যাণ্ড মেডিসিন' (The Relation of Genetics to Physiology and Medicine) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সমবেত শ্রোতাদের বললেন, "সুপ্রজনন বিদ্যা ভেষজ বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে অবদান রেখেছে তা হল বুদ্ধিগত। মানুষের বংশগতি সঞ্চারণের সমগ্র ব্যাপারটাই এমন অস্পষ্ট, পৌরাণিক কাহিনী ও কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন

যে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের ভিত্তি রচনা করাই এক প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন, 'অনুষঙ্গের ব্যাপারটি একদিন মানুষের রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে। মানুষের দেহ লক্ষণ সৃষ্টিতে অনুষঙ্গের প্রভাবের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি সত্য, কিন্তু এক সময় যে শত শত অনুষঙ্গ আবিষ্কৃত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কতকগুলি যে মানুষের দৃশ্য ও অদৃশ্য দেহ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য একত্র সংবদ্ধ করবে, এমন অনুমান করা চলে।"

১৯৪১ সালে জুন মাসে, মর্গান পঁচাত্তর বছর বয়সে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির জীববিজ্ঞান বিভাগের সর্বময় কর্তার পদ হতে অবসর গ্রহণ করলেন। গবেষণার কাজ কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করলেন না। "ইনস্টিটিউটে বসবাসকারী অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপকের" একটি নতুন পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি গবেষণার কাজ যথারীতি চালাতে লাগলেন। তিনি বললেন, অফিস পরিচালনা সংক্রান্ত কাজকর্মের দায় থেকে মুক্ত হয়ে এবার "তিনি কিছু কাজ করে উঠতে পারবেন।" ম্যাসাচুসেটস্-এর উডস্ হোলে ১৯০৩ সালে একটি সমস্যা সমাধানে তিনি প্রথম তৎপর হন। এবার সেই সমস্যাটির সমাধান বার করাই তাঁর নিত্য কর্ম ধারার অন্তর্ভুক্ত হ'ল। এ প্রশ্নটি প্রত্যক্ষভাবে ড্রসোফিলা মাছির সুপ্রজনন বিদ্যার সঙ্গে জড়িত নয়। এটি মিশ্র ও স্ব-প্রজননের সমস্যা, এবং জৈনিক বিন্যাসের (Genetic Situation) ধরন যা ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে। উভলিঙ্গ সাধারণ সামুদ্রিক স্কোয়ার্ট কেন নিজের শুক্রাণু সিঞ্চনের দ্বারা কখনও আপন গর্ভোৎপাদন করে না মর্গান তার কারণ অনুসন্ধান করছিলেন। এই উভলিঙ্গ সামুদ্রিক প্রাণীগুলির শুক্রাণু অন্য স্বজাতির গর্ভোৎপাদন করত। মৃদু অ্যাসিডে সিঞ্চন করে এবং অন্য কতকগুলি সহজ প্রক্রিয়ায় মর্গান একটি স্কোয়ার্টের নিজ শুক্রাণু দ্বারা তার গর্ভসঞ্চার করালেন। যে বাচ্চাটি এবার প্রসূত হল, সেটি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পরীক্ষার জন্য এমনিভাবে স্বনিষেক প্রক্রিয়ায়, একই জনকের শুক্রাণু দ্বারা পর পর বংশবৃদ্ধি ঘটানো হতে লাগল।

হাজার হাজার পরীক্ষা চালানোর পর মর্গান স্বীকার করলেন তিনি মিশ্র ও স্বপ্রজননের সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হননি, শুধু পৌঁছেছেন "একটা মনের অবস্থায়, কোন সমাধান নয়।" গবেষণার কাজ কিন্তু চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্ন। শেষে ১৯৪৫ সালে শেষের দিকে আশি বছর বয়সে সুপ্রজনন বিদ্যার এই প্রধানতম বিজ্ঞানী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

॥ ১৬ ॥

হারবার্ট ম্যাকলীন ইভান্স

(১৮৮২-   )

হর্মোন ও পুষ্টি-বিষয়ক গবেষণায় আমেরিকার অবদান

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একমাত্র সুপ্রজনন বিদ্যার ক্ষেত্রেই শুধু আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অগ্রগতির নতুন পথ প্রশস্ত করে দেননি, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এনডকরিনোলেজি (অন্তঃনিঃস্রাবী গ্রন্থি রস ক্ষরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান) নামক বিজ্ঞানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখাটির উন্নতি সাধনেও অতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞানের এই শাখাটির উপজীব্য বিষয় হল অনাল গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ। এক সময় আমেরিকার ছাত্ররা জীবাণুবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইউরোপে যেত। পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে থাইরয়েড (গলগ্রন্থি), পিটুইটারি, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়, প্যারা থাইরয়েড (উপগল গ্রন্থি), অণ্ডাশয়, শুক্রাশয় সংক্রান্ত কতকগুলি অনাল গ্রন্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদল আসতে লাগল আমাদের দেশে। এই অনাল গ্রন্থিগুলি দেহের রক্ত প্রবাহে সরাসরি ভাবে শরীরের প্রয়োজনীয় বহু রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ করে।

কিছুকাল ধরে বিজ্ঞানীরা পুনরায় ধীরে ধীরে থিয়োফ্রেসটাস প্যারাসেলাসের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। খৃষ্টধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথারের মত ভেষজ বিজ্ঞানের সংস্কারক এই মহান বিজ্ঞানী বলতেন, "মানুষের দেহটি একটি বিরাট ও জটিল রাসায়নিক কারখানা। মানুষের এই দেহের মধ্যে রয়েছে এক অদৃশ্য ডাক্তারখানা ও চিকিৎসা। এই অদৃশ্য চিকিৎসক দেহের প্রয়োজন মত ঔষধ তৈরি করে, ঔষধের বিধান দেয়, কম্পাউণ্ডারী করে, ঔষধ প্রয়োগ করে।" রসায়ন বিজ্ঞান কিভাবে ভেষজ বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হতে পারে তিনি তারও ইঙ্গিত দেন। বিজ্ঞানীরা পুনরায় অনুধাবন করতে শুরু করলেন যে দেহ যন্ত্রের বিভিন্ন

কোষ ও গ্রন্থি নিঃসৃত রসকলা ও অঙ্গের ভৌত ও রাসায়নিক ক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারলে এগুলির কার্য প্রণালী জানা সহজতর হবে।

জন জ্যাকব আবেলই সর্বপ্রথম হর্মোন (উত্তেজক রস) থেকে প্রাপ্ত কেলাস বিশুদ্ধ বা প্রায় বিশুদ্ধ আকারে নিষ্কাশন করেন। ১৮৯৭ সালের মে মাসে জনস হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেষের আড্রিনালের (কটিগ্রন্থি) কেন্দ্র শাঁস ত্বকে এপেনেফ্রিনের একটি মনোবেঞ্জিল উদ্ভূত সক্রিয় সালফেট নিষ্কাশন কালে এই হর্মোনজাত কেলাসটি পাওয়া গিয়েছিল। এমনি কেলাস নিষ্কাশন ভেষজ বিজ্ঞানে একটি কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা। নিউ জার্জির ক্লিফটনের জোকিচি টাকামিন নামে একজন জাপানী রসায়নবিদ এর কিছুকাল পরই এই হর্মোনটির বিশুদ্ধ কেলাস উৎপাদন করেন এবং আড্রিনালিন নামে সেটি বাজারে বিক্রয় করতে শুরু করেন। পাঁচ বছর পর এটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হতে লাগল। 'আড্রিনালিন' একটি মৃত সঞ্জীবনী তুল্য। আকস্মিক শারীরিক বা মানসিক আঘাত বা উত্তেজনায় মরণাপন্ন রোগীর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া যখন রুদ্ধ হয়ে আসার উপক্রম করে তখন সেই জীবন মরণ সন্ধিক্ষনে এই ঔষধটি প্রয়োগ করে রোগীর দুর্বল হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া চালু রাখা যায়। রক্তবাহ সঙ্কুচিত করে এই ঔষধটি স্থানিক রক্ত মোক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবল রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করে, এবং হাপানির আকস্মিক প্রবল টান রোধ করে।

আবেল যখন আড্রিনাল সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যস্ত তখন দেহের আভ্যন্তরীণ আরও এক ধরনের রসক্ষরণ গ্রন্থির আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হল। কোন প্রণালী অনুসরণ করে অগ্ন্যাশয় হতে অগ্ন্যাশয় রস নির্গত হয়ে পাকস্থলীতে পতিত হয়ে খাদ্য বস্তুর পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে শারীরবৃত্তবিদগণ বহুদিন ধরে সে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছিলেন। সেই চেষ্টা থেকেই এই রসক্ষরণের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়। ১৯০২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্নস্ট এইচ স্টার্লিং ও উইলিয়াম বেলিস কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে এই রসক্ষরণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ হল একটি রাসায়নিক প্রতিবর্তী। ক্ষুদ্রান্ত্রের মুখের চারপাশে পট্টির মত যে কোষগুলি রয়েছে সেগুলি সেকরেটিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে। এই রাসায়নিক পদার্থ কোনও প্রকার নলের সাহায্য না নিয়েই দেহের রক্ত প্রবাহের মাঝে মেশে। রক্ত প্রবাহ এই রাসায়নিক পদার্থ অগ্ন্যাশয়ে বহন করে নিয়ে যায়। সেখানে রক্তবাহিত সেক্রেটিন অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে খাদ্যনালীতে অগ্ন্যাশয় রস

প্রেরণে সাহায্য করে। এই হর্মোনটি আড্রিনালিনের মতই অতিশয় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক যৌগিকের সমশ্রেণীর।

১৯১৪ সালের খৃষ্টজন্মের দিনে এডওয়ার্ড সি কেণ্ডেল নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী থাইরোকসিন নামে নতুন একটি হর্মোন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। এই কেলাসটির অতি সামান্য এক কণিকা মাত্র এক কালীন মনুষ্যদেহে দেখতে পাওয়া যায় অথচ এই হর্মোনটির উপরই মানুষের জীবন মরণ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি জড়ত্ব নির্ভর করে। ১-৫০ সালে অষ্ট্রিয়ার সালসবুর্গে বহু সংখ্যক হাবাগোবা বিকৃতাঙ্গ ক্রেটিনকে (cretin) পরীক্ষা করে বোঝা গিয়েছিল এই হতভাগ্য মানুষগুলির এই শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়েছে সম্ভবতঃ এদের থাইরয়েড (গলগ্রন্থি) গ্রন্থি অতিমাত্রায় রোগাক্রান্ত হবার জন্যই, কিংবা হয়ত আদপেই এদের দেহে কোনও থাইরয়েড গ্রন্থি নেই। এই ক্রেটিনরা সাধারণতঃ হয়ে থাকে বিকৃতদেহী, কিম্ভূতকিমাকার, বিরাট উদর ও উদভ্রান্ত দৃষ্টি সম্পন্ন। ভবিষ্যৎহীন অসহায় এই মানুষগুলিকে সুস্থ স্বাভাবিক করার চেষ্টা সত্ত্বেও এরা এমনি জরগদ্গবের মত বেড়ে চলে।

থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজ চলার জন্য দায়ী যে রসায়নিক পদার্থটি (হর্মোন) থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তা নিষ্কাশনের বহু চেষ্টা চলতে থাকে। কতকগুলি সুচতুর কৌশল অবলম্বন করে কেণ্ডেল শেষ পর্যন্ত এই থাইরয়েড গ্রন্থিরস থাইরকসিন নিষ্কাশন করতে সক্ষম হলেন। কেণ্ডেল প্রথমে কিছুটা ভুলভ্রান্তিসহ এই থাইরকসিনের উপাদান সূত্র (ফরমূলা) আবিষ্কার করেছিলেন। পরে নির্ভুল ফরমূলা আবিষ্কৃত হয়। ১৯২৭ সালে রসায়নাগারে এটি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। এগুলি বর্ণহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূচাকৃতি, এর শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই আইডিন। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত থাইরকসিনের সাহায্যে ঐ কিমভূত কিমাকার ও জড়বুদ্ধি ক্রেটিনগুলিকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হল। ইতিহাসে এই প্রথম ক্রেটিনিজম, মিকসেডেমা (হাইপো থাইরয়েডইজিম) এবং হাইপার থাইরয়েডইজিম—এই ব্যাধিগুলির ভেষজ বিজ্ঞান দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব হল।

এরপর ফ্রেডারিক জি বানটিং ইনসুলিন আবিষ্কার করলেন। পাস্তুরের রোগজীবাণু তত্ত্ব বা কুরি দম্পতির তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম আবিষ্কারে বিশ্ববাসী যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উঠেছিল, এই ইনসুলিনও তেমনি বিস্ময় সৃষ্টি করল। বহুমূত্র যে অগ্ন্যাশয় ঘটিত রোগ প্রায় তিনশত বৎসর ধরে এই তত্ত্ব মানুষের

জানা ছিল। এই গ্রন্থির নির্যাসের সাহায্যে বহুমূত্ররোগীর চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। তারপর টোরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণ্টিং সহসা এক সমাধানসূত্র পেয়ে গেলেন। ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানোর জন্য পাঠ্যবিষয়ক বক্তৃতা তৈরি করবার সময়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মোজেস বারনের একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলি বেঁধে রাখলে ট্রিপসিন নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকারী কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই ট্রিপসিনই অগ্ন্যাশয়ের যে কোষগুলি ইনসুলিন উৎপাদন করে তাদের অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা লোপ করে দেয়। অগ্ন্যাশয় রসে এই ভাবে ইনসুলিন উৎপন্ন না হওয়ার জন্যই প্রধানতঃ পূর্ববর্তী পরীক্ষকগণ বহুমূত্র রোগে অগ্ন্যাশয় রসের নির্যাস প্রয়োগ করে রোগ নিরাময়ে সক্ষম হননি। বাণ্টিং এর গবেষণার পূর্বে অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলি কেটে দেওয়া হতনা তাই ট্রিপসিন অগ্ন্যাশয়ে সঞ্চিত ইনসুলিন নষ্ট করে দিত!

বাণ্টিং বুঝতে পারলেন যে অগ্ন্যাশয় রস সংগ্রহের পূর্বে অগ্ন্যাশয়গামী নালিকাগুলি বেঁধে রাখতে হবে, যাতে ট্রিপসিন বহুমূত্ররোধক ইনসুলিন সৃষ্টিকারী কোষগুলি ধ্বংস না করতে পারে। এই পথে পরীক্ষা চালিয়ে হয়ত তিনি সাফল্য লাভ করবেন। পরিকল্পনা নিয়ে দেখা করলেন অধ্যাপক কে, আর, ম্যাকলিঅডের সঙ্গে। ইনি বহুমূত্ররোগের রোগবিদ্যা ও শারীর বৃত্তে বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক ম্যাকলিঅডের নিকট বাণ্টিং চাইলেন গবেষণাগারের 'সুযোগ সুবিধা, আট সপ্তাহের জন্য একজন সহকারী, ও পরীক্ষার জন্য দশটি কুকুর। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল।

অগ্ন্যাশয় নালিকাসমূহ বেঁধে দেওয়া কতকগুলি কুকুরের অগ্ন্যাশয় রসের খানিকটা নির্যাস তৈরি করলেন বাণ্টিং। ১৯২১ সালের ২৭শে জুলাই-এর সকালে এই নির্যাস অন্য একটি কুকুরের জুগুলার শিরার মধ্যে ইনজেকসন করা হল। এই কুকুরটির অগ্ন্যাশয় অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বিদূরিত করে এটিকে ইতিপূর্বে বহুমূত্র রোগগ্রস্থ করে তোলা হয়েছিল। বাণ্টিংএর এই গবেষণায় রক্তের শর্করার পরিমাণ বিশ্লেষণের ভার দিয়েছিলেন অধ্যাপক ম্যাকলিঅড চার্লস এইচ বেণ্টের উপর। উদগ্রীব চঞ্চল গবেষণাগারের অপর প্রান্ত থেকে যখন "রক্তে শর্করার ভাগ কমে এসেছে" বলে সানন্দ চিৎকার কানে ভেসে এল, তখন বাণ্টিং বুঝলেন যে, কুকুরটিকে তিনি বহুমূত্র রোগে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। ছমাস পরে

আরও বিশুদ্ধ অগ্ন্যাশয় রস নির্যাস প্রস্তুত হল। তারপর এটি সর্বপ্রথম পরীক্ষা করা হ'ল চৌদ্দবছরের একটি কিশোরের উপর। ছেলেটি আহত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে টোরোণ্টো জেনারেল হাসপাতালে পড়েছিল। এই অবস্থা থেকে সর্বদাই বহুমূত্র দেখা দিয়ে রোগীর অনিবার্য মৃত্যু ঘটে। এই অত্যাশ্চর্য নির্যাস ছেলেটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আজ লক্ষ লক্ষ বহুমূত্ররোগীর প্রাণ ইনসুলিন প্রয়োগে রক্ষা পাচ্ছে। ভেষজ ও রসায়ন যে এক বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে, ইনসুলিন তারই সাক্ষ্য বহন করছে। ইনসুলিন আবিষ্কার করার জন্য বাণ্টিং ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ক্যানাডা সরকার তাঁকে আমৃত্যু ৭৫০০ ডলার হারে বার্ষিক বৃত্তি দেন। ইংরাজ সরকার পরে তাঁকে নাইট খেতাবে ভূষিত করেন।

ইনসুলিন ইনজেকসনের দ্বারা দেহে প্রয়োজনীয় ইনসুলিন সরবরাহ করে বহুমূত্ররোগীর রোগ উপশম করা যায় মাত্র, রোগ নিরাময় করা যায় না। ইনসুলিনের সাহায্য ব্যতীত, খাদ্যের সঙ্গে মনুষ্যদেহে গৃহীত শর্করার যথোচিত সদ্ব্যবহার হয় না। অগ্ন্যাশয় কোষ দেহে ইনসুলিন উৎপন্ন না করলে, দেহ খাদ্যের শর্করা ভাগ গ্রহণ করতে পারে না। শর্করা দেহে সঞ্চিত হতে থাকে এবং সেই সঞ্চিত শর্করা ধীরে ধীরে মূত্রে আশ্রয় নেয়। শর্করাজাত তেজ দেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সব বহুমূত্ররোগীর অগ্ন্যাশয়, এই ইনসুলিন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, বা প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইনসুলিন উৎপন্ন করে না তাদের দেহ এই অত্যাবশ্যকীয় শর্করা শক্তি হতে বঞ্চিত হয়। কাজেই এইসব রোগীর দেহে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন সরবরাহ করতে হয়। যতদিন পর্যন্ত না ভেষজ বিজ্ঞান অগ্ন্যাশয়ের পীড়া বা অপুষ্টিজনিত ক্ষয় রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে, ততদিন বহুমূত্ররোগীদের রোগ প্রশমিত রাখতে নিয়মিত ইনসুলিন নেওয়া ছাড়া গতি-নেই। ইনসুলিন গলাধঃকরণ করে দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করা যায় না। কারণ পাচন নালীর গাঁজনে এর উপাদানগুলি তখন বিভাজিত হয়ে যায়। ফলে দেহ শর্করা গ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলে।

ইনসুলিন অগণিত বহুমূত্র রোগীর প্রাণরক্ষা করেছিল। এদের একজন হলেন পশ্চিমাঞ্চলের সান জোয়াকুইন উপত্যকার এক গ্রাম্য ডাক্তার। ক্যালিফোর্নিয়ার মডেস্টোর ডাঃ সি ডব্লিউ ইভ্যান্স জীবনের প্রথমভাগে ছিলেন প্যাসিফিক রেলওয়ের ডাক্তার। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মাঝে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের উপর অস্ত্রোপচার করবার জন্য প্রায়ই তাঁর ডাক পড়ত।

এ সময় মাঝে মাঝে তিনি তার ছেলে হার্বার্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। হাবার্ট মস্ত বড় একজন সার্জেন হবে এই স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

বড় হয়ে হার্বার্ট ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। হার্বার্টের বাবাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি হার্বার্টও আকৃষ্ট হলেন। স্নাতকের পরীক্ষায় পাস করবার পর তিনি পড়তে গেলেন জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ১৮৭৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বহুবিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কর্মজীবনের প্রস্তুতির জন্য, আমেরিকার তরুণ বিজ্ঞানীদের আজ এরপর থেকে ইউরোপের বড় বড় দিকপালদের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন রইল না।

অধ্যাপক জ্যাক লোয়েবের নিকট ইভানস্ তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করার বাসনা জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক লোয়েবে তাকে তখন এই উপদেশ দিয়েছিলেন: 'সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণায়-রত মামুলী বিজ্ঞানী হয়ে জীবন কাটিও না। বাঁধা ক্ষেত্র ভেঙ্গে নতুন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়, ভয় পেও না, নিজের বাঁধা ধরা বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয়ের গবেষণার কাজে এগিয়ে আসতে।' ইভানস্ এই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আঁটসাট সীমান্ত ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে পড়ছিল। বিভিন্ন শাখার গবেষক বিজ্ঞানীরা বেপরোয়াভাবে একে অন্যের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছিলেন। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে তার নির্বাচিত বিজ্ঞানের শাখা আঁকড়ে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছিল। ইভান্স শারীরবিদরূপে বিজ্ঞানী জীবন শুরু করলেন। পরে ভ্রূণতত্ত্ব তাকে আকর্ষণ করল। কিন্তু একঘেয়ে কলাছেদের কাজ ক্লান্তিকর ঠেকতে লাগল। চাইলেন দেহ যন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতি স্তরের ক্রিয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে, ধরা পড়ে গেলেন গতিশীল জীববিদ্যার গবেষণার মাঝে। লালাগ্রন্থির গবেষণাও অবশ্য তার অন্তর্গত ছিল।

কুকুরের অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিরস হতে ইনসুলিন তৈরি করে বহুমূত্র রোগগ্রস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বান্টিং যখন কুকুর মেরে চলেছেন সেই সময় ইভান্স পিটুইটারি গ্রন্থি নামে রহস্যময় একটি লালাগ্রন্থি সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার করতে চলেছিলেন। এই পিটুইটিয়ারি গ্রন্থিটি দেহের একটি অতি ক্ষুদ্র অঙ্গ, মস্তিষ্কের তলদেশ সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি অস্থিপ্রকোষ্ঠে নিরাপদে সংস্থাপিত। জীব ও প্রাণীর লালাগ্রন্থিগুলির মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাওয়া

সবচেয়ে কঠিন, এটি তার অন্যতম। বিজ্ঞানীরা বহুদিন অনুমান করে আসছিলেন যে এই লালাগ্রন্থিটির কাজের সঙ্গে জীবদেহের বৃদ্ধির কোনও একটি সম্বন্ধ আছে।

এই পিটুইটিয়ারি গ্রন্থিতে জীবের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী কোনও হর্মোন ক্ষরণ করে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য ইভান্স কশাইখানা ও টিনে প্যাক করা মাংসের কারখানা থেকে ষাঁড়ের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করে, তার জলীয় নির্যাস তৈরী করে নিলেন। ১৯২০ সালে প্রথমে অনেকটা করে এই নির্যাস মূষিক শাবককে খাইয়ে ফলাফল পরীক্ষা করলেন। তারপর এই নির্যাস তাদের দেহে ইনজেকসন করলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই মূষিক শাবকগুলি বৃদ্ধি পেয়ে বিরাট আকার ধারণ করল। এই বৃদ্ধি শুধু মেদস্ফীতি জনিত নয়, ইঁদুর শাবকগুলির অস্থি, হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ক, পৌষ্টিক নালী ও অন্যান্য সমুদয় অঙ্গই বিরাট আকৃতি লাভ করেছিল। মূষিকশাবকগুলি স্তন্য ত্যাগ করবার কিছুকাল পরই ইভান্স ইনজেকসন বন্ধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেল। আবার পিটুইটারি গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করার ফলে দেহ ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করেছে, এমনি কতকগুলি মূষিককে এই ইনজেকসন দিয়ে দেখা গেল মূষিকগুলি পুনরায় স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়েছে। ১৯২২ সালে "অ্যানাটোমিক্যাল রেকর্ড" পত্রিকায় ইভান্স ও জোসেফ এ লঙ, এই জীবদেহের বৃদ্ধি সহায়ক হর্মোনের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে যদি এই অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়, তা হলে মানুষের ক্ষেত্রেও কেন তা সম্ভব হবে না? আরও বিশুদ্ধ, আরও শক্তিশালী পিটুইটারি নির্যাস তৈরি করলেন ইভান্স। এবার এটি জে. এম নাম্নী নয় বৎসরের একটি বালিকার উপর পরীক্ষা করা হ'ল। প্রায় চার বছর এই বালিকাটির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছিল। নিউইয়র্ক শহরের ডঃ উইলিয়াম এনজেলবাক বালিকাটিকে এই ইনজেকসন দিলেন এবং ১৯৩১ সালে আট মাসের মধ্যে মেয়েটির ২·৭ ইঞ্চি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেন। অন্যান্য চিকিৎসকগণও এই নির্যাসটি রোগীদের উপর পরীক্ষা করে দেখলেন। আরও বিস্ময়কর সাফল্যের কথা ঘোষিত হল। পনেরো বছরের একটি খর্বকায় বালক একুশ মাসে সাড়ে আট ইঞ্চি বেড়ে গেল।

এই পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাসের সাফল্য দেখে, অনেক বিজ্ঞানী স্বপ্ন দেখতে লাগলেন যে, পৃথিবী থেকে একদিন অতি খর্বকায়, দৈত্যপ্রমাণ বা বামনাকৃতি

মানুষের দল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় ব্রণ্টোসোরাস ও বর্মযুক্ত ডাইনোসারের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলিও ত্রুটিযুক্ত লালা গ্রন্থি নিয়ে জন্মানোর ফলেই ধরা পৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দল বিজ্ঞানী আবার আশা করতে লাগলেন যে, এই ইনজেকসন দিয়ে একদিন পৃথিবীতে দৈত্যসম এক মানব কুল সৃষ্টি করা যাবে। ইভান্সের মনে কিন্তু এমনি কোনও রোমাঞ্চ দেখা দিল না। তিনি শুধু এই মন্তব্য করেছিলেন, 'জাপ সম্রাট নাকি তাঁর খর্বাকৃতি সেনাদের দীর্ঘকায় করে তুলতে চান। দৈহিক বৃদ্ধি উত্তেজক এই হর্মোনের দ্বারা একাজ সম্ভব। কিন্তু এতে এখন যে খরচা পড়বে, তা বহন করবার ক্ষমতা মিকাডোরও নেই।'

পরীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা গেল, লালা গ্রন্থিগুলির মধ্যে জটিলতম হল এই পিটুইটারি গ্রন্থি। এটি যুগপৎ বারোটিরও অধিক বিভিন্ন ধরনের হর্মোন উৎপন্ন করে। এটি দেহের অন্যান্য গ্রন্থিগুলির কাজের প্রধানতম সমন্বয় সাধক বলে মনে হয়। এটিকে তাই প্রধান লালা গ্রন্থি (মাস্টার গ্লাণ্ড) বলা হয়ে থাকে। এর কার্য প্রণালীর অনেক কিছুই এখনও বিজ্ঞানের অপরিজ্ঞাত রহস্যগুলির অন্যতম।

ইভান্স লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর পিটুইটারি নির্যাস পিটুইটারি গ্রন্থির অভাবে রুদ্ধবৃদ্ধি ইঁদুরের বৃদ্ধি বর্দ্ধনের সাহায্য করলেও কিন্তু এর অভাব বা ত্রুটি জনিত স্তিমিত যৌন প্রবৃত্তির পুনরুদ্রেক করতে সক্ষম হত না। পিটুইটারি গ্রন্থিহীন স্ত্রী মূষিক সঙ্গম কালে ডিম্বাণু নিঃসার করে না। কিন্তু রতি ক্রিয়ার এক ঘণ্টার কম সময়ের আগে যদি এ গ্রন্থিটি অপসারিত করা হয়, তা হলে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ পিটুইটারি গ্রন্থির পূর্ব লতিতে আরও একটি হর্মোন নিঃস্রাবী অংশ আছে। সেটিই ডিম্বাণু উৎপাদন করে থাকে।

এই অনুমান সত্য কিনা তা পরীক্ষা করবার একটি কৌশলের সন্ধান মিলল। এটি উদ্ভাবন করলেন ১৯১৭ সালে চার্লস আর স্টকার্ড নামে একজন আমেরিকাবাসী ও জর্জ এ পাপানিকোলাউ। এরা বিভিন্ন সময়ে স্ত্রী গিনিপিগের যোনির মল সংগ্রহ করে দূরবীণে পরীক্ষা করে, বিভিন্ন ধরনের ভ্রূণ কোষের অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেন। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংগম প্রবৃত্তি কালেই ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়ে থাকে। স্টকার্ড ও পাপানিকোলাউ এর

পরীক্ষিত গিনিপিগ যখন সংগম প্রবৃত্তির অধীনে থাকে তখন দেখা গেল তার জনন কোষগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এওসিন রঞ্জকের দ্বারা তখন তার প্রোটোপ্লাজমগুলিকে উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত করা চলে। আবার গিনিপিগটির মধ্যে যখন সংগম প্রবৃত্তির লক্ষণ থাকে না, তখন তার জনন কোষগুলি অন্য ধরনের হতে দেখা যায়। কাজেই বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত যোনিমল পরীক্ষা করে কোনও প্রাণীর সংগম প্রবৃত্তি নির্দ্ধারণ করা যায়। ১৯২২ সালে ইভান্স ও জোসেফ এ ল্যাং এই পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা কার্য চালিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন যে ইঁদুরের ক্ষেত্রে সংগম প্রবৃত্তি ঘড়ির কাঁটার মত বৃত্তাকার পথে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হতে থাকে।

পরের বছর ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কেলেতে ইভান্সের গবেষণাগারে গবেষণা চালিয়ে ফিলিপ ই. স্মিথ যৌনধর্মের সঙ্গে পিটুইটারি গ্রন্থির সম্পর্কটি আরও স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন। তিনি একটি সুচতুর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। তাতে কণ্ঠনালী ছেদ করে অপেক্ষাকৃত সহজে পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারিত করা সম্ভব হত। গ্রন্থিটি অপসারিত হবার পরই যৌন প্রবৃত্তি সর্বদাই মন্দীভূত হয়ে আসত। পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারণের ফলে নিবৃত্তকাম মূষিক দেহে পুনরায় অন্য একটি মূষিক দেহ হতে সংগৃহীত এই পিটুইটারি গ্রন্থি তিনি পুনঃসংস্থাপিত করলেন। তাতে মূষিকটির স্তিমিত যৌন শক্তি পুনরায় স্বাভাবিক, এমন কি মাত্রাধিক হয়ে উঠল। এমনি ভাবে স্মিথ চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করলেন যে পিটুইটারি গ্রন্থিতে এমন একটা কিছু রয়েছে যা জীবের যৌন প্রবৃত্তি উদ্রেক করে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে স্মিথ ইঁদুর নিয়ে এই পরীক্ষা করেছিলেন, তাই সফল হতে পেরেছিলেন। কারণ গিনিপিগ খরগোস, কুকুর ও বিড়ালের উপর এই পরীক্ষা চালিয়ে সাফল্য অর্জন করা যায় না। অন্য দিক দিয়ে আবার তাঁর ভাগ্য মন্দ। কারণ তাঁর এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের চারমাস আগেই জার্মানীতে বার্নার্ড জোনডেক ও সেলেমার অ্যসহাইম অপরিণত তরুণ প্রাণীদেহে পিটুইটারি পুনঃ সংস্থাপন সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। তারা পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে গোনাডোট্রপিক হর্মোন নিষ্কাশন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এই গোনাডোট্রপিক হর্মোনই গর্ভাশয় ও শুক্রাশয়ে যথাক্রমে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু নিঃসরণে সাহায্য করে থাকে।

গবেষণাকালে জোনডেক লক্ষ্য করেছিলেন, মূষিকের দেহে তার

পিটুইটারি নির্যাস ইনজেকসন করলে যে ফল পাওয়া যায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মূত্র ইনজেকসন করলেও সেই একই ফল দেখা দিয়ে থাকে। এ থেকে জোনডেক স্ত্রীলোকের গর্ভ নির্ণয়ের প্রথম নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। ১৯২৮ সালের পর থেকে এই পদ্ধতিটির অনেক অদল বদল হয়েছে। অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের মূত্র মুষিক খরগোশ বা ভেকের ত্বকে ইনজেকসন করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রাণীটি হত্যা করে তার জননইন্দ্রিয় পরীক্ষা করলে জনন কোষের কতকগুলি অতি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এ পদ্ধতি শতকরা ৯৯ ভাগ নির্ভুল। ঋতু বন্ধের আট দিনের মধ্যেই এতে গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ ধরা পড়ে।

এই সব আবিষ্কারের পিঠ পিঠই পিটুইটারি গ্রন্থির অপর বহিঃ পার্শ্বস্থ স্তিতে অবস্থিত চতুর্থ আর একটি হর্মোনের সন্ধান পাওয়া গেল। লং আইল্যাণ্ডের কোল্ড স্প্রিং হারবাবের ওস্কার রীডল পায়রাকে পিটুইটারি নির্যাস খাইয়ে দেখতে পেলেন যে এতে তার প্রথম পাকস্থলীতে দুগ্ধ নিঃসারের ক্ষমতা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। এই দুগ্ধ উৎপাদনকারী হর্মোন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর (পুরুষ প্রাণীরও) লালা গ্রন্থিতে দুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে। হুলো বিড়ালকে এই ইনজেকসন দিয়ে দেখা গিয়েছিল যে সেটি দুগ্ধবতী হয়ে উঠেছে। এই দুগ্ধ উৎপাদনকারী হর্মোনটির নাম দিয়েছিলেন রীডল্ প্রোল্যাকটিন। পরে তিনি পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, যে এই প্রোল্যাক্টিন জীবের মনে মাতৃভাব উদ্রেক করতেও সক্ষম হয়।

১৯৩৩ সালে একজন ফরাসী গবেষক পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগে পঞ্চম একটি হর্মোনের সন্ধান পেলেন। তিনি জানালেন জীবদেহে এর প্রভাব বহুবিধ। থাইরয়েড গ্রন্থিকে সক্রিয় করে তোলা তার মধ্যে অন্যতম। এই হর্মোনটি এখন থাইরোট্রপিন নামে পরিচিত।

ইতিমধ্যে ইভান্স ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক জীববিদ্যার ইনস্টিটিউটের ডাইরেকটার নিযুক্ত হলেন। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন বিশুদ্ধ আকারে উৎপাদনের প্রচেষ্টাও তিনি পরিত্যাগ করলেন না। নাছোড়বান্দার মত লেগে রইলেন এ কাজে। ১৯৩৯ সালে জানালেন হর্মোনটি তিনি বিশুদ্ধ আকারে নিষ্কাশিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বহু বিজ্ঞানীই বস্তুটিকে বিশুদ্ধ দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন বলে স্বীকার

করতে রাজী হলেন না। তাদের মতে বস্তুটি অবিশুদ্ধ ও যৌগিক। অন্যেরা তাঁর ঐ নিষ্কাশিত বস্তুটিকে একমাত্র দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন বলে মানতে রাজি হলেন না। ১৯৪১ সাল নাগাদ ল্যাক্টোজোনিক বা দুগ্ধ উৎপাদক ও থাইরোট্রপিক হর্মোন গবেষণাগারে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশোধিত করে বিশুদ্ধ আকারে নিষ্কাশিত করা সম্ভব হল। এই হর্মোনগুলি প্রাণী দেহে ইনজেকসন করে দেখা গেল প্রাণীগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাত্রা বেড়ে গেছে। পিটুইটারি গ্রন্থিজাত হর্মোনই একমাত্র দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে পুনরায় তাই বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। রীডল দাবী করলেন যে দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন পৃথক একটি বস্তু, এই ধারণা প্রয়োজনীয় হলেও অপরিহার্য নয়। ইভান্সের মতে মূষিক দেহে পিটুইটারি নির্ধাস দ্বারা যে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা দেয় তার জন্য থাইরোট্রপিক (গল গ্রন্থিরস উত্তেজক) ল্যাক্টোজেনিক (দুগ্ধ উৎপাদক) বা গোনাডোট্রপিক (ডিম্বাণু উৎপাদক) হর্মোন অত্যাবশ্যক নয়। ১৯৪১ সালে তিনি প্রমাণ করলেন যে স্ত্রী মুষিকের বৃদ্ধিব জন্য থাইমাস গ্রন্থিও অত্যাবশ্যক নয়। শেষে চো হাও লি নামে একজন বিজ্ঞানী ষাঁড়ের পিটুইটিটারি গ্রন্থির থেকে এই বৃদ্ধি প্রবর্ধক হর্মোন বিশুদ্ধ ভাবে নিষ্কাশিত করতে সক্ষম হলেন। চো হাও লি চীনের ক্যাণ্টন শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইভান্সের অধীনে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। চো হাও লির নিষ্কাশিত বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন প্রয়োগ করে সেটির দুগ্ধ, গলগ্রন্থি, ফলিমিল, ইনটারস্টিটিয়াল সেল (মধ্যবর্তী কোষ) বা এড্রিনোকোরটিকোট্রপিক রস উত্তেজক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল না। এটি এক বিশুদ্ধ যৌগিক বলে মনে হল। চো ও ইভান্স সায়েন্স পত্রিকায় এ তত্ত্ব প্রকাশ করলেন, কিন্তু তাতেও বিতর্ক সাঙ্গ হল না। চার্লস আর স্টকার্ড মনে করতেন, দেহ বৃদ্ধির সত্যিকারের প্রকৃতিটি কি তা সম্পূর্ণরূপে এখনও জানা সম্ভব হয়নি বলেই এই মতানৈক্য ও তজ্জনিত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে! জীব দেহ কি ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় শরীর বৃত্তে তার সঠিক পদ্ধতি না জানতে পারা পর্যন্ত এই বিতর্ক চলতে থাকবে।

ইভান্স আরও একটি বৃহত্তর সম্মানের অধিকারী। তিনি, চো হাও লি ও মিরিয়াম ই সিমসন নামে তাঁর দুই সহকর্মী মিলে তাঁরা পিটুইটারি গ্রন্থির (হাইপোফেসিন) সম্মুখ ভাগের ষষ্ঠ হর্মোনটি বিশুদ্ধ আকারে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই হর্মোনটিকে সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে এ সি টি এইচ

বা অ্যাড্রেনোকর্টিওট্রোপিক হর্মোন (ACTH or adrenocortiotropic hormon)। এই হর্মোনটি, বৃক্কের বহিস্ত্বক বা ছাল উৎপাদনে সাহায্য করে, যাতে বৃক্কটি কার্টিসন নামে তার নিজস্ব হর্মোন আরও বেশী উৎপাদন করতে পারে। ১৯৪৯ সালে গেঁটে বাত (Rheumatoid arthritis) ও গেঁটেবাতসহ হৃদপিণ্ডের প্রদাহযুক্তজ্বরে (Rheumatic fever) সাফল্যের সঙ্গে এই ACTH হর্মোন ব্যবহৃত হওয়ায় সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে গেল। গেঁটে বাত সম্বন্ধে একজন প্রধান বিশেষজ্ঞ ডঃ ফিলিপ এস হেঞ্চ, ও জৈব রসায়নবিদ এডওয়ার্ড সি কেণ্ডেল দেখালেন যে এই দুইটি রোগ কর্টিসোন ও ACTH হর্মোন ব্যবহার করে উপশম করা যায়। কেণ্ডেল থাইরকসিন, পরে কর্টিসোন বিশুদ্ধ আকারে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিষ্কাশন ও বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোটিসোন ও হাইড্রোকোটিসোন প্রয়োগে গেঁটে বাত চিকিৎসার সুব্যবস্থা করায় ডঃ হেঞ্চ ও কেণ্ডেল ১৯৫০ সালে ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান।

ইভান্সের বিশুদ্ধ হর্মোন আর্মার অ্যাণ্ড কোম্পানি তাঁদের কারখানায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হর্মোন চিকিৎসকদের নিকট পাঠালেন। কর্টিসোনের নির্যাস নিষ্কাশন তৈরি করা খুবই কঠিন। এক গ্রামে ($\frac{1}{30}$ আউন্স) কর্টিসোন নিষ্কাশন করতে ১,৮০০,০০টি মেষ হত্যা করে তাদের বৃক্ক সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ পরিমাণ ACTH নিষ্কাশন করতে প্রয়োজন হয় হাজার হাজার শূকরের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করবার, তার উপর রয়েছে এগুলিকে চাঁছা ছোলা করে পরিষ্কার করা, শোধন করা। এতে এ হর্মোনটি তৈরি করতে যেমন সময় লাগে, তেমনি খরচাও পড়ে অত্যধিক। এ জিনিস কৃত্রিমভাবে তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

সাগ্রহে রসায়নবিদ্‌রা এই প্রাণজ হর্মোনগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরির কাজে লেগে গেলেন। প্রথম কৃত্রিম কর্টিসোন তৈরি করলেন রবার্ট বি উডওয়ার্ড। ইনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মাসাচুসেটস্ ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজি হতে পি, এইচ ডি উপাধিলাভ করেন।

কিন্তু কৃত্রিম ACTH তৈরি করার কাজ অত সহজ হল না। অতিশয় দক্ষতা ও অগাধ অধ্যবসায় সহকারে রসায়ন বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারের কাজে লেগে থেকেও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। যা হোক; আমেরিকান সায়নামিড কোম্পানিতে দুই গবেষকদল, ও ইভান্স লেবরেটরীতে চো হাও লির অধীনে গবেষণারত আর একটি বিজ্ঞানী দল ১৯৫৫ সালে জানালেন যে এই

বস্তুটি কম পক্ষে উনষাটটি এমিনো অ্যাসিড এককের শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত একটি অতিকায় পরমাণু।

হর্মোন গবেষণার ক্ষেত্রে আরও অনেকেই নিযুক্ত ছিলেন। সেণ্ট লুইএর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের জীবরসায়ন গবেষণাগারের এডওয়ার্ড এ ডোইজি জোনডেকের পিটুইটারি গ্রন্থি-বিষয়ক মূল গবেষণা পড়ে ডিম্বাশয় গ্রন্থির হর্মোনের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বহু হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ থেকে গর্ভিনীদের হাজার হাজার গ্যালন মূত্র সংগ্রহ করলেন। নতুন ধরনের কনডেনসার ও অভিনব পাতন যন্ত্র নির্মাণ করে এক সঙ্গে পঞ্চাশ গ্যালন মূত্র ঘনীভবন, পাতন ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন। ছয় বছর ধরে বিভিন্ন দ্রাবকের সাহায্যে এই ভাবে মূত্র থেকে হর্মোন পৃথক করবার চেষ্টা করে চললেন। অবশেষে তিনি এই গর্ভিনী মূত্রে একটি অতি শক্তিশালী হর্মোনের সন্ধান পেলেন। ১৯২৯ সালে ডোইজি ডিম্বকোষজাত বিশুদ্ধ কেলাসিত হর্মোন পৃথক করণের কথা ঘোষণা করলেন।

এই নতুন হর্মোনটির নাম দেওয়া হয়েছিল এস্ট্রোন। এরপর ডোইজি ও অন্যান্য গবেষকগণ আলফা এস্ট্রাডিওল ও এস্ট্রিয়ল নামে নারী ডিম্বাশয় জাত অন্যান্য হর্মোনের সন্ধান পেলেন। এস্ট্রাডিওলই নারী ডিম্বশেয়ের মূল হর্মোন। এই হর্মোনটির জন্যই যৌবনারম্ভে নারী দেহে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডিম্বাশয়ের প্রতি বীজ কোষের গহ্বর গাত্রসংলগ্ন কোষগুলিই এই হর্মোন উৎপাদন করে থাকে। এটি এস্ট্রোন অপেক্ষা দশগুণ শক্তিশালী।

অণ্ডাশয়ের আর একটি হর্মোন হল প্রোগেস্টারোন। ১৯৩০ সালে জর্জ ডব্লিউ কোরনার, রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অপরিশোধিত অবস্থায় প্রোগেস্টারোন নিষ্কাশিত করেন। ১৯৩৪ সালে বিশুদ্ধাবস্থায় এটি বুটেনাণ্ড ও অন্যান্য তিনটি গবেষণাগারে নিষ্কাশিত করা হয়। পরে কৃত্রিম উপায়েও তৈরী করা হয়। এই হর্মোনটি জনন কোষ রোপণ ও ক্রমবর্দ্ধমান ভ্রূণের পুষ্টির জন্য জরায়ুগাত্রে আস্তরণ তৈরী করে। তা ছাড়া, এই হর্মোনটি জরায়ুর পেশী সংকোচনে বাধা দিয়ে, অসময়ে ভ্রূণটির জরায়ু হতে নির্গত হওয়া বন্ধ করে। সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে স্ত্রী ডিম্বাশয়ের হর্মোন পাওয়া যায় গর্ভবতী জীব ও প্রজননার্থ পালিত ঘোড়ার পালের মূত্র থেকে। এই হর্মোনগুলি কিছুটা আপাত সাফল্যের সঙ্গে হিমোফিলিয়া, শিশুদের যোনি স্ফীতি, স্ত্রীলোকের ঋতু সম্পর্কিত পীড়া, চিকিৎসায় তীব্র দুরূহ রজঃবোধের উপসর্গের সাময়িক বিরতি

সাধনে, পর্যায়ে ক্রমিক তীব্র মাথা ধরা (migraine) ও বার্দ্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধে, এবং বন্ধ্যাত্ব, বিলম্বিত যৌবনোদ্গম, অপোগণ্ডতা (ইনফ্যাণ্টাইলইজম) যৌন প্রকৃতি হীনতা প্রভৃতি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়েছে।

স্ত্রীজননতন্ত্রজাত হর্মোন আবিষ্কারে আমেরিকানদের এই নাটকীয় সাফল্যের পর পুরুষ জননতন্ত্রজাত হর্মোন (male hormones) আবিষ্কারের নবোদ্যমে চেষ্টা শুরু হল। ১৯২৩ সাল থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ সি কোচের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এবিষয় গবেষণা চালাচ্ছিলেন। লেমুয়েল সি ম্যাকগী নামে জনৈক বিজ্ঞানী ছিলেন এই গবেষক দলে। তিনি অতি সূক্ষ্ম ও কুচি কুচি করে কাটা তাজা ষণ্ড শুক্রাশয় স্নায়ু কলা থেকে পুরুষ সেক্স হর্মোন নিষ্কাশিত করতে সক্ষম হলেন। একটি পরীক্ষার সাহায্যে এই হর্মোনটির কার্যোপযোগিতা প্রমাণিত হল। পরীক্ষাটি বহু শতাব্দীর সুপরিচিত একটি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু যুগ ধরেই মানুষ জানত যে মোরগের অণ্ডাশয় অপসারিত করলে সাধারণ মোরগ অপেক্ষা তার মাংস আরও নরম ও কোমল হয়ে থাকে। অন্য দিক দিয়েও খাসি করা মোরগ সাধারণ মোরগ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এমনি ভাবে পুরুষত্ব নাশের দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়াও বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। গর্বোদ্ধত তেজী মোরগটি এতে নিস্তেজ, শান্তিপ্রিয় ও মেয়েলী স্বভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে। মাথার ও গলার ঝুঁটি তত বাড়ে না। পালকের চকচকে উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো রঙ্গীন বাহার তত খোলে না।

১৯২৭ সালে ম্যাকগী তাঁর তৈরী নির্যাস একটি খাসি করা মোরগকে ইনজেকসন করলেন। মোরগটির মাথার ছোট ঝুটি দেখতে দেখতে সুবৃহৎ ও সোজা খাড়া হয়ে উঠল, কণ্ঠের ঝুঁটিও বেড়ে গেল। এই নির্যাসে ছিল পুরুষের হর্মোন। এই হর্মোনের জন্যই পৌরুষত্ব সূচক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়ে থাকে। এরপর কোক ও তাঁর স্ত্রী বিশুদ্ধ পুরুষ হর্মোন কেলাস নিষ্কাশনের আশায় এই নির্যাস শোধন করতে শুরু করলেন। ১৯৩২ সালে ইউরোপ থেকে খবর এল, বিশুদ্ধ কেলাসের আকারে পুরুষ হর্মোন তৈরী করা গেছে। করেছেন, এডলফ্ বুটেনাণ্ড। অল্পের জন্য ইনি এর আগে স্ত্রী হর্মোন (ফিমেল হর্মোন) প্রথম বিশুদ্ধাকারে নিষ্কাশনের গৌরবলাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কারণ তার কিছু আগেই ডোইজি এ কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবার এই পুরুষ হর্মোন নিষ্কাশনে তিনিই প্রথম সাফল্যের

গৌরব অর্জন করলেন। মানুষের জননতন্ত্রের গ্রন্থির (সেক্স গ্লাণ্ড) বদলে বৃক্কের গ্রন্থিরস থেকে তিনি এই হর্মোন সংগ্রহ করেন।

এই হর্মোনটির নাম এনড্রোস্ট্রেরোন। এটি পুরুষের মূত্র থেকে পাওয়া যায়। যদিও এটি শুক্রাশয় জাত হর্মোন নয়। শুক্রাশয় জাত হর্মোনই মূল পুং হর্মোন। ১৯৩৫ সালে হলাণ্ডের ই'ল্যাকেয়ার বিশুদ্ধ কেলাসের আকারে এটি প্রথম নিষ্কাশিত করেন। এর নামকরণ করা হয়েছিল, টেস্টোসস্টারোন। এই দ্বিতীয় পুং হর্মোনটি অ্যাণ্ড্রোস্টারোনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

মানুষের যৌনগ্রন্থি (সেক্স গ্ল্যাণ্ড) বদলে বা কৃত্রিম উপায়ে শক্তিশালী করে নব যৌবন লাভ করা যায়। একদল বিজ্ঞানী এমনি কথা বলতেন। এই সব বিজ্ঞানীদের দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য এবার এই প্রথম দুটি শক্তিশালী পুং হর্মোন পাওয়া গেল। যৌনগ্রন্থি (সেক্স গ্ল্যাণ্ড) বদলে নবযৌবন লাভের হুজুক উঠেছিল ১৮৮৯ সাল থেকে। সেই বছর চার্লস ই ব্রাউন প্যারিসের জীববিজ্ঞান সমিতিতে একটি বক্তৃতা দেন। এই চার্লস ই ব্রাউন এক সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোপ্যাথোলজির (স্নায়ুরোগ নিরূপণ বিদ্যা) অধ্যাপক ছিলেন। বক্তৃতা কালে তিনি কুকুরের শুক্রাশয় নিঃসৃত রস হতে নিষ্কাশিত অশোধিত জলীয় পদার্থ আপন দেহে ইনজেকসন করেছেন। তিনি দাবী করেছিলেন এমনি ইনজেকসন গ্রহণের ফলে তিনি জরার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এর পরই রাতারাতি একদল গ্রন্থি চিকিৎসক ও গ্রন্থি পরিবর্তনের সাহায্যে নবযৌবনদানকারী হাতুড়ে চিকিৎসকের উদ্ভব হল। ভিয়েনার সার্জেন ভেরোনফ ও ইউজেন স্টাইনাবের বহু বিজ্ঞাপিত গ্ল্যাণ্ডের পরীক্ষায় ১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এই হুজুক চরমে ওঠে। খোজা ভেড়া, পাঁঠা, ষাঁড় ও ঘোড়া নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ভোবোনফ বললেন '১৯১৩ সালে আমি বাঁদরের মাঝে মানুষের দেহ যন্ত্রের কতকগুলি বদলি অংশের (স্পেয়ার পার্ট-এর) সন্ধান পাই। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে আমি বাঁদরের দেহ থেকে এই বদলি অংশ (গ্রন্থি) স্পেয়ার পার্টস (গ্ল্যাণ্ড) সংগ্রহ করে পুরানো গ্রন্থির বদলে এপর্যন্ত এক হাজার মানুষের দেহে বসিয়েছি।'

বাঁদরের গ্রন্থি মানুষের দেহে জুড়ে দেবার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হত। হর্মোন আবিষ্কারের পর স্টেইনাখ তাঁর বিখ্যাত বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড জুড়ে দেবার পদ্ধতি বদলে এসট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরোন ইনজেকসন দিতে

লাগলেন। কিন্তু বৃদ্ধের যৌবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না এতে। স্টকার্ড জানালেন, স্টেইনাথ ও ভেরোনফের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মেছিল যে সেক্স গ্ল্যাণ্ড জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্যই বার্ধক্য দেখা দেয়। এটি ভুল। সেক্স গ্ল্যাণ্ডের জরাজীর্ণতা একটি উপসর্গ, কারণ নয়। বলদ, খোজা ঘোড়া খাসি করা মোরগ, সাধারণ ষাঁড় ঘোড়া বা মোরগ অপেক্ষা আগে বা পরে বার্ধক্যে উপনীত হয় না।

হর্মোন গবেষণায় নতুন নতুন তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছিল নিতাই। তার মাঝে জিনের ভিত্তিতে বা একসওয়াই ক্রোমোজোমের একত্র যুক্তি বা বিযুক্তির ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ণয়ের পন্থা প্রায় তলিয়ে যাবার উপক্রম করল। শেষোক্ত পন্থায় প্রথম প্রবক্তা টি এইচ মর্গান পন্থী সুপ্রজননবিদগণ। তাঁরা এ মতের সত্যতার সপক্ষে বহুবিধ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতেন। বিশেষ করে ড্রসোফিলা মাছির ক্ষেত্রে। জীবের লিঙ্গ ভেদ দেখা দেয় কি ভাবে, এ প্রশ্নে বিজ্ঞান আজ সর্বজন গ্রাহ্য কোনও মতবাদ গ্রহণ করতে পারেনি। বিজ্ঞানীদের শুধু এই কথা মেনে নিতে হয়েছে যে এ ব্যাপারে ক্রোমোসোম ও দেহের বিভিন্ন গ্রন্থির কার্যকলাপই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মানুষ ও অন্যান্য অধিকাংশ জীবের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লিঙ্গ নিয়ন্তা হল ক্রোমোসোম। ভ্রূণের প্রতি কোষে যদি দুটি একস্ ক্রোমোসোম থাকে তা হলে ভ্রূণটি স্ত্রী লিঙ্গ পাবে। আর সেটিতে যদি একটি একস্ ও একটি ওয়াই ক্রমোসোম থাকে তা হলে সেটি পুরুষ জীবের রূপ নেবে। কি ভাবে ক্রোমোসোম, ভ্রূণে লিঙ্গ লক্ষণ বিকাশে সাহায্য করে তা এখনও এক রহস্য। আমরা এখন অবশ্য জানি লিঙ্গ লক্ষণ বিকাশের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত রয়েছে যৌন (সেকস্) হর্মোনে বিভিন্ন গ্লাণ্ডের (গ্রন্থির) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও আমরা অনেক কথাই এখন জানি। জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পদ্ধতির (ফীড ব্যাক) সাহায্যে গ্ল্যাণ্ডগুলি পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেকটি গ্লাণ্ড পরস্পরকে সাম্যাবস্থায় রক্ষা করে। ক্রোমোসোম কি ভাবে হর্মোন উৎপাদন বা যৌনপ্রকৃতির (সেক্সের) অন্য কোনও বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, তা আমরা এখনও জানি না।

জীব দেহে কোন লিঙ্গ কেন দেখা দেয়, তা স্থির করার সমস্যাবলী ১৯৩২ সালে হার্বার্ট এস জেনিং সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন, "লিঙ্গ লক্ষণ বিকাশে জিনের প্রভাব কার্যকরী হয় তার উৎপন্ন হর্মোন থেকে। গ্রন্থিতে

কোন হর্মোন দেখা দেয়, তা নির্ভর করে, শুরুতে সেখানে কোন ধরনের জিন ছিল তার উপর।" অন্তঃকরণ সম্পর্কিত গবেষণা নতুন ভেষজ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বভিত্তিক চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ দুটি শাস্ত্র অবশ্য এখনও শৈশবাবস্থায়। এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্টকার্ড যদিও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কিছু প্রমাণ দিয়েছিলেন। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা বিভাগে কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে সর্বপ্রকার সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বই প্রায়শঃ বংশগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্ল্যাণ্ডগুলির অতঃক্ষরণের বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। লক্ষ্য করেছিলেন, কতকগুলি গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড) একত্র মিলে কতকগুলি জাতের কুকুরের দেহে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি করে। স্টকার্ড' কৃত্রিম উপায়ে কতকগুলি জাতের কুকুর সৃষ্টি করলেন। যেগুলি খেয়াল খুশি ও বিচিত্র অব্যবস্থচিত্ততার বুদ্ধি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে এমনি সব অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের অনুরূপ। পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে কুকুরগুলির এই অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে গ্ল্যাণ্ডের গোলযোগ। আরও দেখা গেছে যে স্নায়ুতন্ত্র যৌনগ্রন্থির (সেক্স্ গ্ল্যাণ্ডের) উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বহু বিজ্ঞানীর দৃঢ় বিশ্বাস ফলিত শরীরবিদ্যা ভবিষ্যতে একদিন হর্মোনের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরা এখন আর নীচ, রুক্ষ ও নির্বোধ প্রকৃতির মানুষের বদলে ফরমাস মাফিক কাজ করার অনুরূপ, সদাশয়, মধুর স্বভাব, ও কর্মতৎপরতা সম্পন্ন কলের মানুষ (রোবট) তৈরী করার কথা বলেন না। তারা চেষ্টা করছেন জীব বিজ্ঞানের সাহায্যে এমনি ফরমায়েসী মানুষ তৈরী করতে। এদিক দিয়ে যেখানেই একটু আলোক দেখছেন, সে দিকেই তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। আশা করছেন, জীববিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের চারিত্রিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করতে তারা একদা নিশ্চয়ই সফল হবেন।

হর্মোন ছাড়া আরও কতকগুলি বস্তু আছে যেগুলিও মানুষের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলি হল খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন। ভাইটামিন সম্বন্ধে গবেষণা তা থেকে আহরিত পুষ্টি সম্বন্ধে নতুন তত্ত্ব সাধারণ ভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকার অত্যুজ্জ্বল অবদান। হর্মোনের মত এ অবদান মৌলিক। যে সব স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী এই উভয় ক্ষেত্রে পথিকৃতের কাজ করেছেন ইভান্স তাদের অন্যতম। তিনি হর্মোনের গবেষণায়ই

চিরস্মরণীয় কীর্তি রচনা করে যাননি, ভাইটামিনের ক্ষেত্রে ও অনেক মৌলিক আবিষ্কার ও অবদান রেখে গেছেন। মূলতঃ রসায়ন বিজ্ঞানীরূপে তিনি এই সব গবেষণাও আবিষ্কার করেননি। করেছিলেন প্রাণ প্রক্রিয়ার পরস্পর সংযুক্ত সমগ্র শক্তিগুলির সন্ধানকারী শারীর স্থানবিদ ও শারীরবৃত্তাবিদ্‌রূপে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিদ্যালয়ের ফলিত জীববিজ্ঞানের ইনসটিটিউটে মূষিকের যৌন প্রবৃত্তি চক্র সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় থেকে ইভান্স ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। হর্মোন সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সময়ই তিনি এ কাজ হাতে দেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা কার্যে ব্যবহৃত ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণীগুলির খাদ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল এই হর্মোন সংক্রান্ত পরীক্ষাকালে। প্রাণীগুলির যৌন প্রবৃত্তি চক্র রচনায় এদের খাদ্যেরও কোনও প্রভাব রয়েছে এমনি অনুমান করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেবার আগের তিনটি বছরে (১নং ১৪—১৬) উইস্‌কশনিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যালকোলুম ভিটামিন এ ও বি আবিষ্কার করেছিলেন। এই এ ও বি ভিটামিন সম্বন্ধে কতকগুলি খাদ্য তৈরি করেছিলেন ম্যালকোলুম। ইভান্স তাঁর গবেষণাগারের কতকগুলি ইঁদুরকে নিয়মিত এই ভিটামিন যুক্ত খাদ্য খেতে দিলেন। কিছুদিন পর তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন এই খাদ্য খেয়ে ইঁদুরগুলির স্বাভাবিক যৌন চক্র দেখা দিচ্ছে, যৌন সংসর্গ ও গর্ভ হচ্ছে, কিন্তু গর্ভস্থ শাবক জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না। বিকাশ কালেই গর্ভ মধ্যেই ভ্রূণটির মৃত্যু ঘটেছে। ভিটামিন এ বা বি কোনটিই এই ভাবে জরায়ু মধ্যে ভ্রুণের এই অদ্ভুত মৃত্যু রোধ করতে পারছে না।

তারপর শুরু হল ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানযুক্ত খাদ্যের সন্ধান। দেখা গেল টাটকা লেট্‌স ও শুকনা আলফাফা খড়ে এই উপাদানটি বিদ্যমান রয়েছে কারণ ইঁদুরের খাদ্যের সঙ্গে এগুলি মিশিয়ে দিলে বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ করা যায়। গমের বীজও এমনি শক্তিশালী উপাদান। এ থেকে যে সোনালী রঙা তৈলাক্ত পদার্থ নিষ্কাশিত করা যায়, তার কণা মাত্রই মৃতবৎসার দোষ, ও বন্ধ্যাত্ব রোধ করতে সক্ষম। যতদিন না নিশ্চিত হতে পারছেন যে খাদ্যের এই অজ্ঞাতপূর্ব উপাদানটিই পুরুষ মূষিকের বন্ধ্যাত্ব ও স্ত্রীমূষিকের গর্ভস্রাবের জন্য দায়ী, ততদিন এ বিষয়ে আরও গবেষণা চালাতে লাগলেন ইভান্স। তারপর ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে

(এই বছরেই ম্যাসকোলাম ভিটামিন ডি আবিষ্কার করেছিলেন) তিনি ভিটামিন একস্ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। এর নাম পরে বদলে রাখা হয় ভিটামিন-ই।

এই ভিটামিনটি আবিষ্কৃত হবার পর এটি মানুষের কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করতে লাগলেন ইভান্স ও আরও অনেকে। তাদের মনে পড়ল সহস্র সহস্র দুর্ভাগিনী নারীর কথা! এরা সুস্থ, নিরোগ, স্বাভাবিক অথচ গর্ভে পূর্ণ সময় সন্তান ধারণ করতে অক্ষম—প্রতিবারই অকালে গর্ভপাত হয়ে যায়। নারীর অকাল গর্ভপাত রোধে এই ভিটামিনই কার্যকারী হবে, ইভান্স এমনি কোনও দাবী করেননি। কিন্তু ডেনমার্কের ওডেনসের কাউন্টি হাসপাতালের ডাঃ পি. কোকৎ মূলার কতকগুলি গাভীর উপর ভিটামিন-ইর উপযোগিতা পরীক্ষা করেন। এই গাভীগুলির অকাল গর্ভস্রাব হবার দোষ ছিল। মূলার এদের ভিটামিন-ই সেবন করিয়ে সুফল পেলেন। এরপর পরবর্তী পর্যায়ে যে সব পরীক্ষা তিনি চালিয়েছিলেন, তার ফলাফল তিনি ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে ইংরাজী মেডিকেল জার্নাল, 'ল্যান্সেট' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর পরীক্ষার এক নং কেস হল, চব্বিশ বছর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক। এর চারবার গর্ভপাত হয়। একে ইভান্স আবিষ্কৃত গমের তেল খাওয়ান হয়। এবার গর্ভধারণ করে স্ত্রীলোকটি স্বাভাবিক ভাবেই সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দিল। দুই নং কেস হল একটি উনত্রিশ বৎসর বয়স্কা নারী। প্রথম সন্তানের জন্মের পর উপর্যুপরি পাঁচবার এর গর্ভপাত হয়। এই স্ত্রীলোকটিকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় দুই বড় চামচে এই গমের তেল খাওয়ান হল প্রথম স্ত্রীলোকটির মত এও স্বাভাবিক সুস্থ সবল সন্তান প্রসব করল। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীও মনে করে থাকেন যে সন্তান ধারণ কালে নারীদের পক্ষে এই ভিটামিনই অতিশয় প্রয়োজনীয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মনে এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ রয়ে গেছে। তাঁরা আরও নিঃসন্দেহ প্রমাণ চান। তা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হেনরি সি. শেরম্যান গবেষণা কালে লক্ষ্য করেছিলেন যে ভিটামিন-এ-র অভাব ঘটলেও জনন তন্ত্র ঠিক মত কাজ করতে পারে না। তাহলে, বোঝা যায় যে জনন ক্রিয়ার সহায়ক শুধু একমাত্র ভিটামিন-ই নয়। অন্য ভিটামিনও একাজে সাহায্য করে থাকে। স্বাভাবিক প্রজনন কাজ চালনোর জন্য যে সব রাসায়নিকের প্রয়োজন হয়, ভিটামিন-ই তাদের একটি, এই মাত্র। প্রজনন কার্যের সঙ্গে ভিটামিন-ই-র সম্পর্কটি এখনও সুপরিস্ফুট হয়ে

ওঠেনি। এ সম্বন্ধে যে সব দুর্বোধ্য প্রশ্নের এখনও কোনও মীমাংসা হয়নি সেগুলি হল : ভ্রূণের বিকাশে ভিটামিনের ক্রিয়া চলে ঠিক কোন প্রণালীতে? ভিটামিন-ই-এর অভাবে ভ্রূণগুলি কেন অকালে নষ্ট হয়ে যায়? কেনই আবার ভিটামিন সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ স্বাভাবিক শাবক জন্ম নেয়? মানুষের দেহে এমনি ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে কি? এমনি কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করতে ইভান্স ও তাঁর সহকর্মীদল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে অক্লান্ত ভাবে গবেষণা চালাতে লাগলেন সেই বিরাট ইঁদুর বাহিনী নিয়ে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক ইনস্টিটিউট প্রচার করলেন যে হেনরিক ড্যাম নামে তাঁদের একজন গবেষক মুরগীদের প্রয়োজনীয় স্নেহে দ্রবণীয় আর একটি ভিটামিনের সন্ধান পেয়েছেন। শূকরের যকৃৎ, চর্বি, পাটবীজ, শস্যকণা, শক্তজাতের বাঁধাকপি ও টমেটোতেও তাঁরা এই ভিটামিনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। সবুজ শাকশব্জী, বিশেষ করে আলফালফায় এটি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই রক্তস্রাব-বিরোধী ভিটামিন ঘন করে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ালে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ও জার্মান শব্দ 'কোয়াগুলেশনস্ ভিটামিন' থেকে এর নাম দেওয়া হল ভিটামিন-কে।

বিশুদ্ধ আকারে এই বস্তুটি নিষ্কাশনের চেষ্টা চলতে লাগল। সেণ্ট লুই ইউনিভারসিটি স্কুল অব মেডিসিনের জীব রসায়ন বিদ্যা বিভাগে সিডনী এ থেয়ার এবং এডওয়ার্ড এ, ডোইজি ১৯৩৮ সালে কে-১ ভিটামিনটি বর্ণহীন কেলাস রূপে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন। পরে তারা পচামাছের সার থেকে ভিটামিন কে-২ (K_{-2}) বিচ্ছিন্ন করলেন। ডোইজি ও তাঁর সহ কর্মীদল ১৯৩৯ সালে এই ভিটামিন কৃত্রিমভাবে তৈরী করলেন। কোপেন হেগেনের হেনরিক ড্যামের সঙ্গে তাঁরা একত্রে এর জন্য ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

ইভান্স যখন ভিটামিন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তার আগেই আমেরিকার অন্য বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে বেশ কিছু প্রাথমিক গবেষণার কাজ করেছিলেন। আমাদের দুগ্ধ ও মাংস সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পশু খাদ্য আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে পশুখাদ্য গবেষণার সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে ভিটামিন গবেষণায় যে অগ্রগতি ঘটেছে তা এই পশুখাদ্য গবেষণা থেকেই। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিই ছিল এই গবেষণার আদি কেন্দ্র।

প্রথম দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছিলেন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। গবেষণার বিষয় ছিল পুরাতন একটি প্রশ্ন। বহুবার এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু কোনও সমাধান মেলেনি। খাদ্যের রাসায়নিক উপাদান যদি ঠিক থাকে এবং দৈহিক তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা যদি তার একই প্রকার থাকে তা হলে যে কোন খাদ্যই খাওয়া যাক না কেন; তাতে কিছু এসে যায় না—এ কথা কি সত্য? জীবদেহ হয়ত সত্যই ঠিক একটি এঞ্জিন নয়। যাতে মাঝে মাঝে কয়লা বা তেলের যোগান দিলেই তা নির্দিষ্ট ক্যালোরির তাপ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। বরং এ কথাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত মনে হয় যে কোনও নির্দিষ্ট খাদ্যের দ্বারা যে পরিমান তাপই উৎপন্ন হোক না কেন, আসলে দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন সেই খাদ্যের কতকগুলি বিশেষ উপাদান। এ কথা কি সম্ভব হতে পারে না যে কোনও প্রাণীকে কোনও খাদ্য আকণ্ঠ খাওয়ালেও সেই খাদ্যে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের অভাবের ফলে প্রাণীটি দিন দিন রুগ্ন হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে?

এসম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রচলিত ছিল সেগুলির সত্যতা নির্ধারণের জন্য স্টেফেন এম ব্যবকক একটি পরীক্ষা ফাঁদলেন। তাঁর নিজের ধারণা হয়েছিল যে খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণই সব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের কৃষক সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নিকট অবিরত এই প্রশ্ন তুলতেন: কোন্ ধরনের খাদ্য তাঁহাদের গবাদি পশুগুলির উন্নতি সাধনে সক্ষম হবে? সরল ও অকপট প্রশ্ন। এরপর পুষ্টি বিষয়ক যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হল, যে সব বিচিত্র ঘটনা শৃঙ্খল আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত নূতন ক্ষেত্রে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করে তুলল, তার মুলে ছিল মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক সমাজের এই ব্যাকুল প্রশ্নের সমাধাণ প্রচেষ্টা।

১৯০৭ সালে এই পরীক্ষা শুরু হল। পরীক্ষা কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হল এডুইন বি. হার্টের উপর। এই পরীক্ষা অনুযায়ী চারদল বকনা বাছুরকে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খাওয়ান হতে লাগল। একদলকে খেতে দেওয়া হল শুধু গম, আর একদলকে ভূট্টা, আর একদলকে জই। চতুর্থ দলটিকে খাওয়ান হল গম ভূট্টা-জই একত্র মিশিয়ে। এই সকল রাসায়ানিক পদার্থ যা খাওয়ান হল তা সযত্নে রাসায়ানিক সমীক্ষণ ও নিখুঁত ভাবে ওজন

করার ব্যবস্থা হল, যাতে প্রতিটি বাছুরের ভাগে সমপরিমাণ তাপ উৎপাদনকারী সমজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ পড়ে। এই বাছুরগুলির খাদ্যই শুধু বিশদভাবে পরীক্ষা করা হল না, এদের গোবর ও চোনার ওজন নেওয়া হতে লাগল। এর বেশীর ভাগ কাজের ভার পড়েছিল এলমার ভি. ম্যাক কোলুমের উপর। তিনি তাঁর কিছু আগে উইস্‌কনসিনের ম্যাডিসনে এসে পৌঁছেছেন।

গবেষণার কাজ কতটা এগোল, প্রতিদিন সকালে গবেষক কর্মীরা একত্র জড়ো হয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করতেন। ম্যাককোলুমও অবশ্য এই গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণাটি যে ভাবে চালান হচ্ছে তাতে এর সাফল্য ও নির্ভুলতা সম্বন্ধে তার কিছুটা সন্দেহ ছিল। তাঁর মতে পুষ্টি সম্বন্ধে এই পরীক্ষা চালন উচিত এমন পদ্ধতিতে, যা আরও সহজে নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য। বিষয়টি গবেষণার যোগ্যই বটে, হয়ত এই পরীক্ষা থেকে কৌতূহলোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষা পুষ্টির বিরাট সমস্যার মুলে প্রবেশ করতে পারবে না। ম্যাককোলুমের মনে হল, 'যে সব গবেষক ছোট ছোট প্রাণীর উপর পুষ্টি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালালেন, তারাই ঠিক পথে চলছেন'—তিনিও ঐ পথে পরীক্ষা চালান স্থির করলেন, কিন্তু এই পরীক্ষায় একটা নতুন ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করবেন। তিনি তাঁর পরীক্ষাধীন প্রাণীগুলিকে খেতে দেবেন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য যার উপাদান নির্ভুল ভাবে তার জানা থাকবে।

১৯০৭ সালের শেষের দিকে। উইসকনসিনে পৌঁছাবার কয়েক মাস পরই তিনি তাঁর পরিকল্পিত গবেষণার জন্য একপাল ইঁদুর সংগ্রহ করে পুষতে শুরু করলেন। কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর মালথাসের মতবাদে বিশ্বাস করতেন। ম্যাককোলুমের এই পুষ্টির সমস্যা নিয়ে গবেষণার পরিকল্পনাটিকে তিনি খুব সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখলেন না। স্কুলের অধ্যক্ষও সমস্যাটির এমনি নতুন পদ্ধতিতে সমাধান প্রচেষ্টার বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কানা ব্যবকক ম্যাককোলুমের গবেষণাগারে এলেন। একটা উচু টুলে বসে, ভাল চোখটি দিয়ে পড়েই তরুণ ম্যাককোলুমের গবেষণার পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষা চালানোর সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কাজেই ম্যাককোলুম তাঁর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। পুষ্টি সম্পর্কে পরীক্ষা গবেষণা চালানোর জন্য আমেরিকায় ম্যাককোলুমই প্রথম ইঁদুরের পাল পোষেন।

প্রথমে তিনি বুনো ইঁদুর দিয়ে পরীক্ষা চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল খাঁচায় বদ্ধ অবস্থায় এগুলি খুবই ভয় পেয়ে যায়, এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। এগুলির বদলে তিনি শাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। শিকাগো শহরে পোষা জন্তু-জানোয়ার বিক্রেতার নিকট হতে তিনি এগুলি কিনেছিলেন।

ব্যাবককের বাছুরের পাল সানন্দে বেড়ে চলেছে। কলেজে ছেলে পড়ানোর মাঝেও সময় করে ম্যাককোলুম তাঁর ইঁদুরের পাল নিয়ে গবেষণা করে চললেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিষ ও নিরামিষ-ভোজীদের তুলনামূলক কর্মক্ষমতা নির্ণয়ের পরীক্ষা হয়েছিল। এ পরীক্ষা তিনি তাঁর গবেষণার পক্ষে অবান্তর মনে করলেন। তিনি নির্ভুল ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা করতে উদ্যত, কোনও আধা-বৈজ্ঞানিক ভোজবাজি দেখাতে যাচ্ছেন না। খাঁচায় জীবন্ত ইঁদুরগুলি তাঁর অভ্রান্ত টেস্টটিউব; ইঁদুরগুলিকে যে খাদ্য খাওয়াচ্ছেন তা বিশুদ্ধ রসায়ন। পরীক্ষা থেকে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তা সুস্পষ্ট, নিখুঁত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। যে কোন ছাত্রই ইচ্ছা করলে নিজে হাতে কলমে সে পরীক্ষা পুনরায় করে দেখতে পারবে। এই হল তাঁর কার্যক্রম, এ থেকে তিনি একচুলও নড়বেন না।

১৯১১ সালে, ম্যাককোলুম যখন তাঁর মূষিক কাহিনী নিয়ে গবেষণায় রত, তখন উইসকনসিন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বকনা বাছুর নিয়ে পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হল তাদের ১৭ নং রিসার্চ বুলেটিনে। দেখা গেল পরীক্ষার ফলাফল অতি অদ্ভুত। প্রতিটি বাছুরকেই সমান পরিমাণ শ্বেতসার, চিনি, প্রোটিন, লবণ, খনিজ পদার্থ ও জল খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই খাদ্য গ্রহণের ফলাফল দেখা দিয়েছে বিভিন্ন প্রকার। যে বাছুরগুলিকে ভুট্টা খাওয়ানো হয়েছিল, সেগুলি হয়েছিল তেজী। তাদের গায়ের চামড়া হয়েছিল নরম মসৃণ। এরা সময়-মত স্বাস্থ্যবান বাচ্চা প্রসব করল। যে গরুগুলি গম খেয়ে বেড়ে উঠেছিল সেগুলি হল দুর্বল. আলসে প্রকৃতির, গায়ের লোম হল রুক্ষ. এরা কোনও জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করতে পারত না। প্রসবের আগেই বাচ্চা মারা যেত। জই এবং ভুট্টা, গম ও জই একত্র মিশিয়ে খাওয়ান হয়েছিল যে বাছুরগুলিকে সেগুলির বৃদ্ধিও স্বাভাবিক হল না। এদের কতকগুলির গর্ভমাস পূর্ণ হবার আগেই বাচ্চা হল। কতকগুলি বাচ্চা হল রুগ্ন প্রকৃতির, জন্মের অল্পকাল পরেই মারা গেল।

স্পষ্টতই বিভিন্ন খাদ্যের উপাদানই গরুগুলির স্বাস্থ্যের এই বিপুল পার্থক্য ঘটিয়েছে। কিন্তু এ থেকে বোঝা গেল না কেন ভূট্টা খেয়ে বাছুরগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, আর জই খেয়ে ঘটে অবনতি!

১৯১৪ সালে জার্নাল অব বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রী ম্যাকলুমের গবেষণাগারের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করল। এই প্রবন্ধটি পুষ্টি বিষয়ক গবেষণায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। প্রবন্ধটির নাম 'আইসোলেশন অব দি সাবসস্ট্যানস ইন বাটার ফ্যাট হুইচ একজার্টস এ স্টিমুলেটিং ইনফ্লুয়েন্স অন গ্রোথ' (Isolation of the substance in butter fat which exerts a stimulating influence on growth মাখনের যে উপাদানটি জীব দেহের বৃদ্ধির সহায়তা করে সেটির বিচ্ছিন্নকরণ)। এই প্রবন্ধে একটি লেখ ছিল। এটি পুষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা দূর করল, একটি নতুন ভিটামিন আবিষ্কারে সহায়তা করল। আশি দিন ধরে ১৪১ নং ইঁদুরটিকে ছানা, শ্বেতসার, ল্যাকটোজ, এগাএগা (সামুদ্রিক আগাছা থেকে তৈরি জেলি , লবণ জল, ও লার্চ খাওয়ান হয়েছিল। এতে ইঁদুরটির ওজন ভয়ানক ভাবে কমে যেতে দেখা গেল। এর পর প্রত্যহ ইঁদুরটির খাবারের সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ মাখনের নির্যাস মিশিয়ে দেওয়া হতে লাগল। এবার দ্রুত ইঁদুরটির ওজন বাড়তে লাগল এতে। পঁয়ত্রিশ দিনে ইঁদুরটির পঞ্চাশ গ্রাম ওজন বেড়েছিল। এর পর ম্যাককোলুম মাখনের বদলে ডিমের কুসুম মেশালেন খাদ্যে। লেখে রেখার ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রইল। কিন্তু এর পর যখন ডিমের কুসুমের বদলে খাবারে জলপাই তেল মেশান হ'ল তখন ইঁদুরটির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল। এ থেকে ম্যাককোলুম এই সিদ্ধান্ত করলেন: চর্বি ও তেল, এদের রাসায়নিক উপাদান সামান্য পৃথক হলেও কিন্তু এদের জীবের বৃদ্ধি উত্তেজক ক্ষমতা পৃথক, কারণ এদের অন্যবিধ নির্যাসগুলির সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে 'অজ্ঞাত-পরিচয় কতকগুলি উপাদান—এগুলি স্নেহে দ্রবণীয় (ভিটামিন)-এ'।

দুবছর পর ম্যাককোলুম আর একটি ভিটামিন আবিষ্কার করলেন। ছানার জল থেকে দুগ্ধ শর্করা (ল্যাকটোজ) তৈরি হয়, তা থেকে তিনি এই ভিটামিনটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটি একটি রাসায়নিক পদার্থ। এর দ্বারা মানুষের বেরিবেরি রোগ সারে। ম্যাক্‌কোলুম এর নাম দিলেন জলে দ্রবণীয় ভিটামিন-বি। ভিটামিন নিয়ে যে বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল তা

অনেকটা কাটল। আপাতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে, এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, পুষ্টির জন্য খুব সামান্য পরিমাণে এদের প্রয়োজন হয়। ম্যাককোলুম এদের মধ্যে দুটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে এ-হোলস্ট তৃতীয় আর একটি আবিষ্কার করলেন। পরে এর নাম দেওয়া হয় ভিটামিন সি। এটি স্কার্ভি রোগের প্রতিরোধক।

এরপর আরও ভিটামিন আবিষ্কৃত হতে লাগল। ১৯২২ সালে ম্যাককোলুম কর্ড মাছের তেল থেকে তৈরি স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-ডি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। এই ভিটামিন্ ডি রিকেট প্রতিরোধে সক্ষম। পরের বছর তিনজন বিজ্ঞানী স্বতন্ত্রভাবে এবং প্রায় যুগপৎ কৃত্রিম উপায়ে এই ভিটামিনটি তৈরি করলেন। নিউইয়র্কের শিশু-চিকিৎসক আলফ্রেড এফ. হেস, লণ্ডনের লিস্টার ইনসষ্টিটিউটের এইচ. গোল্ডব্লাট, উইসকোনসিনের ম্যাডিসনে ওরিক-ষ্টিনবক, এরা অতি সামান্য পরিমাণ ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্যবস্তুতে অতিবেগুনী রশ্মিপাত করে সেই খাদ্য-বস্তু ভিটামিন ডি-কে সমৃদ্ধ করে তুললেন।

ভিটামিন-ডি উৎপাদন করতে ষ্টিনবক একটি অতি সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এই পরীক্ষায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আর্চি ব্ল্যাক। কতকগুলি ইঁদুরকে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ রেখে, তাঁরা তাদের এমন ধরনের খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন যাতে ইঁদুরগুলির রিকেট জন্মায়। এই খাদ্য খাবার পর ইঁদুরগুলির রিকেট দেখা দিল। তারপর এই অন্ধকার কক্ষবাসী ইঁদুরগুলিকে যে জোয়ার অন্যান্য খাদ্য দেওয়া হত তার উপর অতি-বেগুনী রশ্মিপাত করে তাদের খেতে দেওয়া হল। কিছুদিন এই খাদ্য খাবার পর ইঁদুরগুলির রিকেট সেরে গেল। মানুষের যে সব খাদ্যে ভিটামিন-ডি-র অভাব আছে, ষ্টিনবক সেগুলির উপরও এমনি অতি-বেগুণী রশ্মিপাত করে সেগুলিকে ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ করে তুললেন। দেখতে পেলেন তাঁর এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সঙ্গে মনুষ্য-ভোগ্য ভিটামিন-ডি তৈরি করা যায়। লোভী ব্যবসায়ী শ্রেণী যাতে ভিটামিন-ডি তৈরির এই পদ্ধতিটির সুযোগ গ্রহণ করে জনসাধারণকে শোষণ করতে না পারে তার জন্য ষ্টিনবক এই আলোক রশ্মি প্রয়োগ খাদ্যের ভিটামিন-ডি পরিমাণ বৃদ্ধির প্রণালীটির পেটেণ্ট গ্রহণ করলেন। ১৯২৪ সালের ২০শে জুন তিনি পেটেণ্টের জন্য আবেদন করেন। পেটেণ্ট হস্তগত হলে সেটির (নং:১৬৮০,৮১৮) স্বত্ব তিনি উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন। এই পেটেণ্ট থেকে

প্রাপ্ত অর্থ বিলি ব্যবস্থার ভার দেওয়া হল উইসকনসিন অ্যালামনি রিসার্চ ফাউণ্ডেশনকে।

স্টিনবকের এই অতি-বেগুনী রশ্মির সাহায্যে ভিটামিন-ডি প্রস্তুত প্রণালী যে সব খাদ্য প্রস্তুতকারী কারখানা ব্যবহার করল, তাদের নিকট হতে এইটির ও আরও একটি সহায়ক পেটেন্টের রয়ালটি বাবদ ফাউণ্ডেশণ লক্ষ লক্ষ ডলার অর্জন করল। এই অর্থ গবেষণার কাজে নিয়োগ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হল। আমেরিকার আরও বারো তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয় এমনি ভাবে তাদের গবেষক অধ্যাপকদের গৃহীত পেটেণ্ট থেকে গবেষণার কাজের জন্য প্রভূত অর্থ লাভ করেছিল। গবেষকদের পেটেণ্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ গবেষণার কাজে নিয়োগ করা, এবং অন্যান্য গবেষক বিজ্ঞানীরা অন্যান্য যে সব পন্থায় গবেষণার কাজে অর্থ সংগ্রহ করতেন, সামাজিক নীতির দিক দিয়ে তা সুযুক্তিপূর্ণ ও বাঞ্ছনীয় হলেও, কয়েকটি মহল থেকে এ ব্যবস্থার সমালোচনা করাও হয়েছে। তাঁরা বলেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলের অধিকারী সমগ্র সমাজ। ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে এরা তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেণ্ট রেজিস্ট্রী করবার বিরোধী।

ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণার প্রতি বহু আমেরিকান বিজ্ঞানী আকৃষ্ট হলেন। ভেষজ বিজ্ঞানে, শারীরবৃত্তে, রসায়ন বিজ্ঞানে, কৃষি বিদ্যায় উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক গবেষক ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যায় ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৯১১ সালে যেখানে এমনি প্রায় চল্লিশটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৩০ সালে সেখানে সেই ভিটামিন সমন্ধে প্রায় পনেরোশতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। এই গবেষণার জন্য হাজার হাজার ইঁদুর, কুকুর, পায়রা, গিনিপিগ এমন কি রোচ মাছও মারা হয়েছিল। বিভিন্ন ভিটামিনগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, হর্মোন, সাধারণ বিপাক ক্রিয়া, সংক্রামক রোগ গ্রাহীতা, ভিটামিন বিক্রিয়া, সাধারণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে লাগল। লীগ অব নেশানস্-এর নিযুক্ত একটি কমিটি বিভিন্ন ভিটামিনের শক্তির আন্তর্জাতিক মান নির্দিষ্ট করে দিল, নতুন ভিটামিনের গবেণায় নিযুক্ত বহু গবেষণাগারকে বিনামূল্যে ভিটামিন নির্যাস বিতরণ করল। সারা বিশ্বই ভিটামিন গবেষণা ও প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত হল।

টিনে পোরা খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ ভিটামিন নিয়ে প্রচণ্ড মেতে উঠলেন। এরা তাঁদের বিজ্ঞাপনে তাঁদের প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীতে মিশ্রিত বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অতিরঞ্জিত ও অত্যাশ্চর্য (প্রায়শঃ অপরীক্ষিত) গুণাগুণের ফিরিস্তি দিতে লাগলেন। খাদ্য সামগ্রীর প্রতিটি বাক্স, টিন বা অন্যান্য মোড়কে নানাবিধ অদ্ভুত গুণ-সম্পন্ন ভিটামিনের কথা লেখা হত—এগুলি নিরাময় না করতে পারে দুনিয়ায় এমন কোনও রোগ বুঝি নেই। রাতারাতি জনসাধারণ ভিটামিন-সচেতন হয়ে উঠল। আমেরিকার মানুষ টিনে ভর্তি ভিটামিনশূণ্য খাদ্য খেয়ে খেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল। প্রথমে তাই তারা কাঁচা তরিতরকারী ও ফলমুলে নিহিত ভিটামিনের প্রতি আকৃষ্ট হল। টিনে পোরা খাবার তৈরির বড বড় কারখানাগুলি অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা ফলমুল ও শাকসব্জীতে প্রাপ্ত ভিটামিন ও টিনে ভর্তি খাদ্যের ভিটামিনের শক্তির তুলনামুলক বিচার করবার জন্য নিজেরা গবেষণাগার খুলে রসায়নবিদ নিয়োগ করলেন, বা এ বিষয়ে গবেষণা চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলিকে অর্থ-সাহায্য করতে লাগলেন। যখন দেখা গেল যে রান্না করা বা টিনে পোরা খাবারে বিভিন্ন ভিটামিনের পরিমাণ কম বা সেগুলি একেবারেই ভিটামিন-শূন্য, তখন রসায়নবিদগণ এই সব খাদ্যবস্তু ভিটামিন যুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন।

ভিটামিনের অত্যাশ্চর্য গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে ভিটামিন-যুক্ত খাদ্যশিল্পের মালিকগণ 'সাইয়োসফি' (Sciosophy—বিজ্ঞানবাদ) নামে একটি শব্দ উদ্ভাবন করেছিলেন। সত্যমিথ্যা ও আধা-বৈজ্ঞানিক অর্থদ্যোতক এই শব্দটিকে এই সব ধনী শিল্পপতিরা তাদের 'ভিটামিনযুক্ত' খাদ্যের প্রচার বিজ্ঞাপনে অবাধে ব্যবহার করতেন। কথাটা প্রথমদিকে ক্রেতাদের ভূতের মত পেয়ে বসেছিল একেবারে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড ও ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভিটামিন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নির্বিচারে লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শাস্তি বিধানের জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করতে লাগলেন। ভিটামিন নিয়ে এই হুজুগ একদিন অবশ্য কেটে গেল। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল, সাধারণতঃ লোকে যে সব খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, যেমন দুধ, শাক শব্জী, ফলমুল, ডিম ও কিছু পরিমাণে মাংস—এগুলি সবই গড়পড়তা বেশ সুষম খাদ্য, দেহের পুষ্টি-সাধন ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত ভিটামিন এই সবে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। ভিটামিনের অভাবে পুষ্টিজনিত সমস্যার দিক থেকে

মানুষের বিশেষ কোনও ভয়ের কারণ নেই। এর চেয়ে সহস্রগুণ ভয় রয়েছে সেই বিষম সামাজিক ব্যবস্থায় যেখানে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর দেশগুলির লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারজনিত অপুষ্টির সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাকালীন অবস্থায়।

ভিটামিনের গবেষণা শুধু বিশুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানের কাহিনী নয়, ফলিত বিজ্ঞানের কাহিনীও বটে। বিভিন্ন ভিটামিন-যুক্ত খাদ্য এখন লক্ষ লক্ষ শিশু সাধারণ ভাবে নিয়মিত গ্রহণ করে থাকে। কোটি কোটি লোক ভিটামিন-যুক্ত রুটি খেয়ে থাকে। ভিটামিনযুক্ত শত শত টন ঈস্ট, গুড়া দুধ, জই, কর্নফ্লেক, বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্য এখন নিত্যই খাচ্ছে মানুষ। দুধে ভিটামিনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য গাভীদের ভিটামিন ডি. যুক্ত ঈস্ট ও দুধ খাওয়ান হয়ে থাকে।

হাঁপানি, বাত, মৃগী ও অন্যান্য স্নায়বিক রোগ প্রবল শিরঃপীড়া, হৃদরোগ, সর্দি, নালী ঘা, গেঁটে বাত প্রভৃতি রোগ চিকিৎসায়, এমন কি বার্ধক্যরোধেও বহুদিন ধরেই চিকিৎসকবর্গ বিশেষ খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা দান করে আসছেন। ভিটামিনের গুণাগুণ প্রচারিত হবার পর এই খাদ্যভিত্তিক চিকিৎসা প্রণালী নতুন অনুপ্রেরণা লাভ করল। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বিশেষ মাত্রায় ভিটামিন প্রয়োগের দ্বারা রোগ নিরাময়ের পরীক্ষা চলতে লাগল। যেমন, পাইয়োরিয়া (দাঁতের মাড়ির রোগ), কয়েক ধরনের রক্তস্রাব, এমন কি হিমোফিলিয়া সারাতেও ভিটামিন-সি প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে, সে দিন এই যুগে কি ভাবে কোটি কোটি মানুষের খাদ্যের প্রকৃতি ও ধরন বদলে দিয়েছে, সে কথাও সে প্রসঙ্গে লেখা হবে। পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল, খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক উপাদানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পর্যাপ্ত খাদ্যে উদর-পূর্তিই সঙ্গত। খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ হল এই: সবল ও স্বাস্থ্যবান দেহ গঠনের জন্য দেহ যন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি খাদ্যের সঙ্গে সরবরাহ করতে হবে।

নতুন এই পুষ্টি বিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্য সমাজের ঘোর অভিশাপ বেরিবেরি, শিশুস্কার্ভি, রিকেট ও পেলাগ্রে রোগ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধ্য হতে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল শতকরা পনেরো বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, মানুষকে আগের চেয়ে আরও দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী করে তুলেছে। মনুষ্য সমাজের এই সব উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী

করতে পারেন বহু মার্কিন বিজ্ঞানী। এদের মধ্যে হার্বার্ট ম্যাকলিনস্ ইভান্স ও এলমার ভেরনন্ ম্যাক্‌কোলমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইভান্স এখনও পিটুইটারি গ্রন্থির বহির্ভার্গের হর্মোনের বৃদ্ধি-উত্তেজক ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করছেন, সঙ্গীদের নিয়ে এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন। ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণার কাজও তিনি পরিত্যাগ করেননি। ম্যাক্‌কোলাম ১৯৪৬ সালে সসম্মানে জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর এক চোখ কানা। অন্য চোখের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি পুষ্টি সম্পর্কে মানুষের ধারণা সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এ কাজ যখন শেষ হল তখন তাঁর বয়স আটাত্তর বছর। তখন অবশ্য ভিটামিন ও হর্মোনের গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চলেছে সমানে।

॥ ১৭ ॥

এডুইন পাওয়েল হাবল

(১৮৮৯-১৯৫৩)

আমেরিকার বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে অতিকায় যন্ত্রপাতি ও বিপুল নিধি

এ দেশে বিজ্ঞানের যে সব শাখার চর্চা প্রথমে শুরু হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান তার অন্যতম। বহু যাজক ইউরোপ থেকে এ দেশে আসবার সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। দূরবীন দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা ছিল এই সব পাদ্রী সাহেবদের এক শখ। নতুন দেশে মহা উৎসাহে তাঁরা এই শখ পরিতৃপ্ত করতেন। গির্জায় উপাসনান্তিক হিতোপদেশ (সার্মন) প্রদান কালে তাঁরা এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান কাজে লাগাতেন পরমেশ্বর ও তাঁর রচিত এই বিচিত্র নভোমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য রূপ প্রদর্শন করতে। ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকে বহু শৌখিন জ্যোতির্বিদ নৌচালনার সুবিধার্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতেন। তখনকার দিনে উপনিবেশবাসীদের জীবনে নৌপরিচালনার বিষয়টি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন এফ. হের্শেলের সুপারিশক্রমে ১৮২৯ সালে নাথানিয়েল বউডিচ ইংলণ্ডের রয়েল অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সোসায়িটির সভ্য নির্বাচিত হন। কুড়ি বছর পর হার্ভার্ড মান মন্দিরের প্রথম ডাইরেক্টর উইলিয়াম সি. বণ্ড এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। রয়েল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসায়িটির সভাপতি এই উপলক্ষ্যে বলেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অপেক্ষাকৃত দেরীতে শুরু করলেও এখন তারা তাদের স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এই বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে এ বিষয়ে তাঁরা তাঁদের ভূতপূর্ব গুরুদের শিক্ষা দিতে সক্ষম।"

১৮৬০ সালে আলভান ক্লার্ক আঠারো ইঞ্চি ব্যাস-যুক্ত একটি সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করলেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রনির্মাতা এবার জন্ম নিলেন আমেরিকায়। এর পর আরও অনেক দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাতা আবির্ভূত হলেন। বৃহৎ দূরবীন নির্মাণে এরা পথিকৃতের কাজ করে গেছেন। জন এ. ব্রেসার ছিলেন একজন ইস্পাত কারখানার কর্মী। সামুয়েল ল্যাংলির পরামর্শে ইনি কাচ ঘষার কাজ ছেড়ে দিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের কাজে হাত দেন। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের বহু মান মন্দিরের জন্যও তিনি বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন।

এ কথা সত্য যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণা আশু কোনও বাস্তব প্রয়োজন সাধন করে না। এ দিক দিয়ে এ গবেষণার তেমন বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। মার্কিন বিজ্ঞানীরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করায় অনতিবিলম্বে এই দেশই জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞানের এই শাখায় বিশ্বের নেতৃস্থান অধিকার করেছে। এর জন্য আংশিক ভাবে দায়ী আমেরিকার বিত্তবান ধনীদের বদান্যতা। এই দানশীল ধনী শিল্পপতিগণ উন্নততর ও বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও বিশাল মানমন্দির নির্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন। এই ভাবে অতি আধুনিক অতিকায় যন্ত্রপাতির সাহায্য পেয়ে আমাদের জ্যোতির্বিদগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, তা আবিষ্কার করার মত যন্ত্রপাতি পৃথিবীর আর কোনও দেশে ছিল না। আরও বৃহত্তর ও উন্নততর যন্ত্র তৈরির কল্পনা আমেরিকার শিল্পপতিদের রোমাঞ্চিত করে তুলত। এই মনোভাবের প্রভাবেই তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি মার্কিন জ্যোতির্বিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই জ্যোতির্বিদদের অনেকেই ছিলেন নির্ভীক চিত্তে নতুন তত্ত্ব প্রচারের দুর্লভ সৎ সাহস ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার অধিকারী। এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এঁরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নব নব গবেষণায় মগ্ন হয়েছিলেন। ইউরোপীয় জ্যোতিষ চর্চায় যেখানে ছেদ পড়েছিল মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞান সেখান থেকে শুরু করেছিল।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বিপুল জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল চারশ বছর আগে, ১৫৪৩ সালের ২৪শে মে। ঐ দিনই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম

হয়। ঐ দিন পোলিশ জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাসের 'অন দি রিভোলিউসন অব দি হেভেনলি বডিজ' (On The Revolution Of The Heavenly Bodies) নামক গ্রন্থখানির সদ্যমুদ্রিত এক কপি মৃত্যু শয্যাশায়ী লেখকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গ্রন্থখানি কোপার্নিকাস পোপ তৃতীয় পলকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থে কোপার্নিকাস এই অভিনব মত প্রকাশ করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকৃতি, মিশরীয় জ্যোতির্বিদ টলেমীর বর্ণনা মত এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে—যে কথা বিশ্বাস করতেন পিথাগোরাস।

কোপার্নিকাস প্রস্তাবিত বিশ্বজগৎ ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র। সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহটি ছিল এর সর্বশেষ সীমান্ত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনেসার যুগে ইউরোপে নতুন ভাবে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হওয়ার ফলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে গ্যালিলিও এই অভিনব যন্ত্রটি তুলে দিয়েছিলেন। এতে মানুষের চর্মচক্ষের দৃষ্টির সীমা বহুদূর প্রসারিত হল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের উদ্দাম কল্পনার গতি রুদ্ধ হল। তারপর আবির্ভূত হলেন মহামতি নিউটন। এক ইংরাজ কৃষকের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর এর জন্ম। ১৬৬৫ সালে লণ্ডনে যখন প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, তখন তিনি লণ্ডনের বাইরে চলে যান। এখানে তিনি আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র। এই সূত্রের সাহায্যেই আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্যময় গতিবিধির ব্যাখ্যা মিলল। গ্যালিলিও তাঁর বিরাট প্রতিভা নিয়েও গ্রহ-নক্ষত্রের এই গতিবিধির রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেননি।

এরপর শুরু হল সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ ছাড়িয়ে, যে সব অগণিত তারকারাশি রাতের আকাশে মিট মিট করে জ্বলে, সেগুলির পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পালা। এই নতুন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর কাজ যারা করেছিলেন, উইলিয়াম হের্শেল তাঁদের অন্যতম। যুদ্ধের হাঙ্গামা এড়াতে তিনি ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় পালিয়ে আসেন। জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি গান শেখাতেন। সেই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় মন দেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। সৌখিন জ্যোতির্বেত্তারূপেই হয়ত সারা জীবন কাটত। এর মধ্যে এক আশ্চর্য কাজ করে বসলেন। ১৭৮১ সালের ১৩ই মার্চ আবিষ্কার করলেন নতুন একটি গ্রহ, উরেনাস। এই আবিষ্কারের ফলে দুটো ব্যাপার ঘটেছিল তাঁর জীবনে। ইংলণ্ডরাজের সুনজরে পড়লেন, লাভ করলেন এক ধনবতী স্ত্রীরত্ন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য আরও বড় বড় কাচ তৈরি করলেন হের্শেল, নিজেই ঘষে পালিশ করলেন এই কাচ। নিজের তৈরি উনিশ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক যুক্ত এই দূরবীন দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করলেন হের্শেল, আবিষ্কার করলেন, দূর মহাকাশের আকাশ গঙ্গায় লক্ষ লক্ষ নতুন তারকার দীপ্ত সমারোহ। ১৭০৪ সালে ইংলণ্ডের রয়েল সোসায়িটির সভায় বক্তৃতা দেবার সময় জানালেন, "এই ছায়াপথ, (বাংলায় যাকে বলা হয় আকাশ গঙ্গা) বিপুল নক্ষত্ররাজির সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের সূর্য ও সৌর মণ্ডল এই বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ-রূপী ছায়াপথের একটি অংশ মাত্র।"

গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস ও হের্শেলের ব্রহ্মাণ্ডের সীমা প্রসারিত হয়েছিল এই ছায়াপথ পর্যন্ত। ছায়াপথের বাইরেও প্রসারিত যে অন্তহীন নক্ষত্রলোক, তার রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব নেবেন কে? এ কাজ অপেক্ষা করছিল, জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই তিন মহারথীর উত্তরসূরী আর একজন যুগন্ধর জ্যোতির্বেত্তার জন্য। কিন্তু এ কাজে হাত দেবার আগে কিছুটা নির্ভুল ভাবে জানার প্রয়োজন পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব। কাজটা খুব সহজ নয়। প্রকিসমা সেণ্টাউরি নামে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে তারকাটি আছে বলে আমরা এখন জানি, সেটি পৃথিবী থেকে ২৫ ট্রিলিয়ন মাইল (২৫,০০,০০০ কোটি মাইল) দূরে। তুলনায় পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মাত্র ৯ কোটি মাইল। আলোকরশ্মি সেকেণ্ডে ১৮,৬ ,০০ মাইল বেগে ছুটে ছয় ট্রিলিয়ন মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় নেয় এক বছর। কাজেই প্রকিসমা সেণ্টাউরি নামে ঐ নক্ষত্রটি হতে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি পৌঁছাতে সময় নেয় ৪·২ বছর। (আমরা এখন হিসাবটা অন্যভাবে প্রকাশ করে বলি। নক্ষত্রটি পৃথিবী হতে ৪·২ আলোকবর্ষ দূরে।) এই হিসাব অনুযায়ী সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি এসে পৌছাতে সময় লাগে মাত্র আটমিনিট। আর সূর্যই এই বিশ্বজগতে আমাদের নিকটতম তারা।

উইলিয়াম হের্শেল মাত্র ষোল বছর মারা গেছেন, এই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায় রচিত হল। হের্শেলের পুত্র জন, ফ্রেড্রিক ডব্লিউ. বেসেলের নিকট হতে একখানি পত্র পেলেন। তাতে জানা গেল বেসেল এক নতুন পদ্ধতির সাহায্যে ৬১ বলাকামণ্ডল (Cygni 61) নামক নক্ষত্রটির দূরত্বটি নির্ণয় করেছেন। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ত্রিকোণোমিতিক লম্বন পদ্ধতি। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব এত বিপুল যে দেখে মনে হয় এগুলি যেন

আকাশের নির্দিষ্ট স্থানে স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে। দীর্ঘরাত্রি ধরে অবিরত সযত্ন পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাবে আরও দূরবর্তী নক্ষত্রের সঙ্গে দূরত্ব বিচারে এরা স্থির নিশ্চল নয়, গতিশীল। কক্ষপথে পৃথিবী স্থান পরিবর্তনকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী একটি নক্ষত্রকে দূরবর্তী অপর একটি নক্ষত্রেব নিকট হতে দূরে সরে যেতে দেখা যায়। তাতে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থান হতে বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করা নক্ষত্র দুটির আপেক্ষিক অবস্থিতির পরিমাপ কোণের করে ত্রিকোণোমিতির সাহায্যে নিকটতম তারকাটির দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

কিন্তু এই পদ্ধতি এতই জটিল যে ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে ১৯০০ সাল নাগাদ এর সাহায্যে মাত্র ষাটটির দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। তবুও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে জ্যোতির্বিদগণ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই পদ্ধতির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হল ও এই উন্নততর পদ্ধতি নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ে প্রযুক্ত হতে লাগল। কয়েক শ্রেণীর নক্ষত্রের বর্ণালী রেখায় আলোর তীব্রতার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে এগুলির উজ্জ্বলতার মাত্রার যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি এদের দূরত্বের হিসাবেরও ইঙ্গিত মেলে। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ওয়ালটার এস অ্যাডামস্, এই বর্ণালী রেখায় আলোর তীব্রতার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নাক্ষত্রিক লম্বন নির্ণয়ের একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে এই কৌশলে অ্যাডামস্ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ প্রায় দু হাজার নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অসীম মহাশূন্যে রয়েছে অযুত নিযুত নক্ষত্র। এই দু হাজার নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় তার কাছে তুচ্ছ।

সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রসহ আমাদের এই বিশ্বলোক একটি ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। এই ছায়াপথের বাইরেও দেখা যায় থোকা থোকা আরও অসংখ্য আলোক দীপ্তি। এগুলি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য ছায়াপথ, অন্য বিশ্ব?

১৭৮২ সাল নাগাদ চার্লস মেসিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিদ মহাকাশে এমনি একশত তিনটি নীহারিকার (নেবুলার) অবস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। স্যার উইলিয়াম হাগিনস্‌ই সর্বপ্রথম এই নীহারিকাগুলির প্রকৃতি নির্ণয়ের কাজে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি লিখেছিলেন

'এই সব নীহারিকাগুলির ছোট একটির দিকে বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ফেরালাম। পাঠকেরা এবার কল্পনা করতে পারেন কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার পর কিছুটা বিস্ময়সহ সুতীব্র উদ্বেগ উত্তেজনা ভরে আমি বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখেছিলাম। সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের আলোকরশ্মি থেকে প্রাপ্ত অখণ্ড সপ্তবর্ণ বর্ণালীর মত নয় এই নীহারিকা বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালী, ঠিক এইটিই আমি আশা করেছিলাম। অত্যুজ্জ্বল গ্যাসের আলোর বর্ণালীতে যেমন একটিমাত্র উজ্জ্বল সবুজ বর্ণালী রেখা দেখা যায়, এটি তেমনি।' কিন্তু এটাই নীহারিকার সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। পরে দেখা গিয়েছিল এর অধিকাংশ হতে সূর্য রশ্মির বর্ণালীর মত অবিচ্ছিন্ন সপ্তবর্ণ বর্ণালী সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হের্শেল এই নীহারিকাগুলির নাম দিয়েছিলেন 'দ্বীপ সদৃশ্য বিশ্ব।' দেখা গেল এগুলিতে রয়েছে অসংখ্য তারকা। কারণ এদের আলোকরশ্মি থেকে তারকাপুঞ্জের আলোকরশ্মির মত অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী পাওয়া যায়। কতকগুলি নীহারিকা অবশ্য তারকাপুঞ্জের সমষ্টি নয়। সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল গ্যাস মণ্ডল মাত্র।

নীহারিকাগুলি এত দূরে যে তখনও পর্যন্ত এগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের কোনও পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দূরত্ব একশত আলোকবর্ষের অধিক হলে লম্বন পদ্ধতির সাহায্যে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কাজেই শতাধিক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নীহারিকাগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। যে পদ্ধতিতে এই সুদূর নীহারিকা-পুঞ্জের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব হল তার আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক স্মরণীয় কীর্তি।

আকার ও দীপ্তি অনুযায়ী মহাকাশের বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবৃত হল সেফাস (Cepheus) নক্ষত্র-মণ্ডলে অবস্থিত সেফিড (Cepheid) নামে পরিবর্তনশীল নক্ষত্রটি। এর আদিরূপ ডেলটা সেফির (Delta Cephei) নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে সেফিড। বহুদিন ধরে জ্যোতির্বিদগণ লক্ষ্য করেছিলেন, কতকগুলি ম্লানজ্যোতি তারকা যেন এক সময় অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে। তখন এগুলির স্বপ্রভতা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে জ্যোতিপ্রভা এক সময় সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায়, তারপর সেগুলি আবার ধীরে ধীরে পুনরায় ক্ষীণপ্রভ হয়ে ওঠে। স্বপ্রভতার এই হ্রাসবৃদ্ধি চলতে থাকে কয়েকদিন থেকে এক মাস, এমন কি পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত।

১৯১২ সালে হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের সহকারীরূপে কাজ করবার সময় মিস হেনরিয়েটা এস. লিভিট একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। মিস হেনরিয়েটা লিভিট ছিলেন র‍্যাডক্লিফ কলেজের স্নাতক। তারকা ও নক্ষত্র-পুঞ্জের প্রকৃতি আরও ভালভাবে নির্ধারণের জন্য, মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নভোমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হত। বহুবছর ধরে এই আলোকচিত্রগুলি পরীক্ষা করার ভার ছিল মিস হেনরিয়েটা লিভিটের উপর। ছায়াপথের প্রান্তভাগে কতকগুলি পরিবর্তনশীল সেফিডের অবস্থিতির খবর জানা গিয়েছিল। এই অংশের কতকগুলি তারকাপুঞ্জের আলোকচিত্র পরীক্ষা করতে করতে মিস লিভিট এক বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। দেখতে পেলেন সহস্র সহস্র দ্যুতি পরিবর্তনশীল নক্ষত্রগুলির মধ্যে বৃহৎ ও উজ্জ্বলতরগুলির স্বপ্রভতা ম্লান ও ক্ষুদ্রাকার সেফিডগুলির (পরিবর্তনশীল তারকা) স্বপ্রভতা অপেক্ষা ধীরে ধীরে বাড়ে ও কমে। উজ্জ্বলতর দ্যুতির সেফিডগুলি সর্বোচ্চ মাত্রায় জ্যোতিষ্মান হতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নেয়। তারপর এগুলি আকাশপট হতে লুপ্ত হয়ে যায়। অন্য অনেকে নিঃসন্দেহে এমনি ধরনের আলোকচিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু মিস লিভিটের চোখে যে অদ্ভুত ঘটনা ধরা পড়েছিল, তা কেউই আগে লক্ষ্য করতে পারেন নি।

শতশত আলোকচিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন মিস লিভিট। এই পরীক্ষা থেকে যে সব তথ্য হস্তগত হল তাতে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে সেফিডের দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধির কাল নিঃসন্দেহে তার মূল স্বপ্রভতার সঙ্গে জড়িত। এরপর তিনি পরিবর্তনশীল নক্ষত্রগুলির (সেফিড) হ্রাসবৃদ্ধির কালের সঙ্গে এগুলির স্বপ্রভতার সম্পর্ক (Period luminosity) আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। জানালেন, সেফিডের দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধির কাল প্রত্যক্ষভাবে স্বপ্রভতা বা দীপশক্তির সমানুপাতিক। এখন কার্যত দেখা যায় যে, কোনও তারকার আপাত স্বপ্রভতা সবক্ষেত্রে তার প্রকৃত বা স্বকীয় স্বপ্রভতা নয়, কারণ তারকার দৃশ্য ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে দর্শকের নিকট হতে তার দূরত্বের উপর। নক্ষত্রটি মহাকাশে যত দূরে, ততই সেটি ম্লান দেখাবে। পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত কোনও দুটি সেফিডের কোনও একটির স্বপ্রভতা যদি অপরটির অপেক্ষা দ্রুতগতিতে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তবে বুঝতে হবে সেটির স্বকীয় স্বপ্রভতা অপরটি অপেক্ষা কম।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট এই সূত্র আবিষ্কারের অর্থ খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। স্বপ্রভতার হ্রাসবৃদ্ধির সমান কাল-সম্পন্ন দুটি সেফিডের কথা ধরা যাক। অর্থাৎ এমন দুটি সেফিডের কথা চিন্তা করা যাক যারা সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা হতে সর্বনিম্ন ম্লানাবস্থায় যেতে একই সময় নেয়। মনে করা যাক এদের একটি অপরটি অপেক্ষা শত গুণ বেশী জ্যোতিষ্মান। তা হলে একটি সেফিড অপরটি অপেক্ষা দশগুণ দূরে অবস্থিত। কারণ একথা আজ স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে কোনও আলোক উৎসের-দীপ্তির তারতম্য ঘটে তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে (inversely) (১০০=১০^{২})। তদুপরি এই দুটি সেফিডের একটি যদি আমাদের ছায়াপথের মত কোনও পরিচিত নক্ষত্র জগতে অবস্থান করে, তাহলে অন্য সেফিডটির দূরত্ব নির্ণয় করাও সম্ভব। এ ক্ষেত্রে এই নক্ষত্রজগতটির দূরত্ব হবে এর অন্তর্গত সেফিডটির দূরত্বের সমান, যার স্বপ্রভতার হ্রাসবৃদ্ধির কালের ও স্বপ্রভতার তুলনা করা হয়েছিল অন্যটির সঙ্গে। এইভাবে নাক্ষত্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহারোপযোগী এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল। নাক্ষত্রিক দূরত্ব পরিমাপের নতুন একটি মানদণ্ড পাওয়া গেল। নক্ষত্রগুলির দূরত্ব নির্ধারণের যে সমস্যা ইতিপূর্বে দুরতিক্রম্য মনে হয়েছিল, এবার তার আরও একটি যেন অপসারিত হল।

এই সময় আরও একজন জ্যোতির্বিদ মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের যাট ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্র মণ্ডল পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। ইনি একজন ভূতপূর্ব প্রাণীবিদ ও সাংবাদিক; নাম হারলো শেপলি। প্রাণীবিদ্যা ও সাংবাদিকতার চর্চা ছেড়ে দিয়ে ইনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। হারলো শেপলি কতকগুলি নক্ষত্রদল বা 'বর্তুলাকৃতি নক্ষত্রমণ্ডল' পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এগুলি আমাদের ছায়াপথেরই অন্তর্গত। অথচ মনে হত যেন বিচ্ছিন্ন পৃথক এক নক্ষত্র জগৎ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গিয়েছিল, এই এক একটি নক্ষত্রমণ্ডলে প্রায় ৩৫০০০ নক্ষত্র রয়েছে। যে সময় মিস লিভিটের সূত্র থেকে সেফিডগুলির গুরুত্ব ধরা পড়েছিল, সেই সময় শেপলিও এই বিচ্ছিন্ন বর্তুলাকৃতি নক্ষত্র মণ্ডলে এই সেফিডগুলির অস্তিত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করছিলেন, এবং কতকগুলি এমনি ধরনের তারকা পরে দেখতেও পান। কয়েকটি পরীক্ষার পর ১৯১৭ সালে শেপলি কতকগুলি বর্তুলাকার নক্ষত্রপুঞ্জের দীপ্তি পরিবর্তনের কাল-স্বপ্রভতা সূত্র নির্ধারণে সক্ষম

হলেন। তাতে সেফিডগুলি থেকে এই বর্তুলাকার নক্ষত্রমণ্ডলের প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হল। ইতিপূর্বে শুধু এগুলির আপেক্ষিক দূরত্বই জানা ছিল। শেপলি এবার মিস লেভিট আবিষ্কৃত সূত্রের ব্যাপক প্রয়োগ করতে সক্ষম হলেন।

আড়াই লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত বিশ্বের সন্ধান করেছিলেন শেপলি। ১৯২৫ সাল হতে এই দূরত্ব খুবই কাছে এসে গিয়েছিল। মহাশূন্যে ছড়ানো রয়েছে এমনি আরও অসংখ্য নক্ষত্র জগৎ। হাতছানি দিয়ে ডাকছে দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে, পরিচিত মহাদেশের তটভূমি পরিত্যাগ করে যিনি মহাশূন্যের আন্তঃনক্ষত্রিক ঘনকৃষ্ণ অন্তহীন মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে প্রস্তুত। এই দুঃসাহসী যাত্রার জন্য অর্ণবযানও প্রস্তুত—বিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিদ জর্জ এলিরি হেল-এর দূরদৃষ্টির ফলে নির্মিত অতিকায় একশত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

হেল স্পেক্ট্রোহ্যালিওগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৯১ সালে এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সাফল্যের সঙ্গে সৌর কলঙ্কের আলোকচিত্র গ্রহণে সমর্থ হন। এই আলোকচিত্র থেকে দেখা গেল যে এই সৌর কলঙ্কগুলি অতি তীব্র চুম্বক ও বৈদ্যুতিক আলোড়নপূর্ণ স্থান। হেল পাসাডেনাতে এসেছিলেন সৌর মানমন্দির নির্মাণের উপযোগী স্থান খোঁজ করতে। তাঁর চেষ্টায় এবং ওয়াশিংটনের কর্নেগী ইনস্‌টিটিউসনের অর্থ সাহায্যে উইলসন পর্বত শীর্ষে বিখ্যাত মানমন্দিরটি স্থাপন সম্ভব হল।

মানমন্দিরের এই অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ভর দিয়ে মহাশূন্যের যে নূতন কলম্বাস নূতন বিশ্ব আবিষ্কারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন তিনি হলেন এডুইন পি. হাবল। রবার্ট এ মিলিকানের মারফৎ হাবল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃত্তি লাভ করেন। মিলিকান ছিলেন তাঁর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। হেল ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাতা, পথপ্রদর্শক। এই দুইজন বিখ্যাত মনীষীর অতি গভীর প্রভাব পড়েছিল হাবলের জীবনে। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁকে ঢের বেশী আকর্ষণ করেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরই ভাল লাগত গণিত। একুশ বছর বয়সে তীক্ষ্ণধী হাবল ইলিনয় থেকে রোডস্‌ বৃত্তি লাভ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন। কিছুকালের জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ রাখলেন। অক্সফোর্ডে তিনি আইন পড়লেন, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে কেনটাকির লুইভিলে ওকালতি শুরু করলেন।

ওকালতি করেছিলেন মাত্র এক বছরের জন্য। তারপর সহসা আইন ব্যবসায়ের প্রতি বীতরাগ জন্মাল। এবার মনুষ্যসমাজের আইনকানুনের চর্চার বদলে তিনি ইয়ার্কস মানমন্দিরের গবেষক রূপে আকাশমণ্ডলের আইনকানুনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই আকর্ষণই তাঁকে এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এসেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত হবার সময় তিনি তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে ১৯১৬ সালে 'এ ফটোগ্রাফিক ইনভেস্টিগেসন অব ফেণ্ট নেবুলা' (A Photographic Investigation of Faint Nebulae)—আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্লান নীহারিকাপুঞ্জের প্রকৃত অনুসন্ধান) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯১৯ সালে হাবল মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের কাজে যোগ দেন এবং পূর্ব পরিচিত হাজার হাজার নীহারিকার আরও বিস্তৃত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন। সবচেয়ে কাছের যে নীহারিকাটি সেটি সাদা চোখে চাঁদের চেয়ে কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতি অস্পষ্ট মেঘের মত দেখা যায়। এর স্বপ্রভতা তৃতীয় বা চতুর্থ মানের তারার উজ্জ্বলতার সমান। প্রথমে তিনি উত্তর ভাদ্রপদ (অ্যাণ্ড্রোমিডা) নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত বিখ্যাত কুণ্ডলিত নীহারিকা মেসিয়ে ৩১ ও মেসিয়ে ৩৩ পরীক্ষা করলেন।

মেসিয়ে ৩৩ পৃথিবী থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত অন্যান্য সুপরিচিত নক্ষত্র ও নীহারিকা অপেক্ষা বহুগুণ নিষ্প্রভ। কিন্তু এ থেকে নীহারিকাটির নিজস্ব স্বপ্রভতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। হাবল এর মাঝে সেফিডগুলির সন্ধান করতে লাগলেন। প্রায় বার তেরটা সেফিড আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। এগুলির স্বপ্রভতার হ্রাসবৃদ্ধির কাল আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত সেফিড-গুলির স্বপ্রভতার হ্রাসবৃদ্ধির কালের সমান। তারপর তিনি "কাল-স্বপ্রভতার" সূত্রের সাহায্যে এদের নিজস্ব স্বপ্রভতার হিসাব করলেন। দেখা গেল এগুলি আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত সূর্যের চেয়ে চার হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল। এই হিসাব থেকে তিনি নির্ভয়ে বললেন যে মেসিয়ে ৩১ নীহারিকাটি পৃথিবী থেকে ৯০০০০০ আলোক বর্ষ দূরে। এ স্থান আমাদের ছায়াপথ থেকে বহু দূরে।

মেসিয়ে ৩৩ নক্ষত্রমণ্ডলটি আমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডলের বেষ্টনী থেকে বহু দূরে—মহাশূন্যের বিপুল অনন্ত বিস্তারের মাঝে একটি "দ্বীপ বিশ্ব", পৃথিবী

থেকে দশ লক্ষ আলোক বর্ষের কিছু কম দূরে অবস্থিত। মহাশূন্যের এই নতুন অজ্ঞাত সমুদ্রের রহস্যোদ্ঘাটনে হাবল অনেক দূর এগিয়েছিলেন। তিনি অসংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে আমাদের এই ছায়াপথের বাইরে রয়েছে অগণিত বিশ্ব। এছাড়া, আরও দূরে মহাশূন্যের ঐ অনন্ত বিস্তারে রয়েছে যে আরও সহস্র সহস্র অসংখ্য বিশ্ব বা তারামণ্ডল, তারও ইঙ্গিত দিলেন হাবল। সুদূর মহাশূন্যে "দ্বীপ বিশ্বের" অস্তিত্বের কথা এর আগে বলা হলেও স্বীকৃত হয়নি। হাবলের পর্যবেক্ষণের ফলে দ্বীপ সদৃশ বিশ্বের অস্তিত্ব এবার সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গৃহীত হল।

আমাদের এই মিলকিওয়ে ছায়াপথের বাইরে রয়েছে অসংখ্য নতুন বিশ্ব, এই তথ্য প্রচারিত হবার পর জ্যোতিবিদগণ শশব্যস্ত চেষ্টা করতে লাগলেন এই নতুন বিশ্বগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের। একশত ইঞ্চি, ষাট ইঞ্চি ও অন্যান্য অতিকায় শ্রেণীর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা চলতে লাগল, এই নতুন বিশ্বগুলির প্রকৃতি নির্ধারণের। নীহারিকাগুলিকে এক একটি নতুন বিশ্ব বলে মনে হয়েছিল। এমনি সহস্র সহস্র নীহারিকা সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেল, এগুলি কোনটি তারা, কোনটি বা গ্যাস, কি ধূলিমেঘ সমন্বয়ে সৃষ্টি, কোনটি বা নিকটবর্তী কোনও তারার আলোকে উদ্ভাসিত, কোন বৃহত্তর ধূলিকণা সমষ্টি। হের্শেল এগুলিকে আখ্যা দিয়েছিলেন "দীপ্তিমান আদিম তরল পদার্থের প্রমত্ত প্রবাহ"। এই নীহারিকাগুলির মধ্যে প্রায়ই সন্ধান মেলে সেফিডের এমন কি নোভারও। এই নোভাগুলি এক অদ্ভুত বস্তু। এগুলির ঔজ্জ্বল্য ১০০০০০ সূর্যের সমান। অকস্মাৎ বিনা নোটিশে মহাশূন্য হতে এগুলি আবির্ভূত হয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত, তারপর আকাশপটে ক্ষণকাল বিরাজ করে নিঃশেষে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নীহারিকা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ লব্ধ বিবিধ তথ্য বেড়ে চলল। এর কোথায় যে শেষ তা বুঝি কেউ বলতে পারে না। এই নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ লব্ধ-তথ্য থেকে সহসা ঘটল এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার-গুলির মধ্যে এটি স্থান পাবার যোগ্য। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও আলোক চিত্রের সাহায্যে যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা চলে তা থেকে দেখা গেল আমাদের এই ছায়াপথের বাইরে রয়েছে অগণিত ছায়াপথ। এই পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে মানুষ মহাশূন্যের সেই তারামণ্ডলগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। সেই দূর তারামণ্ডলগুলি অতি দ্রুতগতিতে আমাদের এই পৃথিবী থেকে দূরে সরে

যাচ্ছে। মহাবিশ্বের সেই বিরাটকায় তারাপুঞ্জের তুলনায় আমাদের পৃথিবী এক অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা মাত্র। দূর নক্ষত্রমণ্ডলী পৃথিবীর দিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে অতি প্রচণ্ড গতিতে। দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে তাদের গতিবেগ। এমনি ত্বরান্বিত গতিবেগে সব নক্ষত্রগুলি ছুটে চলেছে মহাবিশ্বের বহিঃপ্রান্তের লক্ষ্যে। বিরাট এক সাবানের বুদ্বুদের মত মহা-বিশ্বের নীহারিকাপুঞ্জগুলি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যে হারে এদের ব্যাস বৃদ্ধি ঘটছে তাতে প্রতি ১৪০ কোটি বৎসরে এদের আকৃতি দ্বিগুণিত হয়ে যাবে। বিদ্দ্যুচ্চমকের মত বিশ্বসমক্ষে অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত সত্য উদ্‌ঘাটিত হল। বিজ্ঞান এই বিস্ময়কর সমস্যার কোনও সর্বজন-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হল না তখনই। এ এক উদ্ভট, ভীতিপ্রদ, বিপজ্জনক এবং প্রায় অশুভ লক্ষণসূচক ব্যাপার।

মহাবিশ্বের এই অভিনব স্বরূপ আবিষ্কারের মূলে ছিলেন হাবল। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন মিলটন এ. হিউমেসন। ক্যালিফোর্নিয়ার একজন ব্যাঙ্কারের ছেলে। তবু চৌদ্দ বছর বয়সে গ্রামার স্কুলে পাঠ শেষ হলেই পড়াশুনায় পূর্ণচ্ছেদ টানেন। স্কুলের পড়াশুনা তাঁর ভাল লাগত না। পাসাডেনার পথ থেকে উইলসন পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত মানমন্দির তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত যেন। অতএব পাহাড়ের উপর মানমন্দিরের কাছে একটা হোটেলে কাজ নিলেন। হোটেলে ফাইফরমাস খাটতেন। খচ্চরবাহিনীর পিঠে চড়িয়ে পাহাড় বেয়ে বেয়ে আনতেন মানমন্দিরের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, রসদ। মাঝে মাঝে কাজ করতেন দূরবীণে প্রকাণ্ড ঘড়িঘরে, সাহায্য করতেন মানমন্দিরের সুউচ্চ বীক্ষণাগারে রুটিন-বাঁধা আলোচিত্র পরিস্ফুটনের কাজে। এই সব স্বেচ্ছামূলক করে তিনি মানমন্দিরের কাজে এমনি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন যে, ১৯২২ সালে তাঁকে মানমন্দিরের বেতনভুক কর্মচারী রূপে গ্রহণ করা হল। বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালানর সুযোগ দেওয়া হল।

আমাদের এই ছায়া পথের বাইরে রয়েছে আরও অসংখ্য ছায়াপথ, হাবল এর নিঃসংশয় প্রমাণ দেবার পর তিনি ও হিউমেসন আর একটি সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করলেন। আরিজোনার ফ্লাগস্টাফস্থিত লাওয়েল মানমন্দিরে কর্মরত ভেস্টো এম স্লিফার নামে জনৈক জ্যোতির্বিদ বর্ণালী বীক্ষণ সমীক্ষার দ্বারা কুণ্ডলিত নীহারিকার গতি পরীক্ষার চেষ্টা করছিলেন। লণ্ডন

পদ্ধতি প্রয়োগ করে এদের গতি সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ধাবমান জোতিষ্কলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হতে লাগল।

১৮৪১ সালে প্রাগের ক্রিস্টিয়ান ডপলার, যথন বর্তমানে ডপলার বিধি, (Doppler Effect) নামে পরিচিত তথ্য আবিষ্কার করেন। শব্দের উৎস যদি শ্রোতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে তা হলে শব্দের তীক্ষ্ণতা বাড়তে থাকে (কারণ এক্ষেত্রে স্বল্পতর স্থানের মধ্যে অধিক সংখ্যায় শব্দতরঙ্গ ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করে), এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পর ডপলার প্রমাণ করলেন যে এই "ডপলার বিধি" বা কম্পাসের পরিবর্তন আলোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আলোকের বর্ণ এক্ষেত্রে শব্দের তীক্ষ্ণতার সমতুল্য। দৃশ্য আলোকের মধ্যে লোহিত বর্ণের আলোকের অন্যান্য বর্ণের আলোক অপেক্ষা নিম্নমাত্রার (অর্থাৎ লোহিতবর্ণের আলোকের তরল দৈর্ঘ্য অন্যান্য বর্ণের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড়)। দৃশ্য আলোকের বর্ণালীর একপ্রান্তে থাকে লোহিত রং, অপর প্রান্তে বেগুনী রং। বেগুনী রঙের কম্পাঙ্ক মাত্রা সর্বোচ্চ (অর্থাৎ বেগুনী রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোট। কোনও জ্যোতিষ্মান বস্তু দর্শকের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে তার কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ বর্ণালীতে বর্ণ রেখাগুলি স্থান পরিবর্তন করতে থাকবে, লোহিত আলোকের বর্ণরেখাগুলি বেগুনি রঙের দিকে ঈষৎ স্থানান্তরিত হবে। বর্ণরেখার স্থানান্তরের পরিমাণ পরীক্ষা করেই কোনও আলোক উৎসের সামনে এগিয়ে আসার বা পিছনে সরে যাওয়ার গতিবেগ নির্ধারণ করা যায়।

এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্লিপার দেখতে পেলেন কতকগুলি কুণ্ডলিত নীহারিকা অতি প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে, কুণ্ডলিত নীহারিকাটির এক প্রান্ত এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। আর এক প্রান্ত ছুটে যাচ্ছে, পৃথিবীর বিপরীত দিকে। ১৯২৮ সাল নাগাদ তেতাল্লিশটি এমনি অত্যুজ্জ্বল ও নিকটতর কুণ্ডলিত নীহারিকা পরীক্ষা করে যে সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন, তা থেকে বুঝতে পারলেন সাধারণ ভাবে এই নীহারিকাগুলি অতি দ্রুতবেগে পৃথিবীর বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। তিনি এই সব তথ্যের তাৎপর্য সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। হাবল কিন্তু এই নক্ষত্রগুলির পৃথিবীর বিপরীত দিকে ছুটবার গতিবেগের সঙ্গে, পৃথিবী থেকে এগুলির দূরত্বের একটা অদ্ভুত সম্পর্ক লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, বর্ণালীতে লোহিত রঙের বর্ণরেখাগুলির

স্থানপরিবর্তন থেকে নীহারিকাটির পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবার গতিবেগের যে হিসাব পাওয়া যায়, সেই গতিবেগ আবার পৃথিবী থেকে নীহারিকাটির দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। যে সব নীহারিকা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত কম দূরের নীহারিকা থেকে দ্রুততর গতিতে ছুটে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আমাদের এই ছায়াপথের বাইরে, মহাবিশ্বের দূর দূরান্তে একের পর এক, নতুন নতুন নীহারিকার সন্ধান বার করেছিলেন হাবল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নীহারিকাগুলির গতিবেগ ও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের মধ্যকার এই সম্পর্কসূত্র মহাবিশ্বের সমগ্র নীহারিকাপুঞ্জের ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা শুধু প্রয়োজন নয়, যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাবিশ্বের যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চলে, ততদূর পর্যন্ত সব নীহারিকাগুলির ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা চালাতে হবে। প্রথমে প্রয়োজন এই স্বপ্রভতা পরিবর্তনকারী সেফিডগুলি প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল পদ্ধতির সাহায্যে এই ছায়াপথের বাইরের নীহারিকাগুলির দূরত্ব নির্ণয় করা। এ কাজের ভার নিলেন হাবল। তারপর প্রয়োজন হল বর্ণলিপি যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালীতে বর্ণরেখার লোহিত রঙের দিকে স্থান পরিবর্ত লক্ষ্য করা। এ কাজের ভার দেওয়া হল হিউমেসনকে।

বহুদূরবর্তী নীহারিকাপুঞ্জের আলোকচিত্র গ্রহণ তখনও ছিল এক অতি দুরূহ কাজ। মহাশূন্যের দূরতম প্রান্তে সহস্র সহস্র অতি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর মত এই নীহারিকাগুলি। একটিকে ঘিরে এমনি শতশত নীহারিকা। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত বর্ণালিলেখ যন্ত্রটির ছিলকাটিতে একটি ক্ষুদ্রতম আলোকবিন্দুসম দৃষ্ট নীহারিকাটির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে হত হিউমেসনকে। সারারাত ধরে এই ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর উপর অবিরত সতর্ক দৃষ্টি রেখে রাত্রি শেষে ব্রাহ্ম মুহূর্তে যখন ফুটে ওঠে প্রথম উষার আলোক, তখন ফটোগ্রাফিক প্লেটটিকে দিনের আলোর স্পর্শ থেকে ঢেকে আড়াল করে রাখতে হত। এই ভাবে ফটোফিল্মে একটি নীহারিকার আলোক সম্পাত করতে সময় লাগে দীর্ঘ পচাত্তর ঘণ্টা। অর্থাৎ এর জন্য প্রায় পুরো আট থেকে দশ রাত ধরে ফটো প্লেটে নীহারিকাটির আলোক সম্পাত করানোর প্রয়োজন হত।

এর পর মানমন্দিরের বীক্ষণাগারে বর্ণালির ফটোগ্রাফিক ফিল্মটি পরিস্ফুটন করা হয়। নীহারিকার বর্ণালির সঙ্গে সূর্যের বর্ণালি মিলিয়ে দেখা হয়। ক্যালসিয়াম বা হিলিয়াম প্রভৃতি পরিচিত বর্ণরেখার স্থান পরিবর্তন

লক্ষ্য করা গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি অতিশয় সূক্ষ্ম কাজ। কারণ এমনি দীর্ঘ সধৈর্য প্রতীক্ষার পর যে বর্ণলিপি চিত্র পাওয়া যায় তার দৈর্ঘ্য $\frac{১}{১০}$ ইঞ্চি, প্রস্থ $\frac{১}{৩০}$ ইঞ্চি। এই অতিশয় ক্ষুদ্র বর্ণালি চিত্রের মাঝে বিধৃত বর্ণরেখাগুলি। দশ কোটি বছর আগে, কল্পনাতীত দূরত্বে অবস্থিত নীহারিকা থেকে এই বর্ণালির আলোক রশ্মির যাত্রা শুরু হয়েছিল। এমনিতর ক্ষুদ্রাকৃতি বর্ণালি চিত্র পরীক্ষা করতে হত হিউমেসনকে।

হাবল স্থির করলেন, লোহিত পরিবর্ত নীহারিকাটির অবস্থিতির যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তা থেকে তিনি নীহারিকাটির দূরত্ব নির্ণয় করবেন। তারপর তিনি এই পৃথিবী থেকে নীহারিকাটির দূরত্বের পরীক্ষা করবেন। সেই দূরত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন নীহারিকাটির গতিবেগের সম্পর্ক। এ কোনও ধরাবাঁধা রুটিন-মাফিক নীরস কাজ নয় এটা। রীতিমত রোমাঞ্চকর ও পরম কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা। মানমন্দিরের কর্মীগণ রুদ্ধনিঃশ্বাসে হাবলের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। হিউমেসন এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'কি ধরনের ফলাফল যে পাওয়া যাবে তা আমরা জানতাম না। কিন্তু এ পরীক্ষা থেকে যে ফল পাওয়া গেল তা অভাবিত। কোনও নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হলে যে বিপুল চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখা দেয়, তেমনি উল্লাস ও হর্ষোৎফুল্লতা দেখা দিল মানমন্দিরের বীক্ষণাগারে। প্রতিটি বর্ণালি লিপিতেই দেখা গেল বর্ণরেখা লোহিতরঙের দিকে সরে যাচ্ছে। এতে বোঝা যায়, সব নীহারিকাগুলিই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোনটির ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম নেই। এগুলির দূরত্বের সঙ্গে গতিবেগের যে সম্পর্ক ইতিপূর্বে নির্ণয় করা গিয়েছিল, এই ছায়াপথ ছাড়িয়ে ও গভীরতম বহিঃনাক্ষত্রিক প্রদেশেও সে সূত্র ভালভাবেই খাটছে।

ক্রমেই মহাশূন্যের আরও গভীরে অবস্থিত নীহারিকাগুলির দূরত্ব পরীক্ষা করতে লাগলেন হাবল ও হিউমেসন। এখন থেকে তাঁরা নীহারিকাগুলির নির্ণীত দূরত্ব ছক কাগজে লিখতে লাগলেন। দেখা গেল, পেগাস্যাস নক্ষত্রমণ্ডলের এন. জি. সি. ৩৮৫ নামে একটি নীহারিকা সেকেণ্ডে ২৪০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই নীহারিকাটি পৃথিবী থেকে তেইশ মিলিয়ন (২৩ কোটি) আলোকবর্ষ দূরে। কোমা বেরেনিকো নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্গত পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন (৪'৫ কোটি) আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এন.জি.সি. ৪৮৪৪ নামক নীহারিকাটি সেকেণ্ডে ৪৭০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে

দূরে সরে যাচ্ছে। ২নং সপ্তর্ষি মণ্ডলটি আরও প্রচণ্ড গতিতে, সেকেণ্ডে ৯০০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই নক্ষত্র মণ্ডলটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৮৫ মিলিয়ন (৮·৫ কোটি) আলোক বর্ষ দূরে। ১৯৩০ সালে যখন ১০৫ মিলিয়ন (১০·৫ কোটি) আলোক বর্ষ দূরের লিও (সিংহ) নক্ষত্র মণ্ডলটি আবিষ্কৃত হল তখন দেখা গেল এটি প্রলয়ঙ্কর গতিতে সেকেণ্ডে ১২০০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ১৯৩৪ সালে হাবল স্বাতী (Boötes) নক্ষত্রমণ্ডলের দূরতম প্রান্তে একটি নীহারিকা আবিষ্কার করেন। এটি তখন ২২০ মিলিয়ন (২২ কোটি) আলোক বর্ষ দূরে দেখা গিয়েছিল। এবার দেখা গেল এটি আরও দ্রুততর গতিতে, সেকেণ্ডে অনুমিত ২৪০০০ মাইল অতি বিস্ফোরক বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

দূর নক্ষত্রমণ্ডলের নীহারিকাপুঞ্জ পৃথিবীর বিপরীত দিকে কল্পনাতীত প্রচণ্ড গতিবেগে ছুটে চলেছে: হাবলের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার নিয়ে সারা বিশ্বে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, পৃথিবীতে কোনও নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে আর কখনও এমন আলোচনা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। ভৌত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি ও বিস্তার চিরকালই বিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্ন বলে গণ্য হত। বিজ্ঞানে এ নিয়ে বহু বিতর্ক চলেছে। বহু মতবাদ প্রচারিত হয়েছে এ সম্বন্ধে। কিন্তু এই সব মতবাদের সমর্থনে যথোচিত তথ্যাভাবই এগুলির সত্যতা স্বীকারের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবার হাবল প্রচার করলেন আর একটি নতুন মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, অবিশ্বাস্য গতিতে চলেছে এর বৃদ্ধি, আর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় নক্ষত্র জগৎ অভাবনীয় দ্রুত গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আইনস্টাইন নিজে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে 'বর্ণরেখার স্থান পরিবর্তন বা লোহিত পরিবর্তের ব্যাপারটি গতিবেগের ফলাফল বলে মনে করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।' তা হলেও হাবল আশা করতে লাগলেন, এ বিষয়ে আরও গবেষণা করে নীহারিকাগুলির বর্ণ রেখার স্থান পরিবর্তন প্রকৃত, না আপাতদৃষ্ট, তা নির্ধারণ করতে তিনি সক্ষম হবেন। হাবলের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, লোহিত পরিবর্ত (Red Shift) নীহারিকাগুলির গতি বা পদার্থ-বিদ্যার সূত্রের অজ্ঞাতপূর্ব কোনও সূত্রের প্রভাবে দেখা দেয়। হাবল মনে করতেন, সতর্ক সাবধানী পর্যবেক্ষকের পক্ষে বর্তমান ব্যাখ্যাই নিঃসংশয়ে

মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। বরং নীহারিকাগুলির এই গতিবেগকে 'আপাত গতিবেগ' এই রূপ বর্ণহীন আখ্যা দেওয়াই সমূচিত কাজ হবে।

হাবল বুঝতে পেরেছিলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর একটি প্রধান কাজ হবে, এই ছায়াপথ বর্হিভূত বিভিন্ন ধরনের ছায়াপথগুলির শ্রেণী বিভাগ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এই কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের প্রায় সারা জীবন কেটে গিয়েছিল। এই নক্ষত্র জগতের বাইরের সমুদয় ছায়াপথগুলিকে হাবল, উপবৃত্তাকার, কুণ্ডলিত ও অসমাঙ্গ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। প্রথম শ্রেণীর ছায়াপথগুলির আকৃতি গোল। এর অভ্যন্তরে রয়েছে অসংখ্য তারাপুঞ্জ। তারা সমাবেশ সবচেয়ে ঘন ছায়াপথটির কেন্দ্রস্থল এই শ্রেণীর একটি ছায়াপথ এম ৩২। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছায়াপথগুলির কেন্দ্রস্থল উপগোলাকার। এগুলি দেখতে কেন্দ্র গোলকের চতুর্দিক ঘেরা চ্যাপ্টা থালার মত। সেই চ্যাপ্টা থালার গায়ে সংযুক্ত কুণ্ডলিত বাহু। এম ৩১ নামে ছায়াপথটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। অসমাঙ্গ ছায়াপথের দৃষ্টান্ত হল ম্যাগেল্লানিক মেঘ। হাবলের এই অভূতপূর্ব বিরাট পরীক্ষা কালে দূর নক্ষত্র জগতগুলির হাজার হাজার আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছিল।

ভৌত বিশ্বের বিস্তৃতি ও গঠন সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য হাবল ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ জে. সি. ক্যাপটেইন পরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করলেন। এক যুগ আগে ক্যাপটেইন নভোমণ্ডলের নির্বাচিত খানিকটা অংশের নক্ষত্ররাজির পরিসাংখ্যিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের খানিকটা অংশের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। হাবল মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির থেকে দেখা আকাশের ছোট্ট খানিকটা অংশের ১২৮৩টি আলোক-চিত্র গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম প্রান্তের নীহারিকা পুঞ্জও এই আলোক চিত্রে ধরা পড়েছিল। এত সুদূরের নীহারিকা পুঞ্জের আলোক চিত্র ইতিপূর্বে আর কখনও গৃহীত হয় নি। এই আলোক চিত্র গুলিতে প্রায় ৪৫০০০ পৃথক পৃথক নীহারিকা ধরা পড়েছিল। ১০০ ইঞ্চি দূরবীণের পরিধিতে ব্রহ্মাণ্ডের যতটা অংশ ধরা পড়বে, এই হিসাবের ভিত্তিতে সেখানে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন 'দ্বীপ বিশ্ব' থাকবার কথা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যে কোটি কোটি দ্বীপ বিশ্ব রয়েছে তার তুলনায় দূরবীনের ক্ষুদ্র পরিধিতে ধরা পড়া ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশের এই ৭৫ মিলিয়ন দ্বীপ বিশ্ব অতি নগণ্য। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির থেকে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের

শুধু শতকরা এক ভাগই দেখতে পাওয়া যায় মাত্র। কাজেই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে "দ্বীপ বিশ্বের" সংখ্যা অনুমান করা যায় প্রায় ৫০০ ট্রিলিয়ন (শতপরার্ধ)। এই বিপুল সংখ্যক "দ্বীপ বিশ্বের" কল্পনায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। এগুলি বিশাল গোলাকৃতি সসীম ব্রহ্মাণ্ডের মহাশূন্যের মাঝে মোটামুটি সমান ভাবে ছড়ানো। এই ব্রহ্মাণ্ডের বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কয়েক বিলিয়ন আলোক বর্ষ।

হাবল হিসাব করে দেখেছিলেন দুটি নীহারিকার মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব প্রায় ২ মিলিয়ন আলোক বর্ষ। একটি নীহারিকার ব্যাসের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০০ আলোক বর্ষ। প্রতি নীহারিকায় যে বস্তুপিণ্ড থাকে তা দিয়ে ১০০০ মিলিয়ন নক্ষত্র গড়া চলে। প্রতি নীহারিকার গড় ঔজ্জ্বলতা আমাদের সূর্যের ৫৮ মিলিয়ন গুণ। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে মহাশূন্যস্থ বস্তুর মধ্যক ঘনত্ব প্রায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে $১০^{-৩০}$ গ্রাম। অর্থাৎ মহাশূন্যে অযুত নিযুত নিখর্ব সংখ্যা বিশ্ব যত স্থান অধিকার করে আছে মহাশূন্যের অনির্বচনীয় বিশাল বিস্তারের তুলনায় তা নগণ্য! বস্তুতঃ পৃথিবীর আয়তনের অনুরূপ একটি গোলকের মাঝে যদি ক্ষুদ্র একটি ধুলিকণা রাখা যায় তবে সেটি যতটা স্থান অধিকার করবে, মহাশূন্যে অগণিত বিশ্ব ততটুকু স্থানই অধিকার করে আছে। এই হিসাব অনুযায়ী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য বিলিয়ন নীহারিকার অস্তিত্ব থাকা সত্বেও মহাশূন্য প্রকৃত পক্ষে অতি ফাঁকা জায়গা। গবেষণাগারে আমরা যত নিখুঁত শূন্যতাই সৃষ্টি করি না কেন, ব্রহ্মাণ্ডের এই শূন্যতার নিকট তা খুবই সঘন বলে মনে হবে।

শান্ত চিত্তে গভীর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠায় নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করে হাবল যে অকাট্য ও গ্রানিটসদৃশ সুদৃঢ় তথ্য সংগ্রহ করেন তারই ভিত্তিতে তিনি তার নতুন ব্রহ্মাণ্ডের চিত্ররূপ রচনা করেন। ধর্মতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ মানুষের সামনে ব্রহ্মাণ্ডের যে স্বরূপ তুলে ধরতেন, হাবলের এই ব্রহ্মাণ্ড তার তুলনায় অনেক বেশী বিজ্ঞাননির্ভর ও গ্রহণযোগ্য। এই সময় অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও গাণিতিক আঁকজোক, প্রতীক ও উদ্ঘাতনযুক্ত সমীকরণের দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চিত্ররূপ বর্ণনার চেষ্টা করছিলেন। পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের অভাবে বিজ্ঞানীরা এই ভাবে নতুন গাণিতিক প্রতীকের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ নির্ণয়ের পথ খুঁজেছিলেন।

বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণে অগণিত ধাবমান ছায়াপথ সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের যে বিচিত্র রূপ হাবলের চোখে ধরা পড়েছিল, তার বহু বছর আগে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মাণ্ডের একটি চিত্র রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের একটি স্থৈতিক চিত্ররূপ তুলে ধরলেন—ব্রহ্মাণ্ডের এই রূপ অপরিবর্তনীয়। আইনস্টাইনের এই ব্রহ্মাণ্ড চিত্রটি এমনি জটিল যে বিশুদ্ধ গণিতবিদ্ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে এর সঠিক রূপ অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। তাও তাদের প্রায় ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত সূক্ষ্ম প্রতীকের সাহায্য নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়।

আইনস্টাইনের সূত্র প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এই বছরের শেষের দিকে হলাণ্ডের লীডেন মান মন্দিরের ডাইরেকটর উইলেম ডি. সিটের আর একটি ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র দাখিল করলেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে তিনি তা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ নির্ধারণের কাজে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র রচনায় ইনিও বিশুদ্ধ গণিতের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং আইনস্টাইনের থেকে পৃথক এক ব্রহ্মাণ্ড চিত্র উপস্থিত করলেন। আইনস্টাইনের সমীকরণে ব্রহ্মাণ্ডের যে চিত্র প্রস্তাবিত হয় তাতে ব্রহ্মাণ্ড জড়পদার্থপূর্ণ ও স্থাণু। ডি. সিটেরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড কার্যতঃ শূন্য, সেখানে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়া কিছু পরিমাণ বস্তু কণিকা বড় জোর থাকতে পারে এই পর্যন্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই পুরাণো দুটি মডেলের কোনটির সঙ্গেই কিন্তু হাবলের পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের কোনও মিল ছিল না। ডি সিটেরের মডেল ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে সক্ষম হয় নি, কারণ যথাযথ বিচার করলে এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। আর আইনস্টাইনের ব্রহ্মাণ্ড-চিত্রও অসার্থক এই জন্য যে এই স্বীকার্যে ব্রহ্মাণ্ড স্থির নিশ্চল, মাউণ্ট উইলসন মান মন্দিরে নীহারিকার বর্ণালিতে লোহিতের দিকে বর্ণরেখার যে স্থান পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তেমন ঘটনার নিদর্শন এখানে লক্ষ্য করা যায় না। মাউণ্ট উইলসন মান মন্দিরের জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণলব্ধ বিস্ময়কর তথ্যের নিরিখে নিজের সূত্রের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরে আইনস্টাইন বিনা দ্বিধায় নিজের সূত্র নস্যাৎ করে দিতে চাইলেন। সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ এই গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী স্বীকার করলেন তাঁর সূত্র অভ্রান্ত, অনড়প্রতিষ্ঠ কোন পবিত্র সত্য নয়। গণিত শাস্ত্র যুক্তিহীন ভক্তিভরে পূজা আরাধনার কোনও পরম

পূজণীয় স্বর্ণ বিগ্রহ নয়। নির্বিচারে অন্ধের মত বিশেষজ্ঞদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনেরও কোন প্রয়োজন নেই বিশ্ববাসীর।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে যে সব ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র তুলে ধরেছিলেন, সেগুলির আজ সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হল। অপস্যয়মান নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে হাবল যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছিলেন তার অর্থ উদ্ধার করতে পাসাডেনার মান মন্দিরে প্রায়ই জড়ো হতেন হাবল, হেল, মিলিকান এবং তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আরও অনেক জ্যোতিষ্ক। এ নিয়ে এদের মধ্যে অন্তহীন আলোচনা চলত। এই আলোচনায় যে সব বিজ্ঞানী যোগ দিতেন এদের মধ্যে একজন ছিলেন, ভৌত রসায়ন বিজ্ঞান ও গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গ্রাজুয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ রিচার্ড চেস টোলম্যান।

অনেক আগেই ১৯০৭ সালেই, টোলম্যান আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণায় মেতে ছিলেন। দশ বছর পর প্রকাশিত হয়। তার "দি থিয়োরী অব রিলেটিভিটি অব মোশান (The Theory of Relativity of Motion) নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি। ১৯২৭ সালে, ক্যালিফোর্নিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউসনে যোগ দেবার ছয় বছর পর প্রকাশিত হল তাঁর 'স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস্ (Statistical Mechanics)। এটি জোসিয়া ডব্লিউ গিবসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে লিখিত। যে ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মৌলের সঠিক আচরণ অনুসরণ বা নির্ধারণ করা চলে না, সেইসব ক্ষেত্রে বহু অনুসমন্বিত তন্ত্রের মোটামুটি আচরণ প্রদর্শনকারী সূত্রের অনুসন্ধানার্থে এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিকস্ উদ্ভাবিত হয়েছিল।

প্রথম থেকেই মাউণ্ট উইলসনের মান মন্দিরে হাবল ও হিউমেসনের জ্যোতিষ্কীয় আবিষ্কার টোলম্যানকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ কি, এ বিষয়টি তিনি পুনরায় অনুসন্ধান করে দেখা স্থির করলেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বেসমেণ্টের (ভূগর্ভস্থ অংশ) ৫ নং কক্ষে সদা উদগীর্ণ নিজের পাইপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি কাগজ-কলম হাতে আঁকজোকে মাতলেন। তাঁর পদ্ধতি অনেকটা আইনস্টাইনের পদ্ধতির অনুরূপ। দীর্ঘ সমীকরণ প্রথমে তিনি টেবিলে ছড়ানো একটি কাগজ খণ্ডে টুকে ফেলতেন। এই সমীকরণটি তার ভৌত ব্রহ্মাণ্ডের কল্পিত রূপ।

অংশত গাণিতিক জটিলতা, এবং কিছুটা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য তাঁর এই সমীকরণ অতি-মাত্রায় কল্পিত মহাব্রহ্মাণ্ডের একটি চিত্ররূপ প্রদর্শন করত মাত্র। কখনও তিনি এই সমীকরণে একটি প্রতীক চিহ্ন সংযোগ করেন, কখনও একটি দূর করেন। কখনও কোনও চিহ্ন বা সূচক পরিবর্তন করেন, নতুন বাধা-বিপত্তি দেখা দিলে, বা নতুন ব্যাখ্যা মনে পড়লে, সূত্র নিয়ে ভেল্কিবাজি সৃষ্টির চেষ্টা চলতে থাকে তাঁর। পেনসিলের এক একটি আঁচড়ে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, সূত্র সমেত এক একখানা কাগজখণ্ড দলা পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হত বহু "ব্রহ্মাণ্ড"।

গবেষণার কাজে আত্মনিমগ্ন হয়ে প্রায় নির্বাসিতের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন টোলম্যান। ১৯২৯ সালে এই সব নির্বাসিতের জীবন পরিত্যাগ করে আবার জনসমাজে প্রবেশ করলেন। এত দিনের চেষ্টায় তাঁর সামনে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হাবলের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের তিনি এক নতুন অস্থৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য তারকা, পরিবর্তনশীল সেফিড নক্ষত্র, নোভা (নতুন তারা), ধুমকেতু, গ্রহ-উপগ্রহ, অতিকায় নক্ষত্রমণ্ডল, আন্তঃপ্রদেশের শূন্যাবস্থা, ধুলি এবং আদিম বস্তুপিণ্ড সমষ্টি নয়। এটি একটি গাণিতিক সমীকরণের সুষ্ঠু সংক্ষেপণ। এই সমীকরণটি (বা লাইন এলিমেণ্ট) দেখতে আইনস্টাইন বা ডি সিটারের সমীকরণ থেকে খুব পৃথক নয়। কিন্তু এই সমীকরণে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা ছিল। তাতে এই সমীকরণের সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড আইন-স্টাইনের সূত্রের স্থৈবিক ব্রহ্মাণ্ড না হয়ে দিন-সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত-সাধ্য। ডি সিটারের প্রকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় এটি বস্তুশূন্য নয়, বস্তুপূর্ণ।

গাণিতিক আঁকজোকের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড চিত্র নির্ধারণের বহুবিধ প্রচেষ্টার কাহিনী পাঠ করেছিলেন টোলম্যান। কিন্তু সাধারণতঃ বিজ্ঞানে যা ঘটে থাকে কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তাঁর চোখে পড়েনি। ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্যদের সামনে তাঁর প্রবন্ধ পঠিত হবার কয়েকমাস আগে হাওয়ার্ড পি. রবার্টসন হুবহু তাঁরই সমীকরণের অনুরূপ একটি সমীকরণ উদ্ভাবন করেছিলেন। রবার্টসন তখন ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করছেন।

সাত বছর আগে আলেকজাণ্ডার এ. ফ্রায়েডম্যান নামে একজন প্রতিভাবান রুশ গণিতবিদ আইনস্টাইনের স্থৈতিক বিশ্বের প্রমাণে একটি ভ্রমপ্রমাদ আবিষ্কার করেন, এবং দেখিয়ে দেন যে, গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী এতে দুটি অস্থৈতিক ব্রহ্মাণ্ড গঠন সম্ভব। টোলম্যানের গবেষণালব্ধ তথ্য অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হলে যখন এই দুইজন বিজ্ঞানীর গবেষণার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি কাগজপত্র ঘেটে খুঁজে বার করলেন এবং এ দুজন বিজ্ঞানীর এ বিষয়ে অগ্রগণ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এই প্রবন্ধ দুটি পাঠ করে তিনি লিখেছিলেন, "ফ্রায়েডম্যানের এই প্রবন্ধটির প্রতি এ যাবৎ বিশেষ নজর না দেওয়া হলেও ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে নতুন অধ্যায় সূচনাকারী· রূপে সব কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।" টোলম্যান নিজেকে বিজ্ঞানের মুগ্ধ গায়েন মনে করতেন না।

এই গাণিতিক সমীকরণ প্রথম ব্রহ্মাণ্ড রহস্য সমাধানের কাজে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন, লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আভে জর্জ লামাত্রে নামে জনৈক তরুণ বেলজিয়ান যাজক। লামাত্রে ফ্রয়েডম্যানের সমীকরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখলেন এবং তাঁর অস্থৈতিক লাইন এলিমেণ্ট জ্যোতিষীয় তথ্যে প্রয়োগ করলেন। নিকটতম ছায়াপথের বর্ণালিতে যে লোহিত পরিবর্তন দেখা যায় তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করে নিলে—এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নির্ণয়ে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচারিত একটি পত্রিকায় লামাত্রের এই গবেষণা প্রকাশিত হওয়ায় এটি বহুদিন বিজ্ঞানী সমাজে অজ্ঞাত রয়ে যায়। শেষে ১৯৩০ সালে স্যার আর্থার এস. এডিংটন এই প্রবন্ধটির প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রভূত নতুন তত্ত্বের ভিত্তিতে (এগুলি লামাত্রের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত) রচিত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে টোলম্যান তাঁর নিজস্ব ব্রহ্মাণ্ড চিত্রটি দাখিল করবার পরই অবশ্য এডিংটন লামাত্রের এই প্রবন্ধের কথা জানিয়েছিলেন।

বেশ কিছুটা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত টোলম্যানের এই গতিশীল ব্রহ্মাণ্ডের চিত্র প্রচারিত হবার পর এমনি ধরনের নানা ব্রহ্মাণ্ড চিত্র উপস্থাপিত করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। গতিশীলতায় সজীব হয়ে উঠল ব্রহ্মাণ্ড লোক। ব্রহ্মাণ্ড চিত্র রচনার ধুম পড়ে গেল যেন বিজ্ঞানীদের মাঝে।

যারই সূক্ষ্ম উদ্‌ঘাতন যুক্ত জটিল আঙ্কিক সমীকরণ প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রচনার কাজে এগিয়ে এলেন। হল্যাণ্ডের উইলেম ডি. সিটের, জার্মানীর লো ও হেকম্যান, ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম, এইচ ম্যাকক্রিয়া ও জর্জ সি. ম্যাক ভিটি আঙ্কিক হিসাব অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ড চিত্র উপস্থাপিত করলেন। প্রাচ্য দেশীয়দের মধ্যে জাপানী টেকিউচিই প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের গাণিতিক চিত্ররূপ প্রণয়ন করলেন। বিশুদ্ধ গণিতবিদদের ব্রহ্মাণ্ডের এই মানসচিত্রের সুস্পষ্ট চাক্ষুষ রূপ প্রদর্শনের জন্য কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা সাহায্য নেবার প্রয়োজন হত না। দেখে, স্যার জেমস জীনস বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমরা যদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে এই বিশ্বকে এখন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীদের বিশুদ্ধ চিন্তা ধারার সৃষ্টিরূপে দেখতে হবে। যান্ত্রিক মডেলের মধ্যে যদি আমরা এর স্বরূপ খুঁজবার চেষ্টা করি, তা হলেই হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হবে। দেখা দেবে স্ববিরোধিতা।

স্বতঃ আপন গঠন-পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের যে মানসচিত্র হাবল ও টোলম্যান উপস্থাপিত করেছিলেন, এ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি ব্রহ্মাণ্ড চিত্র প্রচলিত ছিল। এটি অপর দুটি অপেক্ষা অনেক পুরাতন। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তিন প্রকারের ধারণা তখন প্রচলিত ছিল। সব চেয়ে পুরানো ধারণা অনুযায়ী বিশ্বজগৎ ক্রমেই শীতল হয়ে উঠছে, নিয়ত বিকিরণের ফলে নক্ষত্রগুলি মহাশূন্যে তাদের তাপ হারাচ্ছে। এর ফলে একদা সমস্ত তাপ মহাশূন্যে সমানভাবে বন্টিত হয়ে যাবে, বিশ্বজগতের সমুদয় প্রাণী লোপ পাবে। কারণ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমভাবে এই তাপশক্তি ছড়িয়ে পড়লে, তাপ শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে খুবই যৎসামান্য, জীবজগতের প্রাণধারণের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানীই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই শোচনীয় পরিণতির পুরাতন চিত্রই প্রচার করতেন। হাবলের ব্রহ্মাণ্ডের মানসচিত্রও কম নৈরাশ্যজনক নয়। কারণ, তাঁর এই ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারণের শেষে একদা নিঃসীম শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে।

এই দুই বিশ্বরূপের পরিবর্তে পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা টোলম্যান প্রস্তাবিত তৃতীয় রূপটি সমর্থন করতে লাগলেন। এবার তাঁরা ব্যাতিষঙ্গবাদী তাপগতি বিজ্ঞানের সমর্থনে বলীয়ান। এই তাপগতিবিজ্ঞানের সমীকরণ বলে ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে স্থির-নিশ্চল অবস্থায় উপনীত না হয়েও

চিরতরে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হওয়া সম্ভব। নিয়ত নবজন্মলাভ করছে, পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হচ্ছে, এমনি একটি প্রকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা এবার সম্ভব হল। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতীত কোন প্রণালীতে বিকিরণই ব্রহ্মাণ্ডের এই হৃত জড়পদার্থ পুনরুৎপাদন করে চলেছে। ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপের এই ব্যাখ্যায় বিশ্বজগতের তাপক্ষয় জনিত বিলুপ্তির যে ভয়াল চিত্র অঙ্কিত করা হত তা শুধু বাতিল হ'ল না, ক্রমপ্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ড একদা পরিপূর্ণ শূন্যতায় মিলিয়ে যাবার যে মতবাদ প্রচারিত হত তাও পরিত্যক্ত হল। ধরাপৃষ্ঠ হতে মানব সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত নয়, টোলম্যানের বিশ্বরূপবাদ এমনি ভরসা দিল।

আরও ভালভাবে মহাকাশের আরও দূরান্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারলে কি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ আরও সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে? সুনিশ্চিতভাবে মিলবে বর্ণালিতে লোহিত পরিবর্তের রহস্যের ব্যাখ্যা? ব্রহ্মাণ্ড যদি হয় সম্প্রসারণশীল, ব্রহ্মাণ্ডের আরও গভীর দেশ পর্যবেক্ষণ করতে পারলে কি জানা যাবে সেই সম্প্রসারণের প্রকৃতি? আরও নিঃসন্দেহে কি এতে সমীক্ষা করা যাবে নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যুরহস্য? ব্রহ্মাণ্ড আর পৃথিবীর বয়স হিসাবের সমস্যা, রাসায়নিক মৌল সৃষ্টির রহস্য? বহুদূরবর্তী নীহারিকাগুলির সঙ্গে যদি নিকটবর্তী নীহারিকাগুলির লক্ষণীয় পার্থক্য থাকে, তা হলে আরও গভীরতর পর্যবেক্ষণের ফলে ধরা যাবে ছায়াপথগুলির বিবর্তন রহস্যের সূত্র?

হাবল বিশ্বাস করতেন, যাবে। জর্জ এলিরি হ্যালির দূরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের ফলে তখন তাঁর হাতে একটি আরও উন্নততর দূরবীক্ষণ যন্ত্র এসে গেছে। জীবন সায়াহ্নে হ্যালি আরও শক্তিশালী দূরবীক্ষণ নির্মাণের সম্ভাবনা পরীক্ষা করছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন এক লাফেই একশ ইঞ্চি থেকে দু'শ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করা চলতে পারে। এই দানবিক যন্ত্র দিয়ে আপাতদৃষ্টে অনন্ত অসীম মহাশূন্যে আগের চেয়ে তিনগুণ দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করা চলবে। পরীক্ষা করা চলবে আগের তুলনায় প্রায় ত্রিশগুণ আকারের অজ্ঞাত নভঃমণ্ডলের অংশ। একশ মিলিয়ন নতুন নীহারিকা এসে যাবে এই রাক্ষুসে দূরবীনের পাল্লায়—জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নজরের মধ্যে। এই বিরাট দানবিক দূরবীন যে সব সাজসরঞ্জামের উপর স্থাপন করে ঘোরানো হবে সেগুলিরই ওজন হবে শত শত টন।

১৯২৮ সালে 'ইনটারন্যাশনাল এডুকেশন বোর্ড' দুইশত ইঞ্চি কাচযুক্ত একটি প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র, তার আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি, গৃহনির্মাণ, এবং সম্পূর্ণ নূতন একটি নভোবস্তুবিদ্যার মানমন্দিরের পরিপূর্ণ সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য 'ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিকে ৬০ লক্ষ ডলার অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করলেন। প্রস্তাবিত সংস্থাটি ওয়াশিংটনের মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পরিচালনা করা স্থির হল। হেল এই 'অবজারভেটরী কাউন্সিলে'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জন অ্যাণ্ডারসনের নাম এই প্রকল্পের নির্বাহী আধিকারিকরূপে উল্লিখিত হল।

সান ডিয়েগো থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে পালোমার পর্বত শৃঙ্গোপরি খানিকটা সমতল স্থানে পৃথিবীর বৃহত্তম মনিমন্দিরটি স্থাপিত হল। এটি সমুদ্র সমতল থেকে ৫৬০০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। উইলসন পর্বতমালার চতুর্দিকে সহরাঞ্চল দ্রুত প্রসারিত হওয়ায়, এই মানমন্দিরটির নিকটবর্তী স্থানে নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণের উপযোগী আদর্শ পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই মানমন্দিরের আশেপাশের অঞ্চলের জনসংখ্যা ৩,৩০,০০০ থেকে ২৫,০০,০০০-এ দাঁড়িয়েছিল। লস এঞ্জেলস অঞ্চলের আলোকমালা পর্বতপৃষ্ঠে স্থাপিত মানমন্দিরের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের কাজে বাধা জন্মাত। নতুন মানমন্দিরটি পাসাডেনা থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। পালোমার পর্বত অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিয়মিত প্রবাহী, এবং এ অঞ্চলের চতুর্দিকে ঝড়ের প্রকোপও কম। স্থানটি মানমন্দিরের জন্য নির্বাচিত করার এও এক কারণ। এই দুইশত ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি সর্বপ্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত অন্তরিত একটি ত্রিতল গৃহে স্থাপিত। বাড়ীটির ছাদ ইস্পাত নির্মিত, অর্ধগোলক তুল্য, গম্বুজাকৃতি। গম্বুজটি ½ ইঞ্চি ইস্পাতের পাতে মোড়া, ওজন ১০০০ টন। এর ব্যাস ১৩৭ ফিট, প্রায় রোমের প্যানথীঅ্যানের সমান। একটি বোতাম টিপলেই সমগ্র গম্বুজটি ঘুরতে থাকে।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে জ্যোতির্বিদ-পর্যবেক্ষণ-কালে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দীর্ঘ নলে আরোহণ করে প্রয়োজন মত যন্ত্রটির সঙ্গে নিজে ঘুরে ঘুরে দুইশত ইঞ্চি প্রতিফলকের ফোকাসে সরাসরি পর্যবেক্ষণ চালাতে পারেন। এই দানবিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মাণের সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে এমন সময় জাপানীরা পার্ল হারবারে আক্রমণ

চালাল। আমেরিকাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করতে হল। যুদ্ধকালে মানমন্দিরের নির্মাণ কার্য স্থগিত রইল। দূরবীক্ষণের লেন্সের কাচ পড়ে রইল প্যাসাডেনাতে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির কারখানায় যে চল্লিশ জন কারিগর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মাণের কাজ চালাচ্ছিলেন তাঁরা স্থল ও নৌবাহিনীর জন্য তিনপলা কাচ প্রভৃতি নির্মাণের মত আরও জরুরী কাজের ভার নিতে ছুটলেন। পৃথিবীকে মানমন্দির প্রভৃতি জ্ঞানপীঠের জন্য নিরাপদ করবার জন্য আমেরিকার গণতন্ত্রী মানুষ এগিয়ে গেলেন সমরাঙ্গনে। মহাবিশ্বের যে নূতন দিগন্ত মানুষের চোখের সামনে উন্মোচিত হবার উপক্রম করেছিল সাময়িকভাবে সেখানে নাবল নিষ্প্রদীপের কৃষ্ণ যবনিকা।

হাবলের উপর ভার দেওয়া হল মেরীল্যাণ্ডের এবারডিনস্থিত সমরোপকরণ বিভাগের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের বহিক্ষেপক (External Ballistic) বিভাগটির।

টোলম্যানকে ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালেই ওয়াশিংটনে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে পর পর অনেক কাজের ভার নিতে হয় তাঁকে। তার মধ্যে ছিল ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা পরিষদের) ভাইস প্রেসিডেন্টের কাজ, বার্নাড বারুচ যখন ইউনাইটেড নেশনস্ অ্যাটমিক এনার্জি কনফারেন্সে (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার কাজ। প্রক্সিমিটি ফিউজ (Proximity fuse) ও রকেট প্রকল্পে তাঁর জ্ঞান ও কর্মশক্তির সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে।

দীর্ঘ চার বছর ধরে যুদ্ধ চলল। হাবল তাঁর জ্যোতিষ্কলোক পর্যবেক্ষণের কাজে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে তিনি পাসাডেনায় ফিরে এলেন। আগের দিনের সেই কর্মশক্তি ও উৎসাহ নিয়ে তিনি পুনরায় শান্তিকালীন এই নতুন কাজে ডুবে গেলেন। দশ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির নির্মাণকার্য শেষ করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, তিনি তার একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই দূরবীনটির নক্সা প্রণয়নে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। ইরা এস. ব্রাউন ১৯৪৬ সালে মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ডাইরেক্টর (অধিকর্তা) নিযুক্ত হন। এর দু-বছর পর তাঁকে মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের অধিকর্তা নিযুক্ত করা হল। ইরা

এস. ব্রাউন ক্যালিফোর্নিয়া ইনসস্টিটিউট অব টেকনলজি থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানেই তিনি পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপনার কাজ করেছিলেন। হাবল মাউণ্ট উইলসন ও মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের প্রধান গবেষক নির্বাচিত হন। পরে তিনি মাউণ্ট উইলসন ও মাউণ্ট পালোমার মানমন্দির দুটির সম্ভাব্য গবেষণা প্রকল্প নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত যুক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

নতুন অতিকায় দূরবীনটির নির্মাণকার্য শেষ হবার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন হাবল। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি দশলক্ষ চক্ষুর সমান আলোক রশ্মি সংগ্রহ করতে পারবে। এ দিয়ে মহাকাশে দুই বিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরবর্তী স্থান পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এই পাল্লা একশত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির পাল্লার দ্বিগুণ। এই অতিকায় যন্ত্রে ১০,০০০ মাইল দূরের একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দেখতে পাওয়া যাবে, এবং ৩০,০০০ মাইল দূরের এমনি একটি আলোকিত মোমবাতির আলোকচিত্র গ্রহণ করা চলবে। মাউণ্ট উইলসনে স্থাপিত মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে নভোমণ্ডলের যতখানি অংশ একত্রে পর্যবেক্ষণ করা চলত, এই নতুন দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে তার আটগুণ পরিমাণ নভো মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতে পারা যাবে। দুইশত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির পরিপূরক রূপে পালোমারে আটচল্লিশ ইঞ্চি ব্যাসের ছোট একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রও স্থাপন করা হয়েছিল। এটি ১৯৩১ সালে বার্নাড্ স্মিড্ নামে জনৈক জার্মান ভদ্রলোক নির্মাণ করেছিলেন। স্মিডের এই প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির পাল্লা খুব বেশী দূর ছিল না। কিন্তু এতে নভোমণ্ডলের অতি বিরাট এলেকার এক সঙ্গে আলোক চিত্র গ্রহণ করা যেত। দশ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একবারে যতটা অঞ্চলের আলোক চিত্র গ্রহণ করা চলত, এই এলেকা তার ষাট হাজার গুণ বেশী।

অবশেষে এল যন্ত্রটি উদ্বোধনের সেই ঐতিহাসিক দিন। এই অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি প্রথম ব্যবহারকারীদের অন্যতম ছিলেন হাবল। দুর্ভাগ্যক্রমে টোলম্যান এটির নিমাণ কার্য সম্পূর্ণ হওয়া দেখে যেতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে তিনি পাসাডেনায় তাঁর বাড়ীতে ফিরে আসেন। তারপর এক বছর কাটালেন তাত্ত্বিক গবেষণায়। ওয়াশিংটনে যাবার আগে এই বিষয় নিয়েই তিনি গবেষণা করছিলেন। বিজ্ঞানের দার্শনিক ও সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ ও পণ্ডিতসুলভ অনুশীলনও পুনরায় শুরু হল। ১৯৪৮ সালে ৫ই

সেপ্টেম্বর তিনি নিমুনিয়া রোগে ভুগে দেহত্যাগ করেন। তিন সপ্তাহ আগে তিনি নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। টোলম্যানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা একজন সত্যিকারের প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবিক ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীকে হারাল।

দুইশত ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনুসূচী অনুযায়ী নিয়মিত নভো-মণ্ডল পর্যবেক্ষণ শুরু হল ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাস থেকে। এই ছায়াপথ বহির্ভূত মহাকাশের দূরদূরান্তের জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পুনরায় পর্যবেক্ষণ শুরু হল। এই নতুন যন্ত্র সাহায্যে কতকগুলি জরুরী সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বর্ণালিতে লোহিত-পরিবর্তের রহস্যময় ব্যাপারটির কোনও সন্তোষজনক সমাধান কিছুতেই বার করা যাচ্ছিল না, সেটির রহস্যোদ্ধারের কাজে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হল।

যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধকালে, মাউন্ট উইলসন ও লিক মানমন্দিরের নীহারিকা বর্ণালি বীক্ষণের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অনুযায়ী এই দুই মানমন্দিরে শত শত নীহারিকার বর্ণালির বর্ণরেখার লোহিত-পরিবর্তের পরিমাণের হিসাব নেওয়া হয়েছিল। এই কাজটি শুরু হয় লিক মান-মন্দিরে। এখানে অনেক আগে, ১৯৩৫ সালে পর্যবেক্ষণ কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন নিকোলাস ইউ. মেঅল। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে বহু ছায়াপথের পূর্ণ উজ্জ্বলতা এডিসন পেটিট বিশেষ আলোক তাড়িত যন্ত্রে পরিমাপ করে-ছিলেন। হিউমাসন তখনও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাজে নিযুক্ত। দশ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মুল ফোকাসে একটি নতুন দ্রুততর এবং আরও বহুমুখী নীহারিকা বর্ণালী লেখ যন্ত্র স্থাপন করায় আশা করা যেতে লাগল যে এতে নতুন এবং আরও রোমাঞ্চকর তথ্য সংগৃহীত হবে।

অন্যান্য যে সব তথ্য সংগৃহীত হল তা থেকে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ধরা পড়ল। বহু বছর আগে হাবল ও হিউমাসন নীহারিকাগুলির পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবার গতিবেগ ও দূরত্বের মধ্যকার যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন, দুইশত ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেল, প্রায় এক বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরের অস্পষ্ট নীহারিকাগুলি সেই সম্পর্ক-নির্দিষ্ট গতিবেগ অপেক্ষা সেকেণ্ডে প্রায় ৬২০০ মাইল অধিক দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে। অন্যভাবে বলা চলে, এক বিলিয়ন বছর আগে, (নীহারিকাটি থেকে আসা আলোক পৃথিবীতে আসতে ঐ পরিমাণ সময়ই লেগেছিল) ব্রহ্মাণ্ড আজকের

চেয়ে তখন আরও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ব্রহ্মাণ্ডের এই সম্প্রসারণের গতি এখন যেন সেই তুলনায় কমে এসেছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর কোনও দর্শকের নিকট কতকগুলি নিকটতম নীহারিকা প্রায় নিশ্চল মনে হয়।

সমর বিভাগের কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাবল যে সময় বাড়ী ফিরছেন সেই সময় ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্‌স্টিটিউট অব টেকনলজির উইলিয়াম কেলগ র‍্যাডিয়েশন লেবরেটরীতে নক্ষত্র সমূহের বিবর্তন, সৌরজগতের বয়স, এবং রাসায়নিক মৌলের বিবর্তন সম্বন্ধে নতুন ভাবে গবেষণা শুরু করা হয়েছিল। গবেষণাগারের অধিকর্তা, চার্লস সি. লরিটসেন, ইরা এ. বাউএন, উইলিয়াম এ. ফাউলার, জেসি এল. গ্রীনস্টেইন (ইনি দুবছর পরে যোগ দিয়েছিলেন), এই আকর্ষণীয় গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন। পর্যবেক্ষণ ও পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া যুক্ত তাত্ত্বিক হিসাবনিকাশ থেকে তারা লক্ষ্য করেছিলেন যে ওজনের দিক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসমূহের শতকরা ছিয়াত্তর ভাগ হাইড্রোজেন, তেইশ ভাগ দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুভার মৌল হিলিয়ম। বাকী মৌলগুলি একত্র মিলে হয় শতকরা একভাগ ওজন। তারা আরও প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, পারমাণবিক ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য মৌলের শতকরা হার কমে আসে। অন্যভাবে বলা চলে, হিলিয়মের (পারমাণবিক ভার ৪) চেয়ে সোডিয়ম (পারমাণবিক ভার ২৩) কম, কিন্তু লোহার (পারমাণবিক ভার ৫৬) চেয়ে সোডিয়াম বেশী রয়েছে। নাক্ষত্রিক বিবর্তনের গবেষণা থেকে প্রকাশ পেল যে আমাদের সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তারাগুলির বয়স প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় আমাদের ছায়াপথের প্রাচীনতম তারাগুলির বয়স প্রায় সাড়ে ছয় বিলিয়ন বৎসর। আমাদের সৌরজগতের বয়স আমাদের এই ছায়াপথের চেয়ে দুই বিলিয়ন বর্ষ কম। আমাদের ছায়াপথ যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন এই সৌরজগতের কোন অস্তিত্বও ছিল না। অবাস্তব জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণলব্ধ এই আর একটি অভিনব তথ্য। ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে মানুষের বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে হয়ত এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ড রহস্য সম্বন্ধে যখন এমনি সব চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তখন যে হাবল এই ব্রহ্মাণ্ড রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। ১৯৫৩ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর নিজ গৃহে

তাঁর মৃত্যু হল। তিনি চিন্তাশীল, সুপণ্ডিত ও সমাজ-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি যে জর্জ ডারউইন বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি তাঁর মহাশূন্য সংক্রান্ত অভূতপূর্ব গবেষণা সম্বন্ধে বলেছিলেন: "কারণ আমি যেমন ভাবে শুরু করেছিলাম, তেমনি ভাবে শেষ করতে পারি। আমাদের পৃথিবীর সমতূমি থেকে আমরা সুদূর মহাশূন্যের দিকে তাকাই, কল্পনা করবার চেষ্টা করি কি ধরনের বিশ্বে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের নিকটতম পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের নিবিড় জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞান ফিকে হয়ে আসতে থাকে...যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ ম্লান দিগন্তে পর্যবেক্ষণের ভ্রান্তির মাঝে আমরা খুঁজে ফিরি অস্পষ্ট তটরেখার। কিন্তু অন্বেষণ চলতে থাকে। এ প্রবৃত্তি অনির্বাণ, অদম্য!"

হাবল ঠিক কথাই বলেছিলেন। হিউমেসন থামলেন না। এগিয়ে চললেন। চেষ্টা করতে লাগলেন পৃথিবীর থেকে এক শত বিলিয়নেরও অধিক আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত দুটি অতিশয় অস্পষ্ট ছায়াপথের বর্ণালির লোহিত পরিবর্তের পরিমাণের হিসাব করতে। এগুলি সেকেণ্ডে ৬২,·০০ মাইল বেগে (আলোকের গতিবেগের এক তৃতীয়াংশ) পৃথিবীর দিক থেকে পশ্চাদাপসরণ করছে বলে অনুমান করা হল। কিন্তু এই সুদূর মহাশূন্যের নীহারিকাপূর্ণ স্থান পরীক্ষা করে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য সংগৃহীত হল না। এই প্রকল্পে অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণও এসে যোগদান করলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন তরুণ বিজ্ঞানী অ্যালান আর. স্যাণ্ডেজ। ১৯৫১ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা করতে আসেন। সর্বাধিক দূরবর্তী ছায়াপথগুলির আপাত গতিবেগ কেন হাবল-হিউমাসন নির্ধারিত সম্পর্ক অনুযায়ী হচ্ছে না, তার রহস্যোদ্ধার করার চেষ্টায় স্যাণ্ডেজ ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদগুণ টোলম্যান ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড-চিত্রকারদের ব্যাতিষঙ্গবাদী ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপের সমীকরণ ব্যবহার করছিলেন।

পূর্ববর্তী কয়েকটি বছরে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি অপেক্ষাকৃত নতুন ও জনপ্রিয় মতবাদ রচিত ও প্রচারিত হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ও তাঁর দুজন তরুণ সৃষ্টিক্রমবিদ ও গণিতবিদ ইংরাজ সহকারী, হারমান বণ্ডি ও টমাস গোল্ড, ব্রহ্মাণ্ডের একটি মানসচিত্র উপস্থাপিত করলেন, একে বলা হয় স্থিতাবস্থায় স্থির বা অপরিবর্তনীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। গোল্ড পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ১৯৫১ সালে হয়েল

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক বিচিত্র স্বরূপ অঙ্কিত করলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের শুরু নেই, শেষও নেই। এই অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডে মহাশূন্য সীমাহীন, কাল অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বস্তু পিণ্ডের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। অবিচলিত ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, তেমনি এই সম্প্রসারণ-সৃষ্ট শূন্যস্থানে নতুন ছায়াপথ সৃষ্টি হয়ে দূরাপসৃত ছায়াপথগুলির স্থান পূরণ করছে। ব্রহ্মাণ্ডে নিয়তই সৃষ্টি হয়ে চলেছে হাইড্রোজেন পরমাণু, কাজেই স্থিতাবস্থার সুস্থিত এক অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ড রূপেই এই বিশ্ব জগৎ বিরাজ করে। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা, হয়েলের মতে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাণ্ড ছিল শীতল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তুরন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস কণিকার বিরাট ব্যাপ্তি। এই হাইড্রোজেন গ্যাসের কিছু অংশ জড় আকর্ষণের ফলে ঘনীভূত হয়ে, অবশেষে তারায় পরিণত হয়। এই তারাগুলিও আবার সংকুচিত হতে থাকে। এদের অভ্যন্তর দেশ ঘনতর ও উত্তপ্ততর হয়ে উঠতে থাকে, প্রোটনগুলি সংযোজনের ফলে ভারি হাইড্রোজেন কেন্দ্রক বা ডয়ট্রন সৃষ্টি করে। এগুলি পরে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ে অন্যান্য ভারি মৌল সৃষ্টি করে।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্য যে মানসচিত্রটি উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তাকে বলা হয় তথাকথিত অভিব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড। এই মতবাদটি অধিকতর জনপ্রিয়। এই মত প্রচার করেছিলেন রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী পদার্থ বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো। ইনি কিছুকাল লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য। ইনি এখন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। গ্যামো বললেন, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন,—এই তিনটি মৌল কণিকাযুক্ত ঘন অবস্থার বস্তুপিণ্ড হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জন্ম নিয়েছে। পাঁচ বিলিয়ন বর্ষ আগে এই অতি ঘন গ্যাসের অন্তঃস্থল বিদীর্ণ হয়েছিল। এই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের পাঁচ মিনিট পর ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুপিণ্ড শীতল হতে শুরু করল। সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে (step by step) নূতন মৌল সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়ায় ডয়ট্রন বেরিয়ে এসে প্রোটন ও নিউট্রন একত্র মিলিত হয়ে সর্বাপেক্ষা ভারি মৌলগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিস্ফোরণের ফলে চতুর্দিকে ছিটকে পড়া আদিম বস্তুপিণ্ডগুলি থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ, উপগ্রহ ও ছায়াপথগুলি সৃষ্টি হয়েছে। আদিম বিস্ফোরাত্মিক বস্তুপিণ্ড উৎক্ষেপ কার্য চলেছিল প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে।

বিরাট তুইশত ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ ও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে

আলোকপাতকারী নানাবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ডের বয়স কত এ সম্বন্ধেও মানুষের পুরাতন কৌতূহল জাগ্রত হল। হাবল দেখিয়েছিলেন যে এই নক্ষত্র জগতের বহির্ভূত মহাকাশের শূন্যলোক পর্যবেক্ষণের দ্বারা শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের আকার নির্ণয়ের কাজই হয় না, সেই সঙ্গে হয় তার বয়স নির্ধারণের কাজও। সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ডের নতুন প্রকৃতি সম্বন্ধে আবিষ্কৃত তথ্য পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে পূর্বেকার মোটামুটি স্বীকৃত পুরানো মতবাদ প্রায় ধূলিসাৎ করে দিল। ইতিপূর্বে উল্কাপিণ্ড, তেজস্ক্রিয়তা, সমুদ্রের লবণাক্ততা, পৃথিবীর শিলাস্তরের গভীরতা, এবং অনুরূপ অন্যান্য তথ্যের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স বিজ্ঞানীরা শতাধিক বিলিয়ন বর্ষ বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ড যতই সম্প্রসারিত হয়ে নূতন দিগন্ত পানে ছুটে চলে, সমলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বয়সও তেমনি ক্ষুদ্রতর কল্পের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। ব্রহ্মাণ্ড যদি সম্প্রসারণশীল হয় তা হলে এই শতাধিক বিলিয়ন বছরের ঢের আগেই নিশ্চয় এর সৃষ্টি হয়েছিল। না হলে এই সময়ের মাঝে ছায়াপথগুলি আরও দূরান্তে প্রসারিত হয়ে পড়ত এবং পুনরায় সঙ্কোচন শুরু হবার আগে একেবারে সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত হয়ে অতি ক্ষীণ হয়ে আসত।

পূর্বেকার পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়েছিল, বহু তারকারই বয়স কয়েক বিলিয়ন বছরের বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, কক্ষপথের আকৃতি থেকে মনে হয়েছিল কতকগুলি দ্বৈত নক্ষত্রের বয়স অন্ততঃ এক বিলিয়ন বৎসর। এতে এমন অবস্থা দেখা দিল যাতে মনে হল ব্রহ্মাণ্ডের সন্ততিরূপী এই নক্ষত্রগুলির বয়স বুঝি ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের চেয়ে বেশী। সত্যই তা হলে কি সন্ততি জনকের চেয়ে প্রবীণতর? এডিংটন বললেন, 'কাল ছাটাই হালের ফ্যাসান। সম্প্রসারণশীল বিশ্বের ধারণা যদি সত্য হয়, তা হলে মনে হচ্ছে আমাদের কাল পরিমাণের শতকরা ৯৯ ভাগই ছেটে দিতে হবে।' হয়ত তিনি বিজ্ঞানীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, জন্ম থেকে নক্ষত্রগুলির অভিব্যক্তির মাঝ দিয়ে বর্তমান কালে আসতে যে সময় লেগেছে তার হিসাবে খুবই ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। বস্তুতঃ এই নক্ষত্রগুলি খুবই নবীন, কার্যতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে ধারণাতীত নবীন।

১৯৫২ সালে মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের ওয়াল্টার বাডে আবিষ্কার করলেন যে বিভিন্ন ছায়াপথের দূরত্ব নির্ণয় করতে যে মানদণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আপাতদৃষ্টে ভ্রান্ত। সেফিডগুলির ইতিপূর্বেকার স্বীকৃত সাদৃশ্য সম্বন্ধেও

সন্দেহ দেখা দিল। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে যে মাউন্ট উইলসন ও মাউন্ট পালোমোর মানমন্দিরের হ্যালটন সি. আর্পের মতে আমাদের এই ছায়াপথের সেফিডগুলি অন্য ছায়াপথগুলির সেফিডগুলি থেকে পৃথক ধরনের হতে পারে। ছায়াপথগুলির মধ্যকার দূরত্ব পূর্ব ধারণার চেয়ে ঢের বেশী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব দ্বিগুণেরও বেশী। এতে ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি হবে পূর্ব ধারণা অনুযায়ী আকৃতির দ্বিগুণ। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ বা ছয় বিলিয়ন বৎসর। এই হিসাবের সঙ্গে নভোবস্তুবিদ্যা ও ভূবিদ্যার হিসাবের মিল আছে।

মনে হল সুদূর মহাশূন্যে এক বিলিয়ন আলোক বর্ষের অধিক দূরবর্তী দু'টি নক্ষত্র জগৎ হতেই পরিবর্তনশীল তারকাগুলির দূরত্ব, আকৃতির প্রশ্ন এবং ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি ও আয়ুর বিব্রতকর প্রশ্নটির সদুত্তর মিলতে পারে। হিউমাসন এই নক্ষত্রজগৎ দুটি পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হয়ত অতি সম্প্রতি সম্পূর্ণ নূতন প্রশ্নটির সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে, তা থেকেই এ প্রশ্নের সমাধান হবে। এ পথ বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথ। বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম হয় দৈবক্রমে। বহুদিন এটি ছিল অবজ্ঞাত। হয়ত এই বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানই ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি ও আয়ুর প্রশ্নের মীমাংসা করতে সক্ষম হবে। দু'শ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পৌঁছাবে এই বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লা। ব্রহ্মাণ্ডের যে সব সুদূরতম অঞ্চলে ইতিপূর্বে অনুসন্ধান কার্য চালান যায়নি, এই যন্ত্রটির সাহায্যে সে সব অঞ্চলও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা চলবে। ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর প্রত্যন্তভাগ মানুষের হাতের নাগালে আনবার এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য-পাস-করা ওকলাহোমার এক তরুণ।

১৯২৮ সালে তরুণ কার্ল জি. জানস্‌কি বেল টেলিফোন লেবরেটরির নিউ জার্সির হোমডেনাস্থিত গবেষণাকেন্দ্রে টেকনিক্যাল কর্মীর কাজ পেয়েছিলেন। কোম্পানীর নব-প্রতিষ্ঠিত ট্রান্স-আটলাণ্টিক রেডিও টেলিফোন বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থায় অজ্ঞাত সূত্র হতে যে অবিরাম চড় চড় শব্দ উঠত (স্ট্যাটিক) সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয় তাঁর উপর। অনুসন্ধানের কাজটি নিতান্তই বাস্তব প্রয়োজন উদ্ভূত। জ্যান্‌স্‌কি পাঁচ বৎসর ধরে একটি ডাইরেকশানল অ্যানটেনাযুক্ত বেতার গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই চড় চড় শব্দের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে

এলেন যে এই চড় চড় শব্দের উৎস রয়েছে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে কোনও এক স্থানে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই শব্দ আসছে আমাদের এই নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রস্থল হতে। প্রায় ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূর হতে ব্রহ্মাণ্ডপানে এক নূতন গবাক্ষ উন্মুক্ত হবার উপক্রম করল।

সেই ১৯২৫ সালেই একথা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়া হত যে ইলেকট্রন তার অক্ষে লাট্টুর মত ঘোরে। এ থেকে ধরা পড়েছিল যে পরমাণু বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে। বেতারগ্রাহক যন্ত্রে এই বেতার তরঙ্গ ধরা খুবই কঠিন কাজ। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ইলেকট্রনের এই বেতার তরঙ্গ প্রেরণের ব্যাপারটার মাঝে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যোদ্ঘাটনের এক নতুন পথের সন্ধান পেলেন। ব্যাকুল চেষ্টা চলতে লাগল মহাশূন্যের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত হাইড্রোজেন মেঘমালা প্রেরিত বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে ধরবার। সুদূর নক্ষত্রজগতের হাইড্রোজেন মেঘমালা প্রেরিত বেতার তরঙ্গ ঝঙ্কার ধরাই শুধু এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল না, তারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডল হতে আগত বেতার তরঙ্গ ধরবার জন্যও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এখানে পিছিয়ে ছিলেন।

বেতার গ্রাহক যন্ত্রের এই চড় চড় ঘড় ঘড় শব্দের উৎস ধরবার জন্য ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও বৃহত্তর ও সুবেদী বেতার গ্রাহক যন্ত্র পরিকল্পিত ও নির্মিত হল। সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেমন আলোক তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে, বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রও তেমনি বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে। এক ধরনের বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র হল অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকযুক্ত। এই প্রতিফলক অ্যানটেনায় গৃহীত বেতার তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত করে। তখন একটি আবিষ্ট ভোল্টেজ বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র সক্রিয় করে তোলে। ১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় চেশায়ারে জবুডেল ব্যাঙ্কে একটি ২৫০ ফিট প্রতিফলকযুক্ত বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। রাশিয়ানরা ৩৫০ ফিট ব্যাসের প্রতিফলকযুক্ত একটি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটারী আরও আধুনিকতম একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এর সাহায্যে ছয় বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের স্থানও পরীক্ষা করা চলছে। এই পাল্লা পালোমার পর্বতে স্থাপিত মানমন্দিরের দুই ইঞ্চি দূরবীনটির পাল্লার প্রায় তিন গুণ।

বেতার দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রে আমেরিকা তার অনগ্রসরতা ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠছে। ১৯৫১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে হার্ভার্ড কলেজে হ্যারল্ড আই. ইউয়েন এই নক্ষত্রমণ্ডলের বহিপ্রান্তের হাইড্রোজেন মেঘমালা থেকে আগত বেতার তরঙ্গ প্রথম ধরতে পারলেন। এর অল্পকাল পরই হার্ভার্ড কলেজের মানমন্দিরের ২৪ ফিট ব্যাসের প্রতিফলকযুক্ত রেখায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছায়াপথের হাইড্রোজেন মেঘমালা সম্বন্ধে গবেষণার একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে এরা আগাসিজ স্টেশনের জন্য একটি নতুন যন্ত্র সংগ্রহ করেন। এই যন্ত্রটির চাকতির ব্যাস ৬০ ফিট। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের নেভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে ৫০ ফিট ব্যাসের চাকতিযুক্ত একটি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে। একটি ৮৪ ফিট ব্যাসের যন্ত্র আছে মেরীল্যাণ্ডের রিভার সাইডে। এছাড়া এ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন ও নেভাল রিসার্চ অফিসের সাহায্যপুষ্ট গবেষণাগারও রয়েছে। এর একটিতে রয়েছে ৮৫ ফিট ব্যাসযুক্ত রেকাবিসদৃশ ও ঘূর্ণন-সাধ্য বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র, অন্যটিতে ১৪০ ফিট ব্যাসের এমনি আর একটি যন্ত্র। এটি এদেশের বৃহত্তম বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

এই আকর্ষণীয় ও দ্রুত বর্ধমান গবেষণার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে কাজ হয়েছে। ১৯৪৬ সালে সিগনাম, ক্যাসিওপিয়া ও ক্র্যাব নেবুলায় (ছায়াপথে) প্রথম বেতার সংকেত প্রেরণকারী নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫০ সাল নাগাদ কেমব্রিজের নক্ষত্র পর্যবেক্ষকগণ উত্তর গোলার্ধে পঞ্চাশটি বেতার সংকেত প্রেরণকারী নক্ষত্রের সন্ধান পান। অস্ট্রেলিয়ার পর্যবেক্ষকগণ দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ সংখ্যা বেতার সংকেত প্রেরণকারী নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। পাঁচ বছর পর, মহাশূন্যে একটি বেতারসংকেত প্রেরণকারী দু হাজারটি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উৎসগুলির পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ থেকে ব্রহ্মাণ্ড যে বিবর্তনের পথে সৃষ্টি হয়েছে এই মতবাদের সমর্থন মেলে।

এ এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর ক্ষেত্র। মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে আরও নিখুঁত ডিফ্রাকসান গ্রেটিং করার উপযোগী ইলেকট্রনিকস্ নিয়ন্ত্রিত একটি এনগ্রেভিং যন্ত্র সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। এরূপ নিখুঁত ডিফ্রাকসন গ্রেটিং-এর সাহায্যে নির্মিত আরও সুবেদী ও সূক্ষ্মতর চিত্র গ্রহণক্ষম যন্ত্র নির্মিত হলে ব্রহ্মাণ্ডের আরও অনেক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ঘটনা যে ধরা

পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৫৪ সালে নেভাল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস এইচ. টাউনেস্ একটি নতুন বেতার তরঙ্গ বিবর্ধক যন্ত্র নির্মাণ করেন। একে বলা হয় 'মাসের' (MASER—microwave amplification by stimulated emission of radiation—মাইক্রোওয়েভ অ্যামপ্লিফিকেশন বাই ষ্টিমুলেটেড এমিসন অব র‍্যাডিয়েশন)। তিন বছর পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলাস ব্লোয়েম-বার্জেন একটি নতুন ধরনের 'মাসের' উদ্ভাবন করেন। এটি আন্তঃনাক্ষত্রিক ক্ষেত্রের হাইড্রোজেন থেকে উৎসারিত একুশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ ও প্রেরণের উপযোগী। কৃত্রিম রুবি ক্রিস্ট্যালের দ্বারা এটি নির্মিত। এর দ্বারা বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লা দশ গুণ বেড়ে যাবে। মহাশূন্যের বহিঃপ্রান্ত থেকে এখন যত শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ ধরা সম্ভব, এই যন্ত্র সাহায্যে তার $\frac{১}{১০০০}$ ভাগ শক্তিশালী তরঙ্গও ধরা সম্ভব হবে এবং যন্ত্রটি 'আমাদের মহাশূন্যে প্রান্তের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।'

আমেরিকার বিজ্ঞানীদের দ্বারা উত্তপ্ত ও আলোড়িত সৃষ্টিতত্ত্বের ভাণ্ড থেকেই হয়ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিব্রতকর একাধিক মৌলিক প্রশ্নের জবাব মিলবে।

॥ ১৮ ॥

আর্নেস্ট অর্লাণ্ডো লরেন্স

(১৯০১-১৯৫৮)

বিজ্ঞানের দিন বদলের পালা

পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার বিরাট কাজে হাত দেবার জন্য বিজ্ঞানকে বিশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। বস্তু ও বিকিরণের রহস্যোদ্ধারের জন্যই এই পরমাণু ভাঙ্গার কাজে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই অভিনব কাজে হাত দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার উন্নতি ও নতুন কলাকৌশল। এইসব অত্যাবশ্যক উপকরণের অভাবেই পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার কাজে দেরী হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দ্বারাই পরমাণু কেন্দ্র বিদারণের মত বিজ্ঞানের একটি মৌলিক কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব। মানব ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায় রচনার পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় একজন বিজ্ঞানী বলেছিলেন, 'যতই অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান হোন না কেন, যে যুগে বিজ্ঞানীরা বাইরের জগতের কোনও আধিভৌতিক সাহায্য না নিয়ে একক প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব করে তুলতে পারতেন সে যুগ গত হয়েছে। চিলে-কোঠায় কয়েকটি টেস্ট টিউব, কয়েকটুকরো তার ও টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে গবেষণার বদলে, পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার কাজের জন্য গবেষণার কাজে প্রয়োজন হয়েছিল রীতিমত এঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য নিয়ে বড় বড় যন্ত্রপাতি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করবার।' এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। এই অর্থ জুগিয়েছিল গবেষণায় উৎসাহদানকারী নতুন সংস্থা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি। পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার এই পরম রোমাঞ্চকর কাজটির সূত্রপাত ইউরোপে হলেও, আমেরিকার পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানীরা এ কাজে যোগ দিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরাই এক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

১৮৯৭ সালে পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময়কর একটি আবিষ্কার পণ্ডিত-সমাজে মহা-আলোড়ন সৃষ্টি করল। বস্তুর ক্ষুদ্রতম রূপও অবিভাজ্য—বিজ্ঞানীদের বহু দিন পোষিত এই ধারণার বুদ্‌বুদ্ ফুটো করে দিলেন জোসেফ জন টমসন। ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরীর পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের তখন যে সব প্রতিভাবান ছাত্র জড়ো হয়েছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অধ্যাপক। সেই বছরের ৩০শে এপ্রিল টমসন ঘোষণা করলেন, ক্যাথোড রশ্মি নেগেটিভ বিদ্যুৎ কণিকা বা ইলেকট্রন, এগুলি পরমাণুরই অংশ। অবিভাজ্য পরমাণুর অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করলেন। পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কণিকা রয়েছে। এই কণিকা হল ইলেকট্রন। বিজ্ঞানকে আর একটি পরম পবিত্র ধারণা জলাঞ্জলি দিতে হল

টমসন হিসাব করে দেখলেন যে ইলেকট্রনের ওজন, রাসায়নিক মৌলগুলির মধ্যে সবচেয়ে হালকা যে হাইড্রোজেন, তার পরমাণুর ওজনের ১/১৮০০ ভাগ। এ সম্বন্ধে টমসন যে পরীক্ষা করেছিলেন, বিজ্ঞানীরা তাতে খুব খুশী হন নি। টমসন নিজেও খুশী হন নি। তিনি চার্লস টমসন রিজ উইলসন নামে তাঁর একজন গবেষক ছাত্রকে ডেকে বলেছিলেন, 'এই ধরা দিয়েও ধরা না দেওয়া, ছলনাময়ী ইলেকট্রনের ফটো চিত্র তুলতে পার?' ছয় বছর ধরে উইলসন চেষ্টা করতে লাগলেন একটি উন্নত ধরনের শক্তিশালী ক্যামেরা তৈরি করতে যার সাহায্যে একক একটি ইলেকট্রনের চিত্র ফটোপ্লেটে ধরা পড়বে। ১৯১১ সালে তিনি প্রথম ইলেকট্রনের স্থূল আলোক চিত্র গ্রহণে সমর্থ হলেন। পরমাণু থেকে নির্গত হবার পর জট পাকান সুতার মত নক্‌সা কাটা একটি ইলেকট্রনের গমন পথ ফুটে উঠল আলোক চিত্রে। মেঘ কক্ষে এই গমনপথগুলি ইলেকট্রনের অস্তিত্বের তর্কাতীত প্রমাণ।

ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য উইলসন যে মেঘ কক্ষ নামক যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন, পরে এর নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই যন্ত্রটিই বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয়ে একেবারে অপরিহার্য না হলেও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পরমাণু জগতের এ পর্যন্ত যে সব অভিনব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এই যন্ত্রটির সাহায্য ব্যতীত তার কোনটিই সম্ভব হত না। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, জীব বিজ্ঞানের যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের

অন্তর্গত এই মেঘ কক্ষটি। উইলসন এই মেঘ কক্ষটি আবিষ্কার করার ষোল বৎসর পর তাঁকে এর জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

টমসন ইলেকট্রনের ভরের যে হিসাব দিয়েছিলেন, তা নিতান্তই আনুমানিক। চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীন হিসাব বার করলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে রবার্ট এণ্ড্রুজ মিলিকান। রবার্ট যে বিজ্ঞানী হবেন, তাঁর বাপ-মা কোন কালে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। এ বিষয়ে যদি তার কোনও পারদর্শিতা বা ঝোঁক থেকেও থাকে, তা হলেও বাইশ বছর বয়সের আগে মিলিকান তা টের পান নি। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সঙ্কল্প করলেন পদার্থবিদ হবার উপযোগী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করবেন। মাইকেল পুপিনের নিকট বিজ্ঞানের পাঠ নিলেন। পুপিন তাকে গোটিন-জেনে ওয়ালটার নার্নস্টের অধীনে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য টাকা ধার দিলেন। এখান থেকে সহসা মাইকেলসন তাঁকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে সহকারীর পদ প্রদান করে ডেকে নিয়ে এলেন।

মাইকেলসন মিলিকানের উপর ভার দিলেন ইলেকট্রনের ওজন নিরূপণ করার। তিনি বুদ্ধি কৌশলে এক অদ্ভুত পদ্ধতি (তৈলকণা পদ্ধতি) উদ্ভাবন করলেন। এর দ্বারা তিনি যে বৈদ্যুতিক তৌল ব্যবস্থা সৃজন করলেন তা যন্ত্র নির্মিত তৌল যন্ত্র অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বেশী সুবেদী। ইলেকট্রন পৃথক করে, স্বতন্ত্র ভাবে একটি ইলেকট্রনের তড়িৎ পরিমাণ নিরূপণ করলেন তিনি। তা থেকে দেখতে পেলেন যে একটি ইলেকট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেন কণিকার ১/১৮৩৫ ভাগ। পদার্থ বিজ্ঞানের এই অতুলনীয় কীর্তির জন্য ১৯২৩ সালে মিলিকানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইলেকট্রনের রূপ ও ধর্মের সঠিক পরিচয় পাবার ফলে, কতকগুলি দুর্বোধ্য প্রশ্ন ও অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলা সম্ভব হল। ইলেকট্রনের সাহায্যেই ১৮৮৩ সালে টমাস এ. এডিসন আবিষ্কৃত একটি বৈচিত্র্য ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব হল। এডিসন লক্ষ্য করেছিলেন বায়ুশূন্য কাচের গোলকের মধ্যস্থ কার্বন সূত্রে ব্যাটারি হতে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালন করে, সেটি যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে গোলকের অভ্যন্তরে শীতল একটি ধাতুপট্টেও তড়িৎ প্রবাহ দেখা দেয়। ব্যাটারির পজিটিভ পট্টের সঙ্গে, শীতল ধাতুপট্টটি তার দ্বারা সংযুক্ত করলেই শুধু এমনি তড়িৎ প্রবাহ দেখা দেয়। ব্যাটারির নেগেটিভ পট্টের সঙ্গে গোলক অভ্যন্তরের ঐ ধাতু পট্টটি যুক্ত করলে কিন্তু

এমনি তড়িৎ প্রবাহ দেখা দেয় না। বায়ুশূন্য গোলকের মধ্যে কি ভাবে কার্বন সূত্র থেকে শীতল ধাতু পট্টে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে, এবং কেনই বা এর জন্য ব্যাটারির পজিটিভ পট্টের সঙ্গে শীতল ধাতু পট্টটির সংযোগ সাধনের প্রয়োজন হয়? ইলেকট্রন আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এর কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় নি। বিখ্যাত ইংরাজ বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ও এডিসনের বন্ধু জন এ. ফ্লেমিং শীতল ধাতু পাতটিতে তড়িৎ প্রবাহিত হবার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। উত্তপ্ত কার্বন তুন্ত থেকে যে নেগেটিভ ইলেকট্রনের স্রোত নির্গত হয় তাই বায়ুশূন্য গোলকে স্থাপিত পজিটিভ আহিত শীতল ধাতু পট্টের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে, ধাতুপত্রে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। তড়িৎ প্রবাহে প্রদীপ্ত কার্বন পরমাণুই ইলেকট্রন নির্গত করে।

ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হবার পর জে. জে. টমসন বিচার করে দেখলেন যে ইলেকট্রন যদি তড়িৎ সাম্যাবস্থায় স্থিত পরমাণুর নেগেটিভ তড়িৎ কণিকা হয়ে থাকে, তা হলে এর প্রভাব নষ্ট করবার জন্য এই তড়িৎ সাম্যাবস্থাযুক্ত পরমাণুতে নিশ্চয়ই রয়েছে পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত আর এক অংশ। কিন্তু পরমাণুতে পজিটিভ তড়িৎ কণার অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যায়? এই পজিটিভ তড়িৎ কণিকা আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। ইনি টমসনের একজন ছাত্র। নিউজীল্যাণ্ড থেকে কেমব্রিজে পড়তে এসেছিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, যদি তাঁকে পরমাণুর অভ্যন্তর দেশের প্রকৃতি নিরূপণ করতে হয়, তাহলে তাঁর প্রয়োজন হবে এমনি একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাস বা ছট্‌রা যা এই পরমাণু কেন্দ্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। ১৯০২ সালে তিনি এমনি একটি ছট্‌রা আবিষ্কার করলেন। জিনিসটি আলফা কণা। রেডিয়াম থেকে এই আলফা কণিকা নির্গত হয়। পাতলা কাচের নলে তিনি রেডিয়াম নির্গত এই আলফা রশ্মি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আলফা রশ্মি যে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু তাও তিনি নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। এই আলফা রশ্মি স্বতোবৃত্ত ভাবে সেকেণ্ডে ১২,০০০ মাইল বেগে নির্গত হয়ে থাকে। ইলেকট্রন অপেক্ষা আলফা কণার ভর প্রায় ৮০০০ গুণ বেশী। একটি আলফা কণিকায় রয়েছে ৭,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি। তখনকার দিনে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি-সম্পন্ন আর কোনও বস্তু কণিকার কথা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না।

বহু বছর ধরে রাদারফোর্ড তাঁর তরুণ সহকারী হানস গাইগার ও জেমস চীডউইকের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম সোনার পাতের উপর এই ছুট্‌রাগুলি বর্ষণ করতে লাগলেন। কতকগুলি আলফা কণিকা সোনার পাত ভেদ করে যায়, কতকগুলি বিভিন্ন কোণ রচনা করে বেঁকে যায়, কতকগুলি পাতের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। আলফা কণিকার এমনি ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসার ব্যাপার দেখে রাদারফোর্ড যেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনে এমন তাজ্জব আর অবিশ্বাস্য কাণ্ড আর কখনও ঘটে নি। এ যেন একটা পনেরো ইঞ্চি কামানের গোলা পাতলা টিস্যু কাগজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে আঘাত হানার মত ব্যাপারটা।' ১৯১১ সালের মে মাসে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এটি পরে তার বিজ্ঞানী জীবনের অমর কীর্তি বলে গণ্য হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম 'স্ক্যাটারিং অব আলফা অ্যাণ্ড বিটা পার্টিকেলস অ্যাণ্ড দি স্ট্রাকচার অব দি অ্যাটম' (Scattering of Alpha and Beta particles and the structure of the atom)। রাদার-ফোর্ড এই সময় ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি জানালেন, হাজার হাজার আলফা কণিকার প্রথম পথ লক্ষ্য করে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, আলফা কণিকাগুলি কোটি কোটি স্বর্ণপরমাণু সোজা সরল রেখায় ভেদ করে গেছে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক কতকগুলি কণিকা যেন গমনপথ থেকে সহসা বেঁকে গেছে। যেন শক্ত কোন কিছুতে প্রতিহত হয়ে তাদের সম্মুখ গতি ব্যাহত হয়েছে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে অতিশয় কঠিন কোনও কিছু যা এই অতি ক্ষুদ্র পরম আণবীক্ষণিক ছটরার গতিপথ বেঁকিয়ে দিয়েছে। তদুপরি, যে সব পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রে তিনি এই আলফা কণিকা নিক্ষেপ করেছেন, তার প্রতিটি থেকেই পজিটিভ আহিত হাইড্রোজেন পরমাণু নির্গত রয়েছে। রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠনকারী আরও একটি উপাদান আবিষ্কার করলেন। এই পজিটিভ আহিত কণিকাটি ইলেকট্রনের ১৮৩৫ গুণ ভারি। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন প্রোটন। হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে একটি ইলেকট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বাদ দিলে থাকে প্রোটন।

রাদারফোর্ডই প্রথম পরমাণুর কেন্দ্রযুক্ত রূপের কথা বললেন। তিনি পদার্থের পরমাণু গঠনের নতুন চিত্র তুলে ধরলেন। পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি।

এই পরমাণুর আকৃতি সৌর জগতের অনুরূপ। প্রতি পরমাণুতে রয়েছে পজিটিভ তড়িৎ, বা প্রোটন যুক্ত একটি সুবৃহৎ কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়স। এই নিউক্লিয়স থেকে বেশ কিছুটা দূরে সূর্য প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলির মত ঘুরছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রন। নিউক্লিয়স ও ইলেকট্রনগুলির মধ্যে রয়েছে বিপুল দূরত্ব—বিরাট শূন্যস্থান—এত শূন্য যে পরমাণুগুলিকে মনে হয় প্রায় সবটাই ছিদ্রযুক্ত উর্ন জালের মত। সমস্ত জড় পদার্থই ইলেকট্রনও প্রোটনের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নিউক্লিয়সের চতুর্দিকে পরিক্রমাকারী ইলেকট্রনগুলির অবস্থিতি কিন্তু নির্দিষ্ট নয়। এগুলি বিভিন্ন কক্ষে প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম ঘুরছে। এমনি চক্রাবর্তন লক্ষ্য করেই রাদারফোর্ড পরমাণুগুলিকে সৌর জগতেরর ক্ষুদে সংস্করণ বলে বর্ণনা করেছিলেন। নিউক্লিয়সটি হল এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের সূর্য, নিউক্লিয়াস পরিক্রমাকারী ইলেকট্রনগুলি হল গ্রহকুল। নিউক্লিয়াস পজিটিভ তড়িৎ-বিশিষ্ট হলেও ইলেকট্রনের কেন্দ্রাতিগ গতির জন্য নেগেটিভ তড়িৎ বিশিষ্ট ইলেকট্রন এই পরমাণু কেন্দ্রে ভেঙ্গে পড়ে না। এই কেন্দ্রাতিগ গতির জন্যই পৃথিবী ও গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা করার সময় বিশালকায় সূর্যের মহাকর্ষের টানে তার উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে না।

এর পর যে জটিল প্রশ্নটি দেখা দিল, তা হল, "প্রতি পরমাণুতে ক'টি প্রোটন আছে?" রাদারফোর্ড দুঃসাহস ভরে অনুমান করলেন "প্রতি বড় কণিকার নিউক্লিয়াসের তড়িৎ আধান মৌলটির পরমাণু ভারের সমানুপাতিক হওয়া উচিত।" ১৯১২ সালে তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ও পরীক্ষার ভার দিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ছাত্রদের মধ্যে একজনকে এর নাম হেনরি জি. জে. মোজলে। এক বছরের মধ্যেই মোজলে পারমাণবিক সংখ্যা সূত্র আবিষ্কার করলেন। কোন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বিরানব্বইটি রাসায়নিক মৌলের ওজন অনুযায়ী তালিকায় মৌলটির স্থান নির্দেশ করে। মোজলের সারণীতে প্রথম মৌলটি হল হাইড্রোজেন। এর পারমাণবিক সংখ্যা হল ১। ইউরেনিয়াম হল সর্বশেষ মৌল। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। এই নতুন সারণীটি ডিমিট্রি মেণ্ডেলিফের সারণীটি অপেক্ষা অনেক মৌলিক। ১৮৬৯ সালে মেণ্ডেলিফ বিজ্ঞান জগতকে এই মৌলের পর্যায়সারণী উপহার দেন।

ফ্লাস্কে আবদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে রাদারফোর্ড আলফা কণিকা নিক্ষেপ করে চললেন। হাজার হাজার পরীক্ষা করে কয়েক বছর

কাটল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীতে গবেষক ছাত্রদের পারমাণবিক জগতের সঙ্গে সংগ্রামের দিন শেষ হল। রাতারাতি গবেষক কর্মীরা ছড়িয়ে পড়লেন সরকারী বিভাগগুলিতে, বিভিন্ন কাজে। রাদারফোর্ড সামরিক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছিলেন। কাজের ফাঁকে সময় করে তিনি মাঝে মাঝে বেথাপ্পা সময়ে গবেষণা চালিয়ে যেতেন।

যুদ্ধ শেষ হল। টমসনের স্থানে রাদারফোর্ড ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন এবং ১৯১৯ সালের ১৯শে জুনের তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করলেন। গবেষণার ফলাফল অতি সূক্ষ্ম, ক্ষণস্থায়ী এবং প্রথমে তা লক্ষ্য করাও বেশ কষ্টকর ছিল। কিন্তু পরে উইলসন মেঘকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত ফটো প্লেটো প্লেটের অবদ্রবে তা সন্দেহাতীত ভাবে ধরা পড়ল। আলোক চিত্রে একটি বাঁকা গমন পথই সে কাহিনী জানিয়ে দিল। একটি আলফা কণিকা নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক আঘাত করে ঢুকে গেছে এবং তার ফলে কেন্দ্রক থেকে একটি প্রোটন বের করে এনেছে। তাতে নাইট্রোজেন ভিন্ন একটি মৌল অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম কৃত্রিম উপায়ে এক মৌল থেকে অন্য মৌলে রূপান্তর সাধন সফল হল।

পদার্থের পরমাণুর গঠন সৌরজগতের অনুরূপ পদার্থের গঠন সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের এই মতবাদের উন্নতি সাধনের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ ভাস্বর হয়ে উঠলে তা কেন বিশেষ ধরনের বর্ণালি বা উজ্জ্বল বর্ণরেখা যুক্ত বর্ণালি সৃষ্টি করে তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এই মতবাদ থেকে। ইলেকট্রনের গতির জন্যই যদি এই বর্ণালি দেখা দিয়ে থাকে তা হলে রাদারফোর্ড চিত্রিত পরমাণুর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই বর্ণালি আলোক বিকিরণ করার কথা। কারণ ইলেকট্রনগুলি সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে। তদুপরি পরমাণু কেন্দ্রের টান বিফল করতে ইলেকট্রনগুলির প্রচণ্ড গতিবেগ যদি রক্ষা করা না যায়, তা হলে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের টানে তার উপর গিয়ে ভেঙ্গে পড়বে। বর্ণালি বীক্ষণ যন্ত্রে পরমাণুর যে চিত্ররূপ ধরা পড়েছে, বিজ্ঞানীরা তা প্রাচীন তড়িৎগতি বিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। পদার্থ বিজ্ঞান যেন এ এক অতি বিশ্রী ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এসে দাঁড়াল।

তরুণ দিনেমার বিজ্ঞানী নীলস বোর এই অচলাবস্থা দূর করলেন। ১৯১২ সালের বসন্ত কালে তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে এসেছিলেন রাদারফোর্ডের অধীনে কাজ করতে। পরমাণু যে কেন্দ্রযুক্ত এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। পরের বছর—বোরের বয়স তখন মাত্র আঠাশ বছর—তিনি তিনটি অভিনব গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে এগুলিকে বলা চলে বৈপ্লবিক। তিনি এই প্রবন্ধে অসম সাহসিকতার সঙ্গে তড়িৎগতিবিদ্যার প্রাচীন সূত্র পরিত্যাগ করলেন। বললেন, পরমাণুর এই সূত্র প্রযোজ্য নয়। পরমাণুর অভ্যন্তরের তড়িৎ কণিকার আচরণ ব্যাখ্যায় তিনি একটি নতুন হাতিয়ার, প্ল্যাঙ্কের শক্তি কোয়াণ্টামবাদ প্রয়োগ করলেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে প্ল্যাঙ্ক তাঁর এই কোয়াণ্টামবাদ প্রচার করলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি অন্যতম বৈপ্লবিক মতবাদ। এই মত প্রচার করে প্ল্যাঙ্ক বললেন, শক্তিকণাময়, শক্তি কণিকার সমষ্টি, অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ভাবে এই শক্তি নির্গত হয় না, হয় এক একটি অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গুচ্ছে, এক একটি বাণ্ডিলে। এক একটি বাণ্ডিলের নাম দিয়েছিলেন প্ল্যাঙ্ক 'কোয়াণ্টাম'। কোয়াণ্টামের ভর নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। বোর পরমাণুর কাঠামো চিত্রের যে কল্পনা করলেন তাতে ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকার পথে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে। ক্যাথোড রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি বা এমন কি তাপের মত কোনও বহিঃশক্তির দ্বারা এদের গতিপথের বিশৃঙ্খলা না ঘটলে এরা (ইলেকট্রনগুলি) অবিরাম এমনি বৃত্তপথে ঘুরে চলে। বৃত্তপথের বিশৃঙ্খলা ঘটালে ইলেকট্রনগুলি আপন কক্ষ পরিত্যাগ করে লাফ দিয়ে নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী কক্ষে চলে আসবে। ইলেকট্রনের এই ভাবে লাফ দিয়ে বিভিন্ন কক্ষে যাওয়া থেকে দেখা দেয় বর্ণালির এক একটি বৈশিষ্ট্যসূচক রঙ। বর্ণালির রঙ ব্যাখ্যার এই সূত্র অনুসরণ করে বোর হাইড্রোজেনের জটিল বর্ণালির ব্যাখ্যা করলেন এবং অন্যান্য মৌলের ইলেকট্রনের কক্ষ নিরূপণের চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৯১৬ সালে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হল। এই সময় গিলবার্ট এন. লুইস নামে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী ও গবেষক একটি নূতন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে নতুন চিত্র উপস্থাপিত করলেন। বিশেষ করে বৃত্তপথে গ্রহ-সম আবর্তনকারী প্রোটনগুলির অবস্থিতি সম্বন্ধে

তাঁর চিত্রটি ছিল নতুন ধরনের। তিনি বললেন, 'নিউক্লিয়াসের চার দিকে রয়েছে কল্পিত ত্রিঘাত বিশিষ্ট খোলা বা shell।' সেখানে সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন। তিন বছর পর জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির আরভিং ল্যাংমুইর লুইসের এই মতবাদটি পরিবর্ধিত ও সম্প্রসারিত করে নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনের বিন্যাস সম্পর্কে তার সমকেন্দ্রিক খোলার থিওরি (Concentric Shell Theory) প্রচার করলেন। তিনি পরমাণুর এমন একটি গঠন সৌকর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন, যার সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যাবে। মোসলের পারমাণবিক সংখ্যা-সারণী ভিত্তি করে তিনি তাঁর এই তত্ত্ব নির্ধারণের কাজ শুরু করেন। হিলিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ২) ও নিয়ন (পারমাণবিক সংখ্যা ১০)—এই দুইটি মৌলের পরমাণু সুস্থিত। এরা অন্য পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায় না। এ দুটি মৌলের ইলেকট্রনগুলিকে তাই সুস্থিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরতে হবে, কারণ এরা এই মৌলগুলিকে অন্যান্য মৌলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সংযুক্ত হতে দিতে চায় না। নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রোটনযুক্ত একটি নিউক্লিয়াস ও তৎসংলগ্ন খোলায় রয়েছে দৃঢ় সংবদ্ধ ইলেকট্রন। এই কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলের বাইরে একটি খোলায় চক্রপথে আবর্তিত হচ্ছে দুটি অতিরিক্ত প্রোটন—এই ভাবে হিলিয়াম পরমাণুর গঠন বর্ণনা করলেন ল্যাং মুইর। বিভিন্ন খোলাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বোরের বর্ণিত কক্ষগুলির মধ্যকার দূরত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হল। ল্যাং মুইর বললেন, প্রতি পরমাণুরই বহির্ভাগের সর্বশেষ খোলা ইলেকট্রনে পরিপূর্ণ করার প্রবণতা দেখা যায়। প্রথম খোলায় থাকে দুইটি ইলেকট্রন, দ্বিতীয় খোলায় থাকে আটটি ইলেকট্রন।

ইলেকট্রনগুলির এই সুস্থিত শ্রেণী-গঠনের প্রবণতা থেকেই দেখা দেয় মৌলের রাসায়নিক ক্রিয়া। হাইড্রোজেন খুবই সক্রিয় মৌল। কারণ এর খোলায় মাত্র একটি ইলেকট্রন। এর খোলাটি অসম্পূর্ণ। হিলিয়ামের মত দুইটি ইলেকট্রন যুক্ত সুস্থিত খোলা তৈরির জন্য তার চাই আরও একটি ইলেকট্রন। নিয়নের নিউক্লিয়াসের বাইরে রয়েছে দশটি ইলেকট্রন। তার মধ্যে প্রথম খোলায় দুটি, এবং এরই সঙ্গে সমকেন্দ্রী একটি বৃহত্তর খোলায় আরও আটটি। এই নিয়ন সুস্থিত যে সমস্ত মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ২ থেকে ১০ এর মধ্যে, রাসায়নিক ক্রিয়া কালে অন্য মৌলের সঙ্গে

এদের সংযুক্ত হবার ক্ষমতা নির্ভর করে এদের দ্বিতীয় খোলায় ইলেকট্রনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতার উপর।

ইতিমধ্যে ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণুর গঠন নিয়ে উদ্ভট সব কল্পনার হিড়িক পড়ে গেল। বিশেষজ্ঞ গণিতবিদগণও এক হাত খেলা দেখাতে এগিয়ে এলেন। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীয় ও গাণিতিক বিভিন্ন মতবাদ 'ক্রমান্বয়ে অধিকতর অশোভনতার সঙ্গে একের পর এক দেখা দিতে লাগল।' এমনি নানা নতুন দৃষ্টিকোণ হতে পরীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে পুরাপুরি অনিশ্চয়তা রয়ে গেল। ইতিপূর্বে কিছু সংখ্যক মৌলের কেন্দ্রকের গঠনসৌকর্য জানা গিয়েছিল। রেডিয়মের থোরিয়ম, পোলোনিয়ম, ইউরেনিয়মের মত কতকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরীক্ষা করেই এদের পরমাণুকেন্দ্রের গঠন প্রকৃতি বোঝা গিয়েছিল। এই পদার্থগুলির নিউক্লিয়াস আপনা থেকেই ভেঙ্গে যেত। কিভাবে কোন কৌশলে এই ভাঙ্গন দেখা দিত, তা অবশ্য তখন সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নি। কুরি দম্পতির রেডিয়ম আবিষ্কারের পর ১৯০২ সালে রাদারফোর্ড এবং তাঁর ছাত্র ও সহযোগী ফ্রেড্রিক সডি দেখতে পেলেন যে রেডিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণে তিন ধরনের রশ্মি ও কণিকা নির্গত হয়। এগুলি হল, আলফা বিটা কণিকা ও রশ্মি। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি সম্বন্ধে অন্ততঃ মনে করা হত এদের নিউক্লিয়াসে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন, ও তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম কণিকা। প্রশ্ন উঠল, অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও কি একথা বলা চলে? মার্কিন বিজ্ঞান তখন তত্ত্বের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলিকানের গবেষণাগারের পাশে একটি কক্ষে ১৯১৪-১৫ সালের শীতকালে উইলিয়াম ডি. হারকিনস নতুন শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে পরমাণু নিউক্লিয়াসের কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভের চেষ্টা করছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি নিউক্লিয়াসের সুস্থিতরূপ বৈশিষ্ট্যটি বেছে নিয়েছিলেন। পরীক্ষান্তে তিনি এই মতবাদ প্রচার করলেন যে সব মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম সমন্বয়ে গঠিত। যে সব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা জোড় সংখ্যক সেগুলি বিজোড় পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত পরমাণুসমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্থিত। তাই এগুলি প্রকৃতি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে ভারি মৌলগুলি হাল্কা মৌল থেকে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই

প্রক্রিয়ায় মাঝে ধীরে ধীরে এসে মিশেছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম। রেডিয়ম সম্বন্ধে হারকিনসের এই মতবাদের যথার্থতা স্বীকার করা হত। কারণ রেডিয়ম থেকে ইলেকট্রন কণিকা ও হিলিয়ম নির্গত হয়ে থাকে।

হারকিনসের এই মতবাদ কি অন্য পরমাণুর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য? হারকিনস্ রাদারফোর্ডের ১৯১৯ সালের পরীক্ষা পুনরায় নিজে করে দেখার সঙ্কল্প করলেন। নিজের পরীক্ষা কার্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি উইলসন মেঘ কক্ষের পরিবর্তন সাধন করলেন, তারপর নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাসের মধ্য দিয়ে ছুটন্ত অসংখ্য হিলিয়ম কেন্দ্রকের গমনপথের আলোক চিত্র গ্রহণ করলেন। সেটা ১৯২১ সাল।

আলোক চিত্রগুলির মধ্যে একটি অতি বিচিত্র ধরনের। এতে কেন্দ্রকের গমনপথ রেখা দুবার প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিধা-বিভক্ত সন্নার দুই বাহুর আকারে। সন্নার একটি বাহু, সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত অন্য বাহু অপেক্ষা প্রায় দশগুণ ক্ষীণ। হারকিনস-এর এই আলোক চিত্র থেকে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল যে নাইট্রোজেন কেন্দ্রক থেকে তড়িৎযুক্ত হাইড্রোজেন কণিকা নির্গত হবার যে কথা রাদারফোর্ড বলেছিলেন, তার মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে। হারকিনস্ দেখতে পেলেন পরমাণু জগতে ধ্বংসের সঙ্গে এখানে চলেছে সৃষ্টিরও লীলা। কারণ নাইট্রোজেনের কেন্দ্র থেকে এক্ষেত্রে শুধু হাইড্রোজেন নির্গত হচ্ছে না, সেই সঙ্গে একটি নতুন মৌল অক্সিজেন ও সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে হিলিয়াম কেন্দ্রকের সঙ্গে নাইট্রোজেন কেন্দ্রকের সংযোগ ঘটে। একটি অস্থিত ফ্লরিন পরমাণু গঠিত হয়েছে। এই ফ্লরিন পরমাণুটি আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙে গিয়ে একটি আহিত হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণুতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন ও হিলিয়ম থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে। এমনি ভাবেই তিনি আলোক চিত্রের বিচিত্র গমন পদার্থটির ব্যাখ্যা করলেন।

নিউক্লিয়াসে হিলিয়ম, হাইড্রোজেন কেন্দ্রক ও ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই থাকে না—হারকিনস্ নিউক্লিয়াসের এই যে চিত্র অঙ্কিত করলেন, এতে ছিল স্ববিরোধিতা। এই চিত্র গ্রহণের পক্ষে সব চেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল, নিউক্লিয়াসে কি করে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ কণিকাগুলি পরস্পরকে অবদমিত না করে পাশাপাশি একত্র অবস্থান করতে পারে—এই প্রশ্নটা নিয়ে। অন্যভাবে বলা চলে, ছোট্ট নিউক্লিয়াসে এত কাছাকাছি-

থেকেও কেন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন ও পজিটিভ তড়িৎযুক্ত প্রোটন একত্র সংযুক্ত হয় না? এই বিধি বহির্ভূত বিসদৃশ ব্যাপারটি হারকিনসেরও চোখে পড়েছিল। বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানে দূরকল্পনার আশ্রয় নেওয়া একেবারেই অচল, দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি নিউক্লিয়াসে সম্পূর্ণ নূতন একটি কণিকার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন। নিউক্লিয়াসে এমনি একটি নূতন কণিকার অবস্থিতি আপাত দৃষ্টে তখন অসম্ভব মনে হত। ১৯২০ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি আমেরিকান কেমিকেল সোসায়িটির মুখপত্রে লিখেছিলেন, পরমাণু নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও আলফা কণিকা ছাড়াও রয়েছে 'অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর কণিকা। এদের মোট তড়িতাধান শূন্য।' রাদারফোর্ডও এমনি এক ধরনের কণিকার অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। হারকিনস্ বললেন, এই কণিকাটি খুব নিকট সান্নিধ্যে অবস্থানকারী একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত। খুব কাছাকাছি অবস্থানের ফলে এখানে ইলেকট্রন ও প্রোটিনের তড়িৎ আধান কাটাকুটি হয়ে কণিকাটি নিস্তড়িৎ হয়ে যায়। হারকিনস্ প্রস্তাব করলেন শূন্য পারমাণবিক সংখ্যা যুক্ত এই কণিকাটির নাম দেওয়া হোক নিউট্রন। এই নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎ আধান নেই।

হারকিনস্ যে অজ্ঞাত কণিকাটির অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, ১৯৩২ সালের শীতকালে রাদারফোর্ড গবেষণাগারে বার বৎসর পর সেটি সত্যই আবিষ্কৃত হল। আবিষ্কার করলেন জেমস স্যাডউইক। তিনি বেরিলিয়মে হিলিয়ম তেজস্বণা পাত করে দেখলেন, তা থেকে অমিত শক্তিশালী ভেদন ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বেরিলিয়ম এলুমিনিয়মের চেয়ে হাল্কা একটি ধাতু। বেরিলিয়ম থেকে প্রক্ষিপ্ত এই অজ্ঞাত কোন কিছুর অমিত শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে এবং শক্তির নিত্যতাবাদের মুখ রক্ষা করতে স্যাডউইক বললেন, এই "রশ্মি"গুলি আদপে কোন রশ্মিই নয়। তার বিশ্বাস এগুলি প্রোটন দেহের তুল্য কণিকা, কিন্তু মুল প্রোটনের মত এগুলিতে বিদ্যুৎ আধান নেই। এই কণিকাগুলি (নিউট্রন) তড়িৎহীন বলে পরমাণুর দুর্ভেদ্য দেহের দ্বারা এগুলি প্রতিহত হয় না। তাই এরা প্রলয়ঙ্কর-ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন। আড়াই ইঞ্চির সীসার পাত অর্ধেক সংখ্যক নিউট্রন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না।

নিউট্রনই পরমাণুকেন্দ্র সম্পর্কিত শেষ আবিষ্কার নয়। ইংলণ্ডের রাদারফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জি এন. লুইস ও রেমণ্ড. টি. ব্রীজ

দ্বিগুণ ওজন-সম্পন্ন হাইড্রোজেন পরমাণুর অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে জানিয়েছিলেন। এটি হবে সাধারণ পারমাণবিক ওজনযুক্ত হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। আইসোটোপ একটি মৌলের প্রকার-ভেদ। মৌলের সঙ্গে এদের পারমাণবিক সংখ্যা একটি রূপ। কিন্তু পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন। প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় আইসোটোপ পাওয়া যায় না। এগুলি সর্বদা মৌলের অন্যান্য আইসোটোপের সঙ্গে একত্র মিশ্রিত থাকে।

নিউট্রন আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হবার তিন সপ্তাহ পূর্বে কলাম্বিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক গবেষণাগারে আইসোটোপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। এই আইসোটোপ আবিষ্কার করেছিলেন হ্যারল্ড সি. উরে। জন্ম এর ইণ্ডিয়ানা রাজ্যে। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গবেষণা করেছিলেন বোরের অধীনে। গবেষক জীবনের প্রথম দিকে সাধারণ হাইড্রোজেনের বর্ণালি পরীক্ষা করে উরের ভারি হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব রয়েছে বলে সন্দেহ হয়েছিল। ১৯৩১ সালে শরৎকালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডের এফ. জি. ব্রিকওয়েড রেল হাইড্রোজেন বাষ্পীভূত করে, তার তলানির কয়েক ফোটা কাচের নলে সীল করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন কলাম্বিয়ায় উরের কাছে। উরে নলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ ক্ষরণ পাঠালেন, পরীক্ষা করলেন তার বর্ণালির রেখা, তারপর ঘোষণা করলেন ভারি হাইড্রোজেন আইসোটোপ আবিষ্কারের কথা। 'দুই'—এই অর্থ-দ্যোতক গ্রীক শব্দ অনুযায়ী এই আইসোটোপটির নাম দিলেন, ডয়টোরিয়ম (ডি)। সাধারণ হাইড্রোজেনে প্রতি পাঁচ থেকে ছয় হাজার ভাগের এক ভাগ থাকে এই ডয়টোরিয়ম।

আইসোটোপ আবিষ্কার এই নূতন শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার-রূপে অভিনন্দিত হ'ল, উন্মুক্ত করে দিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক সম্পূর্ণ নূতন জগতের সিংহদ্বার। মানুষের দেহের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই জল, এ কথা স্মরণ করলে শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে দেহে সাধারণ জলের বিকল্পরূপে ভারি জলের গুরুত্বের বিষয় বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। তিন প্রকার হাইড্রোজেন আইসোটাপ ও তিনপ্রকার অক্সিজেন আইসোটাপের সাহায্যে আঠারোটি বিভিন্ন প্রকারের জল তৈরি করা যায়। এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ধর্মী। হাইড্রোজেন আইসোটোপ আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু বিজ্ঞানী প্রায় সীমাহীন নতুন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন, কারণ একমাত্র ৩০০,০০০ জৈব যৌগিক

পদার্থে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব রয়েছে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, আইসোটোপ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, শারীরবৃত্ত ও ভেষজ বিজ্ঞানের গবেষকগণ প্রাণীদেহে খাদ্য, ঔষধপত্র প্রভৃতির পরমাণুর চলাচল পথ ও প্রক্রিয়া নিরূপণের কাজে এটি ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। কয়েক শ্রেণীর চর্বিতে সাধারণ হাইড্রোজেনের বদলে ভারি হাইড্রোজেন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর এই 'মার্কা দেওয়া' চর্বি-অণু প্রাণী দেহে যে যে পথ অতিক্রম করে ও যেসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গমন করে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। আইসোটোপের এই নতুন হাতিয়ারের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে আমাদের পক্ষে মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু বাস্তব সমস্যা সমাধানের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্ত্বও যে মানুষের বাস্তব সমস্যা সমাধানে কি বিপুল ভাবে সাহায্য করতে পারে এ তার আর একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। আইসোটোপ আবিষ্কার করার জন্য ১৯৩৪ সালে উরে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দুই মাসের কম ব্যবধানের মাঝে দুটি নতুন কণিকা আবিষ্কৃত হল, এরা যেন দুটি আনকোরা নতুন ছট্‌রা। সেই সঙ্গে তৈরি হল, পুনরায় পারমাণবিক জগতে হানা দেবার জন্য সেই ছট্‌রা ছোড়ার যন্ত্রও। পরমাণু কেন্দ্র বিদীর্ণ করার কাজে নবাবিষ্কৃত নিউট্রন দেখা দিল এক আদর্শ ছট্‌রারূপে। কারণ অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়তনের তুলনায় এর বস্তুভার এত বিপুল যে হারকিনসের মতে মহিলাদের ছোট একটি অঙ্গুষ্ঠানার মধ্যে যত পরিমাণ নিউট্রন ধরে, তার ওজন হবে দশ লক্ষ টন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজন তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম পরমাণু নির্গত শক্তিশালী আল্‌ফা কণিকার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী ও দ্রুতগামী কণিকা।

নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার পর পরমাণুর এক নতুন রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। হাইড্রোজেন (পারমাণবিক ওজন ১) ব্যতীত সমুদয় পদার্থের পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামে তিনটি মৌল কণিকা। কোন পদার্থের পরমাণু ভার ও পরমাণু সংখ্যা বিয়োগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় পদার্থটির নিউট্রন সংখ্যাও তাই। কোন পদার্থের পরমাণু সংখ্যা আর তার নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা এক। নাইট্রোগ্লিসারিনের বিস্ফোরণকালীন সুতীব্র রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়ও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। রাসায়নিক পরিবর্তনে শুধু নিউক্লিয়সের বাইরের ইলেকট্রনগুলিই অংশ গ্রহণ

করে। এইটাই স্বাভাবিক। কারণ নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যার হেরফের ঘটলে মৌলটি পৃথক আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হবে। সাধারণতঃ অবশ্য এমন ঘটে না।

কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য একটি পদার্থকে আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। এই রূপান্তর প্রকৃতির রাজ্যে স্বতস্ফূর্ত ভাবে ঘটে থাকে। ১৮৯৮ সালের শেষের দিকে কুরি দম্পতি রেডিয়ম আবিষ্কার করায় এই ঘটনার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই এক অভাবনীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হলেন। এখানে দেখা গেল, একটি বিশুদ্ধ ও সাধারণ মৌল তেজরশ্মি ও কণিকা নিক্ষেপ করছে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে নিজে থেকে শেষ পর্যন্ত একটি হালকা মৌল সীসায় পরিণত হচ্ছে। রেডিয়ম পরমাণুর নিউক্লিয়াসটি অতিশয় অস্থিত বা বিক্ষুব্ধ। তাই অতি সহজেই এটি ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে যাবার সময় এই নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন ও হিলিয়ম কণিকা নির্গত হতে থাকে। রাসায়নিক পরিবর্তনের চেয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এই পরিবর্তন ঢের বেশী গুরুতর ও গভীর। একে বলা হয় পরমাণুকেন্দ্রিক পরিবর্তন। রেডিয়মের থেকে সীসায় যেতে কয়েকটি ধাপে এই পরিবর্তন ঘটে।

মৌল সমূহের পর্যায় সারণীতে রেডিয়ম ৮৮তম স্থানে অবস্থিত। অতএব এর পারমাণু সংখ্যা হল ৮৮ এবং এর নিউক্লিয়সেও রয়েছে ৮৮টি প্রোটন। রেডিয়মের পারমাণু-ভার নির্ধারিত হয়েছিল ২২৬। এই পরমাণু-ভার হল নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার সমষ্টি, অতএব রেডিয়মে রয়েছে ২২৬ বিযুক্ত ৮৮ (২২৬ – ৮৮ = ১৩৮) অর্থাৎ ১৩৮টি নিউট্রন। এখন ব্যাপার হল এই, রেডিয়মের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ছোট জগতে একত্রে বহু কণিকার ভীড়। কেন্দ্রকটি তাই খুবই অস্থিত। এই ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলির ঘর সংসার ছেড়ে একটি কণিকা তাই এক সময় হিলিয়াম কণিকার (পারমাণবিক ভার ৪) ছদ্ম বশে বেরিয়ে আসে। একটি কণিকার এমনি গৃহত্যাগের ফলে রেডিয়ম পরমাণু রেডন নামে আর একটি পৃথক মৌলে পরিণত হল। এর পারমাণু-ভার ২২২, পরমাণু সংখ্যা ৮৬।

নিউক্লিয়াসের কণিকাগুলির এই ঘরোয়া বাদ-বিসম্বাদ যেন অন্তহীন। এমনি আরও একটানা আত্মকলহের শেষে আরও কতকগুলি কণিকা নিউক্লিয়াস থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। এবার মৌলটি রূপান্তরিত হল পোলোনিয়মে। এর পরমাণুসংখ্যা ৮৪, পরমাণু-ভার ২১০। পোলোনিয়মের

কেন্দ্রক অতি দুর্বল প্রকৃতির ও সংক্ষুব্ধ। অনতিবিলম্বে এ থেকে সবেগে একটি হিলিয়ম কণিকা বাইরে বেরিয়ে যায় এবং পোলোনিয়মও পৃথক একটি মৌল, সীসকে পরিণত হয়। এই সীসকের পরমাণু সংখ্যা ৮২, পরমাণু-ভার ২০৬।

রেডিয়মের সীসকে রূপান্তরিত হওয়া স্বতস্ফূর্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তন। আমরা এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, বা এর গতি শ্লথতর ও দ্রুততর করতে পারি না। কোনও এক খণ্ড রেডিয়মের অর্ধাংশ ১৬২০ বছরে ভেঙে সীসায় পরিণত হবে। এই সময়কে বলা হয় রেডিয়মের অর্ধায়ু। পরবর্তী ১৬২০ বছরে অবশিষ্ট রেডিয়মের অর্ধাংশ (বা মূলের এক চতুর্থাংশ) অবশিষ্ট থাকবে। এমনি ভাবে চলতে থাকবে রেডিয়মের ক্ষয়।

যখন দেখা গেল যে রেডিয়মের ক্ষয় অস্থিত নিউক্লিয়াসের গঠনের পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই না, তখন বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন, এই প্রক্রিয়া কৃত্রিম উপায়ে সুস্থিত পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ঘটানো সম্ভব কি না? পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রবল ভাবে আন্দোলিত করে বা নাড়িয়ে দিয়ে, যদি তার একাংশ উৎক্ষিপ্ত করা যায় কিংবা সেখানে এক বা একাধিক প্রোটন ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে কৃত্রিম উপায়ে মৌলের রূপান্তর সাধন সম্ভব হবে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে কি করে কোনও ছর্‌রা পাঠানো চলে তা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রথমতঃ নিউক্লিয়াস এত অভাবনীয় ক্ষুদ্র যে এখানে পাঠানোর জন্য চাই এর চেয়েও ক্ষুদ্রতর ছর্‌রা। দ্বিতীয়তঃ, এই ছর্‌রাটিকে ছুড়তে হবে প্রলয়ঙ্কর গতিতে। যতে সেটি পজিটিভ অস্থিত নিউক্লিয়াসের তড়িতীয় রক্ষা-ব্যূহ ভেদ করতে পারে।

১৯১৯ সালে আলফাকনিকার সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অমর কীর্তি রচনা করেছিলেন রাদারফোর্ড। কিন্তু তবু এতে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ খুশী হতে পারেননি। অবিশ্বাসীরা নাক সিঁটকে ছিলেন। হাজার হোক রাদারফোর্ড এক তেজস্ক্রিয় মৌল (রেডিয়ম) ব্যবহার করেছেন, তাঁর এই কৃত্রিম রূপান্তর সাধনের কাজে। এই রেডিয়ম আপন স্বভাবের নিয়মে স্বতোবিশ্লিষ্ট হয়ে, হিলিয়ম ছর্‌রা নিক্ষেপ করছিল। পরমাণু কেন্দ্রে ছর্‌রা নিক্ষেপের কাজে প্রকৃতির সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রাদারফোর্ড। ধরা যাক যদি নিক্ষেপের কাজে এমন একটি স্বতোবিশ্লেষণশীল মৌল না পাওয়া যেত? ধরা যাক আমাদের হাতে রেডিয়ম নেই। তখন কি হত? এরা যা বলতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা কোনও সন্দেহ

রাখলেন না। এরা চাইছিলেন যোল আনা মানুষের নিজের শক্তিতে সাধ্য কৃত্রিম রূপান্তর। সত্যিকারের কৃত্রিম মৌল সৃষ্টির স্বীকৃতি লাভ করতে হলে বিজ্ঞানীদের স্বভাবজ আলফারশ্মি বিকীর্ণকারী রেডিয়ম জাতীয় মৌলের সাহায্য নেওয়া চলবে না। মনুষ্য-সৃষ্ট ছট্‌রা প্রয়োগ করে পরমাণু কেন্দ্রের রূপান্তর সাধন করতে হবে।

এ প্রায় এক অসম্ভব দাবী। এর অর্থ হল, বিজ্ঞানীদের এক যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র ছট্‌রা নির্মাণ করতে হবে, তাতে অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চার করতে হবে। আর এ কাজের জন্য আবিষ্কার করতে হবে এমন এক যন্ত্র যা ইলেকট্রন্ প্রোটন্ বা হিলিয়াম পরমাণুতে সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইলের কাছাকাছি গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবে। অতি আশ্চর্যের বিষয়, বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত এমনি এক যন্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে সব গবেষক পরমাণু কেন্দ্র বিদারণের সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁরা এমনি এক যন্ত্র আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির মধ্যে এমনি প্রচণ্ড শক্তিশালী পরমাণু-বিদারণ যন্ত্র নির্মাণের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ ও সোৎসাহ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এমন অমিতশক্তিধর পরমাণু বিদারক কামান নির্মাণ করতে হবে, যা বজ্রসম দুর্দান্ত বিস্ময়কর শক্তিতে আঘাত হেনে পরমাণুকেন্দ্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে। সেই চূর্ণিত অংশ তুলে নিয়ে চালান যাবে পরীক্ষার কাজ।

এই পরমাণুভঙ্গকারী যন্ত্র নির্মাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আর্নেস্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্স। ১৯০১ সালের ৮ই আগস্ট দক্ষিণ ড্যাকোটার ক্যাণ্টন নামে ছোট্ট শহরটিতে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলায় তাঁকে পাবলিক স্কুলে পড়তে পাঠান হয়েছিল। পরে পড়তে যান সেণ্ট ওলাফ কলেজে ও দক্ষিণ ড্যাকোটার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেতার বার্তা প্রেরণের সখের পরীক্ষা চালান থেকে বিজ্ঞানের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকালের জন্য মনে হয়েছিল, ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করার দিকেই বুঝি তাঁর বাসনা প্রবল। শেষে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের পরমাণু ও বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণার কাজেই জীবন উৎসর্গ করলেন।

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল স্নাতকোত্তর গবেষণা করেন। এ সময় তিনি অধ্যাপক ডব্লিউ এফ. জি. সোয়ানের প্রভাবাধীনে আসেন। সোয়ান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করলে তিনি তাঁর

সঙ্গে ইয়েলে যান, এবং সেখানে তাঁর অধীনে কিছু গবেষণার কাজ করেন। তারপর সেখান থেকে ১৯২৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ করেন এবং ন্যাশনাল রিসার্চ ফেলো রূপে সেখানে কাজ করতে থাকেন। পরে এখানে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে সোয়ান যখন ফিলাডেলফিয়ার বারটল রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন, তখন লরেন্সও অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে এলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২৯ সালের বসন্ত কালে, একদিন সন্ধ্যায় দৈবক্রমে লরেন্সের হাতে আসে পদার্থবিদ্ রেলেফ ওয়াইডারো কর্তৃক সদ্য লিখিত একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে প্রবন্ধের সঙ্গের একটি যন্ত্রের রেখাচিত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। প্রবন্ধ শেষ করা আর হয় না। এই যন্ত্র সাহায্যে ওআইডারো বায়ুশূন্য নলে তড়িৎযুক্ত পটাশিয়াম পরমাণুতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্ত ভোল্টেজ অপেক্ষা দ্বিগুণ তড়িৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যথা সময়ে যদি ছট্‌রায় পুনঃ পুনঃ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা যায়, তা হলে অল্প ভোল্টেজ প্রয়োগ করেই ছট্‌রায় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করা সম্ভব। ধারণাটি কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন কিছু নয়। ছট্‌রারূপে ব্যবহারের পারমাণবিক কণিকার এই ভাবে পুনঃ পুনঃ ত্বরণ বৃদ্ধির ব্যাপারটা অনেকটা 'বাচ্চাদের দোলনায় দোল দেবার মত। প্রতিবার ধাক্কায় যদি দোলনাটি খুব দূরে না যায়ও; তা হলেও শুধু মৃদু ধাক্কাগুলি ঠিক মত সমলয়িত করেই দোলনাটিকে অতিশয় দ্রুত গতিতে দোলান যায়।'

অধ্যাপক সোয়ানের মতে, 'লরেন্সের মস্তিষ্ক ছিল অসাধারণ উর্বর, মনন শক্তিও ছিল অলোকসামান্য।' ওআইডরোর প্রবন্ধের চিত্র থেকে প্রাপ্ত ধারণা তাঁর মাথায় ঢুকে, উর্বর জমিতে পুষ্ট হতে লাগল। পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন বা সবিরাম অতি-শক্তিশালী তড়িৎ ভোল্টেজের প্রয়োজন হয় কি করে তা এড়ান যায় তারই উপায় অনুসন্ধান করছিলেন লরেন্স। এমন একটা প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করতে চাইছিলেন, যাতে অতি উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ ও বায়ুশূন্য নল ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। অথচ নিক্ষিপ্ত ছটরায় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করা যাবে। প্রবন্ধের চিত্রটি দেখে তিনি ভাবলেন, অতি মূল্যবান সূত্র পেয়ে গেছেন। রেখাচিত্রটি দেখবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন যন্ত্রের খসড়া আঁকতে ও গাণিতিক সূত্রসমূহ

লিখতে বসে গেলেন। যন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। পরের দিন তিনি তাঁর এক জন বন্ধুকে বললেন, তাঁর মাথায় এক নতুন আইডিয়া এসেছে। শীঘ্রই তিনি বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্র উদ্ভাবন করবেন।

লরেন্স স্থির করলেন পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হানবার কার্যে ব্যবহৃত তড়িৎ কণিকাটিকে তিনি শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকের সাহায্যে বেঁকিয়ে বৃত্তাকার পথে ঘোরাবেন। ঢাকনা দেওয়া ভাজার পাত্রের আকারের সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য একটি ট্যাঙ্কের মাঝে কণিকাটি যখন বৃত্তাকারে অর্ধেক পথ অতিক্রম করবে, বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় তখন তিনি তাকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দেবেন। কণিকাটি তাতে ক্রমশঃ দীর্ঘতর বৃত্তপথে এবং আরও দ্রুততর গতিতে ছুটতে থাকবে, শেষে আনবে বায়ুশূন্য নলের প্রান্তে। এখানে ছোট্ট একটি ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে কণিকাটি একটি সংগ্রাহক কক্ষে নিক্ষিপ্ত হবে। তিনি এমন ভাবে তড়িৎ ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করবেন, যাতে ঠিক যে সময় মূল পরিবর্তী প্রবাহ দিক পরিবর্তন করছে, সেই সময় কণিকাটি ফিরে এসে পুনরায় আর একটি ধাক্কা খাবার জন্য প্রস্তুত হবে। পথিমধ্যে কণিকাটির গতিবেগ বৃদ্ধি করা হবে উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত তড়িৎ আন্দোলিত করে। লরেন্স আশা করলেন, এইভাবে একশ হাজার ভোল্টের তড়িৎ শক্তি এক হাজার বার প্রয়োগ করে তিনি যুগপৎ এক মিলিয়ন ভোল্ট প্রয়োগের সমান ফল পাবেন।

খুবই দুঃসাহসী পরিকল্পনা। কিন্তু এ কি সফল হবে? ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাস নাগাদ লরেন্স তাঁর চুম্বক অনুনাদ ত্বরণ যন্ত্র (magnetic resonance accelerator) নির্মাণ করেন। পরে এটি সাবক্লোট্রোন যন্ত্র নামে খ্যাতি লাভ করে। এই যন্ত্রে একটি তড়িৎ চুম্বকের দুই মেরুর মাঝে স্থাপিত ছিল চার ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত একটি বায়ুশূন্য কক্ষ। এই কক্ষে সংস্থাপিত ইংরাজী ডি (D)-এর আকৃতির দুটি অন্তরিত তড়িতদ্বার। এই তড়িৎদ্বার দুটি অতিশয় শক্তিশালী পরিবর্ত তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। কক্ষের কেন্দ্রে বসান হয়েছিল একটি টাংস্টেন সূত্র। যন্ত্রের অন্যান্য অংশ কাচ ও লাল গালায় তৈরি। এন. ই. এডেলেফসেন নামে তাঁর প্রথম স্নাতকোত্তর ছাত্র সহকারীর সাহায্যে তিনি সত্যই অনুনাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ কণিকায় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হলেন। তাঁর পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হল। সেই

বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বার্কেলীতে ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভায় সর্বসমক্ষে তিনি তাঁর যন্ত্র ও পদ্ধতির কথা ঘোষণা করলেন।

প্রথম দিকে লরেন্সের সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি প্রধানতঃ পরমাণুর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হত। প্রথম কাচের সাইক্লোট্রোন যন্ত্রটি নির্মিত হবার পর লরেন্স এম. স্ট্যানলি লিভিংস্টোনের সাহায্যে অনুরূপ আকারের আর একটি ধাতুনির্মিত সাইক্লোট্রোন যন্ত্র নির্মাণ করলেন। স্ট্যানলি লিভিংস্টোন লরেন্সের প্রতিভাবান ছাত্রদের অন্যতম। এই যন্ত্রে তাঁরা ২০০০ ভোল্টের সাহায্যে ৮০,০০০ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন আয়নিত হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে সক্ষম হলেন। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ লরেন্স এই যন্ত্রের যে মডেল নির্মাণ করলেন, তার দাম পড়ল ১০০০ ডলার। এগারো ইঞ্চির এই নাগরদোলা যন্ত্রটি হাইড্রোজেন গ্যাস আয়নিত করে পাওয়া প্রোটন কণিকাকে ১,২০০,০০০ ভোল্ট শক্তি গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারত। যন্ত্রের শক্তি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন তিনি।

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি এই ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্যে লিথিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হেনে সেটির পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করলেন। পশ্চিম গোলার্ধে এই প্রথম কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর রূপান্তর সাধন করা হল। ইউরোপে এর কয়েক সপ্তাহ আগেই দুজন বিজ্ঞানী একাজ করে বসেছিলেন। এরা রাদারফোর্ডের দুজন তরুণ সহকর্মী, ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীর জন ডি. ক্রকক্রফ্ট ও ই. টি. এস. ওয়ালটন। ১৯৩২ সালের ২৮শে এপ্রিল সেকেণ্ডে ৭০০০ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন প্রোটন কণিকা ব্যবহার করে, এরা লিথিয়ামকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাইভোল্টেজ ট্রান্সফরমার রেক্টিফায়ার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা প্রোটনে এই অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন। ইতিহাসে এই প্রথম স্বভাজ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত রাসায়নিক মৌলের রূপান্তর সাধনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল।

লরেন্সের গবেষণাগারে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিল। গবেষকদের সকলেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, যে বিপুল ভোল্টেজের কথা ইতিপূর্বে স্বপ্নেও ভাবা যায়নি, এবার সেই প্রচণ্ড ভোল্টেজ চালিত বিদ্যুৎ কণিকা উৎপন্ন করা যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে পচাত্তর টন ওজনের বিরাট একটি চুম্বকের ছাঁচ অব্যবহৃত পড়ে ছিল। এটিকে অবিলম্বে সংগ্রহ করে অতিকায় সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের কাজে লাগান হল। যন্ত্রটি স্থাপন করা

হল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত রেডিয়েশন লেবরেটরীতে। আট টন ওজনের তামার তার লাগান হয়েছিল এতে। ১৯৩৬ সালে লরেন্স এই রেডিয়েশন লেবরেটরীর অধিকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই ২৭½ ইঞ্চি সাইক্লোট্রনটি ছিল চতুর্থ মডেল। এর কিছুকাল পরই ৩৭ ইঞ্চির একটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছিল। ২৭½ ইঞ্চি যন্ত্রটি কয়েক মাইক্রোআমপিয়ারের ৫,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্টের ডয়টেরন ও ১০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস উৎক্ষেপ করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল। এই যন্ত্রটির বিরাট চেটাল চুম্বকের দক্ষিণমেরু মেঝে থেকে আড়াই ফিট উচু (বিলাতী ধরনের রান্নাঘরের উনুনের উচ্চতার সমান) আর তার ব্যাস ছিল পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি। যন্ত্রটি থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে যন্ত্র চালককে রক্ষা করার জন্য চল্লিশ ফুট দূরে অবস্থিত একটি কণ্ট্রোল বোর্ড থেকে যন্ত্রটি পরিচালনা করা হত। এ ছাড়া পরিচালকের আরও নিরাপত্তা বিধানের জন্য যন্ত্রটির চারদিকে যথোচিত বিকিরণ শোষক পদার্থ স্থাপনা করা হয়েছিল। সব কিছু কাজ শেষ হলে, লরেন্স ও তার উৎসাহী তরুণ সহকর্মীদের প্রত্যেকে এই অতিকায় তড়িৎচুম্বকের দুই মেরুর মাঝে স্থাপিত ভাজার পাত্রের মধ্যে ধৃত পারমাণবিক আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহার করতে কালবিলম্ব করলেন না। পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গার কাজের জন্য উদ্ভাবিত এই অভিনব অস্ত্রটির বৈশিষ্ট্য এই, এটি নাগরদোলার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন করে বিদ্যুৎ কণিকা পরমাণু কেন্দ্রে বর্ষণ করে। পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার আশায় সবপ্রকার সম্ভাব্য ছটরাই জানাশোনা সব মৌলের উপর নিক্ষেপ করা হল। এই যন্ত্র সাহায্যে প্রোটন, হিলিয়াম কেন্দ্রক, নিউট্রন ও নবাবিষ্কৃত ভারি হাইড্রোজেন ডয়টোরিয়ম কেন্দ্রক নিক্ষেপ করে পরমাণু কেন্দ্র ভঙ্গ করা সম্ভব হল। ভারি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়সকে ডয়ট্রন বলা হয়। লরেন্স ডিউট্রনকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনে বিভক্ত করলেন। এইভাবে তার নিউট্রন ছটরার সরবরাহ হাজারগুণ বাড়িয়ে ফেললেন। ১৯৩৫ সাল নাগাদ তিনি শুধু লিথিয়াম মৌলের পরমাণু কেন্দ্রে ডিউট্রন বর্ষণ করে তাকে হিলিয়মে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন নি, অনুরূপে আরও অনেক মৌলের রূপান্তর সাধন করেছিলেন। পারমাণু পর্যায় সারণীর প্রতিটি মৌলের রূপান্তর সাধনের পথ এখন উন্মুক্ত হল। মধ্যযুগের কিথিয়াবিদগণ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখতেন। এবার সে স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। বস্তুতঃ

লরেন্স ১৯৩৬ সালে তার সাইক্লোট্রন যন্ত্রে প্ল্যাটিনাম (৭৮ নং মৌল)-কে স্বর্ণে (৭৯ নং মৌলে) রূপান্তরিত করেছিলেন।

লরেন্সের খ্যাতি দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য নির্বাচিত হলেন। এই সময় যুক্ত-রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ভারকেন্দ্র নিঃসন্দেহে পশ্চিমাঞ্চলে সরে গিয়েছিল। লরেন্সের গবেষণাগার থেকে একদল তরুণ গবেষক বের হল। অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারগুলির জন্য নতুন সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণ ও পরিচর্যার ভার যাতে এরা গ্রহণ করতে পারে তদুপযোগী শিক্ষা দিয়েছিলেন এদের লরেন্স। তিনি নতুন নতুন ছাত্রদের গবেষণার কাজে শিক্ষিত করে তোলা এবং সরকারী অর্থ সাহায্যে মৌলিক গবেষণার কাজ চালানর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'বিপুল সম্ভাবনাযুক্ত নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে আবিষ্কার, মূল ধারণার পরিবর্তন, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, আমাদের পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমে বুদ্ধিমানের মত অংশ গ্রহণের উপযোগী করে শিক্ষিত করে তুলতে কোনও তরুণকে এক প্রস্ত পুঁথিগত বক্তৃতা শোনানই যথেষ্ট নয়। কারণ কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ত পুঁথির তথ্য অচল ও বাতিল হয়ে যেতে পারে। এই তরুণ কর্মীকে পরমাণু গবেষণার মধ্যে থেকে কয়েক বছর হাতে কলমে কাজ করতে হবে। এই সম্পর্কিত নবাবিষ্কৃত প্রতিটি তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিচার করতে শিখতে হবে। এই শিক্ষানবিশের কাজ সবচেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন করা যায় মূল সমস্যাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করে। কারণ এই ভাবেই সে অধীত বিষয়ের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক পরিচয় লাভে সক্ষম হয় ও নিজেই নতুন পথে এগিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করে। যে সব ছাত্র এই পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণা শিক্ষা করতে আসবে তাদের শিক্ষাকালে কিছুদিন সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ এই গবেষণার কাজ খুবই জটিল ও ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু এর পরিবর্তে, এই পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্র হতে কারি-গরী বিদ্যার সচল বিভাগের আমাদের জাতীয় কার্যক্রমে নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে।'

১৯৪০ সাল নাগাদ এদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে পঁয়ত্রিশটি সাইক্লোট্রোন যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী আঠারো বছরে যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় চল্লিশে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এই সময় সাইক্লোট্রন

যন্ত্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এমনি প্রায় চল্লিশটি। এ ছাড়া পাঁচটি মহাদেশে আরও সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মিত হতে থাকে। এই সব নতুন যন্ত্র নির্মাণে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দেবার জন্য প্রায়ই লরেন্সের ডাক পড়ত। শেষের দিকে তাঁর বেশী সময় কাটত তাঁর বিরাট সাইক্লোট্রন যন্ত্রে উৎপাদিত নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি এদেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে সরবরাহ করার কাজে। এমনি কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও তিনি বাড়ীতে সখের কাজের পিছনে সময় ব্যয় করতে পারতেন।

নানা দিক দিয়ে সম্মানিত হতে লাগলেন তিনি। চূড়ান্ত ভাবে সম্মানিত হলেন ১৯৪০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের জন্য এবং বিশেষ ভাবে এই যন্ত্র সাহায্যে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, তার জন্য, তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে নোবেল পুরস্কার দানের খবর শুনে তিনি, প্রথম যে কথা বলেন তা হল এই, 'এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এতে আমার গবেষণাগারকেই সম্মানিত করা হয়েছে। আমি আমার অতীত ও বর্তমান সমস্ত সহকর্মীদের সঙ্গে এই সম্মানের অংশভাগী।' ১৯৪২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথম বিদেশীদের তাঁদের একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য তালিকাভুক্ত করা শুরু করে, তখন যে তিন জন আমেরিকানকে সভ্যপদে নির্বাচিত করা হয়, তাঁদের মধ্যে লরেন্স ছিলেন অন্যতম। অন্য দুজন হলেন জি. এন. লুইস ও ওয়াল্‌টার বি. ক্যানন।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির কেলগ লেবরেটরীতেও পরমাণু ভাঙ্গবার চেষ্টা চলছিল। এখানে একজন তরুণ বিজ্ঞানী মেঘকক্ষে একটি পরমাণু কণিকায় অভাবিত গমন পথের আলোক চিত্র গ্রহণ করেছিলেন। এ গমন পথটি বাঁকা মেঘ কক্ষে অন্যান্য পরমাণু কণিকার গমন পথের অনুরূপ নয়। এই বাঁকা গমন পথটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের একটি নতুন কণিকা বলে বোঝা গেল। বিচিত্র এই যাযাবর কণিকাটির আবিষ্কারে সমগ্র বিজ্ঞান জগৎ চমকিত হয়ে উঠল। এই নতুন কণিকাটির আবিষ্কারক প্রথম থেকেই বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেননি। অন্য ক্ষেত্র হতে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের আঙ্গিনায়। মিলিক্যানের অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এই তরুণ বিজ্ঞানীর নাম কার্ল ডি. অ্যান্‌ডারসন। ১৯০৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে এর জন্ম। মাতাপিতা এসেছিলেন সুইডেন থেকে। অ্যানডারসন লস এঞ্জেলস পলিটেকনিক হাইস্কুল

থেকে স্নাতকের পরীক্ষার পাস করেন। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে থাকেন। দ্বিতীয় বর্ষে সহসা তিনি এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে পদার্থ বিদ্যা পড়তে চলে আসেন।

১৯৩০ সালের বসন্ত কালে মিলিকান কস্‌মিক রশ্মি বা মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি নির্ধারণের পন্থা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই মহাজাগতিক রশ্মি অতিশয় তীব্র ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ কণিকা সমন্বয়ে গঠিত। মিলিকানের ধারণা হয়েছিল জড় পরমাণুর সৃষ্টির সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। তিনি অ্যানডারসনকে একটি যন্ত্র নির্মাণের কাজে লাগালেন, যার দ্বারা এই মহাজাগতিক রশ্মি প্রখর চুম্বক বলের সাহায্যে বেঁকিয়ে দেওয়া যাবে।

২৪,০০০ গাউস শক্তি-সম্পন্ন চুম্বক ক্ষেত্র রচনাক্ষম একটি শক্তিশালী চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাস ও ২ সেন্টিমিটার উঁচু (এই ধরনের নির্মিত প্রথম) উইলসন মেঘ কক্ষ খাড়া ভাবে স্থাপন করা হল; আলোকচিত্র গ্রহণ করা হল বলরেখা বরাবর চুম্বক মেরুর একটি ছিদ্র দিয়ে। এতে মহাজাগতিক কণিকা চুম্বকের বলক্ষেত্র দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হলে তা ধরা পড়বে। চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় উইলসন মেঘ কক্ষে গ্যাসের পরমাণুর উপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিক্রিয়ার (এর অনেকগুলিই ৩,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন) আলোক চিত্রগ্রহণ করা হল।

১৯৩২ সালের ২রা আগস্ট বিকালে অ্যানডারসনের তোলা ও পরিস্ফুটন করা একটি ফিল্মে দেখা গেল বিধ্বস্ত পরমাণুর একটি অপূর্ব গমন পথচিত্র। এমনি ধরনের পথরেখা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। প্রথমে অ্যানডারসনের মনে হয়েছিল বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য কোনও ইলেকট্রনের হয়ত দিক পরিবর্তন ঘটেছে কিংবা এটি হয়ত কোনও প্রোটন, কারণ বক্ররেখাটি নেগেটিভ ইলেকট্রন কর্তৃক রচিত রেখার বিপরীত দিকে। এ থেকে বোঝা যায় এই কণিকাটি পজিটিভ তড়িৎ-বিশিষ্ট। কণিকাটি ৬ মিলিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ করতে সক্ষম। এ থেকে বোঝা যায় এর ভেদন ক্ষমতা প্রচণ্ড। এমনি প্রচণ্ড ভেদন ক্ষমতা কোনও ইলেকট্রনের আছে বলে জানা নেই। মেঘ কক্ষে এই কণিকাটির গমন পথ এই বক্ররেখার প্রোটনের গমন পথের দশগুণ দীর্ঘ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত প্রোটন নয়। বস্তুত মনে হল এটি যেন পজিটিভ আধান-যুক্ত তড়িৎ কণিকা, অথচ এর ভর নেগেটিভ ইলেকট্রনের অনুরূপ, এ একটি নতুন তড়িৎ কণিকা—একটি পজিটিভ ইলেকট্রন।

অ্যানডারসন পুনরায় এই পরীক্ষার অনুষ্ঠান করলেন। অসংখ্য নতুন আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। তাতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পরীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন তাই সমর্থিত হল। অ্যানডারসন পরমাণু কণিকা জগতের এই নূতন আগন্তুকটির নামকরণ করলেন পজিট্রন।

আরও পরীক্ষার পর অ্যানডারসন জানালেন, 'মনে হয় বিকিরণ যখন জড় পদার্থ ভেদ করে তখন পজিট্রন উৎপাদন করাই তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের সাধারণ ধর্ম।' যা হোক, বিকিরণের শক্তি যদি এক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কম হয় তা হলে পরমাণু কেন্দ্র থেকে পজিট্রন নির্গত হয় না। দেখা গেছে একক অবস্থায় পজিট্রন খুবই ক্ষণজীবী, আয়ু সাধারণতঃ এক সেকেণ্ডের এক বিলিয়ন (একশত কোটি) ভাগের এক ভাগ। পজিট্রন আবিষ্কার করার জন্য অ্যানডারসন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৬ সালের শীতকালে তিনি স্টকহলমে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করলেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৩২ সালটি সত্যই এক বিস্ময়কর বৎসর। চারিটি বিস্ময়কর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে এই এক বৎসরের মধ্যে। নিউট্রন, ভারি হাইড্রোজেন ও পজিট্রন সর্বপ্রথম এই বছরই আবিষ্কৃত হয়। এই বছরই পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় নিত্য ব্যবহার্য প্রধান যন্ত্রপাতির তালিকাভুক্ত হল সাইক্লোট্রন যন্ত্র। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; এই চারটি আবিষ্কারের মধ্যে তিনটির আবিষ্কর্তা হলেন তিনজন তরুণ মার্কিন বিজ্ঞানী। চতুর্থ আবিষ্কারটি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনও একজন মার্কিন বিজ্ঞানীই জিনিসটি আবিষ্কার করেন একজন ইংরাজ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে মার্কিন গবেষকদের অবদানের মাত্রা এবার নিঃসন্দেহে এক নতুন সু-উচ্চ শিখরে পৌছেছে তা বোঝা গেল।

আমেরিকান বিজ্ঞান প্রতিভার নিদর্শন আবার পাওয়া যেতে লাগল। ১৯৩৬ সালে পুনরায় আর একটি পরমাণু কণিকা আবিষ্কার করলেন এই কার্ল ডি. অ্যানডারসনই, যিনি কিছুদিন আগে বিশ্বকে পজিট্রন উপহার দিয়েছিলেন। মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত থাকা কালেই তিনি এই নতুন পরমাণু কণিকাটি আবিষ্কার করেন। এই কণিকা সংক্রান্ত গবেষণায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট এ. মিলিকান ও আর্থার এইচ. কম্পটনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলত। এর ফলে এরা দুজন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষা করে এই রশ্মির সৃষ্টি ও এদের প্রকৃতির

প্রভাব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম নিঃসন্দিগ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটে যেতেন, উঠতেন সুউচ্চ পর্বত শিখরে।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে অ্যানডারসন ছয় সপ্তাহ ধরে পাইকস্ শৃঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষা করে কাটালেন, পৃথিবীর আবহ মণ্ডলের উপরি-স্তরের পরমাণু কণিকার সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির সম্ভাব্য সংঘর্ষের ১০,০০০ টি আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। এ কাজে তাঁর সহায়তা করেছিলেন সেথ এইচ. নেডারমায়ার। ইনি এই মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে অ্যানডারসনের অধীনে গবেষণা করছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে এসে তাঁরা সযত্নে আলোকচিত্রগুলি পরীক্ষা করলেন। মেঘ কক্ষে পরমাণু কণিকাগুলির গমন পথের পাল্লা, বক্রতা ও ভেদন ক্ষমতা পরীক্ষা করলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁরা, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সম্বন্ধে এই কথা লিখলেন, 'আলোক চিত্রগুলির শতকরা প্রায় এক ভাগে লক্ষ্য করা যায় অতি তীব্র ভাবে আয়নিত কণিকার অস্তিত্ব। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনও নয়, প্রোটনও নয়। এগুলি এক ধরনের পারমাণবিক বিদারণ থেকে সৃষ্টি, এ ধরনের বিদারণ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। এর উৎস মহাজাগতিক রশ্মিতে।' পরের বছর আরও পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা আরও ৬০০০ আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। এই পরীক্ষায় তাঁরা মেঘ কক্ষের কেন্দ্রে ১ সেন্টিমিটার পুরু প্ল্যাটিনাম পাত ব্যবহার করেছিলেন। এই আলোকচিত্রগুলি পরীক্ষা করে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, 'এক নতুন ধরনের কণিকার অস্তিত্বের কথা। এগুলির ভর সাধারণ ইলেকট্রন কণিকা অপেক্ষা বেশী, এ ছাড়া আর কোনও ভাবে এগুলির ব্যাখ্যা চলে না।' এরা এই নতুন কণিকাটির নাম দিলেন মেসোট্রন। শব্দটির অর্থ হল মধ্যবর্তী কণিকা। কারণ এর ওজন ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি। ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানী এন. জে. ভাবা এটিকে মেসন অ্যাখ্যা দেন। বিজ্ঞানীরা এখন এই নামটি পছন্দ করে থাকেন।

১৯৩৯ সালে লরেন্স একলাফে ৩৭ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন থেকে তার বিখ্যাত ৬০ ইঞ্চি সাইক্লোট্রনটি নির্মাণ করেন। ভেষজ বিজ্ঞানের গবেষণাও নিয়মিত ভাবে ক্যানসার চিকিৎসার কাজে লাগানোর জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণ কার্যের ব্যয়ভার বহন করেন কেমিক্যাল ফাউণ্ডেশনের ফ্রানসিস পি. গারভান, রকফেলার ফাউণ্ডেশন এবং ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি ক্যানসার কাউন্সিল। উইলিয়াম এইচ. ক্রোকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে

এই সাইক্লোট্রনটি স্থাপনের উপযোগী অট্টালিকা নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করেন। অট্টালিকাটির তাঁর নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়: ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম এইচ. ক্রোকার র‍্যাডিয়েশন লেবরেটরী। ষাট ইঞ্চি এই সাইক্লোট্রনটির ওজন ছিল ২২০ টন। এ থেকে ১০০ মাইক্রোআমপিয়রের ১৬,০০০,০০০ ভোল্ট ডয়টেরন ও এক মাইক্রোআম্পিয়রের ৩২,০০০,০০০ ভোল্ট হিলিয়ম আয়ন পাওয়া যেত। কয়েক ইঞ্চি ব্যাসের এই ভারি-হাইড্রোজেন মৃত্যুরশ্মি যন্ত্রের গবাক্ষ থেকে প্রায় পাঁচ ফিট দূরে সেকেণ্ডে ২৫,০০০ মাইল বেগে প্রতি সেকেণ্ডে, ৬০০,০০০,০০০টি কণিকা নিক্ষেপ করত। এই কণিকার পরিমাণ, ত্রিশটন বিশুদ্ধ রেডিয়ম নির্গত কণিকার সমান। এই ত্রিশটন রেডিয়মের দাম তখন পড়ত, পাউণ্ড প্রতি ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার।

এই সাইক্লোট্রনটি বিশেষ কার্যকরী প্রমাণিত হলে, লরেন্স এটির চেয়ে আরও শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ১৯৩২ সালে যখন ২৭½ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন যন্ত্র থেকে এক দমে বিরাট যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, তখনই দেখা গিয়েছিল যে তিনি একজন কেতাবী পদার্থবিদ্‌মাত্র নন। তারও চেয়ে ঢের বেশী তাঁর কর্মক্ষমতা। এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায়ও তাঁর দক্ষতা কম নয়। অনায়াসেই এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প তিনি সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করে তুলতে পারেন। তাই এবার তিনি ৫০০০ টনের সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা নিতে ভয় পেলেন না। একদমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহৃত ৬০ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন যন্ত্র থেকে ১৮৪ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের আয়োজন করতে লাগলেন। অনেকের সে সময় এই ধারণা ছিল যে সাইক্লোট্রনের শেষ সীমা ২০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত। তা সত্বেও এই বিপুলায়তন সাইক্লোট্রন নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন লরেন্স। এটি হবে এক নতুন ধরনের সাইক্লোট্রন। এটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যে এ থেকে সেকেণ্ডে ৬০,০০০ মাইল বেগে ডয়টেরন ও ২০০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্টের অধিক শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক কেন্দ্র ভেদনক্ষম পারমাণবিক কণিকা উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে। তিনি আশা করেছিলেন, এই যন্ত্রটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হবে। টেনে আনবে পবিত্রতম তীর্থস্থানের ভক্ত যাত্রীর মত শত শত গবেষক বিজ্ঞানী।

ইণ্টারন্যাশনাল এডুকেশন বোর্ড যন্ত্রটির নির্মাণে ১,১৫০,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করলেন। যন্ত্রটি স্থাপনের নিমিত্ত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী চার্টার হিল নামে একটি স্থান নির্বাচিত হল। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে, পৃথিবীর এই বৃহত্তম পরমাণু চূর্ণকারী যন্ত্রটির নির্মাণকার্য শুরু হল। যন্ত্রটির কেন্দ্রস্থল (core) নির্মিত হল চার্টার হিলের গর্ভে। এতে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গিলম্যান হল হতে সাইক্লোট্রন-গৃহটি পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎবাহী তার সংস্থাপন কার্য শেষ হল। একটি চব্বিশপার্শ্ব যুক্ত, ৯০ ফিট উচ্চ ও ১১৬ ফিট ব্যাসের অট্টালিকায় এই মহাকায় যন্ত্রটি স্থাপন করা স্থির হয়েছিল। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এই সাইক্লোট্রন গৃহটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল।

এই বৎসরই ৭ই ডিসেম্বর জাপানীরা পার্ল হারবারে আক্রমণ চালায়। যন্ত্রসংক্রান্ত নির্মাণকার্যের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই শেষ হয়ে এসেছিল। তাই যুদ্ধকালেও এ প্রকল্পটি স্থগিত রাখা হল না। সাইক্লোট্রন যন্ত্রটির নির্মাণ-কার্য শেষ হল ১৯৪২ সালের মে মাসে। স্থির হল যে এই নতুন যন্ত্রটি তখন শুধু যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজেই ব্যবহার করা হবে। এর ৩'০০ টনের চুম্বকটি যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা হল। এই ভীমকায় যন্ত্রের সাহায্যে আশু সমাধানের জন্য বহু বাস্তব সমস্যাই জমেছিল। এ ছাড়া ছিল পুরাতন বিব্রতকর একটি প্রশ্ন, যার উত্তর মরীচিকার মত ক্রমাগত বিভ্রান্ত করে চলেছিল বিজ্ঞানীদের: পরমাণু কেন্দ্রের অভ্যন্তরে লুকানো রয়েছে যে প্রলয়ঙ্কর শক্তি, তার রুদ্ধ অর্গল মুক্ত করা কি কোনও কালে সম্ভব হবে? নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিটি পদার্থ-বিজ্ঞানী মনে করতেন, তা সম্ভব।

লরেন্স বলেছিলেন, "এ কথা বিশ্বাস করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, আমাদের সম্মুখে অনুসন্ধানের এক অভিনব ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। এখানে আবিষ্কৃত হবার জন্য যে মহান সম্পদ লুক্কায়িত রয়েছে, তার সমতুল্য রত্ন ইতিপূর্বে আর কখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অনুসন্ধান থেকে পরমাণু কেন্দ্রে নিহিত প্রায় সীমাহীন শক্তিভাণ্ডারের সন্ধানসূত্র মিলতে পারে।" সেই মুহূর্তে লরেন্স এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতেন, কারণ তখন তিনি ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার উপায় ছিল না তখন সেই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায়। কারণ সামরিক কারণে সে সত্য তথ্য তখন সবিশেষ গোপনীয়।

॥ ১৯ ॥

এনরিকো ফার্মি

(১৯০১-১৯৪৫)

পারমাণবিক শক্তি যাঁরা পৃথিবীতে আনলেন

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুন সালানকিসের নিকট একটি স্যানাটোরিয়ামে মেরি কুরি মারা যাবার ঠিক একমাস আগে নিউইয়র্ক টাইমস্-এ প্রকাশিত একটি সংবাদে বিজ্ঞান জগৎ চমকে উঠল। সংবাদটি বেতার যোগে প্রেরিত হয়েছিল। রোমের লিনসেইস্থিত ইতালীয় একাডেমীর একটি সভার কার্যবিবরণী পরিবেশিত হয়েছিল এই সংবাদে। আইনস্টাইনের বিখ্যাতসূত্রে ১৯০৫ সালে কৃত্রিমভাবে নূতন মৌল পদার্থ সৃষ্টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তখন কিছুকাল বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে মৌল সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মেতেছিলেন। তারপর সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ইতালীয় একাডেমীর গবেষণা বহুবর্ষ পর পুনরায় সেই কৃত্রিম মৌল সৃষ্টি প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়েছিল।

একাডেমীর এই সভায় সিনেটর অর্সো মারিও কোরবিনো মৌলিক পদার্থের পর্যায়-সারণীর বহির্ভূত একটি আনকোরা নতুন ধাতু সৃষ্টির কথা ঘোষণা করেছিলেন। ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই নূতন মৌলটি পর্যায়-সারণীতে ইউরেনিয়াম পারের ধাতু। ইউরেনিয়াম অপেক্ষা এটি ভারি। মারিও কোরবিনোর এই ঘোষণায় একদল বিজ্ঞানী মহলে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু বহু উন্নাসিক গবেষক বিজ্ঞানী ভ্রূ কুচিত করলেন। এরা জানতেন, বিগত শতাব্দীতে প্রায় তেত্রিশজন বিজ্ঞানী তেত্রিশটি নতুন ধাতু আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেখা গিয়েছিল এর প্রত্যেকটি দাবীই অলীক। অকপট ভ্রান্তির ফলে বিজ্ঞানীরা অকালেই এই দাবী করে বসেছিলেন। বস্তুত তখন অমনি কোনও ধাতুর অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই, নতুন মৌল

আবিষ্কারের খবর যে কিছু বিজ্ঞানী অবিশ্বাস ভরে গ্রহণ করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু যে বিজ্ঞানীর নামের সঙ্গে এই আবিষ্কারটি যুক্ত ছিল তিনি কোনও ভুঁইফোড় গবেষক নন। এনারিকো ফার্মি বয়সে তরুণ কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানী-রূপে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর রোমে তাঁর জন্ম। বাপ-মায়ের তিনটি সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। সতেরো বছর বয়সে ফার্মি পিসায় যান। সেখানে বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। রঞ্জন রশ্মি নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা তিনি শুরু করেছিলেন এখানে। সেই পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে একুশ বছর বয়সে তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য এর পর গেলেন জার্মানী ও হল্যাণ্ডে। ফিরে এসে অধ্যাপনার কাজ নেন। প্রথমে রোম, পরে ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রকল্পিত জাত্য গ্যাসের আচরণ সম্বন্ধে তিনি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটি বিজ্ঞানী সমাজে সবিশেষ সমাদৃত হয়। ফলে তাঁকে আবার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকা হল। সিনেটের কোরবিনো সেখানে তাঁর জন্য তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করলেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের একটি নতুন বিভাগ গঠন করতে উদ্যোগী হলেন। আশা করেছিলেন যে অধ্যাপক ফার্মির খ্যাতিতে এখানে প্রভূত ছাত্র সমাগম হবে। উনত্রিংশ বছর বয়সে তিনি ইতালীর রয়েল একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হলেন। এই একাডেমী মুসোলিনি তখন সদ্য স্থাপন করেছেন। সভ্যদের বয়সের দিক দিয়ে একাডেমীর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হলেন এনরিকো। আমেরিকার পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের নিকট তিনি খুবই সুপরিচিত ছিলেন, কারণ ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি মিশিগান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিকিরণের কোয়ান্টামবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিন বছর পর আবার তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন। ফার্মি তাই এমন একজন বিখ্যাত গবেষক ও তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানী যাঁর আবিষ্কারের দাবী লঘুভাবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। নিউইয়র্ক টাইমের রিপোর্টটি পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ গভীর আগ্রহভরে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, সত্যিই কিভাবে ফার্মি ইউরেনিয়াম পরবর্তী মৌল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন?

কোন নতুন জটিল জৈব যৌগিক পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা অবশ্য কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে বিশিষ্ট কীর্তি। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখা গেল ফার্মি তার চেয়েও বড় কাজ করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, মহান সৃষ্টি-কর্তার মত তিনি বিশ্বকে এক নতুন মৌল উপহার দিয়েছেন। এ বিষয় প্রকৃতিদেবী ইতিপূর্বে কখনও প্রকাশ করেন নি। এ যেন আধুনিক যুগের এক অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল।

কোরবিনো জানিয়েছিলেন নতুন মৌল সৃষ্টির কাজে ফার্মি ছটরা রূপে নিউট্রন ব্যবহার করেছিলেন। নিউট্রন অতিশয় ভারি এবং তড়িৎশূন্য বলেই ফার্মি ছটরা রূপে এটি বেছে নিয়েছিলেন। বেরিয়ম থেকে নির্গত হিলিয়ম কেন্দ্রক বেরিলিয়মের উপর বর্ষণ করে ফার্মি তাঁর এই ছটরার নিউট্রন প্রবাহ উৎপাদন করেছিলেন। আলফাকণা বর্ষণ করে ফরাসী বিজ্ঞানী দম্পতি ফ্রেড্রিক ও আইরিন জোলিও কুরি ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই খবর জানতে পেরে ফার্মি আল্‌ফা কণার বদলে নিউট্রন বর্ষণ করে অনুরূপ কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টির সঙ্কল্প করলেন। সমস্ত রাসায়নিক মৌলগুলির উপর একে একে নিউট্রন ক্ষেপণ করে তার ফলাফল পরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হলেন।

পর্যায় সারণীর প্রথম আটটি মৌলের উপর নিউট্রন বর্ষণের কোনও ফল হল না। নবম মৌল ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে সামান্য একটু আশার আলোক দেখা গেল। ফার্মি তাঁর পাঁচজন তরুণ সহকর্মীকে ডেকে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আরও গভীর ও দীর্ঘকালীন পরীক্ষা চালাতে অনুরোধ করলেন। পরীক্ষা চলতে লাগল। একটির পর একটি ধাতুর উপর নিউট্রন বর্ষণ করে চললেন তাঁরা অসীম ধৈর্যে। শেষে এল ইউরেনিয়ামের পালা। ফার্মি আশা করেছিলেন নিউট্রন ইউরে-নিয়ামের (৯২ সংখ্যক মৌল) কেন্দ্রক ভেদ করে একটি প্রোটন ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রকে রেখে যাবে। এই প্রোটন কণিকাটি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রকের ৯২টি প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিরানব্বইটি প্রোটন যুক্ত একটি নতুন পরমাণু সৃষ্টি করবে। অন্যভাবে বলা চলে, এমনি ভাবে একটি নতুন মৌল (পর্যায়-সারণীর ৯৩ সংখ্যক মৌল) সৃষ্টি হবে।

ফার্মির এই পরীক্ষা সফল হল। ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন বর্ষণের ফলে ম্যাঙ্গানিজের অনুরূপ একটি নতুন মৌল সৃষ্টি হল। তদুপরি, এই নতুন পদার্থটির গুণাগুণ ও প্রকৃতি পর্যায়-সারণীতে ইউরেনিয়াম পরবর্তী সম্ভাব্য অজ্ঞাত

অন্য ধাতুর কেন্দ্রকে এমনি নিউট্রন ক্ষেপণের ফলাফল থেকে পৃথক হবে। ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রকে সামান্য একটু অদল-বদলের পরিবর্তে এতে কেন্দ্রকটিই সম্পূর্ণ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তা ছাড়া ইউরেনিয়াম পরমাণু বিক্রিয়াজাত মৌল সমূহ পৃথক করবার উপযোগী যথোচিত পরিমাণে রসায়ন বিজ্ঞানের জ্ঞানও আমাদের তখন ছিল না। আমাদের তখন ধারণা ছিল যে প্রায় চার ধরনের মৌল তৈরী হয়েছে, বস্তুতঃ পক্ষে এদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।'

পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা করলে মনে হয় ফার্মির অসাফল্যের ফল শুভই হয়েছে। কারণ ১৯৩৮ সালে বার্লিন-ডাহ্‌লেমে পারমাণবিক রসায়ন বিজ্ঞানে কতকগুলি পরীক্ষা সারা বিশ্বে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। গোড়া রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলিও অচিরে এই সব পরীক্ষার খবর তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় না ছেপে পারল না। খবরটা হল এই: হিটলারের চ্যান্সেলারী থেকে কয়েক মাইল দূরে কাইজার উইলহেলম্ ইনস্‌টিটিউট ফর কেমিস্ট্রীতে, তিনজন জার্মান গবেষক ১৯৩৪ সালে রোমে অনুষ্ঠিত ফার্মির পরীক্ষা (নিউট্রন ক্ষেপণের দ্বারা ইউরেনিয়ম বিদারণ) পুনরায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লেগেছেন।

এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয় এই ভাবে। জনৈক বিজ্ঞানী এই ইঙ্গিত করেছিলেন যে ইউরেনিয়ম ক্ষেপণের ফলে তেরো মিনিট অর্ধায়ু-সম্পন্ন যে মৌলটি ফার্মির হস্তগত হয়েছিল, তা তাঁর অনুমিত কোনও ইউরেনিয়ম পারের ধাতু নয়, সম্ভবত প্রোট্যাক্টিনিয়ম মৌলের কোনও আইসোটোপ। এই মন্তব্যটি কাইজার উইলহেলম্ ইনস্‌টিটিউটের অটো হ্যান ও লিসি মাইটনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ তাঁরা ১৯১৭ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধ যখন চলছে, তখনই এই প্রোট্যাক্টিনিয়ম মৌলটি আবিষ্কার করেছিলেন। এখন তাঁরা স্থির করলেন, ফার্মি সত্যই প্রোট্যাক্টিনিয়ম মৌলটি সৃষ্টি করে বসেছিলেন কি না তা দেখবার জন্য তাঁরা পুনরায় ফার্মির পরীক্ষাটি নিজেরা করে দেখবেন।

পরীক্ষাকালে ফ্রিৎস ষ্ট্রসম্যান পরে হ্যানের সঙ্গে যোগ দিলেন। এবং তিনজনে একত্র পরীক্ষাকার্য চালাতে লাগলেন। ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন বর্ষণ করে বর্ষণ-জাত পদার্থ তাঁরা সযত্নে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল বর্ষণজাত বস্তুসমূহে ইউরেনিয়ম পারের ধাতু ব্যতীত রেডিয়মও থাকতে পারে। ওরা রেডিয়মের সন্ধান করতে লাগলেন।

রেডিয়ম পাওয়া গেল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার বদলে পাওয়া গেল বেরিয়ম-পর্যায় সারণীর ৫৬ সংখ্যক মৌল। ওরা ভাবলেন, এ অসম্ভব। এর আগে, লরেন্স ও তাঁর সহকর্মীরা পরমাণুর রূপান্তর সাধনের পরীক্ষাকালে ভারি পরমাণুর সামান্য একটু অংশ মাত্র ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছিলেন, বা পরমাণু কেন্দ্রে ক্ষুদ্র কণিকা অনুপ্রবিষ্ট করতে পেরেছিলেন মাত্র। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল যেন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। সর্বাপেক্ষা ভারি বলে পরিচিত এই ইউরেনিয়ম ধাতুটির কেন্দ্র একেবারে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর এই টুকরোগুলি বেশ বৃহদাকার। ওরা জানলেন, 'এ ব্যাপার নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী।'

হ্যান ও ষ্ট্রসম্যান ১৯৩৯ সালের ৬ই জানুয়ারী ইউরেনিয়ম পরমাণুর উপর নিউট্রন ক্ষেপণ করে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক বিদারণের ফলাফল স্বরূপ বেরিয়াম সৃষ্টির কথা জানালেন। নিউট্রন বর্ষণের এই দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়ার কথা দুই মাস পর জার্মানীর ডাই নাটুর্‌ডিসেন্‌স্থাফ্‌টেন (Die Naturwissenschaf-ten) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হ্যান এই পরীক্ষাকালে শুধু রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধেই শুধু আগ্রহশীল ছিলেন। পরমাণুর রূপান্তর কালে যে আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটে, ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার শীঘ্রই অনুধাবন করতে পারলেন যে এই নিউট্রন ক্ষেপণের ফলে ইউরেনিয়মের কেন্দ্রকের কণিকা জগতে অতি অভিনব ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটা কোনও ব্যাপার ঘটেছে। লিজে মাইটনার ছিলেন ইহুদী। সারা জীবন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রূপে তিনি জার্মানীতে বিজ্ঞানের সেবা করেছেন। তা সত্ত্বেও জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে অনার্য ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের বিতাড়ন ও তাদের বিরুদ্ধে পীড়নমূলক ব্যবস্থা যখন একেবার তীব্রতর হয়ে উঠল, তখন নাৎসী দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে বন্দী শিবিরে পাঠান স্থির করল। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ষাট বৎসর বয়স্কা এই মহিলা বিজ্ঞানী সঙ্কল্প করলেন যে, 'এবার আমার গোপন তথ্য নিয়ে এ দেশ ছাড়বার সময় হয়েছে। এক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে হল্যাণ্ডে যাচ্ছি বলে হল্যাণ্ডের ট্রেন ধরলাম। আমার অষ্ট্রিয়ান পাসপোর্টের সাহায্যে আমি হল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করলাম। সেখানে সুইডিস ভিসা সংগ্রহ করলাম।' মাইটনার অবশ্য বন্দী শিবিরে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়েই প্রধানতঃ জার্মানী ছেড়ে

পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পালিয়ে আসার আরও একটা উল্লেখ-যোগ্য কারণ ছিল। তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন বর্ষণ করে যে অভিনব ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন, তার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা যদি আরও পরীক্ষা অনুসন্ধানে যথার্থ প্রমাণিত হয় তা হলে যে এতে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে যাবে তা তিনি বুঝতে পেয়েছিলেন। বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ হয়ে তাঁর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পরীক্ষা অনুসন্ধানের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাক—তা তিনি চাননি।

স্টকহলম থেকে লিসে মাইট্নার কোপেনহেগেনে গেলেন। এখানে তাঁর ভাগ্নে অটো ফ্রীশ নীলস্ বোরের গবেষণাগারে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ফ্রীশও জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। দুজনে মিলে তাঁরা পুনরায় হানস্ ও ষ্ট্রসম্যানের পরীক্ষা অনুষ্ঠান করে দেখলেন। সেই প্রথম তাঁরা ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন বর্ষণের ফলে বেরিয়াম সৃষ্টির ব্যাপারটাকে ইউরেনিয়ামের বিদারণের ফলাফল বলে ব্যাখ্যা করলেন। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস) চূর্ণ হয়ে সমান আকারের দুটি কেন্দ্রক, বেরিয়াম ও ক্রিপটন পরমাণু কেন্দ্রক এবং স্বল্প পরিমাণে বর্ষণজাত অন্যান্য পদার্থ সৃষ্টি করেছে বলে তাঁরা জানালেন। এই ব্যাখ্যা নির্ভুল হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাখ্যা সহ তাঁরা ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী ব্রিটেনের বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচারে" একখানি পত্র পাঠালেন। এই পত্রটি কয়েক সপ্তাহ পর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। মাইট্নার ও ফ্রীশ ইউরেনিয়ামের এই বেরিয়াম ও ক্রিপটনে বিভক্ত হওয়ার বিস্ময়কর ব্যাপারটাকে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন বলে (fission) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

তারা আরও বলেছিলেন, এই পরমাণু কেন্দ্র বিভাজনের সময় প্রচণ্ড কেন্দ্রীন শক্তি নির্গত হয়। পরিমাণ প্রায় ২০০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। এই আকস্মিক শক্তি নির্গত হচ্ছে আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সূত্র অনুযায়ী ইউরেনিয়মের ভরের খানিকটা অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হবার জন্যই—পরমাণু কেন্দ্রিক শক্তি নির্গমনের এই ব্যাখ্যা মাইটনার নির্ভুলভাবেই করতে পেরেছিলেন।

১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদ প্রণয়ন কালে ঘোষণা করেছিলেন, ভর ও শক্তির মধ্যে কোনও মূলগত প্রভেদ নেই।

তাঁর এই অভিনব মতবাদ অনুযায়ী শক্তির মাঝে কার্যত বিধৃত রয়েছে ভর, আর ভর শক্তিরই রূপান্তর। কারণ গতিশীল বস্তুর ভর তার স্থানু অবস্থায় ভরের চেয়ে বেশী; ভরের নিত্যতা ও শক্তির নিত্যতা—পৃথক ভাবে এই দুইটি সূত্র কাজ করছে না। প্রকৃত পক্ষে রয়েছে একটিই সূত্র—ভরশক্তির তুল্যতা ও নিত্যতা সূত্র। আইনস্টাইন বললেন, যুগ যুগান্তর ধরে এই ধারণা চলে আসছে যে, শক্তির কোনও ওজন নেই। কারণ এর ভর এতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে তা ধরা পড়ে না, কাজে কাজেই শক্তির ওজন চিরকাল উপেক্ষা করে আসা হয়েছে। যেমন, আমরা জানি ৩০০,০০০ টন জল ফোটাতে যে পরিমাণ তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তার ভর সমমূল্য, মাত্র এক আউন্সের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কাজেই এক কোয়ার্ট (প্রায় ১০ ছটাক) জল ফোটাতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হবে তার ওজন হবে যৎসামান্য, এবং উপেক্ষণীয়।

ভর ও শক্তির তুল্যতা প্রকাশ করতে আইনস্টাইন একটি সমীকরণ রচনা করেছিলেন। সমীকরণটি হল

$$E=MC^2$$

$$\text{শক্তি}=[\text{ ভর }]\times[\text{ আলোকের গতিবেগ }]^2$$

এখানে E দ্বারা বোঝাচ্ছে আগের হিসাবে প্রকাশিত শক্তি, M এর দ্বারা বোঝাচ্ছে, গ্রামের হিসাবে প্রকাশিত ভর, এর C-র দ্বারা বোঝাচ্ছে সেণ্টিমিটারের হিসাবে প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি। শেষোক্ত এককটির পরিমাণ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। সূত্র অনুযায়ী এই সংখ্যা গুণিতে হলে অতি বিরাট আকার ধারণ করবে, E-র (শক্তির) পরিমাণ দাঁড়াবে অচিন্তনীয়, সুবিপুল। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, এক পাউণ্ড বস্তু (কয়লা বা ইউরেনিয়াম) যদি সম্পূর্ণভাবে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তা হলে তা থেকে ১১ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমাণ তাপ পাওয়া যাবে। এই শক্তি এক মাসের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকারী শিল্পগুলি যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তার সমান। সেই তুলনায় ঐ এক পাউণ্ড কয়লা পুড়িয়ে (এ ক্ষেত্রে রাসায়নিক রূপান্তর, নিউক্লীয় রূপান্তর নয়) পাওয়া যায় মাত্র আট কিলোওয়াট ঘণ্টা তাপ শক্তি মাত্র। পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লা থেকে প্রাপ্তব্য

নিউক্লীয় শক্তির পরিমাণ সমপরিমাণ কয়লা থেকে প্রাপ্তব্য রাসায়নিক শক্তির দুই বিলিয়ন গুণ বেশী।

সে সময় আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব ছিল নিতান্তই পুঁথিগত। নিজের সূত্রের কোনও পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নি। তবে একথা বলেছিলেন যে তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করলে বা পরমাণু বিদীর্ণ করলে হয়ত তাঁর এই সূত্রের সপক্ষে প্রমাণ মিলবে।

হান মাইট্‌নার স্ট্রসম্যান ফ্রীশের নিউট্রন বর্ষণ পরীক্ষায় পরমাণু কেন্দ্র থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে। এ খবর প্রচারিত হবার পর আইনস্টাইনের ভর শক্তি সূত্রানুযায়ী ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার পুরানো পরীক্ষায় বিজ্ঞানী মহলে নতুন করে শুধু উৎসাহ দেখা দিল না, এবার সে উৎসাহ অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করল। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্বেই মাইট্‌নার ও ফ্রীশ এ বিষয় নিয়ে বোরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সুইডেন থেকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করে আমেরিকায় রওনা হবার আগে ফার্মির সঙ্গে বোরের জেটিতে দেখা হয়েছিল। বোর সেই সময় ফার্মিকে জানিয়েছিলেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তিনি আমেরিকায় কয়েকমাস কাটানো স্থির করেছেন। আইনস্টাইন তখন নিউ জার্সির প্রিন্সটনের ইনস্‌টিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিতে কর্মরত।

পরমাণু কেন্দ্র বিদারণের যে কাহিনী বোর মাইটনার ও ফ্রীশের মুখে শুনেছিলেন তাতে তিনি আনন্দে, উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। খবরটা বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক ভাবে প্রচার করলেন। অটো হান ইউরেনিয়ম বিভাজন ও তার পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ক্ষিপ্র-গতিতে তার গ্যালি প্রুফ পাঠালেন বোরের কাছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকার তিনটি গবেষক দল মাইটনার ফ্রীশের আবিষ্কৃত তথ্য গবেষণা-গারের পরীক্ষায় সমর্থন করলেন।

সেই বছরই ২৬শে জানুয়ারী বোর ওয়াশিংটন ডি. সি. তে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে যোগ দেন। বোরের মুখ থেকে পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজনের কাহিনী সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এই নতুন ব্যাপার সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও জল্পনাকল্পনা চলল। উৎসাহ উদ্দীপনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন সবাই। পরমাণু

সংক্রান্ত গবেষণার সেরা বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মিও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ফার্মি বোরের সঙ্গে আলোচনা কালে বললেন নিউক্লীয় বিভাজনই পরমাণু কেন্দ্র থেকে পারম্পরিক প্রক্রিয়ার (Chain Reaction) সাহায্যে বিপুল শক্তি সংগ্রহের সহায়ক হতে পারে। তিনি অনুমান করেছিলেন, একটি ইউরেনিয়ম পরমাণুর বিভাজন থেকে আরও কয়েকটি নিউট্রন বেরিয়ে তা আবার অন্য ইউরেনিয়ম পরমাণুর বিভাজন ঘটাতে পারে। এই ভাবে একটি স্বয়ং-চালিত প্রতিক্রিয়া শৃঙ্খল সৃষ্টি করা যাবে, যাতে কেন্দ্রক বিমুক্ত প্রতিটি নিউট্রন পালাক্রমে অন্য আর একটি ইউরেনিয়ম বিভাজন ঘটাতে পারে। ঠিক এই ভাবে স্থতোর বাধা কালি পটকার মালার একটিতে অগ্নিসংযোগ করে বিস্ফোরণ ঘটালে সঙ্গে সঙ্গে আর একটিতে বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র পটকার মালাটাই জ্বলে উঠে টর্পেডোর আঘাতপ্রাপ্ত গোলাবারুদের জাহাজের মত বিকট এক নারকীয় শব্দ তুলে বিস্ফোরিত হয়। পরমাণু কেন্দ্রের শক্তিও এই ভাবে বিমুক্ত করে মানুষের কাজে লাগান যেতে পারে। এই ভাবে এক পাউণ্ড ইউরেনিয়মের হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে যে বিস্ফোরণ শক্তি উৎপাদন করা যাবে. তা হবে কয়েক মিলিয়ন পাউণ্ড অতি বিস্ফোরক টি. এন. টির সমান।

পরীক্ষা কালে এ পর্যন্ত যত পরমাণু বিদারণ করা হয়েছে তখন কেন এই পারম্পরিক বা শৃঙ্খল প্রক্রিয়া ঘটেনি? নীল বোর ও তাঁর একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, প্রিন্সটন বিশ্ববিত্যালয়ের জন এ. হুইলারের নিকট এ প্রশ্নটা ধাঁধার মত ঠেকতে লাগল। তাঁরা এর রহস্য সমাধানে উদ্যোগী হলেন। তিন সপ্তাহ পরে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসায়িটির এক সভায় তাঁরা ইউরেনিয়ম বিভাজনের সম্বন্ধে এক নতুন মতবাদ উপস্থিত করলেন। তাঁদের মতে বিভাজনের কাজে ব্যবহৃত সব ইউরেনিয়মই বস্তুত বিভাজিত হয় না। তাঁদের বিশ্বাস, নিউট্রন বর্ষণে, ইউরেনিয়মের শতকরা এক ভাগেরও কম অংশ বিভাজিত হয়েছিল, কারণ ইউরেনিয়ম আইসোটোপের প্রতি তিনটির মধ্যে একটি বিভাজনক্ষম। প্রকৃতিজ ইউরেনিয়মের শতকরা ৯৯·৩ ভাগের পারমাণবিক ভার হল হল ২৩৮। কিন্তু যে ইউরেনিয়ম আইসোটোপটি বিভাজন সাধ্য তার পারমাণবিক ভার ২৩৮ নয় ২৩৫। ইউ-২৩৮ অত্যন্ত

সুস্থিত, এর অর্ধায়ু চার বিলিয়ন বর্ষ বলে অনুমান করা হয়। আমরা আগেই জানি, আইসোটোপগুলি হল একই মৌলের পরমাণু, এদের পারমাণবিক সংখ্যা ও গুণাগুণ একই প্রকারের কিন্তু পারমাণবিক ভার পৃথক।

বোর ও হুইলার এই যুক্তির অবতারণা করলেন যে শুধু মাত্র বিশুদ্ধ ইউ-২৩৫ থেকেই শৃঙ্খল প্রক্রিয়া ঘটান সম্ভব। তারা আরও বললেন যে মন্দগামী নিউট্রন ক্ষেপণ করেই শুধু এই শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সংঘটন চলে। এই মন্দগতি নিউট্রন ১৯৩৪ সালে ফার্মি উৎপাদন করেছিলেন।

বেরিলিয়ম থেকে সাধারণতঃ যে নিউট্রন নির্গত হয় তা অত্যন্ত দ্রুতগতি-সম্পন্ন। সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল এদের দ্রুতি। এই দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রনগুলিকে ইউ-২৩৮ সহজেই আকর্ষণ করে নেয়। কিন্তু এর ফলে বিভাজন ঘটে না। ফার্মি বললেন, নিউট্রনের গতি মন্দীভূতকারী বা প্রশমকরূপে গ্রাফাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রাফাইট বা কৃষ্ণসীসের (বা ভারি জলের) মত গতি মন্দনকারী কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হলে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রনগুলি সেই বাধাদানকারী বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কিছুটা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এতে তাদের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে সেকেণ্ডে এক মাইলের কমে এসে দাঁড়াতে পারে। এই মন্দগতি নিউট্রন ইউ-২৩৮এর উপর গিয়ে পড়লে, শোষিত হবে না। স্প্রিং করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকবে, ইউ-২৩৮এর উপর দিয়ে, যতক্ষণ না গিয়ে পড়ছে কোনও ইউ-২৩৫এর কেন্দ্রকের উপর। নিউট্রনটি ইউ-২৩৫এর কেন্দ্রকের উপর পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিদীর্ণ হবে।

বোর-হুইলারের স্বীকার্য অনুযায়ী পরীক্ষা কার্য চালানোর জন্য কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়মের প্রয়োজন হল। প্রকৃতিজ ইউরেনিয়মে বিভিন্ন আইসোটোপ একত্র মিশ্রিত থাকে। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিজ্ঞানী আলফ্রেড ও. নায়ারই প্রথম প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম থেকে অতি সামান্য পরিমাণে ইউ-২৩৫ বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অণুবীক্ষণিক পরিমাণ ইউ-২৩৫ তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মির নিকট পাঠালেন। কণা পরিমাণে আরও কিছু ইউ-২৩৫ পাঠিয়েছিলেন জেনারেল ইলেকট্রিক লেবরেটরী। এগুলি একত্র করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে তার উপর মন্দগামী নিউট্রন বর্ষণ করা হল। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পরীক্ষান্তে বোর ও হুইলারের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হল।

নায়ার বহু পরিশ্রম করে দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় ভর বর্ণালি মাপক যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র এক কণা মাত্র ইউ-২৩৫ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। যে হারে তিনি এই ইউ-২৩৫ পৃথক করছিলেন, তাতে এই অতি প্রয়োজনীয় আইসোটোপটির এক পাউণ্ড নিষ্কাশন করতে লাগত প্রায় ৭৫ হাজার বছর। কাজেই বিপুল পরিমাণ পরমাণু শক্তি সংগ্রহের কথা তখন স্বপ্ন বলেই মনে হত।

যা হোক এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৩৯ সালে পরমাণু সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পর্কিত শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ গবেষকই এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে ইউ-২৩৫ আইসোটোপ পৃথক করার সমস্যার আশু সমাধানের কোনও সম্ভাবনা নেই। 'ইলেকট্রনিকস্' পত্রিকা সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত পরমাণু গবেষণার ফলাফল মোটামুটি বর্ণনা করে লিখেছিল, 'এ পর্যন্ত ব্যাপার যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ তাতে ইউ-২৩৫এর শৃঙ্খল প্রক্রিয়া যে সত্যই বাস্তবে ঘটে থাকে তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণের জন্য এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে ইউ-২৩৫ আটসোটোপটির উপর নজর রাখা যাক। হয়ত এর দ্বারা সাফল্য অর্জিত হতে পারে।'

জনসাধারণের পক্ষে অবশ্য লক্ষ্য করবার কিছু ছিল না। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে বোর ডেনমার্কে ফিরে গেলেন।

এক বছর পর বোর ও আমাদের পরমাণু-বিজ্ঞানীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে স্থির করলেন যে এই মারাত্মক সম্ভাবনাপূর্ণ পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে অতঃপর তাঁরা তাদের গবেষণার ফলাফল আর সাধারণ্যে প্রকাশ করবেন না। রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার খাতিরেই পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ বন্ধ হয়েছিল। এই শক্তি সত্যিই কোনদিন মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগান সম্ভব হবে কিনা, এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাবার আর কোনও পথ রইল না। বিশ্ববাসীকে শুধু অলস জল্পনা কল্পনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর পরমাণু শক্তির এই বাস্তব প্রয়োগ দেখে চরম আশাবাদী বিজ্ঞানীরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

সুনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শক্তির এই প্রয়োগ শুধু বিস্ময়কর নয়, সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক কীর্তি। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই মুষ্টিমেয়

বিজ্ঞানী, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সহস্র সহস্র গবেষক পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে যে তত্ত্ব আহরণ করেছিলেন, তা কাজে লাগিয়ে এক দানবিক শক্তির উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন। এই অমিত শক্তি বিশ্বের অসীম উন্নতি সাধন করতে পারে, কিংবা এই পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতেও পারে।

তত্ত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান যে এক ও অভিন্ন, পারমাণবিক বোমা তার আর একটি নিদর্শন। সূর্যের তাপ, বিকিরণের প্রকৃতি, পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় গবেষণা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে আলোক তড়িৎ কোষ বা ম্যাজিক আই, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, রেডার ও টেলিভিশন প্রভৃতি। পরমাণু বোমা আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও এমনি ঘটনা ঘটেছিল। সে সব তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীরা কোনও কালে কোনও কাজের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, তাঁরা এমন সব পরিকল্পনা ও গাণিতিক সমীকরণ সরবরাহ করলেন, যার দ্বারা এক অতি মারাত্মক সমরাস্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব হল। এমনি প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসশক্তি-সম্পন্ন শয়তানী মারণাস্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও নির্মিত হয়নি।

পৃথিবীর প্রতি দেশের প্রতি জাতি, ধর্ম ও আদর্শাবলম্বী হাজার হাজার বিজ্ঞানী পরমাণুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে গেছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে পরমাণু-শক্তি মারাত্মক পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজে ব্যবহারের জন্য মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিজ্ঞানী নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারেননি যে কি এক মহাদানব তাঁরা সৃষ্টি করতে চলেছেন। তারা তখন শুধু এইটুকু জানতেন যে মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার তারা শুধু আর একটু বৃদ্ধি করে দিয়ে যাচ্ছেন মাত্র। পারমাণবিক শক্তি আহরণের মহানাট্যে শুধু মার্কিন বিজ্ঞানীরাই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরাই অংশ গ্রহণ করেছেন।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ছাড়া পরমাণু বিজ্ঞানে অন্যান্য যে সব বিজ্ঞানীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, দিনেমার নীলস্ বোর; ইতালীর এনরিকো ফার্মি, এমিলিও সেগ্রে, ব্রুনো পনটিকোরভো, অষ্ট্রিয়ার উলফগনগ পাউলি ও ভিক্টর ভাইস্‌কফ্; হাঙ্গেরীর লিও জিলার্ড, এডওয়ার্ড টেলার ও জর্জ ফন হেভেসি; সোবিয়েত ইউনিয়নের পীটার কাপিট্‌জা ও ডিমিট্রি স্কোবেলজিন; ফ্রান্সের আইরিন ও ফ্রেড্রিক জোলিও কুরি এবং হানস্ বেথে; ভারতের চন্দ্রশেখর রমন এবং জাপানের হিদেকি ইউ-কাওয়া।

হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর যুদ্ধকালীন পরমাণু বিভাজন সংক্রান্ত গবেষণা ও পরীক্ষার কাহিনীর উপর থেকে আংশিকভাবে যবনিকা উত্তোলিত হল। তখন বিস্মিত বিশ্বের সামনে পরমাণুশক্তি জয়ের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হল। পরমাণু বিভাজন যে বাস্তবে সম্ভব তা পরীক্ষান্তে প্রদর্শিত হবার পর এবং শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা আংশিকভাবে সফল হবার পরই, হিরোসিমায় পরমাণু শক্তির আকস্মিক ভয়াল প্রকাশে বিশ্ববাসী তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। পরমাণু সংক্রান্ত এই গবেষণায় তখন কয়েকজন জার্মান নিউক্লিয় বিজ্ঞানীও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা বুঝে-ছিলেন, পরমাণু শক্তি কাজে লাগিয়ে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস শক্তি-সম্পন্ন দানবিক বোমা নির্মাণের সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে রণদামামা বেজে উঠল। সারা ইউরোপ জুড়ে চলল হিটলারের অস্ত্রের ঝনৎকার। তাঁর বিজ্ঞানীরা পরমাণু শক্তি সংগ্রহের গবেষণা চালাতে লাগলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানোয় সরকারী উত্তম প্রথম দিকে তেমন ছিল না। এখানে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। হিরোসিমায় বোমা বর্ষণের ছয়দিন পর পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে স্থলবাহিনীর তরফ থেকে যে সরকারী রিপোর্ট প্রচারিত হয় সেই রিপোর্টে হেনরি ডি. স্মিথ লিখেছিলেন, 'আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী নিউক্লিয় পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের এই বিশেষ বিত্তা সামরিক প্রয়োজনে প্রয়োগের কথা কোনও দিন চিন্তা করেননি। তাই তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি এ সম্বন্ধে কি করা প্রয়োজন। কাজেই প্রথম দিকে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ বন্ধ করার এবং মারণাস্ত্র নির্মাণে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের কাজে সরকারী সমর্থন সংগ্রহের ব্যাপারে উত্যোগী হয়েছিলেন বিদেশে জন্মগ্রহণকারী এদেশের ক্ষুদ্র একদল বিজ্ঞানী। এরা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক শরণার্থী। ইউরোপ থেকে উৎপীড়ন নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন।'

আরও একজন শরণার্থী বিজ্ঞানী এই সময় পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এর নাম লিওজিলার্ড, বয়স চল্লিশ। কাজ করতেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিত্যালয়ের পরিদর্শক ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানীর। জিলার্ড ছিলেন একজন সক্রিয় নাৎসী-বিরোধী। হাঙ্গেরীতে থাকতে নিজের গবেষণা চালানোর উদ্দেশ্তে একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন জিলার্ড। আমেরিকায় আসবার সময়

এটি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কলাম্বিয়া এসে গবেষণা চালানোর জন্য। ১৯৩৯ সালের ৩রা মার্চ তিনি এবং ওয়াল্টার জিন নামে একজন তরুণ ক্যানাডিয়ান বিজ্ঞানী পারমাণবিক বিভাজন সত্যই ঘটে কি না তার প্রমাণ পাবার জন্য পরীক্ষা করছিলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজিয়ে সুইচ টিপে তাঁরা টেলিভিশন টিউবে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন পরীক্ষায় ফলাফল দেখবার জন্য। জিলার্ড পরে লিখেছিলেন, 'সেই রাত্রে আমি বুঝেছিলাম, পৃথিবীর মহা দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসছে।'

পরমাণু বিভাজনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল কল্পনা করে জিলার্ড অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে জার্মান মিনিস্ট্রি অব মিউনিশনস্ (সমরোপকরণ মন্ত্রণালয়) পরমাণু বিভাজনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি গবেষক দল সংগঠন করেছিল। জিলার্ড ভাবলেন, পরমাণু শক্তি কাজে লাগিয়ে বোমা তৈরি করতে হিটলারের বিজ্ঞানীরা যদি পূর্ণোদ্যমে তৎপর হয়ে উঠতে থাকেন? সে চেষ্টা সফল হলে সমগ্র পৃথিবী নাৎসী দাসত্বের অধীন হবে! সেই বছর জুলাই মাসেই তিনি ছুটলেন প্রিন্সটনে, তাঁর বন্ধু ইউজেন পি. ভিগেনারের সঙ্গে আলাপ করতে। ইনিও তাঁরই মত হাঙ্গেরী থেকে এদেশে এসেছিলেন। জিলার্ড অতঃপর আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করলেন। আইনস্টাইন তখন গিয়েছিলেন লং আইল্যাণ্ডের পনটিক উপসাগরের নিকটবর্তী এক নির্জন সমুদ্রাবাসে বিশ্রাম ভোগ করতে। জিলার্ড এডওয়ার্ড টেলার নামে আর একজন হাঙ্গেরীয় শরণার্থী পদার্থ বিজ্ঞানীকে বললেন, মোটর চালিয়ে তাকে সেখানে নিয়ে যেতে।

আরও একজন বিদেশে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান বিজ্ঞানী পরমাণু বোমার ভয়াল সম্ভাবনায় বিমূঢ় হয়ে উঠেছিলেন। এঁর নাম আলেকজাণ্ডার শাকস্। বালক বয়সে তিনি রাশিয়া থেকে এখানে আসেন। শিক্ষা লাভ করেন হার্ভার্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে ইনি ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের ঘরোয়া পরামর্শদাতা ও শ্রমশিল্প উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পারমাণবিক শক্তি মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অবিলম্বে যে একটা কিছু করা দরকার শাক্স সে সম্বন্ধে জিলার্ডের সঙ্গে একমত হলেন। বিজ্ঞানী হিসাবে আইনস্টাইনের যে বিপুল মর্যাদা রয়েছে, তা তিনি জানতেন। জিলার্ড যখন প্রস্তাব করলেন যে শাক্স এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একবার

সাক্ষাৎ করুন, তখন তিনি আর দেরী করলেন না। ১৯৩৯ সালের ১১ই অক্টোবর তিনি আইনস্টাইনের নিকট হতে একখানা পত্র নিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের হাতে দিলেন।

রুজভেল্ট পরমাণু শক্তি থেকে বিশ্বের সুস্পষ্ট বিপদাশঙ্কা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল, সঙ্কল্প অনুযায়ী ক্ষিপ্র গতিতে কাজ করবার সৎসাহস ছিল। যে সব পরামর্শদাতা এ ব্যাপারে ইতঃস্তত করছিলেন বা পারমাণবিক বোমার বিপদাশঙ্কায় তত গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না, তাঁদের পরামর্শ তিনি শুনলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর তখনও পাচ সপ্তাহ কাটেনি। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইউরেনিয়াম সম্বন্ধে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে ছিলেন আলেকজাণ্ডার শাক্স, এনরিকো ফার্মি, লিও জিলার্ড, ই. পি. ভিগনার, এডওয়ার্ড টেলার এবং স্থল ও নৌবাহিনীর কয়েকজন প্রতিনিধি। এই সমিতির অধিবেশন বসল ১৯৩৯ সালের ২১শে অক্টোবর। কমিটির সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিগণ এই মত প্রকাশ করলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত পরীক্ষার কাজ হাতে নেওয়া উচিত হবে না। এ কাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর ছেড়ে দেয়াই উচিত হবে। সমিতি প্রথম অর্থ মঞ্জুর করলেন ১৯৪০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ যৎসামান্য। মাত্র ৬০০০ ডলার।

ইতিমধ্যে, ১৯৩২ সালে সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণ করবার জন্য ১৯৩৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর, আর্নেস্ট ও লরেন্সকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল। এই সময় সহসা বোঝা গেল যে, অন্যান্য দেশেরও এই সাইক্লোট্রন যন্ত্র রয়েছে এবং এর দ্বারা তাঁরাও বৃহদাকারে পরমাণু বিভাজনের পরীক্ষা চালাতে পারে। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে, শাকস্ ও আইনস্টাইন ইউরেনিয়ম প্রকল্পের শম্বুক গতিতে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। সেই বছরের এপ্রিল মাসে শাক্স পুনরায় হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে, পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা আরও দ্রুতগতি করবার জন্য এবং এ কাজে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

এই সময় ইংল্যাণ্ডও জার্মানীর পারমাণবিক বোমা নির্মাণের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ইংরাজ বিজ্ঞানীরা রেডার সংক্রান্ত গবেষণাতেই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, কাইজার উইলহেলম

ইনষ্টিটিউটের একটা বিরাট অংশ পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য পৃথক করে রাখা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডও পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। সে দেশের বিজ্ঞানীরাও এসম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ করছিলেন। ইলেকট্রন আবিষ্কারক জে. জে. টমসনের পুত্র নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী স্যার জি. পি. টমসনের নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। লিভারপুলে গবেষণার কাজ শুরু করলেন অটো আর ফ্রিশৎস ও জে. রোটব্ল্যাট। পরে এন. ফেদার ও ই. ব্রেটসের অধীনে বিখ্যাত ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীর পদার্থ বিজ্ঞানের শাখায়ও এই গবেষণার কাজ শুরু করা হল। জার্মানী প্রথমে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলে বিশ্বের যে সমূহ বিপদ দেখা দেবে সে সম্বন্ধে ফরাসী বিজ্ঞানীরাও অবহিত ছিলেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে হিটলারী বাহিনীর নিকট ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করলে ফ্রেড্রিক জোলিও কুরি তাঁর সহকারী এইচ. ফন হলবান ও এল. কোয়ারস্কিকে কেমব্রিজে পাঠান ইংরাজ পরমাণু বিজ্ঞানীদের কাজে সাহায্য করবার জন্য।

যে সময় ফরাসী বিজ্ঞানীরা ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেছেন সেই সময় ১৯৪০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটি গঠন করলেন। পূর্বতন ইউরেনিয়ম উপদেষ্টা কমিটি এই কমিটির একটি সাব-কমিটি বলে গণ্য হল। বছর শেষ হবার আগেই শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর জন্য কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়া হল। পরের বছর গ্রীষ্মকালে ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির (জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা কমিটি) ডাইরেক্টর ভ্যান নেভার বুস, পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার কাজ যতটা এগিয়েছে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট তার একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করলেন। ইংল্যাণ্ডের টমসন কমিটির অধিবেশনে যোগ দিয়ে কে. টি. বেনব্রিজ ও সি. সি. লরিটসেন যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাও তিনি জানালেন। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালেই ইংরাজ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে পারমাণবিক বোমা তৈরি সম্ভব। তারা আকরিক ইউরেনিয়ম থেকে গ্যাসীয় পরিব্যাপন (gaseous diffusion) পদ্ধতিতে ইউ-২৩৫ পৃথক করার সুপারিশ করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তখন ক্লেমেণ্ট অ্যাটলির (তিনি তখন চার্চিল মন্ত্রিসভার সদস্য) নিকট প্রস্তাব করেন যে পরমাণু বিভাজনের কাজে ইংরাজ বিজ্ঞানীরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করুক। উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত জ্ঞান ও কর্ম

সাধনায় চলুক এই পারমাণবিক শক্তিজয়ের প্রয়াস। চার্চিল সরকার সাগ্রহে এ প্রস্তাব মেনে নেন।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে হ্যারল্ড সি. উরে ও জর্জ বি পেগরামকে ইংলণ্ডে পাঠান হল ইংরাজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য। এর দুমাস আগে চার্চিল কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্তমানে প্রচলিত বিস্ফোরকগুলিই যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করি। তা হলেও আমি মনে করি উন্নততর অস্ত্রের উদ্ভাবনে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।" স্যার জন অ্যানডারসনের উপর ইংল্যাণ্ডের এই পারমাণবিক বোমা নির্মাণের প্রকল্প পরিচালনার ভার পড়েছিল। তিনি এই পরিকল্পনাধীনে ইংল্যাণ্ডের সেরা পরমাণু বিজ্ঞানীদের জড়ো করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ডারউইনের প্রপৌত্র (চতুর্থ পুরুষ) স্যার চার্লস ডারউইন, দুজন শরণার্থী বিজ্ঞানী রুডলফ্ ই. পেইএরল্স, ও ফ্রানজ্ ই. সাইমন এবং নিউট্রন আবিষ্কারক স্যার জেমস্ স্যাডউইক।

যে সপ্তাহের রবিবারে জাপানীরা পার্ল হারবারে আক্রমণ চালায়, সেই সপ্তাহে উরে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন। পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজ আরও ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানালেন তিনি। এবার দ্রুত গতিতে কাজ হতে লাগল। পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার ঠিক একদিন আগে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের সার্বিক প্রচেষ্টার সঙ্কল্প গৃহীত হল। এগারো দিন পরে ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট অফিসের অধীনে পুনর্গঠিত হল। বোমা নির্মাণের কাজে সাহায্য করতে পেইএরলস্, সাইমন ও হার্লবান সহ একদল ইংরাজ বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রে এলেন। অবশেষে সমর সচিব হেনরি এল. ষ্টিমসনের আদেশে ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট "ম্যানহাটান এঞ্জিনিয়ারিং ডিষ্ট্রিক্ট" নামে পারমাণবিক বোমা প্রকল্প গঠিত হল।

পরের বছরের প্রথম দিকে ইংরাজ ও ক্যানাডিয়ান বিজ্ঞানীদের একটা যুক্তদল আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করার জন্য মন্ট্রিয়েলে গেল। তারপর সেই বছরের শেষের দিকে, প্রথমে স্যার জন অ্যান্ডারসন ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের আলোচনার পরিশেষে রুজভেল্ট চার্চিলের সঙ্গে আলোচনান্তে স্থির হয় যে সমগ্র ইংরাজ পরমাণু বিজ্ঞানী দল,

যুক্তরাষ্ট্রে এসে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজে যোগ দেবেন। পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজ চলবে শুধু আটলান্টিকের পরপারে।

এই সর্বশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে, পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছিল কয়েকদল গবেষকের উপর। এই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি ছিল নিয়ন্ত্রিত ও স্বয়ংপুষ্ট নিউক্লীয় শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সৃষ্টি। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজ সম্পাদন করা স্থির হয়েছিল। এখানে আর্থার এইচ. কম্পটন নিউট্রন সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। এপ্রিল মাসে, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের কর্মরত বিজ্ঞানীরা শিকাগোতে এসে মিলিত হলেন। যে সংস্থার অধীনে তাঁরা কাজ চালাতে লাগলেন, পরে মেটাল্যারজিক্যাল লেবরেটরী নামে তা পরিচিত হয়। এনরিকো ফার্মিও এই বিজ্ঞানীদলের মধ্যে ছিলেন।

পারমাণবিক বোমা নির্মাণের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল প্রচুর বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের সরবরাহ। ১৯৪১ সালে মাত্র কয়েক পাউণ্ড বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়া যেত। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে এমস্-এর আইওয়া স্টেট কলেজ প্রথম বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম সরবরাহ করল। এখানে ফ্রাঙ্ক এইচ. স্পেডিং এই ধাতুটি শোধনের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। ইতিমধ্যে ফার্মির উপর নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সৃষ্টির যন্ত্র নির্মাণের ভার দেওয়া হল। আইনের চোখে ফার্মি কিন্তু তখনও শত্রু দেশের নাগরিক। তিনি ও জিলার্ড প্রথমে ২৬ ফিট ব্যাসযুক্ত একটি গোলকাকৃতি যন্ত্র নির্মাণের কথা চিন্তা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটি যে আকারে নির্মিত হয়েছিল তাতে সেটি দেখতে হল গোলকাকৃতি কিন্তু উপরের দিকে মৌচাকের আকৃতিতে অংশতঃ চ্যাপ্টা। এই যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'পাইল'। এই যন্ত্রটিকে ফার্মি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাগ-ফিল্ডের পশ্চিম দিককার মঞ্চের নিচে স্কোয়াস র‍্যাকেট কোর্টের উপর স্থাপন করেছিলেন। এই পাইলে (পারমাণবিক চুল্লী) ছিল বিশেষ ভাবে পরিশুদ্ধ গ্রাফাইট নির্মিত ১২৪০০ পাউণ্ড পরিমাণ ইষ্টক। চুল্লীর গাত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর ছিল গর্ত। এই গর্তগুলিতে ইউরেনিয়ম অক্সাইড ও বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম সীল করা অ্যালুমিনিয়মের আবরণে মুড়ে স্থাপন করা হয়েছিল। পারমাণবিক চুল্লী শীতল রাখবার জন্য পাম্প করে তার মধ্যে জল ঢালা হত। সে সময় ইউরেনিয়ম যাতে ক্ষয়িত হয়ে না যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রাফাইটের ইটগুলি জাফরির আকারে সাজান হয়েছিল। দেখা

গিয়েছিল, নিউট্রনের গতি মন্থর করতে এরূপ বিন্যাসেই সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়।

তাত্ত্বিক কচকচি, আঁকজোখ, আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পনা পরিবর্তন, পরিবর্ধন হল বহু। গ্রাফাইট ইটের বিন্যাসও বহুবার ঢেলে সাজা হল। শেষে বিজ্ঞানীদের চেহারা হল কয়লা খাদ থেকে বের হওয়া খনি মজুরদের মত। এ থেকে পারমাণবিক চুল্লীর নাম হয়েছে 'পাইল'। চুল্লিটি শেষবারের মত পরীক্ষার সময় ফার্মি, কম্পটন ও জিন স্কোয়াস র‍্যাকেট কোর্টের মেঝের দশ ফিট উপরে অবস্থিত একটি বারান্দায় স্থাপিত কণ্ট্রোল প্যানেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখানে হারবার্ট এল. অ্যানডারসনও উপস্থিত ছিলেন। ইনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মির কাছে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী গ্রহণ কালে তাঁকে ইংরাজী পড়িয়েছিলেন।

জর্জ এল. ওয়েজের উপর ভার পড়েছিল, চুল্লীর সর্বশেষ স্তরের নিয়ন্ত্রণ দণ্ডটি চালনা করবার। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত এই দণ্ডটি শৃঙ্খল প্রক্রিয়া রোধ করে রাখে। আর একটি নিরাপত্তা বিধায়ক দণ্ড চুল্লীর কেন্দ্রস্থানে স্থাপিত হয়েছিল। এটি ছিল স্বয়ংচালিত। আয়নিত করণকারী একটি কক্ষের ক্রিয়ায় চালিত দুটি বৈদ্যুতিক মোটর এই চালনার কাজ করত। যখন অতি বিপজ্জনক সংখ্যায় নিউট্রন নির্গত হতে থাকবে, তখন আয়ন-কক্ষে গ্যাস অতি মাত্রায় বিদ্যুতায়িত হবে। তাতে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণ দণ্ড পরিচালনাকারী মোটর চালু হয়ে, নিউট্রন শোষক, কাডমিয়াম পাত মোড়া ইস্পাত দণ্ডটি পাইলে ঢুকে যাবে। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসাবে জরুরী অবস্থায় ব্যবহার্য 'জিপ' নামে একটি নিয়ন্ত্রণ দণ্ড পাইল থেকে উঠিয়ে, অলিন্দের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হল। কোনও কারণে যদি স্বয়ং চালিত নিয়ন্ত্রণ দণ্ড ঠিক মত কাজ না করে তা হলে সেই জরুরী অবস্থায় ব্যবহার্য এই নিয়ন্ত্রণ দণ্ডটি যাতে চালু করে দেওয়া যায় সেজন্য তার দড়ি কাটতে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নরম্যান হিলবেরী। এ ছাড়াও, অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, জল প্লাবিত করার কাজে সুশিক্ষিত তিন ব্যক্তি চুল্লীর নিকটস্থ একটি মঞ্চে স্থান গ্রহণ করল। প্রয়োজন হলেই এরা ক্যাডমিয়াম লবণ মিশ্রিত জলের দ্বারা চুল্লীটি প্লাবিত করে দেবে।

ফার্মি বললেন, স্বয়ং-চালিত ব্যবস্থানুযায়ী একটি কাঁটা বিকিরণের তীব্রতা প্রদর্শন করবে। চুল্লীতে যখন শৃঙ্খল প্রক্রিয়া শুরু হবে, তখন এই কাঁটা একটি

রেখা অঙ্কন করে চলবে। রেখাটি ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী হতে থাকবে। কখনও নিম্নমুখী হবে না। অর্থাৎ এটি হবে শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সূচক রেখা। নিয়ন্ত্রণ দণ্ডগুলি তুলে নেবার আদেশ দিয়ে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় ফার্মি পরীক্ষা শুরু করলেন। ছয় মিনিট পর জিন হাত দিয়ে জরুরী নিয়ন্ত্রণ দণ্ড 'জিপ' তুলে নিয়ে সেটি অলিন্দের রেলিংএর সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। ফার্মি তখনও তীক্ষ্ণ চোখে কন্ট্রোল বোর্ড পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। ১০টা ৩৭ মিনিটের সময় ওয়েলকে আদেশ দিলেন, ভার্নিয়ার নিয়ন্ত্রণ দণ্ডটি চুল্লী থেকে কিছুটা তুলে নিতে যাতে দণ্ডটির তের ফিট প্রমাণ অংশ চুল্লীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। আধঘণ্টা কেটে গেল। স্বয়ং-চালিত নিরাপত্তা বিধায়ক দণ্ড তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করা হল। গাইগার কাউণ্টারে ক্লিক ক্লিক শব্দ দ্রুততর হল। কর্মীদের মাঝে চাপা উত্তেজনা বেড়ে চলল।

খিদে পেয়েছে, লাঞ্চে যাওয়া যাক, বললেন ফার্মি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কর্মী দল। দুপুর দুটোয় আবার সবাই চুল্লীর নিকটে ফিরে এল। আরও সমন্বয়ন, আরও আদেশ দান, লিওনা মার্শালের যন্ত্রপাতির আরও অনেক পাঠ নেওয়া, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত একমাত্র মহিলা। ৩টা ২১ মিনিটে ফার্মি স্লাইড রুলে নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধির হার হিসাবে করতে লাগলেন। সূচক রেখা ফার্মির হিসাব মত পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তারপর সহসা তিনি শান্তভাবে, স্লাইডরুল বন্ধ করলেন। বেশ খুসী খুসী মনে হল তাঁকে। বললেন, শৃঙ্খল প্রক্রিয়া স্বয়ং পুষ্ট হয়েছে। রেখা চিত্র তারই সূচক। তারপর আরও আঠাশ মিনিট কাল চুল্লীটি চালু রাখা হল। ৩টা ৫৩ মিনিটের সময় ফার্মি জিনকে বললেন 'সব ঠিক'। নিয়ন্ত্রণ দণ্ড চুল্লীতে ঢুকিয়ে রাখা হল। গাইগার কাউণ্টারে ক্লিক ক্লিক শব্দ কমে এল। শৃঙ্খল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এ যুগের এক অলৌকিক কাণ্ড শেষ হ'ল। ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর, মানুষের ইতিহাসে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে স্বয়ংপুষ্ট পরমাণু কেন্দ্রীন শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হল। শীতজর্জর সেই বুধবারের অপরাহ্নে এনরিকো ফার্মি ও উপস্থিত একচল্লিশ জন লোক জানল, মানুষ ইতিহাসের সর্পিল যাত্রা পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক অতিক্রম করল।

আর্থার এইচ. কম্পটন এই পারমাণবিক চুল্লীর পরীক্ষা কার্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে এ সম্বন্ধে বার্তা বিনিময় করেছিলেন জেমস বি. কোনাণ্টের সঙ্গে। জেমস কোনাণ্ট ছিলেন সায়েণ্টিফিক রিসার্চ

অ্যাণ্ড ডেভলাপমেন্ট অফিসের এই পারমাণবিক বোমা নির্মাণ প্রকল্পের কর্ম-সচিব। 'ইতালীয় নাবিক নতুন পৃথিবীতে পৌছেছেন। যতটা আশা করেছিলেন তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর এ পৃথিবী।'—কম্পটন বলেছিলেন কোনাণ্টকে। দু জনের মধ্যে এই বার্তাবিনিময়ের জন্য কোনও কোড (সাংকেতিক বাক্য) পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ছিল না। তবু কোনাণ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্ষুদ্রতর পৃথিবী বলতে বোঝাচ্ছে, পারমাণবিক চুল্লীটি ছোট, বিস্ফোরণ যতটা ভয়ঙ্কর আশা করা গিয়েছিল ততটা হয়নি। কোনাণ্ট তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেশীয়রা কি বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন?' কম্পটন বুঝেছিলেন, এর দ্বারা বোঝাচ্ছে তারা পূর্ণ মাত্রার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে তাই তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ, খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ।' ফার্মি ও তাঁর শিকাগোর সহকর্মীদল পরীক্ষার ফলাফল অনুসরণ করে পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজ শুরু করতে দেরী করলেন না।

নিউট্রন শোষণকারী বায়ুমণ্ডল আড়াল করে রাখবার জন্য পারমাণবিক চুল্লীটি আংশিকভাবে বেলুনের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। এই চুল্লীটি নিয়ে পরীক্ষা চালান ছিল বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। ভয় ছিল চুল্লীটির ইউরেনিয়ম একটা ন্যূনতম আকার (critical size) গ্রহণ করলে, কোনও বিভিন্ন নিউট্রন বা মহাজাগতিক রশ্মি থেকে আগত কোনও নিউট্রন কণিকার দ্বারা ইউরেনিয়মে স্বতঃবৃত্ত বিভাজন ঘটে শৃঙ্খল প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। পাইলের এই ন্যূনতম আকার (critical size) তখনই দেখা দেয় যখন ইউরেনিয়মের উপর পতিত হয়ে যে সব নিউট্রন বিভাজন সৃষ্টি করে এবং যেগুলিকে ইউ ২৩৮ শুষে নেয় বা যেগুলি ইউরেনিয়ম-পৃষ্ঠ ত্যাগ করে পালিয়ে যায় তাদের সংখ্যা সমান হয়ে দাঁড়ায়। খুব বড় একটি পারমাণবিক চুল্লীতে বিভাজন সৃষ্টিকারী নিউট্রন সংখ্যার যখন মাত্রাধিক্য ঘটে তখন অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে। যত রকমের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তারই ভিত্তিতে নির্মাণাধীন পারমাণবিক চুল্লীর ন্যূনতম আকারের (critical size) হিসাব করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল হিসাবে একটা মস্তবড় গলদ রয়ে গেছে। কারণ নিউট্রন বর্ষণের ফলে চুল্লীটি যখন ন্যূনতম আকারে (critical size) উপনীত হবে বলে অনুমান করা গিয়েছিল, তার অনেক আগেই সেটি ঐ অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল। অবশ্য এই পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণের কাজের সঙ্গে ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরা কোনও কালেই পরিচিত

ছিলেন না। তা হলেও তাঁরা সম্ভবপর সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

এই পারমাণবিক চুল্লী নির্মাতারা যে আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবু এই বিভাজন প্রক্রিয়াকালে তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা কম ছিল না। কারণ এই নিউক্লীয় বিভাজন কালে যে অতিভেদী রশ্মি বা বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়েছিল তার সংস্পর্শে এসে তাঁদের তিলে তিলে দীর্ঘদিন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভুগে মৃত্যু-মুখে পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল। গবেষক কর্মীদের এমনি অতিভেদী তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রশ্মির মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পারমাণবিক চুল্লীর চারদিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে পাঁচফুট পুরু বিকিরণ শোষক পদার্থের একটি দেওয়াল তোলা হয়েছিল। সুকৌশলে নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দূর থেকে চুল্লীটির কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন চলত।

নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় মেটালরিজিকাল লেবরেটরী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল শৃঙ্খল প্রক্রিয়া ছাড়াও এই চুল্লীটির সাহায্যে খুব ভালভাবে বিপুল পরিমাণে আরও একটি নতুন মৌল উৎপাদন সম্ভব। এই নতুন কৃত্রিম মৌলটির কাহিনী শুরু হয় ১৯৪০ সালে মে মাস থেকে। সেই মে মাসের কোনও একদিন দুজন গবেষক বার্কেলিতে লরেন্সের সাইক্লোট্রনে ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন ক্ষেপণ করছিলেন। এর ছয় বছর আগে ফার্মি রোমে তাঁর বিখ্যাত নিউট্রন ক্ষেপণের পরীক্ষা করে-ছিলেন। এই গবেষক দুজনের নাম এড্ুইন এম. ম্যাকমিলান ও ফিলিপ এইচ অ্যাবেলসন।

ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন বর্ষণ করলে ফল দাঁড়ায় এই যে নিউট্রনটি ইউরেনিয়মের জটিল কেন্দ্রকে প্রবেশ করে একটি ভারি ইউরেনিয়ম পরমাণু গঠন করে। সাধারণ ইউরেনিয়ম পরমাণুর আপেক্ষিক ওজন যেখানে ২৩৮, এই ভারি পরমাণুটির আপেক্ষিক ওজন সেখানে ২৩৯। এখন, এই ভারি ধরনের ইউরেনিয়ম পরমাণুটি অত্যন্ত অস্থিত প্রকৃতির। এটি নিউট্রন ও প্রোটনের সমন্বয়ে এমন ভাবে গঠিত যে, এর কেন্দ্রকের কণিকাগুলি পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণে সর্বদা বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল হয়ে থাকে। কেন্দ্রকের অতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক কণিকা জগতের এই বিক্ষুব্ধ অস্থির চাঞ্চল্য দূর করতেই যেন তার নিউট্রনগুলির একটি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়, পাঠকদের মনে আছে

বোধহয় প্রতি নিউট্রন একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। যে নিউট্রনটি বিভক্ত হয় তা থেকে একটি ইলেকট্রন বহির্গত হয়। তার প্রোটন অংশ কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রে রয়ে যায়। এই অবস্থায়, ভারি ইউরেনিয়াম পরমাণুটির নিউক্লিয়সে প্রোটনের সংখ্যা দাঁড়ায় বিরানব্বই-এর বদলে তিরানব্বই। এর ফলে সম্পূর্ণ পৃথক গুণাগুণ সম্পন্ন একটি আনকোরা নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এই ভারি ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়। এর অর্ধায়ু তেইশ মিনিট, স্বতোবিদারিত হয়ে এটি ৯৩ সংখ্যক মৌলে পরিণত হয়।

ম্যাকমিলান এই নতুন মৌলটির নাম রাখলেন নেপচুনিয়ম। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি পরে নোবেল পুরস্কার পান। এই নেপচুনিয়ম অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির। নিজের অবস্থায় যেন এরা সুখী নয়। তাই এর পরমাণুর অর্ধাংশের আড়াই দিনের মধ্যেই স্বতোবৃত রূপান্তর ঘটে, জন্ম নেয় ৯৪ সংখ্যক নতুন মৌল—ঠিক যে ভাবে নেপচুনিয়ম জন্ম নিয়েছিল, তেমনি-ভাবেই। অর্থাৎ নেপচুনিয়মের নিউট্রনগুলির মধ্য থেকে একটি নিউট্রন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে তার ইলেকট্রন অংশ কেন্দ্রকের বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়, প্রোটন অংশ রয়ে যায় কেন্দ্রকের মাঝে। এই ভাবে কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা তিরানব্বই থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় চুরানব্বইতে।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে গ্লেন টি. সীবর্গ ও তার সহযোগীবৃন্দ সর্বপ্রথম ৯৪ সংখ্যক মৌল আবিষ্কার ও সনাক্ত করেন। সীবর্গ লস এঞ্জেলস্থিত ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্লুটেনিয়ম, Pu (Plutonium-Pu) যখন তিনি আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠাশ বৎসর। এই আবিষ্কার শুধু মাত্র উদ্যোগপর্ব। কারণ এর সাত বছর পরই তাঁর অধীনে কয়েকটি গবেষক বিজ্ঞানী গোষ্ঠী ইউরেনিয়ম জাতীয় আরও সাতটি মৌল আবিষ্কার করেন।

প্লুটোনিয়ম খুবই সুস্থিত মৌল। এর উপর নিউট্রন বর্ষণ করলে অতি সহজেই ইউ-২৩৫এর অনুরূপ বিভাজন ক্রিয়া ঘটে, শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সংঘটনক্ষম নিউট্রন নির্গত হয়। এ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এখানে আমরা এমন একটি পদার্থ পাচ্ছি যা পরিকল্পিত পারমাণবিক বোমায় ইউ-২৩৫এর বদলে ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া এই নতুন মৌলটি ইউ-২৩৫ অপেক্ষা সহজে ইউরেনিয়াম থেকে পৃথক করা যায়।

ওজন করা চলে এমনি পরিমাণে প্রথম প্লুটোনিয়ম সংগ্রহের তিন মাস আগেই ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম নিয়ন্ত্রণ সাধ্য শৃঙ্খল প্রক্রিয়া ঘটান সম্ভব হয়। পারমাণবিক বোমা নির্মাণের পথে তৃতীয় বৃহৎ যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল, সেটিরও সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সমস্যা হল প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম থেকে বিশুদ্ধ ইউ ২৩৫ নিষ্কাশন করার সমস্যা। তখনও পর্যন্ত যে পদ্ধতিতে ও যে সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম থেকে এটি পৃথক করা হত, তার চেয়েও আরও কম সময়ের মধ্যে এই আইসোটোপটি উৎপাদন করার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ডব্লিউ. অ্যাস্টন ১৯১৯ সালে ইউরেনিয়ম শোধনের যে তড়িৎচুম্বকীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, বার্কেলীতে লরেন্স সেই পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন। দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভাবন করেছিলেন পারমাণবিক বোমা নির্মাণ সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত ইংরাজ বিজ্ঞানীরা। একে বলা হত গ্যাসীয় পরিব্যাপন পদ্ধতি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যারল্ড সি ইউরে ও জন ডুনিং ইউরেনিয়ম শোধনের এই পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন। বহু গবেষণাগারে শত শত বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম শোধনের উন্নততর ও দ্রুততর পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টায় বহু পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়েছিলেন। শেষে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে ইউ-২৩৫ ও প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করাই স্থির হল। পরীক্ষামূলক ভাবে বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি পরীক্ষা করার জন্য ছোটখাট কারখানা স্থাপন না করে যুগপৎ এই সব বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী বিপুল পরিমাণে ইউরেনিয়ম ও প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত ছিল সত্যই দুঃসাহসী ও ঝুঁকিদারী কার্যক্রম। অথচ এ ছাড়া তখন কোনও উপায়ও ছিল না। কারণ তখন নাৎসীরা পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করবার চেষ্টা করছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল।

পরে জানা গিয়েছিল আসলে জার্মানরা পারমাণবিক বোমার উপর খুব বেশী আস্থা স্থাপন করেনি। এর পিছনে অর্থব্যয় করেছিল তারা সামান্যই। ওরা চেয়ে ছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধজয় করতে। ওদের ধারণা হয়েছিল, সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করতে অন্ততঃ কুড়ি বছর সময় লাগবে।

প্রচুর পরিমাণে প্লুটোনিয়ম ও ইউ-২৩৫ উৎপাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়

১৯৪২ সালের শেষের দিকে। এর ফলে অতি সামান্য পরিমাণ প্লুটোনিয়ম নিয়ে গবেষণাগারের পরীক্ষা কালে নির্ধারিত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়েকটি বৃহদাকার ইউরেনিয়ম চুল্লী স্থাপন করতে হয়েছিল, সুবৃহৎ বাড়ীঘরযুক্ত কয়েকটি বিশাল নগরী নির্মাণ করতে হয়েছিল। এমনি একটি নগরী নক্সভিলের নিকট টেনেসির ওক রীজ। এখানে ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে ড্যু পণ্ট কোম্পানি প্লুটোনিয়ম উৎপাদনের জন্য হিমায়ন ব্যবস্থাযুক্ত ইউরেনিয়ম গ্রাফাইট চুল্লীসহ একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন।

এই শহরেই আবার বিশুদ্ধ ইউ ২৩৫ উৎপাদনের জন্য লরেন্সের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী আর একটি কারখানা স্থাপিত হল। গ্যাসীয় পরিব্যাপন পদ্ধতি অনুযায়ী ইউরেনিয়ম শোধনের একটি কারখানা স্থাপন করলেন ক্রাইসলার কর্পোরেশন।

শেষোক্ত কারখানাটি স্থাপনের জন্য কলাম্বিয়া নদীর গ্রাণ্ড কুলি ড্যামের নিকট একটি স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। কারখানাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'হ্যানফোর্ড এঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস'। ওয়াশিংটনস্থিত প্যাসকোর নিকট এক অতি নির্জন স্থানে এটি স্থাপন করা হয়। ড্যু পণ্ট কোম্পানি নির্মিত হিমায়ন ব্যবস্থাযুক্ত কারখানাটি চালু হয় ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

ওক রীজ ও হ্যানফোর্ডের ইউরেনিয়ম শোধনের বিরাট কারখানাগুলির নির্মাণ কার্য শেষ হবার আগেই নিউ মেক্সিকোর লস আলামোসের নিকট একটি অধিত্যকার উপর পারমাণবিক বোমার পরীক্ষাগার নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই স্থানটি সাণ্টা ফি থেকে কুড়ি মাইল দূরে এবং সমুদ্র সমতল হতে ৭০০০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। এই পরীক্ষাগারে প্রথম পারমাণবিক বোমা নির্মিত হবে। এই পরীক্ষাগারটি অনতিবিলম্বে বিশ্বের সেরা সুসজ্জিত ও সাজসরঞ্জামযুক্ত পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে পরিণত হল। এই পরীক্ষাগারে পরিচালনার ভার নিয়ে এলেন একজন তরুণ বিজ্ঞানী। তার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। এই বহুমুখী প্রতিভাবান, তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত বিজ্ঞানীর নাম রবার্ট জে. ওপেনহাইমার। ইনি অবিলম্বে লস আলামোসের পরীক্ষাগারে দেশের সেরা পদার্থ বিজ্ঞানীদের এনে জড়ো করলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এস. কে. অ্যালিসন ছিলেন এর দক্ষিণ হস্ত।

যে সব বিজ্ঞানী লস অ্যালামোসে কাজ করছিলেন বা পারমাণবিক বোমা নির্মাণে যাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন, আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্নেস্ট ও. লরেন্স, রবার্ট এ. মিলিক্যান, নীলস্ বোর, এনরিকো ফার্মি ও এডওয়ার্ড টেলার। এই সব মনীষীদের প্রতিভা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একত্রিত করে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের মূল কাজে লাগানো হয়ে ছল। প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় লস আলামোসে, ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে।

লস অ্যালামোসের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা যে তাঁদের কর্তব্য কার্য বেশ ভালভাবেই সম্পাদন করেছিলেন, মুষ্টিমেয় যে কয় ব্যক্তি ঝড় বর্ষা ও বজ্রপাতের মধ্যে প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তারা তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। পরীক্ষামূলক এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই, সকাল সাড়ে পাঁচটায়, আলবুকুয়েরকের ১২০ মাইল পূর্বে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে অবস্থিত আলোমোগোরোডো বিমান ঘাটিতে। বোমাটি চোখ ধাঁধান অগ্নিঝলক সৃষ্টি করে বিস্ফোরিত হয়েছিল। বিস্ফোরণ স্থানে আধ মাইল ব্যাসযুক্ত একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়ে তালগোল পাকান সবুজ চকচকে বালুকায় ছেয়ে গিয়েছিল। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল বিস্ফোরণ কেন্দ্রে ১০ কোটি ডিগ্রী ফারেনহিট তাপ উৎপন্ন হয়েছিল। এই দিনই পৃথিবীতে নেবে এসেছিল ভয়াবহ পারমাণবিক যুগের আতঙ্ক।

বিজ্ঞান-সৃষ্ট এই দানবিক শক্তির প্রথম পরিচয় পেল মানুষ ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট। সেদিন একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৫০,০০০ ব্যক্তির মৃত্যু হয় হিরোশিমাতে। শহরটিও প্রায় ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গিয়েছিল।

পাঁচ মাস পর, ১৯৪৬ সালের নববর্ষের আগের দিন এনরিকো ফার্মি তল্পিতল্পা গুটিয়ে শিকাগোয় ফিরে এলেন। তিনি তখন পুরাদস্তুর আমেরিকার নাগরিক। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লীয়ার স্টাডিজে 'ডিস্টিংগুইশ্ড সার্ভিসেস প্রফেসার অফ ফিজিক্স' রূপে পূর্বের মতই তিনি সমান উৎসাহ নিয়ে কাজ করে চললেন। তখনও করবার অনেক কিছুই রয়ে গেছে। এই জরুরী কাজের মাঝেও তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করতেন নতুন ছাত্রদের পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষাদানে। তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডওয়ার্ড টেলার বলেন, ফার্মি বিশ্বাস করতেন, সব চেয়ে ভাল ভাবে পড়াতে হবে সব চেয়ে পুরানো ছাত্রদের নয়। আনকোরা নতুন ছাত্রদের, 'যারা সবে বিজ্ঞান জগতে ভীরু পদক্ষেপে চলতে শুরু করেছে।'

'ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মাঝে এত বড় বিরাট কাজ ইতিপূর্বে আর কখনও সম্পন্ন হয়নি। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ঐতিহ্য, এঞ্জিনিয়ারিং ও শ্রমশিল্পে অতি উচ্চ শ্রেণীর নৈপুণ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাবেশ ও এমন এক অচিন্তনীয় জীবন মরণ পরিস্থিতি, যার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সুপরিকল্পিত, সুসংহত ও ত্বরিত কর্মপন্থা গ্রহণের, সর্বোপরি দুই মিলিয়ন ডলার অর্থব্যয়ের—এই সব ব্যাপার মিলিত হয়েই বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী কীর্তি রচনা সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে পরমাণু-শক্তি আহরণের যে অন্বেষণ চলছিল এবার তা শেষ হল। কিন্তু এই পরমাণু শক্তি জয় করে মানুষ এক নতুন ও সঙ্কটজনক সমস্যা সৃষ্টি করে বসল।

পারমাণবিক বোমা রোধ করতে পারে এমন কোনও অস্ত্র মানুষের হাতে নেই। ফার্মি এ কথা অস্বীকার করেন না। হ্যারল্ড সি. উরে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'পারমাণবিক বোমার বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যদি আমরা এখনই ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তা হলে আমাদের আতঙ্কের মাঝে খেতে ঘুমোতে ও মরতে হবে' বহু বিজ্ঞানী এ কথার যথার্থতা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আরও অনেক বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কৃত হলেও কিন্তু পরমাণু বিভাজনের মত এমন বিশ্বগ্রাসী দ্রুত সর্বনাশা, এবং বৈপ্লবিক আবিষ্কার আর কখনও ঘটেনি। বিজ্ঞানের আর কোনও আবিষ্কারের ফলাফল একত্র মিলে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেনি যার দ্বারা, সামান্য একটি বোতাম টিপলেই মানব সভ্যতা সমূলে ধ্বংস হতে পারে।

অন্য আর একদিক দিয়েও পরমাণু বিভাজন বিজ্ঞানের অন্যান্য কীর্তি থেকে পৃথক। ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্বের মূল শক্তি মানুষের হাতের মুঠোয় এল। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা এতে এক লাফে প্রায় এক শতাব্দী এগিয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বৈষয়িক উন্নতি ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের উপযোগী বিপুল সমাহৃত শক্তি মানুষের অনায়াসলব্ধ সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

সে সময় আমেরিকাই বিশ্বে পারমাণবিক বোমার একমাত্র অধিকারী ছিল। কাজেই এই মারাত্মক অস্ত্রটি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের নিকট প্রস্তাব পেশ করবে তা স্বাভাবিক। ১৯৪৬ সালের ১৩ই জুন, রাষ্ট্র সঙ্ঘের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বার্নার্ড বারুচ এমনি একটি প্রস্তাব করেন। ছয়দিন পর রাশিয়ার তরফ থেকে আন্দ্রেই

গ্রোমিকো আর একটি প্রস্তাব পেশ করেন। আজ পর্যন্ত কোনও প্রস্তাবই গৃহীত হয় নি। শঙ্কিত বিশ্ব আজও এই পারমাণবিক বোমার সার্বিক ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবার সূত্রের অনুসন্ধান করে চলেছে।

বছরের পর বছর ধরে এই পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলেছে। এই সময়ে ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ও এই প্রকল্পবহির্ভূত বিজ্ঞানীরা পরমাণু সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। এতে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক নতুন প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এবং অনেক নতুন নতুন ক্ষেত্রে এই পরমাণু শক্তির ব্যবহার করা গেছে। এই পরমাণু শক্তির সাহায্যে মানুষ অজ্ঞাতপূর্ব বহু মৌল আবিষ্কার করেছে, বহু প্রয়োজনীয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রস্তুত করেছে, এবং ইতিপূর্বের আবিষ্কৃত চারটি রাসায়নিক মৌল অসন্দিগ্ধরূপে সনাক্ত করেছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রথম পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত করার বিস্ময়কর অবদানের জন্য ২৫,০০০ ডলারের একটি বিশেষ পুরস্কার দেন ফার্মিকে। তিনিই প্রথম কমিশনের নিকট থেকে এমনি পুরস্কার পেলেন। জনসাধারণ অবশ্য জানত না যে ফার্মি তখন মারাত্মক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং রোগের সঙ্কটাবস্থা দেখা দেওয়ায়, এক মাস পূর্বে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের নিকট হতে এই অসাধারণ সম্মান লাভের বার দিন পর তিপ্পান্ন বছর বয়সে ফার্মি মারা যান। বিশ্ববাসী যখন এই মহাবিজ্ঞানীর তিরোধানে শোক প্রদর্শনে ব্যস্ত তখন ইতালীর প্রেসিডেন্ট লুইগি ইনউদি ফার্মির পত্নীকে তারযোগে শোকবার্তা প্রেরণ করে জানান, 'ইতালী এই মহামানবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে। ইনি নিউক্লীয় পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্যাবলীর অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরে আপন নাম সংযুক্ত করে রেখে গেছেন।'

পরমাণু বিভাজন সম্ভব হওয়ায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ক্ষেত্রেও দ্রুত তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি দেখা দিল। এগুলি এখন পারমাণবিক চুল্লীতে সাইক্লোট্রনের তুলনায় একশ কোটি গুণ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক পারমাণবিক চুল্লীতে স্থাপন করে তার উপর চুল্লীর নিউট্রন বর্ষণ করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হচ্ছে

থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এমনি নিউট্রন বর্ষণে পদার্থের রূপান্তর ঘটে যায়। ইতিমধ্যেই কয়েক শত নতুন ধরনের আইসোটোপ সৃষ্টি করা গেছে এবং এগুলি সারা বিশ্বের বিভিন্ন গবেষকদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের নানা শাখায় পরীক্ষা কার্য চালানোর পক্ষে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এক নতুন, অভিনব ও অতি সূক্ষ্ম হাতিয়ার। দুই দিনের কম সময়ের মধ্যে এগুলি পৃথিবীর যে কোনও স্থানে প্রেরণ করা যায়। বিচ্ছুরিত বিকিরণের ভেদন ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন বেধবিশিষ্ট সীসার পাতে তৈরী পাত্রে ভর্তি করা হয় এগুলি স্থানান্তরে প্রেরণ কালে। যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি হল, আয়োডিন ১৩১, ফসফরাস ৩২, কোবাল্ট ৬০, এবং কার্বন-১৪। আয়োডিন ১৩১ আইসোটোপ শুধু থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারের কারণ অনুসন্ধান কার্যেই ব্যবহৃত হয় না, রোগাক্রান্ত থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসাতেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ৬০ আইসোটোপটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৮ সালে। এটি এখন ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিয়াম ও রঞ্জন রশ্মির বদলে ব্যবহৃত হয়। কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে ফসফরাস-৩২ আইসোটোপটির বিপুল উপযোগিতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। অধিক পরিমাণে ও সুপুষ্ট শস্যদানা উৎপাদনের জন্য জমিতে ফসফেট সার মিশ্রণের সর্বোত্তম পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছে এই ফসফরাস ৩২ আইসোটোপটি। বার্কেলির লরেন্সের গবেষণাগারের উদ্ভাবনদক্ষ মেলভিন কেলভিনের হাতে কার্বন-১৪ আইসোটোপটি, উদ্ভিদ জগতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া, সালোক সংশ্লেষের বহু রহস্য ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত করছে। শ্রম শিল্পের অনেক সমস্যা সমাধানের কাজেও আইসোটোপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় লৌহ ও গন্ধক, ইস্পাত শিল্পে, লৌহ ও ব্লাস্ট ফার্নেসে উৎপন্ন ধাতু মলের মধ্যকার গন্ধক বিনিময় অনুসন্ধানের সাহায্য করছে। এঞ্জিনের ক্ষয়, রবার টায়ার ও ভারি যন্ত্রপাতির চলমান অংশের উপর তাপ ও ঘর্ষণের প্রতিক্রিয়া এই নতুন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে পরীক্ষিত হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে ১৯৫৭ সালে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমেরিকার যন্ত্র শিল্পে প্রায় আধ বিলিয়ন ডলার বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনেক সময় অনেক অদ্ভুত কাজে লেগে যায়। যেমন ধরা যাক কার্বন-১৪ আইসোটোপটির কথা। ১৯৪৬ সালে উইলার্ড

এফ. লিব্বি (তখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত) এই আইসোটোপটির সাহায্যে অতি সুপ্রাচীন বস্তুসমূহের—যেগুলি হয়ত খৃষ্টপূর্ব ৩০০০০ বছর পূর্বে নির্মিত—সেগুলিরও সঠিক বয়স নির্ধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রাচীন মোমির কাঠের শবাধার, ও পোশাক পরিচ্ছদ, প্রাচীন দগ্ধ গৃহের কাষ্ঠ, পুরা কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, শিল্প বস্তু, প্রাগৈতিহাসিক গুহায় প্রাপ্ত হাড় ও কাঠ কয়লার টুকরা, এবং অতি সম্প্রতি কালে প্রাপ্ত ডেড সী স্ক্রোল (সম্ভবত ১৯০০ বৎসরের প্রাচীন)—এসবেরই বয়স এদের কার্বন-১৪ থেকে নির্গত ইলেকট্রন সংখ্যার হিসাব করে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা গেছে। এই পদ্ধতিটি—নির্ভুলতার দিক দিয়ে অতিশয় কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছাত্রদের নিকট পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ও জৈবিক বিবর্তনের কাল নির্ণয়ে এটি এক চমকপ্রদ ও নির্ভরযোগ্য অস্ত্র।

পরমাণু শক্তির ব্যবহার এখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য, কীটপতঙ্গ, উৎপাদন, উদ্ভিদ ও কীটের শারীর বৃত্ত ক্রোমোসোমের পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, খাদ্য নির্বীজন, ও শ্রমশিল্প গবেষণার বিবিধ ক্ষেত্রে এই রাসায়নিক গোয়েন্দা ও নিরাময়ক আইসোটোপগুলির ব্যবহার কার্যতঃ সীমাহীন। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিমূলক অবদানে গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

পরমাণু শক্তি আবির্ভাবের ফলে বিজ্ঞানের এইসব নতুন ও চমকপ্রদ উন্নতি ছাড়াও রয়েছে মানুষের পক্ষে এর সাহায্যে অসীম নূতন শিল্প শক্তি সংগ্রহের সম্ভাবনা। পরমাণু শক্তি মানুষের হয়ে কাজ করবে, কলকারখানা, খনি, ক্ষেত-খামারে মানুষকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির হাত থেকে বাঁচাবে। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে। প্রতি পরমাণু চুল্লীই এক একটি সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। পরমাণু-চুল্লীতে ইউরেনিয়ম বিভাজিত হবার সময় বিপুল তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে জল বাষ্পীভূত হয়ে সাধারণ টার্বাইন চালাতে পারে। এইভাবে পরমাণু শক্তি চালিত যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে তা প্রয়োজন মত যত্রতত্র সরবরাহ করা যাবে।

১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারত, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র সহ কয়েকটি দেশে অন্তত আটটি পরমাণু-চুল্লী ব্যবহৃত হচ্ছিল বা এসব দেশের

দ্বারা বা এসব দেশের জন্য তৈরী হচ্ছিল। এই সব ও অন্যান্য চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পায় সেই বছরের আগস্ট মাসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সম্পর্কে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে আহূত রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

অনুন্নত দেশগুলির কথা আর কি বলা যায়? পৃথিবীর সব শক্তিবুভুক্ষু দেশগুলির শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প মূল্যে প্রচুর শক্তি প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলির কয়েকজন বিজ্ঞানী একথা বললেন। পাকিস্তান ও ইরাক স্বল্প পরিমাণ শক্তি উৎপাদনক্ষম পরমাণু-চুল্লী পেতে চায়। ব্রেজিল ও আর্জেণ্টিনার প্রতিনিধি জানালেন, চিরাচরিত জ্বালানীর অভাবে তাঁদের দেশে শিল্পোন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলির কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের কাজে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের এক অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। অনুন্নত তিনটি মহাদেশ সাহায্যের আশায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

'কিভাবে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি তার জীবন শুদ্ধ পবিত্র ও মধুময় করে তুলতে পারে' তার উপায়ের অনুসন্ধানে, এক বছরের কিছু আগে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় 'শান্তির কাজে পরমাণু' সংক্রান্ত একটি কার্যক্রম পেশ করেন। এই কার্যক্রম অনুযায়ী তিনি প্রথমে পরীক্ষা কার্যে, শেষে শ্রমশিল্পে ব্যবহার্য পরমাণু চুল্লী নির্মাণের জন্য ঋণদান ও ইজারার ভিত্তিতে অবাধে পারমাণবিক জ্বালানী সরবরাহ করার প্রস্তাব করেন। আঠারো মাস পর তিনি এই সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করেন। তারপর ১৯৫৬ সালের প্রথমদিকে সারা বিশ্বকে চমকিত করে তিনি ঘোষণা করলেন যে এদেশে এবং বিদেশে শান্তির কাজে পরমাণু-শক্তির ব্যবহারের সহায়তা করবার জন্য ৮৮০ পাউণ্ড ইউ-২৩৫ সরবরাহ করা হবে। এক বছর ধরে যথোচিত রক্ষা-কবচ সহ ইউরেনিয়মের অধিকাংশ, যে সব দেশ ইউ-২৩৫ উৎপাদন করে না সেই সব দেশে প্রেরণ করা হবে। আইসেনহাওয়ার বললেন যে, 'বিশ্বশান্তি সুদৃঢ় করতে পরমাণুশক্তিকে যে এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত করা চলে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী একটি কাজ' এটা।

বহু বর্ষ আগে আলফ্রেড নোবেল বলেছিলেন, 'আমি ভাবি যদি এমন একটা অস্ত্র তৈরী করতে পারতাম, যার সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা এমনি ভয়ঙ্কর যে তার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।' পরমাণু বিভাজন ও

সংযোজন (fusion) সেই আশা খুব নিকটবর্তী করেছে। ওপেনহাইমার ঘোষণা করেছিলেন, ‘কারণ পরমাণু যুগের অভিনবত্ব এই যে এক বিশ্বজনীন সর্বনাশের সামনে বিশ্ব এক আইনকানুন সাধারণ বোঝাপড়া ও সাধারণ মানবতার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হবে।’

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর সাফল্যের সঙ্গে যেদিন শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সংঘটন করা হয়েছিল, সেই দিনই পৃথিবীতে পারমাণবিক যুগের সূত্রপাত হয়। পাঁচ বছর পর এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফলক উৎকীর্ণ করা হয়। সেই দিনই, হিরোসিমার অধিবাসীরা যখন পারমাণবিক বোমা বর্ষণের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করতে কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে, তখন নিউ মেকসিকোর আলামোগরোডোর মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহ-সৃষ্ট এক বালিয়াড়ীতে একটি কাষ্ঠনির্মিত সুবৃহৎ শাদা ক্রুশ স্থাপন করা হচ্ছিল (এই আলামোগরোডের মরুভূমিতেই প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করা হয়)। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের ছোট একটি দল সমবেত হয়েছিল সেখানে। দেখা দিয়েছিল পৃথিবীর সব দেশের জাতীয় পতাকার বর্ণ সমারোহে রামধনু রঙের জৌলুষ। এরা এখানে সমবেত হয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে পরমাণু-যুদ্ধ পরিহার করার আবেদন জানাতে। সেই সময় বোমা-বিধ্বস্ত হিরোসিমার জীবিত অধিবাসীরা প্রার্থনা জানাচ্ছিল মানবতার কাছে, চিরতরে যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করার জন্য।

প্রাচীন কিমিয়াবিদগণ বার্ধক্য দূর করতে ও পরমায়ু বৃদ্ধি করতে মানুষকে মৃতসঞ্জীবনী দান করে যেতে পারেনি। পরমাণু বিভাজন ও সংযোজন সম্ভব করে, আধুনিক কিমিয়া মানুষকে সেই সঞ্জীবনী সুধা এনে দিয়েছে। অবশ্য যদি আমরা মানব সমাজকে যুদ্ধবিগ্রহ হতে নিবৃত্ত করতে পারি, তবেই এই সঞ্জীবনী ভোগ করা চলবে। কারণ এই পারমাণবিক যুগে যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হওয়ার অর্থ হবে সামূহিক ধ্বংস।

———

নির্ঘণ্ট

ফ্রীম্যাসন (Freemason) ঃ একটি সঙ্ঘ। মধ্যযুগ কি তারও আগে থেকে ফ্রীম্যাসনদের এই সঙ্ঘ চলে আসছে। এটি অনেকটা গুপ্ত ধরনের সংস্থা। সামাজিক প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য ও পারস্পরিক সাহায্যের জন্য এদের নিজস্ব আবাস থাকে। এই সংস্থা পৃথিবীব্যাপী।

ক্যাথিটার (Catheter) ঃ দেহের রন্ধ্রপথে (বিশেষতঃ মলদ্বারে বা প্রস্রাবের দ্বারে) প্রবেশ করাইয়া বায়ু বা তরল পদার্থাদি ঢুকাইবার বা বাহির করিবার নল-বিশেষ।

গিরোনডিস্ট (Girondists) ঃ ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রথম দিকে এই দলটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। এরা নরমপন্থীদল। ১৭৯২ সাল পর্যন্ত এরা খুবই শক্তিশালী ছিল। রবেসপেরি ও তার দলবল এদের হটিয়ে দেয়।

ফরাসী জাতীয় পরিষদ (French National Assembly) ঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সংঘটনকারী সংস্থার নাম।

ফ্লগিস্টনবাদ (Theory of Phlogiston) ঃ এই মতবাদ অনুসারে মনে করা হত দাহ্য বস্তুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্লগিস্টন। এই বস্তুটি কি তা বিজ্ঞানীরা বলতে পারতেন না। এটি কেউ কখনও দেখেন নি। দহন ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হত এই ভাবে যে দহনকালে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দাহ্যবস্তু তার ফ্লগিস্টন হারায়।

ওয়াটার ফ্রেম (Water Frame) ঃ আর্করাইট আবিষ্কৃত সুতাকাটার যন্ত্র। জল শক্তিতে চলত বলে নাম ওয়াটার ফ্রেম। ল্যাঙ্কাশায়ারে বলা হত "Throstle"।

ম্যাসন ও ডিকসন লাইন (Mason and Dixon line) ঃ পেনসিলভানিয়ার দক্ষিণের অর্থাৎ ডেলাওয়ার, মেরিল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ার কিয়দংশের উত্তরের সীমা রেখা। গৃহযুদ্ধের পূর্বে, ওই সীমারেখা দাসপ্রথাযুক্ত ও দাসপ্রথামুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা বলে গণ্য হত।

প্রত্নজীব বিদ্যা (Paleontology) ঃ ভূ-বিদ্যার একটি শাখা। ভূ-প্রোথিত জীবজন্তুর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক বিরাটকায় জীবজন্তু সম্বন্ধে তথ্য আহরণ এই শাখার অন্তর্গত।

জনি অ্যাপেলসীড (Johnny Appleseed): আমেরিকার সর্বত্র ইনি আপেলের বীজ ছড়িয়ে আমেরিকায় আপেল গাছ জন্মানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

ক্রেটাশিয়াস উপযুগ (Cretacious Period): মধ্যজীবীয় (সরীসৃপদের যুগের অন্তর্গত উপযুগ। এটি ১১ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে।

প্লিওসেন উপযুগ (Pliocene Period): নবজীবীয় স্তন্যপায়ীদের যুগের উপযুগ। দেড় কোটি বৎসর পূর্বে শুরু হয়েছিল। উদ্ভিদদের সর্বোতোভাবে উন্নতি দেখা যায়।

প্লিস্টোসেন উপযুগ (Pleistocene Period): নবজীবীয় স্তন্যপায়ীদের যুগের উপযুগ। ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে শুরু। অতিকায় জন্তুদের বংশ লোপ। মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটে।

জুরাসিক যুগ (Jurassic Period): মধ্যজীবীয় যুগের উপযুগ। ১৪ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়। সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্র্য। ডাঙ্গায় বৃক্ষের উন্নতি। দাঁতওয়ালা সরীসৃপ। তার থেকে ক্রমশ পাখির আবির্ভাব।

আর্কেওজোয়েক মহাযুগ (অধিকল্প) (Archaeozoice Era): আদিমতম যুগ। দেড়শকোটি বছর পূর্বে শুরু। এই সময় এক-কোষযুক্ত জীবের ও উদ্ভিদের প্রথম আবির্ভাব হয়।

প্রোটেরোজোয়েক মহাযুগ (Proterozoic Era): কঠিন আবরণ বিহীন স্বল্পকোষী সামুদ্রিক জীবাণু। একশ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল।

এয়োসেন উপযুগ (Eocene Period): নবজীবীয়, (স্তন্যপায়ীদের) যুগের উপযুগ—৭ কোটি বৎসর পূর্বে শুরু হয়।

মাইওসেন উপযুগ (Meocene Period): নবজীবীয় যুগের উপযুগ। ৩ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়। আধুনিক সপুষ্পক বৃক্ষের উন্নতি।

ট্যামনী দল: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন ডেলাওয়ার সর্দারের নাম ছিল ট্যামনিসেণ্ট। ১৭৮৯ সালে এর নাম অনুসারে ট্যামনি সোস্যায়িটি স্থাপিত হয়। সমিতির গৃহটি ট্যামনি হল নামে পরিচিত। একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এই হলটি ভাড়া দেওয়া